ভূমিকা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম ৮টি পত্রে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্গত খ-১ পর্যায়। এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় বাংলা কবিতার ছন্দ। আলোচনা মূলত ২টি ভাগ—ছন্দতত্ত্ব আর ছন্দ-বিশ্লেষণ। ছন্দতত্ত্বকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হল, চতুর্থ ভাগে রইল ছন্দ-বিশ্লেষণ। গোটা পর্যায়টিও ৪টি এককে বিভক্ত। প্রথম ৩টি এককে ছন্দতত্ত্ব, চতুর্থ এককে ছন্দ-বিশ্লেষণ। প্রতিটি এককের অন্তর্গত বিষয়বস্তু এই রকম ঃ

একক ২৩ ঃ বাংলা ছন্দের পরিভাষা এই এককের আলোচনার বিষয়। বাংলার দুই প্রথম সারির ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন আর অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘকালীন ছন্দচর্চার ফসল থেকে তুলে আনা হয়েছে ৩৬টি পরিভাষা এর মধ্য থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি পরিভাষা বেছে নিয়ে দৃষ্টান্তসহ এদের ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল এই এককে। বাকি ১৩টি পরিভাষা ব্যাবহারিক পর্যায়ের—প্রয়োগসূত্রে তাদের ব্যাখ্যা রয়েছে পরের এককগুলিতে।

একক ২৪ ঃ বাংলা ছন্দের ৩টি রীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হল এই এককে। সবরকমের বাংলা কবিতার ছন্দ যে শেষপর্যন্ত ৩টি রীতির মধ্যে আবদ্ধ, এ বিষয়ে বিতর্ক না থাকলেও এদের নাম নিয়ে বিতর্ক এখনো টিকে আছে। সেই কারণে প্রবোধচন্দ্রের আর অমূল্যধনের দেওয়া চূড়ান্ত নামকরণ-দুটিই প্রতিটি রীতির ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হল, এই এককে দৃষ্টান্তসহ সেসব ব্যাখ্যাও করা হল সেইমতো।

একক ২৫ ঃ বাংলা কবিতার ছন্দবন্ধ এই এককে আলোচিত। ছন্দের রীতি কবিতার ছন্দের ভেতরকার পরিচয়, তার আলোচনা থাকবে একক-২এ। ছন্দবন্ধ ছন্দের বাইরের পরিচয়। বাংলা কবিতায় ছন্দের এই বাইরের রূপটি কালের অগ্রগতির সঙ্গো সঙ্গো কীভাবে একঘেয়ে প্রথার শাসন থেকে মুক্তি পেল, ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠল, তার দুটি-একটি দিক তুলে ধরা হল এই এককে। আলোচনা অবশ্য সীমিত রাখতে হল পয়ার, অমিত্রাক্ষর, আর চতুর্দশপদীর গণ্ডির মধ্যে।

একক তিনটি মনোযোগ আর সতর্কতার সঙ্গো পাঠ করলে বাংলা কবিতার ছন্দতত্ত্ব আর প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা তৈরি হতে পারবে, ছন্দবোধ আরো সমৃদ্ধ হতে পারবে, ছন্দ জিজ্ঞাসা বাড়বে এবং বাংলা ছন্দের খুঁটিনাটি নিয়ে জমে-ওঠা বিতর্ক-বিভ্রান্তি থেকে শিক্ষার্থীরা দূরে সরে থাকতে পারবেন।

এই পর্যায়ের এককগুলি তৈরি করতে বিস্তর সাহায্য করছে এই ৩টি বই ঃ

১. প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা (১৯৮৬)।

২. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৮৩)।

৩. পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ (১৯৯৯)।

একক ২৩ ❒ বাংলা ছন্দের পরিভাষা (প্রাথমিক পর্যায়)

গঠন

২৩.১ উদ্দেশ্য
২৩.২ প্রস্তাবনা
২৩.৩ মূলপাঠ-১ ঃ ছন্দ, তার উপাদান
২৩.৩.১ ছন্দ
২৩.৩.২ বর্ণ, ধ্বনি
২৩.৩.৩ অক্ষর, দল
২৩.৩.৪ মাত্রা, কলা
২৩.৩.৫ ছেদ, যতি
২৩.৪ সারাংশ-১
২৩.৫ অনুশীলনী-১
২৩.৬ মূলপাঠ-২ ঃ ছন্দের নানাবিভাগ
২৩.৬.১ পর্ব, পদ
২৩.৬.২ পর্বাঙ্গ, উপপর্ব
২৩.৬.৩ চরণ, পঙ্‌ক্তি
২৩.৬.৪ স্তবক, শ্লোক
২৩.৭ সারাংশ-২
২৩.৮ অনুশীলনী-২
২৩.৯ মূলপাঠ-৩ ঃ উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব
২৩.৯.১ সংশ্লেষ, বিশ্লেষ
২৩.৯.২ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর
২৩.৯.৩ তান, মিল
২৩.১০ সারাংশ-৩
২৩.১১ অনুশীলনী-৩
২৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি-৩

২৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন তাহলে—

- বাংলা কবিতার আশ্রয়ে গড়ে-ওঠা বাংলা ছন্দের তত্ত্ব যে আধুনিক বিজ্ঞানেরই আর-একটি শাখা হয়ে উঠতে পারে এ-রকম বিশ্বাস আপনার মনে তৈরি হবে।

- বিজ্ঞান হয়ে ওঠার পথে বাংলা ছন্দতত্ত্বের সামনে যেসব তর্কের বাধা আছে, তা কমিয়ে আনার জন্য যুক্তি তথ্য খুঁজে নিতে পারবেন।
- বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক পরিভাষা প্রয়োগ করতে পারবেন।

২৩.২ প্রস্তাবনা

ছন্দ নিয়ে আলোচনার অর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় ছন্দ নিয়ে বিতর্ক বাড়ানো, বিভ্রান্তি ছড়ানো। এর কারণ, বাংলা ছন্দতত্ত্ব এখনো পুরোপুরি বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি। সেই ফাঁকে ছন্দ-ভাবুকেরা নতুন নতুন কথা বলেন, নতুন নতুন পরিভাষা তৈরি করে এর সংখ্যা বাড়িয়ে চলেন। এতে করে ছন্দ-ভাবনার আয়তন ক্রমশ বাড়ে এ কথা ঠিক, কিন্তু সেই বাড়তে থাকা আয়তনে নতুন শিক্ষার্থীরা দিশাহারা হয়ে পড়েন, পথ হারিয়ে ফেলেন। এ সমস্যার সমাধান—ছন্দকে বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করানো। এটা করতে গেলে আবশ্যক এমন নির্দিষ্ট কিছু পরিভাষা, যা সবার কাছে মান্য হতে পারে, যার প্রয়োগে বাংলা ছন্দের সূত্র এবং তত্ত্বগুলি শিক্ষার্থীর কাছে একটিমাত্র রূপ নিয়ে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, অন্তর্বর্তী কালের ব্যবস্থা হিসেবে ততক্ষণ শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় হতে পারেন বাংলা ছন্দচর্চায় অগ্রণী ছান্দসিক **প্রবোধচন্দ্র সেন** আর **অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়**। এঁদের তৈরি এবং বাবহার করা অনেকগুলি পরিভাষা বাঙালি ছন্দ-জিজ্ঞাসুর কাছে এখনো শ্রদ্ধেয়। এঁদের ছন্দ-ভাবনা দুটি পৃথক স্রোতে প্রবাহিত হলেও কিছু কিছু পরিভাষা দুজনের কাছেই গ্রাহ্য, অবশ্য অনেকগুলিই রূপে বা অর্থে পৃথক। এর মধ্যে যেসব পরিভাষা তর্ক এড়িয়ে এঁদের শেখানো পদ্ধতিকেই বুঝতে সাহায্য করে, তেমন কয়েকটি নেওয়া হল।

অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগে রয়েছে প্রায় ৫০টি প্রধান পরিভাষা (শাখাপ্রশাখা বাদ দিয়ে)। দুজনের ভাগ প্রায় সমান সমান। এ থেকে বেছে নেওয়া হল ৩৬টি—কেবল অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ১০টি, কেবল প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ১৪টি, আর দুজনের মিলিত প্রয়োগ থেকে ১২টি। পরিভাষাগুলির মধ্যে আবার ২টি ভাগ —২৩টি প্রাথমিক পর্যায়ের, বাকি ১৩টি ব্যাবহারিক পর্যায়ের। প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি পরিভাষার ব্যাখ্যা প্রথম এককের বিষয়। ব্যাবহারিক পর্যায়ের ১৩টি পরিভাষা ব্যাখ্যাসহ সরাসরি ব্যবহার করা হবে দ্বিতীয় আর তৃতীয় এককে। প্রথম এককের মূলপাঠকে ৩টি অংশে ভাগ করা হল ৩টি পৃথক নামে। প্রথম অংশের নাম 'ছন্দ, তার উপাদান'—এতে আছে ৯টি পরিভাষা, দ্বিতীয় অংশ 'ছন্দের নানাবিভাগ'—এতে রয়েছে ৮টি, তৃতীয় অংশ 'উচ্চারণের কয়েকটি স্বভাব'-এ আছে বাকি ৬টি পরিভাষার পরিচয়।

নির্বাচিত পরিভাষার তালিকাটি এইরকম (মোট ৩৬টি)—

১। **প্রাথমিক পর্যায়ের ২৩টি ঃ**

প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ৯টি—দল, কলা, উপপর্ব, পদ, পঙ্‌ক্তি, শ্লোক, প্রস্বর, সংশ্লেষ, বিশ্লেষ।

অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ৬টি—অক্ষর, ছেদ, পর্বাঙ্গ, চরণ, শ্বাসাঘাত, তান।

উভয়ের প্রয়োগ থেকে ৮টি—ছন্দ, বর্ণ, ধ্বনি, মাত্রা, যতি, পর্ব, স্তবক, মিল।

২। **ব্যাবহারিক পর্যায়ের ১৩টি ঃ**

প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে ৫টি—দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত, প্রবহমানতা, মুক্তক।

অমূল্যধনের প্রয়োগ থেকে ৪টি—শ্বাসাঘাতপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান, চতুর্দশপদী।

উভয়ের প্রয়োগ থেকে ৪টি—ছন্দরীতি, ছন্দবন্ধ, পয়ার, অমিত্রাক্ষর।

২৩.৩ মূলপাঠ-১ ঃ ছন্দ, তার উপাদান

ধরুন, আপনি একটি পাকা বাড়ি তৈরির কথা ভাবছেন। এর জন্য আবশ্যক চুন, সুরকি, বালি, সিমেন্ট, কাঠ, লোহা—এ সব মাল-মশলা বা উপাদান। সঠিক অনুপাতে আর সঠিক পরিমাণে এদের মিশ্রণ আর সঠিক কৌশলে এদের প্রয়োগ ঘটলেই ক্রমশ গড়ে উঠবে একটি মজবুত বাড়ি। তেমনি, কবিতা লেখার উপাদান **বর্ণ,** কবিতা উচ্চারণের উপাদান **ধ্বনি, অক্ষর** বা **দল**। কবিতার ছন্দ নিয়ে যখন ভাবব, তখন কবিতার উপাদান হয়ে ওঠে ছন্দেরও উপাদান। কবিতার উপাদান ছাড়াও ছন্দ-গঠনের জন্য আবশ্যক হয় ছন্দের নিজস্ব আরো কয়েকটি উপাদান—**মাত্রা** বা **কলা** আর **যতি,** প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে **ছেদ**-এর ভূমিকা। সেই কারণে, ছন্দ আর তার উপাদানগুলির পরিভাষা হবে প্রথম এককের মূলপাঠের প্রথম অংশের বিষয়। মূলত একই উপাদানকে নির্দেশ করে—এ রকম ১টি করে পরিভাষা বেছে নেওয়া হবে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের প্রয়োগ থেকে। প্রয়োগের দিক থেকে প্রতি জোড়া পরিভাষার মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় পার্থক্য, তা আপনাদের দেখানো হবে দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে। **ছন্দ**-ই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়, অতএব শুরুতেই একটু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই পরিভাষাটি বুঝে নিন। তারপর ক্রমশ জেনে নিন ছন্দের ৮টি উপাদানের পরিভাষা আর তাদের পরিচয়।

২৩.৩.১ ছন্দ

'ছন্দ' কাকে বলব, এই নিয়ে দুজন ছান্দসিকের দু-রকমের কথা শোনা যাক।

১। 'যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়' তাকে 'ছন্দ' বলতে চান অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

২। 'উচ্চারণ আর বিরামের সুশৃঙ্খল ও আবর্তনময় বিন্যাসকে 'ছন্দ' বলতে চান পবিত্র সরকার।

প্রথম কথাটির অর্থ—যেভাবে কথার পর কথা সাজালে শুনতে ভালো লাগে, তারই নাম ছন্দ। অর্থাৎ, কথা নয়, কথা সাজানোও নয়, ছন্দ আসলে কথা সাজানোর এমন একটি কৌশল বা শৃঙ্খলা যার গুণে কথা মধুর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ—কথার উচ্চারণ, একটু থামা, আবার উচ্চারণ, আবার থামা—কথাগুলি আলাদা হলেও কথার উচ্চারণ আর বিরাম যদি পরপর একইভাবে বিশেষ একটি নিয়মে বা শৃঙ্খলায় ঘুরে ঘুরে আসে, তাহলে কথার এই বিশেষ নিয়মে ঘুরে-ঘুরে-আসা-টাই হবে ছন্দ।

তাহলে দেখছি, কেউ বলেন—কথা সাজানোর শৃঙ্খলাটাই ছন্দ, আবার কেউ বলতে চান—শৃঙ্খলার সঙ্গে কথা সাজানোটাই (বিন্যাসটাই) ছন্দ। মুখের ছন্দ বললে বুঝি কেবল মুখের গড়নটুকু, চলার ছন্দ বললে বোঝায় চলার ভঙ্গিটাই। কিন্তু, কবিতার ছন্দ বলতে বুঝব কথা সাজানো আর সাজানোর শৃঙ্খলা একই সঙ্গে।

কথার এই ছন্দ বক্তৃতায় থাকতে পারে, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের গদ্যে থাকতে পারে, কবিতায় তো থাকেই। আমরা যে ছন্দ নিয়ে এ পর্যায়ের আলোচনা করব, তা কেবল কবিতারই ছন্দ—আরো নির্দিষ্ট করে বলতে তা হবে কেবল বাংলা কবিতার পদ্যের ছন্দ।

এবারে বাংলা কবিতার একটি অংশ পড়ে পড়ে বুঝে নিই, কথার উচ্চারণ আর বিরামের এই খেলাটি কী রকম—

নৌকা ফি সন | ডুবিছে ভীষণ | রেলে কলিশন | হয় ||
হাঁটিতে সর্প | কুক্কুর আর | গাড়ি-চাপা-পড়া | ভয় ||

কবি দ্বিজেন্দ্রনাল রায়ের লেখা 'হাসির গান' কাব্যের 'নন্দলাল' কবিতা থেকে নেওয়া এই দুটি ছত্রের প্রথম ছত্রটি পড়তে পড়তে ৪-বার থামলেন। 'নৌকা ফি সন' কথাটুকু উচ্চারণ করে একটু থামা, তারপর 'ডুবিছে ভীষণ' উচ্চারণ করে আর একটু থামা, এরপর 'রেলে কলিশন' উচ্চারণ ও আবার থামা, এবং সবশেষে ছোট্ট কথা 'হয়' উচ্চারণের পর একটু বেহশি থামা (।- চিহ্নের জায়গায় কম থামা আর ॥-চিহ্নের জায়গায় বেশি থামা)। এবারে দ্বিতীয় ছত্রটি পড়ুন। লক্ষ করুন, একইভাবে 'হাঁটিতে সর্প' 'কুক্কুর আর' 'গাড়ি-চাপা-পড়া'—এই ৩টি কথার উচ্চারণের পর ৩ বার একটুখানি করে থামা, শেষ কথা ছোট্ট 'ভয়'-এর উচ্চারণ করেই পুরোপুরি থামা।

এখন আন্দাজ করুন এক-একটি কথার উচ্চারণের মাপ। উচ্চারণ শুনতে শুনতে কানে খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবে—প্রথম ছত্রের প্রথম ৩টি কথা (নৌকা ফি সন, ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন) সমান মাপের, শেষ কথাটি (হয়) মাপে বেশ ছোটো। একইভাবে দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম ৩টি কথা (হাঁটিতে সর্প, কুককুর আর, গাড়ি-চাপা-পড়া) পাশাপাশি সমান মাপের, শেষ কথাটি ('ভয়') ছোটো। এবারে ওপরে-নীচে মিলিয়ে দেখুন, প্রথম ছত্রের কথাগুলি পরপর নীচের ছত্রের কথাগুলির সঙ্গে সমান মাপের ('নৌকা ফি সন' আর 'হাঁটিতে সর্প' , 'ডুবিছে ভীষণ' আর 'কুক্কুর আর', 'রেলে কলিশন' আর 'গাড়ি-চাপা-পড়া', 'হয়' আর 'ভয়')। মাপগুলি অবশ্যই ইঞ্চি-সেন্টিমিটার বা মিনিট-সেকেন্ড ধরে নয়, কবিতার উচ্চারণ শুনে শুনে কান অভ্যস্ত হয়ে উঠলে সহজেই আমাদের বোধে তখন তৈরি হয়ে যায় কথার মাপের আন্দাজ।

বাংলা কবিতার উদ্ধৃত ছত্র দুটিতে আমরা এতক্ষণ কী দেখলাম ? দেখা গেল, এখানে ৮টি কথা এমনভাবে সমাজানো যে প্রতিটি ছত্রেই সমান মাপের এক-একটি কথার উচ্চারণের পর একটি করে ছোটো মাপের বিরাম পর পর ৩-বার একইভাবে (উচ্চারণ-বিরাম-উচ্চারণ-বিরাম-উচ্চারণ-বিরাম) ঘুরে ঘুরে আসে, শেষে ছোটো মাপের একটি কথার উচ্চারণের পর একটি বড়ো মাপের বিরাম। উচ্চারণ আর বিরামের এই ঘুরে ঘুরে আসা দুটি ছত্রে একইভাবে ঘটছে। কবি এমনি করে সাজিয়েছেন কথার উচ্চারণ আর বিরাম—একইভাবে পরপর ঘুরে ঘুরে আসার শৃঙ্খলায়। এই বিন্যাস আর শৃঙ্খলার গুণেই ছত্র দুটির অন্তর্গত কথাগুলি মধুর হয়ে শ্রোতার কানে বাজতে থাকে। তখনই তৈরি হয়ে যায় ছন্দ—কবিতার কথা শুনতে ভালোলাগার জাদু।

২৩.৩.২. বর্ণ, ধ্বনি

আমরা যা উচ্চারণ করি, তা লিখতে গেলেই চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। এই চিহ্নের নাম হরফ বা বর্ণ। কবিকেও কবিতা লিখতে হয় চিহ্নের পর চিহ্ন—বর্ণের পর বর্ণ সাজিয়ে। অতএব, বর্ণ চোখে দেখার জিনিস। যিনি কবিতা পড়েন, তিনি সাজানো বর্ণগুলির দিকে তাকিয়ে থেকেই সেগুলি একটার পর একটা উচ্চারণ করতে থাকেন, ক্রমে ক্রমে গোটা কবিতাই পড়া হয়ে যায়।

তাহলে দেখা গেল, কবি তাঁর কবিতা লেখেন বর্ণ বিন্যাস করে, পাঠক সেই কবিতা পড়েন বর্ণের পর বর্ণ উচ্চারণ করে। বর্ণের এই উচ্চারিত রূপটিই ধ্বনি। অতএব, ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। পাঠক বর্ণ চোখে দেখে উচ্চারণ করেন, শ্রোতা সেই উচ্চারণ থেকে ধ্বনি শুনতে থাকেন।

অর্থাৎ, কবিতা লেখা হয় বর্ণ দিয়ে, ছাপাও হয় বর্ণ দিয়ে। কিন্তু, যখন তা পড়া হয়, তখন সেই কবিতা ধ্বনির সমষ্টি হয়ে শ্রোতার কানে পৌঁছয়। সেই ধ্বনির বিন্যাস থেকেই তৈরি হয়ে যায় কবিতার ছন্দ, এবং তা ধরা পড়ে শ্রোতার কানে।

বাংলায় আমরা ব্যবহার করি ১১টি স্বরবর্ণ ('ঌ' ব্যবহার করি না), কিন্তু উচ্চারণ করি ৭টি স্বরধ্বনি (অ আ ই উ অ্যা এ ও) ; ব্যবহার করি ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, উচ্চারণ করি মাত্র ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি। তার অর্থ, আমাদের কবিরাও বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করে থাকেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে. ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ (মোট ৫১টি)। কিন্তু, পাঠকের উচ্চারণে আর শ্রোতার কানে ধরা পড়ে ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি (মোট ৩৬টি)। বাংলা কবিতার ছন্দ তৈরি হয় এই ৩৬টি ধ্বনির নানারকম বিন্যাস থেকে। অতএব, ছন্দের হিসেব করতে গিয়ে আমরা কানের সাক্ষ্যই মানব, চোখের সাক্ষ্য (অর্থাৎ বর্ণ, বানান এসব) যেন বিভ্রান্ত না করে—সেদিকে সতর্ক থাকব।

এবারে শুনি বর্ণ আর ধ্বনি নিয়ে ছান্দসিকেরা কী কী বলেন। বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, আর ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ—এ কথা প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় দুজনেই মানেন। কিন্তু, 'ধ্বনি' বোঝাতে দুজনেই অনেক সময় 'বর্ণ' কথাটি প্রয়োগ করে থাকেন। প্রবোধচন্দ্র বর্ণকে বা ধ্বনিকে সরাসরি স্বর-ব্যঞ্জনে ভাগ করেননি। তাঁর বর্ণ-বিভাগ এই রকম ঃ বাংলা বর্ণের সব মিলিটে ৪টি শ্রেণি —মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, রুদ্ধস্বর, আর ব্যঞ্জন। এটি আসলে তাঁর ধ্বনি বিভাগও, 'বর্ণ' কথাটির বদলে 'ধ্বনি' বসালেই হল। মুক্তস্বর ছ-টি—অ আ ই উ এ ও। যে কোনো মুক্তস্বর বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব হতে পারে, দীর্ঘও হতে পারে। অন্য স্বরের সহায়তা ছাড়াই এদের উচ্চারণ সম্ভব। ই উ এ ও—এই চারটি স্বর কখনও কখনও পরনির্ভর হয়ে পড়ে। তখনই তারা খণ্ডস্বর। তখন তাদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়। মুক্ত 'আ'-এর পাশে খণ্ড 'ই' আশ্রয় নিলেই তৈরি হয় 'আ-ই' (খাই, নাই)। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তস্বরের দরজাটি রুদ্ধ হয়ে যায়, তৈরি হয় রুদ্ধস্বর 'আই'। রুদ্ধস্বর হচ্ছে একটি মুক্তস্বর আর একটি খণ্ডস্বরের যৌথ উচ্চারণ। এমনি করে ৬টি মুক্তস্বর আর ৪টি খণ্ডস্বরের নানারকম মিলনে তৈরি হয় অন্ততপক্ষে ১৬টি রুদ্ধস্বর—অই (কই, সই), অউ (বউ) আও (যাও, খাও), ইউ (মিউ), উই (দুই), এই (সেই), ওএ (শোয়) ইত্যাদি। এই ১৬টি রুদ্ধস্বরধ্বনির মধ্যে কেবলমাত্র 'অই' আর 'অউ' ধ্বনির জন্য বরাদ্দ আছে 'ঐ' আর 'ঔ' বর্ণ। রইল বাকি ব্যঞ্জন। এদের উচ্চারণের জন্য চাই মুক্তস্বরের আশ্রয়—হয় আগে

মুক্তস্বর পরে ব্যঞ্জন (অপ্, আখ্, ইট্, উট্), না হয় আগে ব্যঞ্জন পরে মুক্তস্বর (প, খা, টি, টু), অথবা আগে-পরে দুদিকেই মুক্তস্বর মাঝখানে ব্যঞ্জন (আদা = আ-দ্-আ, ইনি = ই-ন্-ই)। ব্যঞ্জন যখন উচ্চারণ করব, তখন তা হবে ব্যঞ্জনধ্বনি, আর যখন লিখবে, তখন তার নাম ব্যঞ্জনবর্ণ।

অমূল্যধনের বিচারে 'বর্ণ' হচ্ছে 'লিখিত হরফ'। বর্ণকে বা ধ্বনিক তিনি অবশ্য পরোক্ষে স্বর আর ব্যঞ্জনেই ভাগ করেছেন। স্বরধ্বনি তাঁর কাছে দুটি জাতিতে বিভক্ত—মৌলিক আর যৌগিক। অ আ ই উ অ্যা এ ও—এই ৭টি মৌলিক স্বর, ওই আই আও ইত্যাদি যৌগিক স্বর। দেখা গেল, প্রবোধচন্দ্রের ৬টি মুক্তস্বরই অমূল্যধনের কাছে মৌলিক স্বরধ্বনি, অমূল্যধনের 'অ্যা'-স্বরধ্বনিটি কেবল প্রবোধচন্দ্রের তালিকার বাইরে। আর, প্রবোধচন্দ্রের রুদ্ধস্বরের সঙ্গেও অমূল্যধনের যৌগিক স্বরের পার্থক্য খুব বেশি নেই।

২৩.৩.৩ অক্ষর, দল

'ধ্বনিবিজ্ঞান'-এর পাঠ থেকে আপনারা বাগ্‌যন্ত্র আর ধ্বনির কথা আগেই জেনেছিলেন (FBG : একক ৭ পৃ. ৪-৫), ধ্বনির কথা একটু আগে আরো বিশদভাবে জানলেন। আমাদের এক একটা ধ্বনির উচ্চারণ আসলে বাগ্‌যন্ত্রের নানা অংশের মিলিত চেষ্টার ফল। তবে ধ্বনির উচ্চারণ সাধারণত একটা একটা করে হয় না। একটানা কথা বলতে গেলে ধ্বনিগুলি পৃথকভাবে আমাদের কানে ধরা পড়ে না। বাগ্‌যন্ত্রের অংশগুলির একেবারের মিলিত চেষ্টার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ২-টি-৩টি ধ্বনির একসঙ্গে উচ্চারণ হয়ে যায়, কখনো-সখনো একটি ধ্বনিরই উচ্চারণ হয়। একেবারের চেষ্টার যে-কটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, ইংরেজিতে তার নাম Syllable (beau-ti-ful), বাংলায় একে কেউ বলেন **অক্ষর,** কেউ বলেন **দল**।

একে **অক্ষর** বলেন অমূল্যধন। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাটি এই রকম ঃ 'বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর।' ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে অক্ষর হচ্ছে বাক্যের অণু। একটি শব্দ ভাঙলে তা থেকে পাওয়া যাবে কয়েকটি অক্ষর। 'জননী' শব্দে অক্ষর আছে ৩টি—জ-ন-নী, 'শরৎ' শব্দে আছে ২টি অক্ষর—শ-রৎ। 'গুঞ্জন' শব্দেও ২টি অক্ষর—গুন্-জন্। এই ৩টি শব্দ ভেঙে যেসব টুকরো পাওয়া গেল, তার প্রত্যেকটিতেই আছে দুটি বা তিনটি করে ধ্বনি এবং তার উচ্চারণ হচ্ছে একঝোঁকে (জ = জ-অ, ন = ন্-অ, নী = ন্-ই, শ = শ্-অ, রৎ = র্-অ-ৎ, গুন্ = গ্-উ-ন্, জন্ = জ্-অ-ন্)। এই ৭টি অক্ষরের মধ্যে ২টি শ্রেণি লক্ষ্য করুন। জ-ন-নী-শ—এদের শেষ ধ্বনিটি স্বরধ্বনি (অ-অ-ই-অ), রৎ-গুন্-জন্—এদের শেষে আছে ব্যঞ্জনধ্বনি (ৎ-ন্-ন্)। অমূল্যধন শ্রেণিদুটির নাম দিলেন 'স্বরান্ত' (শেষে স্বরধ্বনি আছে বলে) আর 'হলন্ত' (শেষে যার ব্যঞ্জনধ্বনি)। তবে অক্ষরের শেষধ্বনি যৌগিক স্বর হলেও তাকে হলন্ত-ই বলা হবে। যেমন 'ভাসাই' = ভাসাই—এখানে 'ভা'-র শেষধ্বনি মৌলিক স্বর (আ) বলে এটি **স্বরান্ত,** আর 'সাই'-এর শেষধ্বনি যৌগিক স্বর (আই) বলে এটি **হলন্ত**। অতএব, স্বরান্ত অক্ষরের শেষধ্বনি কখনো ব্যঞ্জন, কখনো যৌগিক স্বর।

প্রবোধচন্দ্র Syllable-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অক্ষর' কথাটির বদলে 'দল' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে দল হচ্ছে 'বাক্‌যন্ত্রের এক প্রয়াসে উচ্চারিত বাক্যভুক্ত ধ্বনিখণ্ড'। 'দল' 'ছন্দ' আর 'ছান্দসিক' শব্দতিনটি ভেঙে তিনি দেখালেন ১টি (দল্), ২টি (ছন্-দ) আর ৩টি (ছান্-দ-সিক) দল। প্রতিটি দলে থাকবে

একটিমাত্র স্বরধ্বনি (মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক), ব্যঞ্জন থাক বা না-থাক। 'অসি', 'আতা', 'ইতি'—এই ৩টি শব্দের প্রথমেই আছে একটিমাত্র মুক্তস্বরধ্বনি দিয়ে তৈরি দল (অ-আ-ই), 'ঐকান্তিক' 'ঔদরিক' 'আইবুড়ো'—এই ৩টি শব্দের প্রথমে রয়েছে একটিমাত্র রুদ্ধস্বরধ্বনি দিয়ে তৈরি দল (ঐ-ঔ-আই) 'অগ্-নি', 'আল্-তা', 'ইন্-দু' শব্দের প্রথম দলে (অগ্-আল্-ইন্) রয়েছে ১টি মুক্ত স্বরধ্বনি (অ-আ-ই) আর একটি ব্যঞ্জনধ্বনি (গ্-ল্-ন্)। যেসব দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর, তার নাম **মুক্তদল** ; আর, যে দলের শেষে রুদ্ধস্বর (বৈ = ব্-ঐ, গৌ = গ্-ঔ, সাই = স্-আই) বা ব্যঞ্জনধ্বনি (অ-গ্, আ-ল্, ই-ন্), তার নাম **রুদ্ধদল**।

লক্ষ্য করুন, অমূল্যধনের 'অক্ষর' আর প্রবোধচন্দ্রের 'দল' একই। অমূল্যধনের 'স্বরান্ত অক্ষর'-ই প্রবোধচন্দ্রের 'মুক্তদল', আর অমুল্যধনের 'হলন্ত অক্ষর' প্রবোধচন্দ্রের কাছে 'রুদ্ধদল'। কাজের সুবিধার জন্য আমরা 'দল' কথাটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করব, এবং সাধ্যমতো সব রুদ্ধদলই মোটা হরফে দেখানো হবে।

২৩.৩.৪. মাত্রা, কলা

১. দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম্ ডিম্ রবে

২. ঘুমপাড়ানি মাসি পিসী ঘুম দিয়ে যাও

৩. বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান

৪. ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে

৫. জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা

৫টি কবিতা থেকে ৫টি ছত্র নেওয়া হল। প্রথম ছত্রটি উচ্চারণ করতে থাকুন। উচ্চারণ হবে এইরকম—'দু-ন্দুভি বেজে ওঠে ডি-ম্ ডি-ম্ রবে'। অর্থাৎ,স 'দুন্' 'ডিম্' 'ডিম'—এই ৩টি হলন্ত অক্ষর বা রুদ্ধদলের উচ্চারণ হবে টেনে টেনে, আর দু ভি বে জে ও ঠে র বে — এই ৮টি স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্তদলের উচ্চারণ হবে কেটে কেটে। এবার দ্বিতীয় ছত্রটি উচ্চারণ করুন। একই রুদ্ধদল 'ঘুম্'-এর দুবার উচ্চারণ হচ্ছে দুভাবে—প্রথম 'ঘুম্'-এর উচ্চারণ পা ড়া নি মুক্তদল তিনটির মতোই কেটে কেটে—ঘুম-পা-ড়া-নি, দ্বিতীয় 'ঘুম্'-এর উচ্চারণ 'ঘু-ম্' বা 'ঘুউম্'—অর্থাৎ খানিকটা টেনে। তৃতীয় ছত্রে দলগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য করুন বিষ-টি প-ড়ে টা-পুর্ টু-পুর্ ন-দেয়্ এ-ল বান্—১৩টি দলই উচ্চারিত হল একইভাবে কেটে কেটে, এর মধ্যে বিষ্ পুর্ পুর্ দেয়্ বান্—এই ৫টি রুদ্ধদল, বাকি ৮টি মুক্তদল। চতুর্থ ছত্রে দেখুন ঃ নে-র্ মে-ঘ্ দলদুটি রুদ্ধদল, উচ্চারণ টেনে টেনে ; পুন্ অন্ দলদুটিও রুদ্ধদল, কিন্তু উচ্চারণ কেটে কেটে (পুন্-জ, অন্-ধ) ; প্রতিটি মুক্তদলেরই কাটা-কাটা উচ্চারণ। পঞ্চম ছত্রে একমাত্র রুদ্ধদল 'ভাগ্' বাদে আর প্রতিটি দলই মুক্তদল (বা স্বরান্ত অক্ষর)। কিন্তু, ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে দেখুন—না হে ভা ধা তা মুক্তদল হলেও তাদের উচ্চারণ টেনে টেনে, বাকি মুক্তদলগুলির উচ্চারণ কেটে কেটে। 'ভাগ্' অবশ্য রুদ্ধদল (ভা-গ্ গ) এবং তার উচ্চারণ টেনে।

দেখা গেল, উদ্ধৃত ৫টি ছত্রে সব শুদ্ধ ১৬টি রুদ্ধদল (বা হলন্ত অক্ষর), এর মধ্যে ৯টির উচ্চারণ কেটে

কেটে, ৭টির উচ্চারণ টেনে টেনে ; অন্যদিকে সর্বমোট ৫৮টি মুক্তদলের (বা স্বরান্ত অক্ষরের) মধ্যে ৫৩টির উচ্চারণ কেটে কেটে, মাত্র ৫টির উচ্চারণ একটুখানি টেনে। এই হিসেব থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, মুক্তদলের সাধারণ কাটা-কাটা উচ্চারণ, কিন্তু রুদ্ধদলের উচ্চারণ দুভাবেই হতে পারে। কোন্ দলের উচ্চারণ কীরকম হবে, সে কথায় আমরা পরে আসব। তার আগে বুঝে নিই, এই দু-রকমের উচ্চারণে আসল তফাত-টা কী।

প্রথম ছত্রের 'দুন্দুভি' কথাটি আর একবার উচ্চারণ করে দেখুন। এর ৩টি দলের উচ্চারণ দু-ন্ দু ভি—'দু-ন্' এর এই টানা উচ্চারণে যেটুকু সময় লাগে, 'দু' বা 'ভি'-র উচ্চারণে সময় লাগে তার চেয়ে কম। দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম 'ঘুম'-এর কাটা-কাটা উচ্চারণ যেন একটু আচমকা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তুলনায় দ্বিতীয় 'ঘু-ম্'-এর উচ্চারণ হয় একটু টেনে, খানিকটা বাড়তি সময় নিয়ে। দল মুক্ত হোক বা রুদ্ধ হোক, কেটে কেটে উচ্চারণ সব ক্ষেত্রেই সব কম সময় নিয়ে, আর টেনে টেনে উচ্চারণ হলেই সময়ের ব্যয় হবে একটু বেশি। দলের উচ্চারণ-কালের এই কম-বেশিকে একটা হিসেবের মধ্যে ধরার জন্য এক ধরনের একক (Unit) তো চাই অনেকটা সেকেন্ড মিনিটের মতো। ছন্দ-বিজ্ঞানে এই এককই হল মাত্রা। এর অর্থ পরিমাণ বা মাপ, ছন্দেরর আলোচনায় এর অর্থ দল-উচ্চারণের মাপ। দলের উচ্চারণ যেখানে কাটা-কাটা, সময়ের ব্যয় সেখানে তুলনায় কম—দল সেখানে ১-মাত্রার। আর দলের উচ্চারণ সেখানে টেনে টেনে, তুলনায় একটু বেশি সময় নিয়ে,—সেখানে দল ২-মাত্রার।

এবারে চলুন ছান্দসিকদের দরবারে। অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কালপরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনিপরিমাণ। 'মাত্রা' নিয়ে দুই শীর্ষ ছান্দসিকের বিতর্ক যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন বিতর্ক এড়িয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার 'মাত্রা'-কে দলের 'ওজন' হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। আমরা অবশ্য খানিকটা অমূল্যধন-ঘেঁষা সময়ের মাপের দিকেই ঝুঁকছি, তবে সেই সঙ্গো দলের উচ্চারণের চরিত্রটিও মাথায় রাখছি (কেটে-কেটে উচ্চারণ আর টেনে-টেনে উচ্চারণ)। কেটে-কেটে উচ্চারণে সময় কম লাগে, টেনে-টেনে উচ্চারণে সময় লাগে বেশি।

একটু আগে বলেছিলাম, মুক্তদলের উচ্চারণ সাধারণত কাটা-কাটা, আর রুদ্ধদলের উচ্চারণ কেটে কেটেও হয়, টেনে টেনেও হয়। এ কথার অর্থ—মুক্তদল সাধারণ ১-মাত্রার, আর রুদ্ধদল ১-মাত্রার বা ২-মাত্রার। ঠিক কোন্ রুদ্ধদলে ১-মাত্রা বা ২-মাত্রা, অথবা কোন্ অবস্থায় মুক্তদলে ২-মাত্রা, এসব নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব। তবে, কোন্ অক্ষরে বা দলে কত মাত্রা, এ নিয়ে অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্র কার্যত কোনও বিরোধ নেই।

'মাত্রা'র কথা বলতে গিয়ে শুরুতেই যে ৫টি ছত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তর্গত দলগুলি পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি এবং প্রতিটি দলের মাথায় মাত্রা-চিহ্ন বসিয়ে দিচ্ছি (যে-দলের উচ্চারণ ১-মাত্রায় তার মাথায় ১, যে-দলের উচ্চারণ ২-মাত্রায় তার মাথায় ২)। দলের ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে (হয় কেটে কেটে না-হয় টেনে টেনে) তার মাথায় বসানো মাত্রা সংখ্যার সঙ্গো মিলিয়ে ছত্রগুলি একটা-একটা করে পড়তে চেষ্টা করুন।

	২	১	১	১	১	১	১	২	২	১	১
১.	দু-ন্	দু	ভি	বে	জে	ও	ঠে	ডি-ম্	ডি-ম্	র	বে

	১	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১
২.	ঘুম্	পা	ড়া	নি	মা	সী	পি	সী	ঘু-ম্	দি	য়ে	যাও

	১	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১	১
৩.	বিষ্	টি	প	ড়ে	টা	পুর্	টু	পুর্	ন	দেয়	এ	ল	বান্

	১	১	২	১	১	২	১	১	১	১
৪.	ঈ	শা	নে-র্	পুন্	জ	মে-ঘ	অন্	ধ	বে	গে
					১	১	১	১	১	১
					ধে	য়ে	চ	লে	আ	সে

	১	১	১	১	১	১	১	১	২	১	১	১	১	২
৫.	জ	ন	গ	ণ	ম	ন	অ	ধি	না	য়	ক	জ	য়	হে
					২	১	১		২	১		১	২	২
					ভা	র	ত		ভা-গ্	গ		বি	ধা	তা

চেনার সুবিধার জন্য রুদ্ধদলগুলি মোটা হরফে ছেপে দেওয়া হল।

এবারে লক্ষ্য করুন—

প্রথম ছত্রে প্রতিটি মুক্ত দলে ১-মাত্রা, প্রতিটি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

দ্বিতীয় ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, ২টি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ১টি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

তৃতীয় ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, প্রতিটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা।

চতুর্থ ছত্রে প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা, ২টি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, ২টি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

পঞ্চম ছত্রে প্রতিটি হ্রস্ব মুক্তদলে ১-মাত্রা, দীর্ঘ মুক্তদলে ২-মাত্রা, রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

'মাত্রা'র আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন, মুক্তদল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ১-মাত্রার, কম ক্ষেত্রেই ২-মাত্রার। রুদ্ধদল ১-মাত্রার হতে পারে, ২-মাত্রারও হতে পারে। ১-মাত্রার দলে হ্রস্ব উচ্চারণ, ২-মাত্রর দলে দীর্ঘ উচ্চারণ—সে দল মুক্ত হোক বা রুদ্ধ রোগ। অর্থাৎ, মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, দুটি-একটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ হতে পারে, রুদ্ধদল হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হতে পারে। দৃষ্টান্ত দিই, উচ্চারণ করে বুঝে নিন—

	১ ১	১ ১	২	২	১ ১	১ ১	২
১.	চলি	চলি	পা	পা	টলি	টলি	যায়

	১ ১ ১ ১	১ ১ ২	১ ১ ২	১ ১
২.	ভালোমন্দ	দুক্খসুখ্	অন্ধকার্	আলো

প্রথম দৃষ্টান্তে চ লি চ লি ট লি ট লি—প্রতিটি মুক্তদল হ্রস্ব, কিন্তু পা পা —দুটি মুক্তদল দীর্ঘ। আবার, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মন্ দুক্ অন্—তিনটি রুদ্ধদল হ্রস্ব, কিন্তু সুখ কার—দুটি রুদ্ধদলই দীর্ঘ।

দল হ্রস্ব হয় তখনই, যখন তার ভেতরকার ধ্বনি একটুখানি কুঁচকে যায়। আর, দলের দীর্ঘ হওয়ার অর্থ ধ্বনিগুলির আয়তনে বেড়ে যাওয়া। এইরকম একটি কোঁচকানো বা হ্রস্ব দলের সমপরিমাণ ধ্বনির নাম প্রবোধচন্দ্র দিয়েছেন কলা। অর্থাৎ একটি হ্রস্বদলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, একটি দীর্ঘদলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। ওপরের দৃষ্টান্ত-দুটিতে ১-মাত্রার প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং তাদের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ এবং তাদের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, মাত্রা আর কলার সম্পর্কটা দাঁড়াল এই রকম—প্রতিটি হ্রস্ব দলে থাকে প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ১-কলা, অমূল্যধনের হিসেবে ১-মাত্রা ; প্রতি দীর্ঘ দলে এঁদের হিসেবে ২-কলা বা ২-মাত্রা। অর্থাৎ, মাত্রা আর কলা কার্যত একই।

২৩.৩.৫ ছেদ, যতি

গোড়ার দিকে ছন্দের সংজ্ঞা নিয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের কথাটি আর একবার শুনে নিন। তাতে আছে ‘উচ্চারণ’ আর ‘বিরাম’-এর উল্লেখ। এই ‘বিরাম’ বা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে থামাটাই কখনো ছেদ, কখনো যতি। গদ্য-পদ্য যা-ই হোক, পড়তে পড়তে বা উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে কম বা বেশি থামতে হয় প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথম কারণ—না থামলে কথার অর্থ শ্রোতার কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, দ্বিতীয় কারণ—না-থামলে দমে কুলোয় না, তৃতীয় কারণ—থামলে কথা শুনতে ভালো লাগে। প্রথম আর দ্বিতীয় কারণ মূলত গদ্য পড়ার ক্ষেত্রে, কখনো কখনো পদ্যের ক্ষেত্রে খাটে, তৃতীয় কারণটি খাটে মূলত পদ্য পড়ার ক্ষেত্রে। প্রথম দুটি কারণে যে-থামা, তার নাম ছেদ, তৃতীয় কারণে থামার নাম যতি। তার মানে, গদ্য পড়তে পড়তে অর্থ-বুঝে-নেওয়া আর দম-ঠিক-রাখার দায়িত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে অনিয়মিত থামা—এর নাম ছেদ, আর কবিতার পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে নিয়মিত থামা—এর নাম যতি।

নীচের গদ্যটুকু পড়ুন—

‘এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত ; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বানপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে,

সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।'

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' থেকে নেওয়া এই গদ্য অংশ এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা কতটা কষ্টসাধ্য, তা একটিবার পরীক্ষা করে দেখুন। আর, তেমন পড়ায় এ অংশে প্রস্রবণগিরির যে বর্ণনা রয়েছে, তাও স্পষ্ট হবে না। সেই কারণে লেখক নিজেই দাঁড়ি-সেমিকোলন-কমা দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন—কোথায় কতটুকু থামতে হবে। কমা কম থামার চিহ্ন আর দাঁড়ি সেমিকোলন পুরো থামার চিহ্ন। এই থামাটাই ছেদ। ছেদচিহ্নগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায় ছেদগুলি কতটা অনিয়মিত। ছেদের দ্বারা বিভক্ত ৭টি অংশ মাপে অনেকখানি ছোটো-বড়ো।

এবারে নীচের পদ্যটুকু পড়ুন—

দিনের আলো	।	নিবে এল	।	সূয্যি ডোবে	।	ডোবে	॥	=	৪ + ৪ + ৪ + ২
আকাশ ঘিরে	।	মেঘ জুটেছে	।	চাঁদের লোভে	।	লোভে	॥	=	৪ + ৪ + ৪ + ২

প্রথম ছত্রের মাঝখানে ৩-বার কম-থামা, শেষে পুরো থামা।

দ্বিতীয় ছত্রের মাঝখানে ৩-বার কম থামা, শেষে পুরো থামা।

প্রতিটি ছত্রের মাঝখানে ৩-বার করে থামার ফলে ৪টি করে টুকরো হল। প্রথম ৩টি টুকরো সমান মাপের (প্রতিটি ৪-মাত্রার), শেষেরটি ছোট (২-মাত্রার)। অর্থাৎ, এক-একটি ছত্র উচ্চারণ করার ফাঁকে ফাঁকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পরে (এখানে ৪-মাত্রার পরে) নিয়মিত থামছি, শেষে আরো ২-মাত্রার উচ্চারণের পর পুরোপুরি থামছি। এই থামাটাই যতি। যতির পেছনে আছে ছন্দ-তালের শাসন, শুনতে ভালোলাগার আকাঙ্ক্ষা। অতএব, ছন্দ বুঝতে গেলে 'যতি'-কেই নিখুঁতভাবে চিনতে হবে, 'ছেদ'-কে তোয়াক্কা না করলেও চলবে।

অমূল্যধন ২-রকম যতির কথা বলেছেন—অর্ধযতি আর পূর্ণযতি। এক-একটি ছত্রের মাঝখানে একদাঁড়ি (।)-চিহ্ন দিয়ে দেখানো কম-থামার জায়গায় অর্ধযতি, জোড়াদাঁড়ি (॥)-চিহ্নে দেখানো পুরো থামার জায়গায় পূর্ণযতি। প্রবোধচন্দ্র শুনিয়েছেন ৫-রকম যতির ১০টি নাম—অনুযতি বা দলযতি, উপযতি বা উপপর্বযতি, লঘুযতি বা পর্বযতি, অর্ধযতি বা পদযতি, পূর্ণযতি বা পঙ্ক্তিযতি। এর মধ্যে ৩টি নাম আমাদের কাজে ব্যবহার করা হবে—পর্বযতি (অমূল্যধনের অর্ধযতি), পদযতি আর পঙ্ক্তিযতি (পূর্ণযতি)। এদের পরিচয় ক্রমশ জানবেন।

২৩.১.৪. সারাংশ-১

ছন্দ ঃ বাংলা কবিতার পদ্যে কথার পর কথা এমনভাবে সাজানো থাকে যে, কথার উচ্চারণ আর বিরাম পর পর একইভাবে ঘুরে ঘুরে আসে। এই কথা-সাজানো আর সাজানোর কৌশল বা শৃঙ্খলা—এই নিয়েই তৈরি হয় বাংলা কবিতার পদ্যের ছন্দ।

বর্ণ, ধ্বনি ঃ লিখতে গিয়ে যেসব চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়, তার নাম হরফ বা বর্ণ। আর, বর্ণের উচ্চারিত রূপের নাম ধ্বনি। ছান্দসিকের ভাষায় বর্ণ শব্দের দৃষ্টরূপ, ধ্বনি শব্দের শ্রুতরূপ। অর্থাৎ, বর্ণ চোখে দেখার জিনিস, ধ্বনি কানে শোনার জিনিস। কবিতা লেখা হয় বর্ণ দিয়ে, পড়া হয় ধ্বনি দিয়ে।

বাংলা কবিতায় কবি ব্যবহার করেন ১১টি স্বরবর্ণ আর ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ, পাঠক উচ্চারণ করেন ৭টি স্বরধ্বনি আর ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্রবোধচন্দ্র বাংলা বর্ণ আর ধ্বনিকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—মুক্তস্বর, খণ্ডস্বর, রুদ্ধস্বর আর ব্যঞ্জন। অমূল্যধন ভাগ করেছেন ২টি শ্রেণিতে—স্বর আর ব্যঞ্জন, স্বরের ২টি ভাগ—মৌলিক আর যৌগিক। প্রবোধচন্দ্রের মুক্তস্বর আর অমূল্যধনের মৌলিক স্বর প্রায় এক, রুদ্ধস্বর আর যৌগিক স্বরেও তেমন পার্থক্য নেই।

অক্ষর, দল ঃ বাগ্‌যন্ত্রের একেবারের চেষ্টায় যেকটি ধ্বনির উচ্চারণ একসঙ্গে হয়ে যায়, অমূল্যধন তাকে বলেন 'অক্ষর', প্রবোধচন্দ্র বলেন 'দল'। যেসব অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি থাকে, তার নাম অমূল্যধনের ভাষায় 'স্বরান্ত অক্ষর'। অক্ষরের শেষধ্বনি ব্যঞ্জন বা যৌগিক স্বর হলে তিনি তাকে বলেন 'হলন্ত অক্ষর'। অন্যদিকে, প্রবোধচন্দ্রের ভাষায়—দলের শেষধ্বনি মুক্তস্বর হলে তা 'মুক্তদল', আর রুদ্ধস্বর বা ব্যঞ্জন বলে তার নাম 'রুদ্ধদল'। অতএব, যা 'অক্ষর' তা-ই 'দল', যা 'স্বরান্ত অক্ষর' তা-ই 'মুক্তদল', যা 'হলন্ত অক্ষর' তাই 'রুদ্ধদল'।

মাত্রা, কলা ঃ 'মাত্রা' কথাটির সাধারণ অর্থ পরিমাণ বা মাপ। ছন্দের আলোচনায় এর অর্থ দল বা অক্ষর উচ্চারণের মাপ, অধ্যাপক পবিত্র সরকারের ভাষায় 'দলের ওজন'। যে দলের উচ্চারণ কেটে কেটে, তার মাপ বা ওজন কম—দল সেখানে হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার। যে দলের উচ্চারণ টেনে টেনে, তার মাপ বা ওজন তুলনায় বেশি—দল সেখানে দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার। মুক্তদল বা স্বরান্ত অক্ষর সাধারণত ১-মাত্রার, রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষর কখনো ১-মাত্রার, কখনো ২-মাত্রার।

অমূল্যধন মাত্রাকে বলেন অক্ষর-উচ্চারণের কাল পরিমাণ, প্রবোধচন্দ্র একে বলেন দলের ধ্বনি-পরিমাণ। দলের ভেতরকার ধ্বনি কুঁচকে গেলে দল হয় হ্রস্ব। এই রকম হ্রস্ব দলের ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা। দলের ধ্বনি আয়তনে বাড়লে দল হয় দীর্ঘ, এ রকম দলের ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা।

অতএব, অমূল্যধনের 'মাত্রা' আর প্রবোধচন্দ্রের 'কলা'-র মধ্যে কার্যত কোনও পার্থক্য নেই।

ছেদ, যতি ঃ কথার অর্থ স্পষ্ট বুঝে নেওয়া আর দাম ঠিক রাখা—এই ২টি প্রয়োজনে গদ্য বা পদ্য পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে অনিয়মিত যে থামা, তার নাম 'ছেদ'। আর, কবিতার পদ্য উচ্চারণ করতে করতে ছন্দের তালে তালে নিয়মিত যে থামা, তরা নাম 'যতি'। ছেদের জায়গা বোঝানোর জন্য

২-রকমের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়—কম থামার চিহ্ন কমা (,) আর পুরো থামার চিহ্ন দাঁড়ি ; সেমিকোলন (।;) ইত্যাদি। অমূল্যধন ২-রকম যতির কথা বলেছেন—কম থামার নাম অর্ধযতি, পুরো থামার নাম পূর্ণযতি। অর্ধযতির চিহ্ন (।), পূর্ণযতির চিহ্ন (॥)।

২৩.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৩ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ

ছন্দ, দল, মাত্রা।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন ঃ

বর্ণ আর ধ্বনি, মাত্রা আর কলা, ছেদ আর যতি।

২. (ক) ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন কীভাবে বর্ণ আর ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

(খ) ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় কীভাবে বর্ণ আর ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

(গ) প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধন কীভাবে দল বা অক্ষরের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, লিখুন।

৩. (ক) বিকল্প পরিভাষা লিখুন ঃ

স্বরান্ত অক্ষর, হলন্ত অক্ষর, মৌলিক স্বর, যৌগিক স্বর।

(খ) নীচের ৪টি ছত্রে প্রতিটি দল পৃথক করে দেখান এবং জলের মাথায় মাত্রা-সংখ্যা বসিয়ে দিন ঃ

i) বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান

ii) সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায়

iii) ঝর্ণা, ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা

iv) বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়

(গ) অর্ধযতি আর পূর্ণযতির চিহ্ন বসিয়ে দিন ঃ

i) কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল

মঞ্জরী চীরহি ঝাঁপি

ii) আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে

মুগ্ধললিত অশ্রুগলিত গীতে

iii) হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে

iv) যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে

(ঘ) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

i) ___________ চোখে দেখার জিনিস, ___________ কানে শোনার জিনিস।

ii) মাত্রাকে অমূল্যধন বলেন ___________, প্রবোধচন্দ্র বলেন ___________ ।

iii) ___________ র সমপরিমাণ ধ্বনির নাম কলা।

iv) ___________ র পেছনে আছে ছন্দ-তালের শাসন।

v) কথার অর্থ শ্রোতার কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্য যে থামা, তার নাম ___________ ।

২৩.৬ মূলপাঠ ঃ ছন্দের নানা বিভাগ

এত সমুদ্র জল টুকরো করতে করতে শেষপর্যন্ত এক ফোঁটা জল হাতে তুলে নেওয়া হয়। নোনা জলের নুনটুকু সরিয়ে বিশুদ্ধ জলের ফোঁটাকেও ভাঙতে ভাঙতে জলের অণু পর্যন্ত পৌছে যেতে পারেনা। এমন কী, ঐ অণুটিকে ভেঙে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের পরমাণুও পেয়ে যেতে পারেন। একইভাবে একটি কবিতাকে যদি টুকরো করতে থাকেন, তাহলে পৌঁছে যাবেন একটি অক্ষর বা দলের (Syllable) উচ্চারণে, আর, দলটিকেও ভাঙলে পাওয়া যাবে কয়েকটি ধ্বনি। দল যেন কবিতার অণু, ধ্বনি তাহলে পরমাণু। উল্টোদিক থেকে ভাবা যায় কয়েকটি পরমাণু মিলেমিশে যেমন অণুর গঠন, অসংখ্য অণুর জোড় লেগে যেমন এক-একটি পদার্থ তৈরি হতে পারে, তেমনি করে কয়েকটি ধ্বনির এক ঝোঁকে উচ্চারণে দল, আর দলের পর দলের উচ্চারণ হতে হতেই অবশেষে একটি গোটা কবিতার উচ্চারণ কানে বেজে ওঠে। এই ধ্বনির উচ্চারণ থেকে কবিতার উচ্চারণ হয়ে ওঠার পথে নানারকম ছন্দ-বিভাগ পেরোনোর ঘটনা ঘটে যায়। এই বিভাগগুলি চিনে নেওয়াই আমাদের এখনকার কাজ। উচ্চারণে প্রথম ধাপে 'ধ্বনি' আর 'দল' (বা 'অক্ষর')-কে ছন্দের মূল উপাদান হিসেবে আপনারা জেনেছেন। এবারে ক্রমে ক্রমে জেনে নিন পরের বিভাগগুলির কথা—ছান্দসিকেরা যাদের নাম দিয়েছেন, পর্বাঙ্গ বা উপপর্ব, পর্ব বা পদ, চরণ বা পঙ্‌ক্তি, শ্লোক বা স্তবক। সেইসঙ্গে ক্রমশ বুঝে নিন—যাতে কীভাবে উচ্চারণ-বিভাগগুলিকে নানারকম ছন্দ-বিভাগ বলে চিনিয়ে নেয়।

২৩.৬.১ পর্ব, পদ

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'কড়ি ও কোমল' কাব্য থেকে 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতার প্রথম ছত্রটি আর একবার উচ্চারণ করুন—

দিনের আলো । নিবে এল । সূয্যি ডোবে । ডোবে ॥ = ৪ + ৪+ ৪+ ২

পর পর ৩টি লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে কম-থামার জায়গাগুলি আর শেষে একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (॥) দিয়ে পুরো-থামার জায়গাটি চিহ্নিত করা হল। এর ফলে কবিতার ছত্রটি ৪টি টুকরোয় ভাগ হয়ে গেল—৩টি সমান, শেষেরটি ছোটো। এই এক-একটি টুকরোই এক-একটি পর্ব। 'পর্ব' নিয়ে আরো বিশদ আলোচনায় একটু পরে আসছি। যে ৩টি লম্বা দাঁড়ি (।) দিয়ে ছত্রটিকে ৪টি পর্বে ভাগ করা হল তাকে অমূল্যধন বলেন 'অর্ধযতি'-র চিহ্ন, প্রবোধচন্দ্র বলেন 'পর্বযতি'-র চিহ্ন। ছত্রশেষের একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (॥) অমূল্যধনের দেওয়া নাম 'পূর্ণযতি'-র চিহ্ন। পরপর ২টি যতির মাঝখানে রয়েছে এক-একটি পর্ব।

প্রথম ৩টি পর্ব যে সমান তার কারণ, প্রতিটি পর্বেই আছে ৪টি করে মাত্রা। প্রতিটি দলের মাথায় ১ বসিয়ে মাত্রা নির্দেশ করছি, উচ্চারণ করে করে প্রতিটি দলের ১-মাত্রা বুঝে নিতে চেষ্টা করুন—

১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১	১ ১			
দি -নের্ আ- লো	নি-বে এ-ল	সুজ্-জি ডো-বে	ডো-বে ||	= ৪+৪+৪+২

আগেই জেনেছেন মুক্তদল (বা স্বরান্ত অক্ষর) সাধারণত ১-মাত্রার, রুদ্ধদল (বা হলন্ত অক্ষর) কখনো ১-মাত্রার, কখনো ২-মাত্রার। এখানে লক্ষ করুন—প্রতিটি মুক্তদল ১-মাত্রার বটেই, এমনকী প্রতিটি রুদ্ধদলও (নের্, সুজ্) ১-মাত্রারই হয়েছে।

লক্ষ্য করছেন, ছত্রটির পর্ব বিভাগ করে ২-রকম মাপের পর্ব পাওয়া গেল—৪-মাত্রার ৩টি আর ২-মাত্রার ১টি পর্ব। ৪টি পর্বের মধ্যে ৪-মাত্রার পর্ব ৩-বার ঘুরে ঘুরে এল পর পর। অতএব, ৪-মাত্রার পর্বই ছত্রটির মূলপর্ব, মাপের দিক থেকে এটি পূর্ণ। এর নাম **পূর্ণপর্ব**। ছত্রের শেষ পর্বটি 'পূর্ণপর্বে'র চেয়ে ছোট মাপের—২-মাত্রার। অতএব, পর্বটির নাম **অপূর্ণপর্ব** এবার নীচের ছত্রদুটি পড়ুন—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	১ ১ ১ ১ ২ ১ ১	
তোমরা চাহিলে সবে	সে পাত্র **অক্খয়্** হবে	
১ ১	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১			
ভিক্খা	অন্নে বাঁচাব বসুধা ||	= ৮+৮+১০

এতে আছে ৩টি পর্ব—প্রথম ২টি পর্ব পরপর ৮-মাত্রার, শেষপর্ব ১০-মাত্রার। ৮-মাত্রার পর্ব ঘুরে ঘুরে এল ২-বার পরপর। অতএব, ৮-মাত্রাই এখানে মূল পর্বের পুরো মাপ, ৮-মাত্রার পর্বই 'পূর্ণপর্ব'। অথচ, শেষ পর্বটির ১০-মাত্রা পূর্ণপর্বের মাপ ছাড়িয়ে গেছে। অমূল্যধনের পথ ধরে এ-পর্বকে বলা হবে 'অতিপূর্ণ পর্ব'।

	২ ১ ১ ১ ১	২					
(বল)	উন্নত মম	শির ||			= ৬ + ২
	১ ১ ১ ১ ১ ১	১ ১ ২ ২	১ ২ ১ ২	২			
(শির)	নেহারি আমারি	নতশির্ ওই	শিখর্ হিমাদ্	**রির্** ||	= ৬ + ৬ + ৬ + ২

প্রথম ছত্রটিতে প্রথম পর্ব ৬-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব ২-মাত্রার। কোনও পর্বই ঘুরে ঘুরে আসে নি। তবু প্রথম পর্বকেই গণ্য করা হবে পূর্ণপর্ব বলে। দ্বিতীয় পর্ব পূর্ণপর্বের চেয়ে মাপে ছোটো বলে অপূর্ণপর্ব হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয় ছত্রে অবশ্য ৬-মাত্রার পর্ব পর পর ৩-বার ঘুরে ঘুরে এসে পূর্ণপর্ব হবার দাবি কায়েম করেছে। শেষপর্ব তার চেয়ে ছোটো বলে অবশ্যই অপূর্ণপর্ব। কিন্তু, লক্ষ করুন, ২টি ছত্রেরই শুরুতে বন্ধনীর মধ্যে ১টি করে ২-মাত্রা মাপের ছোটো পর্ব রয়েছে। পর্বদুটি ছন্দের হিসেবের বাইরে, ছন্দের পক্ষে যেন খানিকটা বাড়তি বোঝা, না থাকলেও ছন্দের ক্ষতি হত না। এ ধরনের পর্বকে ছান্দসিকেরা বলে অতিপর্ব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছত্রের শুরুতেই এসব পর্ব কবিরা বসান, কখনও কখনও ছত্রের মাঝখানে—

ভবের গাছে । বেঁধে দিয়ে (মা) ।পাক দিতেছ । অবিরত ।।

'মা' এখানে ছত্রটির মাঝখানে-থাকা 'অতিপর্ব'।

কম-থামার জায়গায় অর্ধযতি আর পুরো থামার জায়গায় পূর্ণযতি—অমূল্যধনের হিসেবমতো এই ২-রকম থামা বা যতির মাঝখানে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ্য করলেন আর এক রকমের থামা বা যতি, যা কম-থামার চেয়ে একটু বেশি, অথচ পুরো-থামার চেয়ে একটু কম। এর নাম ‘পদযতি’। অমূল্যধনের অর্ধযতিকে প্রবোধচন্দ্র বলেন পর্বযতি। অর্ধযতি বা পর্বযতি কবিতার ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে দেখায়। তেমনি পদযতির কাজ পদ-বিভাগ করে দেখানো। পদযতি পর্বযতির চেয়ে একটু বেশি থামায়। একজোড়া লম্বা দাঁড়ি (।।) দিয়ে অমূল্যধন দেখান পূর্ণযতি, প্রবোধচন্দ্র দেখান পদযতি। ‘বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’-এর ছত্রটিতে (।।) চিহ্ন দিয়ে দেখানো পদযতিটি চিনে নিন। ক্রমশ বুঝে নিন পদ-বিভাগের তত্ত্ব, পর্ব আর পদের পার্থক্য—

১ ১   ১ ১ | ১ ১   ১ ১ || ১   ১ | ১   ১ | ১   ১
দিনের অলো | নিবে এল || সুজ্ জি | ডোবে | ডোবে = (৪ + ৪) + (৪ + ২)

পদযতি (॥) এখানে ছত্রটিকে ২টি খণ্ডে ভাগ করেছে, এক-একটি খণ্ড এক-একটি ‘পদ’। প্রথম পদ তৈরি হয়েছে ২টি সমান মাপের পর্ব নিয়ে (৪+৪), দ্বিতীয় পদ তৈরি হয়েছে ২টি ছোটো-বড়ো পর্ব নিয়ে (৪+২)। অতএব, পর্বের চেয়ে ‘পদ’ বড়ো মাপের খণ্ড। কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি হয়ে এক একটি ‘পদ’। ছত্রটিতে আছে ৪টি পর্ব, কিন্তু ২টি পদ।

লক্ষ্য করুন, ওপরের ছত্রটিতে পর্বের মাপ অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের হিসেবমতো একই (প্রথম ৩টি ৪-মাত্রার, শেষেরটি ২-মাত্রার)। অতএব, অমূল্যধনের ২টি করে ‘পর্ব’ নিয়েই তৈরি হয়েছে প্রবোধচন্দ্রের এক-একটি ‘পদ’।

এবারে পড়ুন ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যেরই আর-একটি কবিতা ‘প্রাণ’-এর দ্বিতীয় ছত্রটি—

‘মানবের্ মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই’।

ছত্রটির পর্ব-বিভাগ আর পদ-বিভাগ প্রবোধচন্দ্র করবেন এইভাবে—

১ ১ ২ | ১ ১   ১ ১ || ১ ১ ১ ১ | ২
মানবের | মাঝে আমি || বাঁচিবারে | চাই =(৪+৪)+ (৪+২)

প্রথম ৩টি পর্বের মাপ ৪-মাত্রা করে, শেষপর্ব ২-মাত্রার। আর প্রথম পদটির মাপ ৮-মাত্রা (৪+ ৪), দ্বিতীয় পদের মাপ ৬-মাত্রা (৪+২)।

অন্যদিকে, অমূল্যধনের পর্ব-বিভাগ হবে এইরকম—

মানবের্ মাঝে আমি | বাঁচিবারে চাই || = ৮+৬

প্রথম পর্ব ৮-মাত্রার, শেষপর্ব ৬-মাত্রার।

ওপরের ছত্রটির ছন্দ-বিভাগ থেকে প্রবোধচন্দ্রের ‘পর্ব’ আর ‘পদ’-এর সঙ্গে অমূল্যধনের পর্বের সম্পর্ক বিষয়ে ২টি কথা লক্ষ করুন ঃ

(১) পূর্ণপর্ব প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে এখানে ৪-মাত্রার, অমূল্যধনের হিসেবে ৮-মাত্রার। অর্থাৎ, দুই ছান্দসিকের পর্বের মাপ দু-রকম।

(২) প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ২ টি পদ ৮ আর ৬ মাত্রার, অমূল্যধনের হিসেবে ২ টি পর্ব ৮ আর ৬ মাত্রার। অর্থাৎ, প্রবোধচন্দ্রের কাছে যা 'পদ', অমূল্যধনের কাছে তা 'পর্ব'।

সব মিলিয়ে দাঁড়াল এই ঃ 'পর্ব' আর 'পদ' নিয়ে প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের হিসেবে আছে কিছু মিল, কিছু গরমিল। দুজনের 'পর্ব' কখনও সমান, কখনো ছোটো-বড়ো। সেই কারণে, প্রবোধচন্দ্রের 'পদ' কখনো অমূল্যধনের 'পর্বে'র সমান, কখনো বড়ো। 'পদ'-এর কথা অমুল্যধন ভাবেননি।

২৩.৬.২ পর্বাঙ্গ, উপপর্ব

'পর্ব', সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়ে গেল। বোঝা গেল, কবিতার একটি ছত্র উচ্চারণ করতে করতে মাঝে মাঝে যে যতি পড়ে (অর্থাৎ থামতে হয়), সেই যতির জায়গাটিতে এক-একটি পর্ব তৈরি হতে থাকে। পর্বগুলি পাশাপাশি সমান হবার কথা, তবে শেষপর্ব ছোটো (বা বড়ো) হতে পারে।

এই 'পর্ব'-কে মাঝখানে রেখে ছান্দসিকেরা একদিকে পর্বের চেয়ে মাপে ছোটো, আর একদিকে পর্বের চেয়ে মাপে বড়ো ছন্দ-বিভাগের কথাও ভেবেছেন। ছোটো মাপের বিভাগচাই আগে দেখুন। 'দিনের আলো' দিয়ে শুরু-করা ছত্রটি আর একবার উচ্চারণ করুন—

১ ১	১ ১		১ ১	১ ১		১ ১	১ ১		১ ১	‖
দিনের্	আলো	|	নিবে	এল	|	সুজ্‌জি	ডোবে	|	ডোবে	‖

'দিনের্ আলো' পর্বটির 'দিনের' 'আলো'—এই দুটি অংশে ভাগ হয়ে উচ্চারণ হচ্ছে। ফলে ৪-মাত্রার পর্বটি ২+২ মাত্রায় আবার ২ টি টুকরো হচ্ছে। একইভাবে 'নিবে এল' আর 'সুজ্‌জি ডোবে' পর্বদুটিও ২+২ মাত্রায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে। শেষের 'ডোবে' পর্বটি অবশ্য ২-মাত্রাতেই থেকে গেল, ভাগ হল না। পর্বের এই ভাগগুলিকে অমূল্যধন বলেন **'পর্বাঙ্গ'** (= পর্বের অঙ্গ), প্রবোধচন্দ্র বলেন **উপপর্ব** (= পর্বের স্বাভাবিক উচ্চারণ-বিভাগ)। 'পর্বাঙ্গো'র চিহ্ন (:), 'উপপর্বের চিহ্ন (:)। এই চিহ্ন দিয়ে ছত্রটি সাজিয়ে দেখুন—

পর্বাঙ্গ ঃ দিনের : আলো । নিবে : এল । সুজ্‌জি : ডোবে । ডোবে

উপপর্ব ঃ দিনের : আলো । নিবে : এল । সুজ্‌জি : ডোবে । ডোবে

অমূল্যধনের 'পর্বাঙ্গ' আর প্রবোধচন্দ্রের 'উপপর্ব' পর্বেরই এক-একটি ভাগ। কিন্তু, পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সবসময় হুবহু এক নয়। এর কারণ, অমূল্যধনের 'পর্ব' আর প্রবোধচন্দ্রের 'পর্ব' সবসময় মাপে এক হয় না। কেন হয় না তা আমরা পরে দেখব। 'দিনের আলো'-র ছত্রটিতে অবশ্য প্রথম ৩টি পর্ব জুদনের হিসেবেই সমান

মাপের (৪-মাত্রার), সে-কারণে পর্বাঙ্গা-উপপর্বও সমান হতে পেরেছে (২-মাত্রার)। কিন্তু নীচের ছত্রটিতে দেখুন—

পর্বাঙ্গা ঃ একা দেখি : কুল বধূ। কে বট : আপনি ॥ = (৪+৪) +(৩ + ৩)

উপপর্ব ঃ একা : দেখি। কুল : বধূ ॥ কে বট : আপনি = (২+ ২) +(২+ ২)+ (৩+ ৩)

অমূল্যধনের হিসেবে ছত্রটিতে ২টি পর্ব, প্রথমটি ৮-মাত্রার। ৮-মাত্রার প্রথম পর্বে পাওয়া গেল ৪-মাত্রার ২টি পর্বাঙ্গা। অথচ, ৮-মাত্রার এই পর্বটিই প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ২টি ৪-মাত্রার পর্বে ভাগ হল, ৪-মাত্রার এক-একটি পর্বে পাওয়া গেল ২-মাত্রার ২টি করে উপপর্ব। 'কে বট আপনি'-অংশটি অমূল্যধনের কাছে ৬-মাত্রার পর্ব, ভাগ হল ৩-মাত্রার ২টি পর্বাঙ্গো। আর, এ অংশটি প্রবোধচন্দ্রের কাছে ৬-মাত্রার একটি পদ, কিন্তু, সরাসরি এর ভাগ হল ৩-মাত্রার ২-টি উপপর্বে (পদটিকে পর্বে পর্বে ভাগ করা সম্ভব নয় বলে)। পর্বাঙ্গা-উপপর্বের মাপটাও সেই কারণেই সমান (৩-মাত্রার)। অতএব দেখলেন, একই কবিতার একই ছত্রে সব পর্বে মাপ ছান্দসিকদের কাছে সমান হয় না, তার ফলে পর্ব কেটে-কেটে-পাওয়া পর্বাঙ্গা আর উপপর্বও অসমান হয়ে পড়ে।

এক-একটা পর্ব যে ২টি-৩টি টুকরোয় ভাগ হতে পারে, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তবে, পর্বের মাঝখানে সত্যিই থামতে হয় কিনা—অর্থাৎ যতি পড়ে কিনা এ বিষয়ে ছান্দসিকেরা একমত নন। অমূল্যধনের মতে পর্বের মাঝখানে যতি নেই, (:) চিহ্নটিও যতিচিহ্ন নয়)। প্রবোধচন্দ্রের মতে যতি অবশ্যই আছে, যতিই পর্বকে উপপর্বে ভাগ করে এবং সে-যতির নাম উপযতি।

২৩.৬.৩. চরণ, পঙ্‌ক্তি

পর্বের চেয়ে ছোটো ছন্দ-বিভাগের কথা হল। এবারে বড়ো বিভাগের কথা। একটু আগেই আমরা দেখলাম থতির আঘাতে 'দিনের আলো'-র ছত্রটির ৪টি পর্বে ভাগ হওয়ার এবং ছত্রটির শেষে পুরো থেমে যাওয়ার ঘটনা। এই পুরো থামার যতিকে বলা হয় 'পূর্ণযতি', আর শুরু থেকে পূর্ণযতি পর্যন্ত পুরো ছত্রটির নাম অমূল্যধনের কাছে **চরণ,** প্রবোধচন্দ্রের কাছে **পঙ্‌ক্তি**। অর্থাৎ, পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকেই অমূল্যধন বলছেন 'চরণ', প্রবোধচন্দ্র বলেছেন 'পঙ্‌ক্তি। প্রবোধচন্দ্র এই কারণে 'পূর্ণযতি'-কে আরো নির্দিষ্ট করে বললেন 'পঙ্‌ক্তিযতি। সেদিক থেকে 'চরণ' আর 'পঙ্‌ক্তি'-র মধ্যে তফাত থাকার কথা ছিল না। কিন্‌কু, 'চরণ' বা 'পঙ্‌ক্তি'র মাপ যে নির্দিষ্ট করে দেয়, সেই পূর্ণযতিই ঠিক কোথায় পড়বে (অর্থাৎ, পর্বের পর পর্ব পেরিয়ে কোন্ পর্বের শেষে পুরোপুরি থামতে হবে)—এই নিয়ে ছান্দসিক দুজন সব সময় একমত নন। তার ফলেই 'চরণ' আর 'পঙ্‌ক্তি' কখনো কখনো পৃথক্ হয়ে যায়।

'দিনের আলো'র ছত্রটি চরণ বটে, পঙ্‌ক্তিও বটে—এটা আমরা দেখলাম। সমান মাপের চরণ-পঙ্‌ক্তি আরো দুটি-একটি দেখা যাক।

১ ১ ১   ১ ১ ১   ১ ১ | ১ ২   ১ ১ ১ ||

১ম চরণ   মরিতে   চাহিনা   আমি | সুন্দর   ভূবনে || = ৮+ ৬ = ১৪ মাত্রার

১ ১ ২   ১ ১   ১ ১ | ১ ১ ১ ১   ২ ||

২য় চরণ   মানবের   মাঝে   আমি | বাঁচিবারে   চাই || = ৮+ ৬ = ১৪ মাত্রার

১ ১ ১   ১ ১ ১   ১ ১ || ১ ২   ১ ১ ১

১ম পঙ্‌ক্তি   মরিতে   চাহিনা   আমি || সুন্‌দর   ভূবনে   = ৮+ ৬ = ১৪ মাত্রার

১ ১ ২ | ১ ১   ১ ১ || ১ ১ ১ ১   ২

২য় পঙ্‌ক্তি   মানবের্ | মাঝে   আমি || বাঁচিবারে   চাই   = ৪+ ৪+ ৪+ ২ = ১৪ মাত্রার

এখানে মাত্রা বসেছে এই নিয়মে—প্রতি মুক্তদলে (বা স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা, শব্দের-প্রথমে-থাকা 'সুন্' রুদ্ধদলেও (বা হলন্ত অক্ষরে) ১-মাত্রা, শব্দের-শেষে-থাকা প্রতি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা। লক্ষ করুন, ২টি ক্ষেত্রেই পূর্ণযতি (পুরো থেমে-যাওয়া) পড়ছে ছত্রের শেষে ১৪-মাত্রার পরে। অতএব, চরণ আর পঙ্‌ক্তির মাপে কোনো পার্থক্য রইল না। পার্থক্য কেবল এদের ছন্দ-বিভাগে। প্রথম চরণ ৮ +৬ মাত্রার ২টি পর্বে ভাগ হয়ে গেছে, আর প্রথম পঙ্‌ক্তির ভাগ হয়েছে ৮ + ৬ মাত্রায় ২টি পদে। দ্বিতীয় চরণে ২টি পর্ব (৮ +৬), কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ৪টি পর্ব (৪+৪+ ৪+২)।

এবারে দেখুন একটি পৃথক্ মাপের চরণ পঙ্‌ক্তির দৃষ্টান্ত—

১   ১ ১   ১ ২ | ১ ১ ২ ২ | ২ ১ ১ ||

এ   নহে   মুখর্ | বনমর্‌মর্ | গুন্‌জিত ||

১   ১   ১ ১ ২ | ১ ১ ১   ১ ২ || ১ ১ ১ ||

এ   যে   অজাগর্ | গরজে   সাগর্ || ফুলিছে ||

অমূল্যধনের হিসেবে এখানে ২-বার পূর্ণযতি, তাই ২-টি চরণ। কিন্তু, প্রবোধচন্দ্র প্রথম ছত্রের শেষে পূর্ণযতি মানেন না, মানেন পদযতি। ২টি ছত্র পুরোপুরি উচ্চারণ করার পরে তিনি পুরো থামতে চান (কেবল 'ফুলিছে'-র পর), তার আগে নয়। অতএব তাঁর হিসেবে ২টি ছত্র মিলে এখানে ২টি পঙ্‌ক্তি।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য চরণ-পঙ্‌ক্তি সমান। যেখানে সমান নয়, সেখানে দেখা যাবে পঙ্‌ক্তির মাপ চরণের চেয়ে বড়ো। এর কারণ, পর্ব আর পঙ্‌ক্তির মাঝখানে প্রবোধচন্দ্র যে অতিরিক্ত ছন্দ-বিভাগ 'পদ' কল্পনা করে নিয়েছে, তা ককনো কখনো 'চরণ'-এর সমান হয়ে যায়। আপনারা জানেন, কয়েকটি পর্ব মিলে তৈরি হয় 'পদ'। তেমনি, কয়েকটি 'পদ' জুড়ে তৈরি হয় পঙ্‌ক্তি। একটু আগে 'এ নহে মুখর'-এর ২টি ছত্র মিলে যে একটি মাত্র পঙ্‌ক্তি তৈরি হল, তার কারণ এক-একটি ছত্র প্রবোধচন্দ্রের কাছে এক-একটি 'পদ' বলেই মনে হয়েছে, তার বেশি নয়। অর্থাৎ, প্রথম ছত্রের শেষে অমূল্যধন পুরোপুরি থামলেও (পূর্ণযতি) প্রবোধচন্দ্র পুরো

থামছেন না, পর্বের শেষে যতটুকু থামতে হয় (পর্বযতি) তার চেয়ে একটু বেশি থামছেন (পদযতি)।

ফলে এখানে অমূল্যধনের ‘চরণ’ হয়ে যাচ্ছে প্রবোধচন্দ্রের ‘পদ’-এর সমান। অতএব, ২টি ‘পদ’ নিয়ে তৈরি ‘পঙ্‌ক্তি’

এখানে ২টি ‘চরণে’রই যোগ ফল। নীচে লক্ষ করুন—

২ ১১ ২	১১ ২১১	১১১	= ৬ + ৬+ ৩ = ১৫
ঐ আসে ঐ	অতি ভৈরব	হরষে	
১১২১১	১১ ২১১	১১১	
জলসিন্‌চিত	ক্ষিতি সৌরভ	রভসে	= ৬ + ৬+ ৩ = ১৫
১১২১১	১১২১১	১১১	
ঘনগৌরব	নবযৌবনা	বরষা	= ৬ + ৬+ ৩ = ১৫
	১১২১১	১১১	
	শ্যামগম্‌ভীর	সরষা	= ৬+ ৩ = ৯

অমূল্যধনের হিসেবে এখানে ৪টি ছত্রই ৪টি চরণ। আর প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে ৪টি ছত্রে আছে ৪টি পদ মিলে একটিমাত্র পঙ্‌ক্তি। প্রথম ৩টি চরণের মাপ ১৫-মাত্রা করে, চতুর্থটি ৯-মাত্রার। পঙ্‌ক্তিটির মাপ ১৫ + ১৫+ ১৫+ ৯ মাত্রা। চরণ আর পদ সমান হলে প্রবোধচন্দ্রের একপদী পঙ্‌ক্তি ছাড়া আর সব পঙ্‌ক্তিই মাপে চরণের চেয়ে বড়ো হবে গণিতের নিয়ম মেনে।

২৩.৬.৪ স্তবক, শ্লোক

ছন্দ-বিভাগ নিয়ে যেটুকু কথা হল, তা থেকে এটা বোঝা যাবে, পর্ব আর চরণ এই ২ রকম মাপের বিভাগ থেকেই উচ্চারণ আর বিরামের বিন্যাসের শৃঙ্খলাটা ধরা পড়ে যায়। কবিতার পদ্য পড়তে গেলেই চলতে থাকে পর্বের পর পর্ব উচ্চারণ, মাঝখানে অর্ধযতি। পরপর কয়েকটি পর্বের উচ্চারণ হলেই পড়ে পূর্ণযতি, শেষ হয় একটি চরণের উচ্চারণ। আবার চলতে থাকে একইভাবে পর্বের পর পর্ব পেরিয়ে আর-একটি চরণের উচ্চারণ আর-একটি পূর্ণযতি পর্যন্ত। এর সঙ্গে বাড়তি যে ২টি বিভাগের কথা আপনারা জানলেন (পর্বের চেয়ে ছোটো মাপের ‘পর্বাঙ্গ’ বা ‘উপপর্ব’ আর পর্বের চেয়ে বড়ো মাপের ‘পদ’), ছন্দের মূল চরিত্র এদের বাদ দিলেও বুঝে নেওয়া যাবে। আর, ‘পদ’ বাদ পড়লে ‘পঙ্‌ক্তি’ও অবান্তর হয়ে পড়ে। কেননা, **‘পঙ্‌ক্তি’র** ধারণা তৈরি হয় কয়েকটি ‘পদে’র যোগফল হিসেবেই।

অতএব, কবিতা যখন পড়ি, তখন আমরা পর পর নির্দিষ্ট মাপের (মাত্রা সংখ্যার) চরণই একের পর এক উচ্চারণ করে যেতে থাকি। মনে রাখবেন, একটি কবিতার গোটা শরীরে যতগুলি চরণ ছড়ানো আছে, তাদের

ছন্দ-স্বভাব একটাই। সে-কারণে, কোনও কবিতার ছন্দ বোঝার জন্য গোটা কবিতাই পড়ে পড়ে দেখার প্রয়োজন নেই, কবিতার একটি অংশ এর জন্য বেছে নিলেই চলে। তবে, অংশটি এমন হওয়া চাই, যাতে থাকে মাপ বা মাত্রা সংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা পরপর কয়েকটি চরণ। এই রকম কয়েকটি চরণের গুচ্ছকে ছান্দসিকেরা বলেন স্তবক।

সাধারণভাবে 'স্তবকে'র অন্তর্গত চরণের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়—২ থেকে ৮ পর্যন্ত, এমনকী তার চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে, এ-বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র একটু ভিন্ন কথা বলতে চান। তাঁর মতে 'স্তবকে'র পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা কমপক্ষে ৫ হওয়া চাই-ই। তার চেয়ে কম হলে তার নাম হবে শ্লোক, 'স্তবক' নয়। ৫ বা তার বেশি সংখ্যার পঙ্‌ক্তির গুচ্ছও তাঁর কাছে বড়ো মাপের শ্লোক-ই, কেবল তার বিকল্প নাম 'স্তবক'। আমরা অবশ্য চরণের যেকেতানা গুচ্ছকেই বলব 'স্তবক'। নীচের 'স্তবক'গুলি উচ্চারণ করতে করতে বুঝে নিন, পরপর সাজানো চরণগুলি মাত্রা সংখ্যায় শৃঙ্খলায় কিভাবে পরপর বাঁধা পড়েল এক-একটি 'স্তবক' তৈরি করেছে—

১. এ জগতে হায় । সেই বেশি চায় । আছে যার ভূরি । ভূরি ॥ =৬+৬+৬+২= ২০
রাজার হস্ত । করে সমস্ত । কাঙালের ধন । চুরি ॥ =৬+৬+৬+২= ২০

২. নিত্‌ত তোমায়্ । চিত্‌ত ভরিয়া । স্মরর্ণ্ করি ॥ =৬+৬+৬+২= ২০
অন্‌তবিহীন । বিজনে বসিয়া । বরর্ণ্ করি ॥ =৬+৬+৫ = ১৭
তুমি আছ মোর্ । জীবন-মরণ্ । হরণ্ করি ॥ =৬+৬+৫ = ১৭

৩. মরিতে চাহি না । আমি সুন্‌দর ভুবনে ॥ ৮+৬ = ১৪
মানবের্ মাঝে আমি । বাঁচিবারে চাই ॥ ৮+৬ = ১৪
এই সূরযকরে এই । পুষ্‌পিত কাননে ॥ ৮+৬ = ১৪
জীবন্‌ত হৃদয়-মাঝে । যদি স্থান্ পাই ॥ ৮+৬ = ১৪

৪. দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে ॥ = ১০
জাগিয়া উঠিল হাহারবে ॥ = ১০
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে । শুধালেন জনে জনে।
ক্ষুধিতেরে অন্নদানসেবা ॥ = ৮+৮+১০ = ২৬
তোমরা লইবে বল কেবা ॥ =১০

১ম স্তবকে ২টি চরণ (৬+৬+৬+২ মাত্রার), ২য় স্তবকে ৩টি চরণ (৬+৬+৫ মাত্রার),
৩য় স্তবকে ৪টি চরণ (৮+ ৬ মাত্রার), ৪র্থ স্তবকে ৪টি চরণ (১০ মাত্রার ৩টি, ৮+৮+১০ মাত্রার ১টি)।

২৩.৭ সারাংশ-২

পর্ব, পদ ঃ কবিতার ছত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে একটুখানি থামতে থামতে পুরো ছত্র পড়ে ফেলি। ফলে পুরো ছত্রটি কয়েকটি টুকরোয় ভাগ হয়ে যায়। এক-একটি টুকরোর নাম 'পর্ব'। সমান সমান মাত্রার পর থামলে পর্বের মাপও পরপর সমান হবে। এ রকম একই মাপের পর্ব পরপর ঘুরে ঘুরে এলে তার নাম 'পূর্ণপর্ব'। 'পূর্ণপর্বে'-র চেয়ে ছোটো মাপের পর্বের নাম 'অপূর্ণপর্ব', আর বড়ো মাপের পর্বের নাম 'অতিপূর্ণপর্ব'। কবিতার ছত্রের শুরুতে, কখনো কখনো মাঝখানে ছোটো মাপের এমন পর্ব মাঝে মাঝে কবিরা ব্যবহার করেন, যা ছন্দের হিসেবের বাইরে। এ রকম অতিরিক্ত এবং প্রায় অনাবশ্যক পর্বের নাম 'অতিপর্ব'।

অমূল্যধনের অর্ধযতি বা প্রবোধচন্দ্রের পর্বযতি কবিতার ছত্রকে পর্বে পর্বে ভাগ করে। এই অর্ধযতি বা পর্বযতির চেয়ে একটু বেশি থামা, অথচ পূর্ণযতির চেয়ে একটু কম থামা প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করে তার নাম দিলেন পদযতি। এই পদযতি ছত্রকে যেসব খণ্ডে ভাগ করে, তার নাম 'পদ'। কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি হয় 'পদ'।

কবিতার একই ছত্রে অমূল্যধনের পর্বের মাপ কখনো প্রবোধচন্দ্রের পর্বের সমান, কখনো তার চেয়ে বড়ো। তাই, প্রবোধচন্দ্রের 'পদ' কখনো অমূল্যধনের পর্বের সমান, কখনো বড়ো।

পর্বাঙ্গ, উপপর্ব ঃ

১টি পর্বকে ২টি-৩টি ভাগে উচ্চারণ করে এক-একটি ভাগকে অমূল্যধন বলেন 'পর্বাঙ্গ', আর প্রবোধচন্দ্র বলেন 'উপপর্ব'। দুজনের পর্বের মাপ যখন সমান থাকে, সেই পর্বের পর্বাঙ্গ আর উপপর্বও তখন সমান। কিন্তু, দুজনের পর্ব ছোটো-বড়ো হলে পর্বাঙ্গ-উপপর্বও হবে ছোটো-বড়ো। আবার, পর্বে পর্বে ভাগ না-হয়ে সরাসরি কয়েকটি উপপর্বে ভাগ হয়ে যায়, প্রবোধচন্দ্রের এ রকম ১টি পদ যদি অমূল্যধনের পর্বের সঙ্গে সমান মাপের হয়, তাহলেও পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব সমান হবে।

চরণ, পঙ্‌ক্তি ঃ

পূর্ণযতি দিয়ে ভাগ-করা ছন্দ-বিভাগকে অমূল্যধন বলেন 'চরণ', প্রবোধচন্দ্র বলেন 'পঙ্‌ক্তি'। কবিতার কোনো কোনো ছত্রের শুরু থেকে সেই ছত্রের বা পরের কোনো ছত্রের শেষে-থাকা পূর্ণযতি পর্যন্ত যে ছন্দ-বিভাগ, তার নাম 'চরণ' বা 'পঙ্‌ক্তি'। অমূল্যধন আর প্রবোধচন্দ্রের পূর্ণযতি একই ছত্রের শেষে পড়লে 'চরণ' আর 'পঙ্‌ক্তি' একই হবে, ভিন্ন ভিন্ন ছত্রের শেষে পড়লে চরণ-পঙক্তি পৃথক্ হবে।

প্রবোধচন্দ্রের পর্ব আর পঙ্‌ক্তির মাঝামাঝি মাপের ছন্দ-বিভাগ পদ। কয়েকটি পদ জুড়ে তৈরি

হয় ‘পঙ্‌ক্তি’। কখনো কখনো কবিতার এক-একটি ছত্র অমূল্যধনের কাছে তরণ হলেও প্রবোধচন্দ্রের কাছে তা এক-একটি পদ বলে গণ্য হতে পারে। তখনই পঙ্‌ক্তি হয়ে পড়ে চরণের চেয়ে বড়ো মাপের পৃথক ছন্দ-বিভাগ।

স্তবক, শ্লোক ঃ

কোনো কবিতার এমন একটি অংশ, যেখানে পরপর ২, ৩, ৪, ৫, ৬, বা ৮টি চরণের গুচ্ছ মাত্রাসংখ্যার শৃঙ্খলায় বাঁধা, তার নাম ‘স্তবক’। প্রবোধচন্দ্রের বিচারে কমপক্ষে ৫টি পঙ্‌ক্তির গুচ্ছ হবে ‘স্তবক’।

২, ৩ বা ৪টি পঙ্‌ক্তির গুচ্ছকে প্রবোধচন্দ্র বলেন ‘শ্লোক’।

২৩.৮ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৩ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ

পর্ব, চরণ, স্তবক।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন ঃ

পর্বাঙ্গ আর উপপর্ব, পর্ব আর পদ, চরণ আর পঙ্‌ক্তি।

(গ) অর্ধযতি পূর্ণযতি পর্ব স্তবক—এই ৪টি পরিভাষা অমূল্যধন প্রবোধচন্দ্র দুজনেই ব্যবহার করতেন। প্রতিটি পরিভাষার ব্যবহারে ছান্দসিক দুজনের কোথায় মিল, কোথায় গরমিল—দেখান।

২. (ক) ‘আম্রের মঞ্জরী গন্ধ বিলায়’—এই ছত্রটিতে দলগুলিকে পৃথক করে দলের মাথায় মাত্রা বসিয়ে নিন। এরপর—

i) সঠিক চিহ্নের সাহায্যে ছত্রটিতে পর্বাঙ্গ পর্ব আর চরণের বিভাগগুলি দেখান।

ii) সঠিক চিহ্নের সাহায্যে ছত্রটিতে উপপর্ব আর পদের বিভাগগুলি দেখান।

iii) ওপরের দু রকমের ছন্দ-বিভাগ থেকে অমূল্যধনের পর্বাঙ্গো-পর্ব-চরণের সঙ্গো প্রবোধচন্দ্রের উপপর্ব-পর্ব-পদ-পঙ্‌ক্তির মাপের কী সম্পর্ক খুঁজে পেলেন, সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) ‘ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।’

প্রশ্ন-২ (ক)-এর পদ্ধতিতে i) ওপরের ৪টি ছত্রে পরপর দুরকমের ছন্দ-বিভাগ করুন।

ii) তা থেকে ঐ দু রকমের বিভাগের কী সম্পর্ক খুঁজে পেলেন, সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) পর পর এমন ৩টি পদ্যছত্রের দৃষ্টান্ত লিখুন যার—

i) প্রথমটিতে পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রার।

ii) দ্বিতীয়টিতে পূর্ণপর্ব ৬-মাত্রার।

iii) তৃতীয়টিতে পূর্ণপর্ব ৮-মাত্রার।

যে কোনো একটিতে ১টি অতিপর্ব থাকবে।

যে কোনো একটিতে ১টি অতিপূর্ণ পর্ব থাকবে।

যেকোনো দুটিতে ১টি করে অপূর্ণপর্ব থাকবে।

(ছত্রের শেষে পর্বের মাত্রাসংখ্যা লিখুন। কোনটি অতিপর্ব, কোনটি কত মাত্রার অতিপূর্ণপর্ব, কোনটি কত মাত্রার অপূর্ণপর্ব প্রতিটি দৃষ্টান্তের নীচে লিখুন।)

৩. (ক) **শুন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

i) ______ উচ্চারণ-বিভাগগুলিকে নানারকম ছন্দবিভাগ বলে চিনিয়ে দেয়।

ii) অমূল্যধন (I)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান ______, চিহ্নটিকে বলেন ______।

iii) প্রবোধচন্দ্র (I)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান ______, চিহ্নটিকে বলেন ______।

iv) অমূল্যধন (II)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান ______, চিহ্নটিকে বলেন ______।

v) প্রবোধচন্দ্র (II)-চিহ্নটি দিয়ে দেখান ______, চিহ্নটিকে বলেন ______।

vi) প্রবোধচন্দ্র চিহ্ন ______, উপপর্বের চিহ্ন ______।

vii) ৪-ছত্রের কবিতাগুচ্ছকে অমূল্যধন বলেন ______, প্রবোধচন্দ্র বলেন ______।

viii) অমূল্যধনের স্তবকের জন্য আবশ্যক ______ টি চরণ, প্রবোধচন্দ্রের স্তবকের জন্য আবশ্যক ______টি পঙ্‌ক্তি।

(খ) পর্বের মাঝখানে যতি পড়ে কিনা, পড়লে সে-যতি দিয়ে তৈরি ছন্দ-বিভাগের নাম কী, লিখুন।

একক ২৪ ❒ বাংলা ছন্দের রীতিবিভাগ

গঠন

২৪.১ উদ্দেশ্য
২৪.২ প্রস্তাবনা
২৪.৩ মূলপাঠ
২৪.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি
২৪.৩.২ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি
২৪.৩.৩ মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতি
২৪.৪ সারাংশ
২৪.৫ অনুশীলনী
২৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়লে—

- বুঝে নিতে পারবেন, কীভাবে ছন্দের দিক থেকে কবিতার শরীরের গঠন অঙ্কের হিসেবের মধ্যে ধরা পড়ে যায়।
- বাংলায় লেখা অসংখ্য কবিতার উচ্চারণে ভঙ্গি যে কেবলমাত্র ৩-রকমের ছন্দরীতিতেই ভাগ হয়ে যায়, এই তথ্য আপনার কাছে স্পষ্ট হবে, এবং কোন কবিতা কোন ছন্দ রীতিতে লেখা, উচ্চারণের সঙ্গো সঙ্গো তা আপনার কানে ধরা পড়বে।
- যেকোনো বাংলা কবিতা সঠিক ভঙ্গিতে নির্দিষ্ট জায়গায় থামা আর সঠিক সময় ধরে উচ্চারণ করার কৌশল আয়ত্ত করতে পারবেন।
- অজানতে হোক বা জেনেশুনে হোক, ছন্দের কোনো-কোনো নিয়ম মেনে চলতে কবিরা যে বাধ্য, এই সত্য বুঝে নিয়ে যেকোনা কবিতার ছন্দ বিচার করতে পারবেন।
- ছন্দের নিয়ম-শৃঙ্খলা বুঝে নিয়ে ছন্দের দিক থেকে নিখুঁত কবিতা লেখা সহজ হতে পারে।

২৪.২ প্রস্তাবনা

সব কবিতা ছন্দের দিক থেকে একই রীতি বা পদ্ধতিতে লেখা হয় না, একই কবির লেখা হলেও নয়, একই বিষয় নিয়ে লেখা হলেও না হতে পারে। এই রীতি বা পদ্ধতি কী ধরনের হবে, তা নির্ভর করে কবি যে নীতিতে

ধ্বনির পর ধ্বনি সাজিয়ে কবিতাটি লিখবেন, তার ওপর। বাংলা কবিতার ছন্দরীতি ক-রকমের হতে পারে, এ নিয়ে বহু বছর ধরে বিস্তর বিতণ্ডা চালিয়ে অবশেষে ছান্দসিকেরা মোটামুটি একমত হলেন, বাংলা কবিতায় কবিরা প্রধানত ৩-ধরনের ছন্দরীতিই ব্যবহার করে থাকেন। সংখ্যার বিতর্ক কেটে গেলেও নামের বিতর্ক এখনো কাটেনি। তবে, বিতর্ক থাকলেও প্রবোধচন্দ্র আর অমূল্যধনের তৈরি ৩-জোড়া নামই ছন্দজিজ্ঞাসুদের কাছে প্রিয়। এই এককের মূলপাঠ থেকে বাংলা কবিতার ছন্দরীতি বুঝে নিয়ে আপনারাই স্থির করতে পারবেন—কোন নাম কতখানি সার্থক।

২৪.৩ মূলপাঠ

বাংলা কবিতার ছন্দরীতি যে ৩টিই, এটা স্থির হয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-মোহিতলাল মজুমদার থেকে শুরু করে প্রবোধচন্দ্র সেন—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক ছান্দসিক পৃথক পৃথক যুক্তি দেখিয়ে ৩টি ছন্দরীতির ৩টি করে নাম সুপারিশ করে গেলেন। শেষপর্যন্ত মোটামুটি বহাল রইল প্রবোধচন্দ্র অমূল্যধনের তৈরি নাম। প্রবোধচন্দ্রের কাছে যে রীতি দলবৃত্ত, অমূল্যধনের কাছে তা শ্বাসাঘাতপ্রধান ; প্রবোধচন্দ্রের কলাবৃত্ত-ই অমূল্যধনের ধ্বনিপ্রধান ; আর, প্রবোধচন্দ্রের মিশ্রবৃত্ত অমূল্যধনের কাছে তানপ্রধান। এঁদের পদ্ধতি পৃথক, সিদ্ধান্ত কখনো কখনো এক। কখনো দুজনের পদ্ধতি মেনে, কখনো একটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরপর ৩টি ছন্দরীতির আলোচনা করা হচ্ছে এই এককের মূলপাঠকে ৩টি অংশে ভাগ করে। এক-একটি অংশে পাবেন এক-একটি রীতির সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য দলের মাত্রা, সঙ্গে থাকবে দৃষ্টান্ত।

২৪.৩.১ দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি

দলবৃত্ত আর শ্বাসাঘাতপ্রধান একই ছন্দরীতির দুটি নাম। এ-রীতির ছন্দে প্রতিটি দলই হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, সে-দল মুক্ত বা রুদ্ধ যা-ই হোক। অর্থাৎ, দলই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম প্রবোধচন্দ্র রাখলেন দলবৃত্ত। আবার, অমূল্যধন লক্ষ করলেন, এ-রীতিতে প্রতিটি পর্বে অন্তত‌পক্ষে ১টি করে শ্বাসাঘাত পড়ে-ই। অতএব, এর নাম হল শ্বাসাঘাতপ্রধান। নীচের দৃষ্টান্তগুলি একটা-একটা করে উচ্চারণ করতে করতে বুঝে নিন ঃ

(১) প্রতিটি দলের উচ্চারণ হ্রস্ব, ১-মাত্রার (কেটে কেটে)।

(২) যে দলের মাথায় মাত্রাচিহ্নের (১) ওপর রেফ্-চিহ্ন দেওয়া হল, তার উচ্চারণে আশপাশের অন্য দলের তুলনায় বাড়তি ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত পড়েছে।

১ ১ ১১ | ১১ ১১ | ১১১১ | ১ ||
১. হায় রে কবে | কেটে গেছে | কালিদাসের্ | কাল || =৪ + ৪ + ৪ + ১

১১১১ | ১১ ১১ | ১১ ১১ | ১ ||
পন্ডিতেরা | বিবাদ্ করে | লয়ে তারিখ্ | সাল্ || =৪ + ৪ + ৪ + ১

	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১	
২.	ইল্‌শে	গুঁড়ি	ইল্‌শে	গুঁড়ি	ইলিশ্‌	মাছের	ডিম্‌	=৪ + ৪ + ৪ + ১
	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১	
	ইল্‌শে	গুঁড়ি	ইল্‌শে	গুঁড়ি	দিনের	বেলায়	হিম্‌	=৪ + ৪ + ৪ + ১

লক্ষ করুন, ২টি দৃষ্টান্তেই প্রতিটি দল বা অক্ষরের মাথায় ১টি করে মাত্রার সংকেত। এটাও লক্ষ করুন, শ্বাসাঘাত পড়ছে প্রতিটি রুদ্ধদল বা হলন্ত অক্ষরের ওপর, যে-পর্বে রুদ্ধদল নেই সেখানে অবশ্য শ্বাসাঘাত পড়ছে পর্বের প্রথম বা দ্বিতীয় মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) ওপর।

প্রতিটি চরণের ডানদিকে দেওয়া অঙ্কগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন—

প্রতিটি পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রার, শেষে অপূর্ণ পর্ব ১-মাত্রার। এ ছন্দরীতিতে প্রায় সব পূর্ণপর্বই ৪-মাত্রার হয়ে থাকে। তবে, প্রবোধচন্দ্র দলবৃত্ত রীতির কোনো কোনো পর্বে ৭মাত্রা ধার্য করে থাকেন। দেখুন এই দৃষ্টান্ত দুটি—

	১ ১ ১	১ ১ ১ ১		১ ১	১ ১	
১.	আগুনের্‌	পরশ্‌মণি		ছোঁয়াও	প্রাণে	= ৭ + ৪
	১ ১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	১ ১	
	এ জীবন্‌	পুণ্‌্য	করো	দহন্‌	দানে	= ৭ + ৪

	১ ১ ১	১ ১ ১ ১			
২.	বাবুদের্‌	তাল্‌পুকুরে			= ৭
	১ ১ ১	১ ১ ১ ১			
	হাবুদের্‌	ডাল্‌পুকুরে			= ৭
	১ ১	১	১ ১	১ ১	
	সে কি	বাস্‌	কর্‌লে	তাড়া	= ৭
	১ ১	১	১ ১	১ ১	
	বলি	থাম্‌	একটু	দাঁড়া	= ৭

অমূল্যধন ৭-মাত্রার প্রতিটি পর্বই দুভাগে ভাগ করে নেবেন—হয় ৩+৪ মাত্রার ২টি পর্বে, না-হয় ৩-মাত্রার প্রথম পর্বটিকে অতিপর্ব হিসেবে গণ্য করে, ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব বের করে আনবেনই।

২৪.৩.২ ঃ কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি

যে ছন্দ-রীতি প্রবোধচন্দ্রের কাছে কলাবৃত্ত, তা-ই অমূল্যধনের কাছে ধ্বনিপ্রধান। প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া হিসেব থেকে আগেই জেনেছেন—১-মাত্রার প্রতিটি দল হ্রস্ব এবং তার ধ্বনি পরিমাণ ১-কলা, ২-মাত্রার প্রতিটি দল দীর্ঘ, তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা। এখন যে ছন্দ রীতির আলোচনা করছি, সেখানে প্রতিটি মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ১-কলা এবং মাত্রাও ১টি ; প্রতিটি রুদ্ধদল দীর্ঘ, অতএব তার ধ্বনিপরিমাণ ২-কলা এবং মাত্রা ২টি। অর্থাৎ 'কলা'-ই এখানে মাত্রা। এই কারণে এ-রীতির নাম কলাবৃত্ত।

প্রবোধচন্দ্র শেখালেন—'কলা' একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিপরিমাণ, অতএব, 'কলাবৃত্ত' রীতিতে প্রতিটি দলের অন্তর্গত ধ্বনিপরিমাণের হিসেব নির্দিষ্ট, দলের মাত্রা-ও নির্দিষ্ট। অমূল্যধনও এ কথাই বলেন একটু অন্যরকম ভাষায়। তাঁর কথাতেও, এ-রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান। স্পষ্ট উচ্চারণে অক্ষরের অন্তর্গত প্রতিটি ধ্বনির হিসেব এখানে রাখতে হয়। এই কারণে, স্বরান্ত অক্ষর (মুক্তদল) এ-রীতিতে হ্রস্ব হলেও হলন্ত অক্ষর (রুদ্ধদল) দীর্ঘ হতে চায়। অর্থাৎ, স্বরান্ত অক্ষরে ১-মাত্রা আর হলন্ত অক্ষরে ২-মাত্রা নির্দিষ্ট। অক্ষরের ধ্বনিপরিমাণ বা ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে মাত্রা নির্দিষ্ট হয় বলেই এ রীতির নাম **ধ্বনিপ্রধান**।

নীচের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ করুন ঃ

(১) প্রতিটি মুক্তদলের উচ্চারণ হ্রস্ব, ১-মাত্রার (কেটে-কেটে)।

(২) প্রতিটি রুদ্ধদলের উচ্চারণ দীর্ঘ, ২-মাত্রার (টেনে-টেনে)।

১ ১   ১ ১ | ২ ১ ১ | ১ ১   ২
১. খ্যাতি আছে | সুন্দরী | বলে তার্ = ৪+৪ +৪
১ ১   ১ ১ | ২ ১ ১ | ১ ১   ২
ত্রুটি ঘটে | নুন্ দিতে | ঝোলে তার্ = ৪+৪ +৪
(প্রবোধচন্দ্রের পর্ববিভাগ)

১ ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ | ১ ১ ১   ১ ১ | ২
২. নূতন্ জাগা | কুন্‌জবনে | কুহরি উঠে | পিক্ = ৫+৫+৫+২
১ ২ ২ | ২ ১ ১ ১ | ১ ২   ২ | ২
বসন্তের্ | চুম্‌বনেতে | বিবশ্ দশ্ | দিক্ = ৫+৫+৫+২

২ ১ ১   ২ | ১ ১   ২ ১ ১ | ১ ১ ১
৩. ঐ আসে ঐ | অতি ভৈরব | হরষে = ৫+৫+৫+২
১১ ২১১ | ১ ১   ২ ১ ১ | ১ ১ ১
জলসিন্‌চিত | ক্ষিতি সৌরভ | রভসে = ৬+৬+৩

	২ ১	১	১	১ ১	১ ২	১ ১	১ ১	১ ২	১ ১১১	১ ১
৪.	মন্ত্রে	সে	যে	পূত	রাখীর	রাঙা	সুতো	বাঁধন্	দিয়েছিনু	হাতে

=৭+৭+৭+২

	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১	২ ১ ১১	
৫.	তোমারে	ডাকিনু	যবে	কুন্জবনে ‖	= ৮+৫
	১ ১ ১	১ ১ ১	১ ১	২ ১ ১ ১	
	তখনো	আমের্	বনে	গন্ধ ছিল ‖	= ৮+৫

(অমূল্যধনের পর্ববিভাগ)

৬.	আম্রের্	মন্জরী	গন্ধ	বিলায় ‖	
	২ ২	২ ২	২ ১	১ ২	
	চম্পার	সৌরভ্	শূন্ন্যে	মিলায় ‖	= ৮+৬

(অমূল্যধনের পর্ববিভাগ)

দেখা গেল, কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্প্রধান রীতিতে পূর্ণপর্ব ৪-মাত্রা থেকে ৮-মাত্রা পর্যন্ত যেকোনা মাপের হতে পারে। তবে, অমূল্যধন অবশ্য প্রথম দৃষ্টান্তে ৮-মাত্রার পূর্ণপর্বই পাবেন ('খ্যাতি আছে সুন্দরী' আর 'ত্রুটি ঘটে নুন্ দিতে'), এ রীতিতে ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব তিনি মানেন না। অন্যদিকে প্রবোধচন্দ্র পঞ্চম দৃষ্টান্তে পাবেন ৮ আর ৫-মাত্রায় ২-টি জোড়া-পর্বের পদ, আর ষষ্ঠ দৃষ্টান্তে পাবেন ৪-মাত্রার পূর্ণপর্ব, ৮-মাত্রার পর্ব তিনি পারতপক্ষে মানেন না।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতিতে মুক্তদল সাধারণত হ্রস্ব এবং ১-মাত্রার, এ কথা জানলেন। এরপর এই রীতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুক্তদলের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার হতেও দেখবেন। ২-মাত্রার মুক্তদল পাবেন ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতায়, 'জনগণমন অধিনায়ক' কবিতায়, এবং আধুনিক কালের দু-চারটি বাংলা কবিতায়। দৃষ্টান্ত দেখুন—

	২ ১ ১	২১ ১	১ ১ ১	১ ২১
১.	মন্দির	বাহির	কঠিন	কপাট ‖

	১১ ১১	২ ২	২ ২
২.	তব শুভ	নামে	জাগে
	১১ ১১	২১ ১	২ ২
	তব শুভ	আশিস	মাগে
	২ ২	১ ১ ১ ১	২ ২
	গাহে	তব জয়	গাথা

(প্রবোধচন্দ্রের পর্ববিভাগ)

	২	১ ১	২	১ ১	২ ১ ১	১ ১ ১ ১		
৩.	রে	সতি	রে	সতি	কাঁদিল	পশুপতি		
					২ ১ ১	১ ১	১ ১ ২	
					পাগল	শিব	প্রমথেশ্	

	২ ১	২ ১ ১ ১	২ ১	১ ১ ১ ১
৪.	নীল	সিন্‌ধুজল	ধৌত	চরণতল
	১ ১১	১ ২ ১ ১	২ ১ ১	২১ ১
	অনিল-	বিকম্‌পিত	শ্যামল	অন্‌চল

মোটা হরফের প্রতিটি দলই মুক্তদল, তবু এদের উচ্চারণ দীর্ঘ এবং ২-মাত্রার। লক্ষ করুন, দীর্ঘ উচ্চারণ আর ২-মাত্রা পাওয়া প্রতিটি মুক্তদল এখানে বানানেও দীর্ঘস্বরান্ত (অর্থাৎ দলের শেষে আ-কার ঈ-কার এ-কার)। বানানে হ্রস্‌স্বরান্দ দলুগলি ১-মাত্রাই পেল। তাহলে ওপরের দৃষ্টান্তকটিতে দলের মাত্রাগোনার নিয়মটা এইরকম দাঁড়ায় ঃ

(১) প্রতিটি হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদলের হ্রসব উচ্চার, ১-মাত্রা।

(২) প্রতিটি দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ, ২-মাত্রা।

(৩) প্রতিটি রুদ্ধদলের দীর্ঘ উচ্চারণ, ২-মাত্রা।

তবে, ব্যতিক্রম কিছু কিছু থাকবেই, যেখানে মুক্তদল বানানো হ্রস্বস্বরান্ত হয়েও উচ্চারণে দীর্ঘ বা বানানে দীর্ঘস্বরান্ত হয়েও উচ্চারণে হ্রস্ব হতে পারে। এমনকী, রুদ্ধদলও কখনো কখনো উচ্চারণে হ্রস্ব হয়ে পড়ে। তাহলেও হ্রস্ব উচ্চারণে ১-মাত্রা আর দীর্ঘ উচ্চারণে ২-মাত্রা—এ নিয়ম সব সময় বহাল থাকবে। ছন্দরীতি অবশ্যই কলাবৃত্ত, তবু আগেকার দৃষ্টান্তগুলির তুলনায় এদের মাত্রারীতি একটু অন্যরকম, বিশেষ করে মুক্তদলের দীর্ঘ উচ্চারণ আর ২-মাত্রা পাওয়ার ক্ষেত্রে। সংস্কৃত কাব্য কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলা কবিতায়, বিশেষ করে চর্যাপদে, এবং ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এ রীতির ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছিল। এই কারণে প্রবোধচন্দ্র একে বলেন প্রাচীন কলাবৃত্ত। এর চলতি নাম অবশ্য 'প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত' বা 'প্র- কলাবৃত্ত'। তবে আধুনিক কালের কবিতায় এর প্রয়োগ কিছু কিছু যে হয়েছে, শেষ ৩টি দৃষ্টান্ত তারই নমুনা।

২৪.৩.৩ মিশ্রণ বা তানপ্রধান রীতি

বাংলা ছন্দের আর-একটি রীতিরও দুটি নাম পাশাপাশি চলছে—**মিশ্রবৃত্ত** আর **তানপ্রধান**। আমরা জেনেছি—দলবৃত্ত রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, রুদ্ধদলও ১-মাত্রার। কলাবৃত্তে মুক্তদল ১-মাত্রার, কিন্তু রুদ্ধদল ২-মাত্রার। আর, আমাদের আলোচ্য রীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রায় নির্দিষ্ট হলেও রুদ্ধদল কিন্তু ১-মাত্রার হতে পারে, আবার ২ মাত্রারও হতে পারে। এটা নির্ভর করে রুদ্ধদলটি শব্দের (word) শুরুতে আছে, না মাঝখানে, না

শেষে—তার ওপর। শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে রুদ্ধদল হবে ১-মাত্রার, শেষে থাকলে ২-মাত্রার আপনার আগেই জেনেছেন,—রুদ্ধদলের ১-মাত্রা হয় দলবৃত্ত রীতিতে, ২-মাত্রা হয় কলাবৃত্ত রীতিতে। আলোচ্য রীতিতে প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করলেন রুদ্ধদলের দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—একটি ১-মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব, আর একটি ২-মাত্রার কলাবৃত্ত স্বভাব। এর অর্থ, এ-রীতি আসলে দলবৃত্ত-কলাবৃত্তের মিশ্রণেই তৈরি। এই কারণে এ রীতির নাম হল **মিশ্রবৃত্ত**। ধরুন 'রুদ্ধদল' শব্দটি। এতে আছে ৩টি দল—রুদ্‌-ধ-দল্‌। 'রুদ'্ আর 'দল'্—দলবৃত্ত রীতিতে ১-মাত্রার, কলাবৃত্ত রীতিতে ২-মাত্রার। কিন্তু, মিশ্রবৃত্ত রীতিতে 'রুদ'্ ১ মাত্রা পায় শব্দের শুরুতে আছে বলে, আর, 'দল'্ ২-মাত্রা পায় শব্দের শেষে আছে বলে। 'রুদ'্-এর ১-মাত্রা পাওয়াটা যেমন দলবৃত্ত স্বভাব, 'দল'্-এর ২-মাত্রা পাওয়াটাও তেমনি কলাবৃত্ত-স্বভাব।

'তান' কথাটি অমূল্যধন কী অর্থে ব্যবহার করেন, তা আপনারা আগেই জেনেছেন। এইমাত্র জানলেন, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) মিশ্র স্বভাব দেখে এক শ্রেণির কবিতার ছন্দ-রীতিকে প্রবোধচন্দ্র বললেন 'মিশ্রবৃত্ত'। সেই একই শ্রেণির কবিতা পড়তে পড়তে অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে একটা টানা সুর। এই টানা সুর বা সুরের টান বা 'তান'-কেই এ ছন্দরীতির বিশেষ লক্ষণ বলে তাঁর কাছে মনে হল। সেই কারণেই এ-রীতিকে তিনি বললেন **তানপ্রধান**।

এ 'তান' বা সুর সব শ্রোতার কানে না-ও বাজতে পারে। এ-রীতির 'তানপ্রধান' নামটিও তেমন পাঠক-শ্রোতার কাছে অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। তবে, দলের মাত্রা নিয়ে একটু আগে যা লেখা হল, সে-বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই।

অতএব, যে ছন্দরীতিতে মুক্তদল ১-মাত্রার, রুদ্ধদল শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রার, শব্দের শেষে থাকলে ২-মাত্রার, তাকেই বলব মিশ্রবৃত্ত। স্তবক পড়তে পড়তে কানে সুর বাজুক বা না-ই বাজুক, ঐ মিশ্রবৃত্তেরই অন্য নাম তানপ্রধান।

ধরুণ নীচের দৃষ্টান্তটি—

১ ১	১ ১	১ ২ ১ ১ ১	‖	
শুধু	তব	অন্‌তর্‌বেদনা	‖	= ০ + ১০

১ ১ ২	১ ১	২	।	১ ১ ২	১ ১	১	১ ১ ১	‖	
চিরন্‌তন্‌	হয়ে	থাক্‌	।	সম্‌রাটের্‌	ছিল	এ	সাধনা	‖	= ৮ + ১০

লক্ষ করুন,

(১) শুধু ত ব ইত্যাদি প্রতিটি মুক্তদল ১-মাত্রা।

(২) শব্দের শুরুতে থাকা অন্‌ সম্‌ রুদ্ধদল-দুটি ১-মাত্রার।

(৩) শব্দের মাঝখানে-থাকা রন্‌ (চি-রন্‌-তন্‌) রুদ্ধদলটি ১-মাত্রার।

(৪) শব্দের শেষে থাকা তর্‌ (অন্‌-তর্‌), তন্‌, টের রুদ্ধদল-তিনটি ২-মাত্রার।

(৫) একটিমাত্র রুদ্ধদল দিয়ে তৈরি 'থাক'্ শব্দটিও ২-মাত্রার।

এখানে ২টি কথা মনে রাখবেন—

(১) 'অন্‌তর্‌বেদনা' কথাটি ভাঙলে পাবেন ২টি পৃথক্ শব্দ 'অন্‌তর্' আর 'বেদনা'। 'তর্' রুদ্ধদলটি 'অন্‌তর্' শব্দের শেষে আছে, তাই ২-মাত্রার। এ রকম ২টি বা ৩টি শব্দের সমাজে তৈরি জোড়-লাগা কথা ভেঙে নেবেন।

(২) 'থাক্' রুদ্ধদলটি শব্দের একমাত্র দল। এ রকম রুদ্ধদলে ২-মাত্রাই ধরবেন।

এবারে নীচের দৃষ্টান্তগুলিতে লক্ষ করুন ঃ

(১) প্রতিটি মুক্তদলে ১-মাত্রা।

(২) রুদ্ধদলে ১-মাত্রা শব্দের শুরুতে আর মাঝখানে।

(৩) রুদ্ধদলে ২-মাত্রা শব্দের শেষে

(৪) শব্দের একমাত্র রুদ্ধদলে ২-মাত্রা।

```
     ২      ১ ১ ১ ১      ২      ১ ১ ১       ১ ১ ১
১.   এই     সূর্‌য্‌করে    এই     পুষ্‌পিত     কাননে          = ৮+৬
     ১ ১ ১   ১ ২  ১ ১    ১ ১     ২        ২
     জীবন্‌ত  হৃদয়্-মাঝে   যদি     স্থান্     পাই            = ৮+৬

     ১ ১ ১    ১ ১ ১   ১ ১   ১ ২ ১ ২      ১  ১ ২
২.   এ কথা    জানিতে   তুমি   ভারত্-ঈশ্‌শর   শা-জাহান্     = ৮+১০
     ১ ১ ১ ১     ১ ১   ২      ১  ২    ১ ২      ১ ১ ২
     কালস্রোতে   ভেসে   যায়্    জীবন্    যৌবন্    ধনমান্      =৮+১০

     ১ ১    ১ ১    ১ ১ ১ ১   ১ ২      ১  ২  ১১  ১ ১        ২ ১ ১
৩.   নামে    সন্‌ধ্যা  তন্‌দ্রালসা  সোনার্    আঁচল্-খসা হাতে        দীপ্‌শিখা     =৮+৮+৬
     ১  ২   ১  ২     ২      ১ ১   ১ ১    ১  ১  ২     ১ ১   ১১১১
     দিনের্   কল্‌লোর   পর্     টানি   দিল    ঝিল্‌লিস্‌স্বর্    ঘন    যবনিকা     = ৮+৮+৬

     ১ ১ ১   ১ ১ ১    ১ ২     ১  ১ ১     ১ ২     ১ ১ ১     ২
৪.   পৃথিবী   ডাকিছে   আপন্   সন্‌তানে     বাতাস্   ছুটিছে     তাই        = ৬+৬+৬+২
     ১ ১   ১ ১ ১ ১    ১ ২    ১ ১ ১    ১ ১ ১ ১   ১ ১    ২
     গৃহ   তেয়াগিয়া    ভায়ের্  সন্‌ধানে   চলিয়াছে    কত    ভাই         = ৬+৬+৬+২
```

এই দৃষ্টান্ত-কটি থেকে লক্ষ করলেন, মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে, পূর্ণপর্ব ৬, ৮ বা ১০-মাত্রার হতে পারে।

২৪.৩.৩ সারাংশ

বাংলা কবিতার ৩টি ছন্দরীতির চলতি নাম দলবৃত্ত-কলাবৃত্ত-মিশ্রবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান-ধ্বনিপ্রধান তান প্রধান। প্রথম ৩টি নাম প্রবোধচন্দ্রের দেওয়া, পরের ৩টি অমূল্যধনের।

দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান রীতি ঃ

যে ছন্দরীতিতে দল-ই মাত্রা, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেন 'দলবৃত্ত'। এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত লক্ষ করে অমূল্যধন এর নাম দিলেন 'শ্বাসাঘাতপ্রধান'। এ রীতির প্রতিটি দলের হ্রস্ব উচ্চারণ এবং ১-মাত্রা, পূর্ণপর্বে ৪-মাত্রা, অমূল্যধনের বিবেচনায় এ রীতির প্রতিটি পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে হলন্ত অক্ষরের (রুদ্ধদল) ওপর, হলন্ত অক্ষর না থাকলে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরান্ত অক্ষরের (মুক্তদলের) ওপর।

কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান রীতি ঃ

যে ছন্দরীতিতে কলা-ই মাত্রা, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেন 'কলাবৃত্ত'। যেহেতু, এ রীতিতে অক্ষরের (দলের) ধ্বনিপরিমাণটাই প্রধান, এবং ধ্বনির নির্দিষ্ট হিসেব থেকে অক্ষরের মাত্রাও নির্দিষ্ট হয়, সেই কারণে অমূল্যধন একে বলেন 'ধ্বনিপ্রধান'। এ রীতির প্রতিটি মুক্তদলের (স্বরান্ত অক্ষরের) হ্রস্ব উচ্চারণ ১-মাত্রা, রুদ্ধদলের (হলন্ত অক্ষরের) দীর্ঘ উচ্চারণ এবং ২-মাত্রা ; পূর্ণপর্বে ৪ থেকে ৭ মাত্রা প্রবোধচন্দ্রের হিসেবে, ৫ থেকে ৮ মাত্রা অমূল্যধনের হিসেবে।

সংস্কৃত কবিতার ছন্দ অনুসরণ করে পুরোনো বাংলাভাষায় লেখা চর্যাপদে আর ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব পদাবলিতে এমন এক ধরনের 'কলাবৃত্ত' ছন্দরীতি প্রয়োগ করা হত, সেখানে দীর্ঘস্বরান্ত মুক্তদল ২-মাত্রা পায়। হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তদলের ১-মাত্রা আর রুদ্ধদলের ২-মাত্রা অবশ্য বহাল থাকে। প্রবোধচন্দ্রের কথায় এ ছন্দরীতির নাম 'প্রাচীন কলাবৃত্ত'। আধুনিক কালের কিছু কিছু কবিতায় এ রীতির প্রয়োগ রয়েছে।

মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতি ঃ

রুদ্ধদলের মাত্রার হিসেব দিয়েই প্রবোধচন্দ্র ছন্দরীতি নির্ধারণ করেন। প্রতিটি রুদ্ধদল যেখানে ১-মাত্রার, রুদ্ধদলের সেখানে দলবৃত্ত-স্বভাব, ছন্দরীতি সেখানে দলবৃত্ত। প্রতিটি রুদ্ধদল যেখানে ২-মাত্রার, রুদ্ধদলের সেখানে কলাবৃত্ত-স্বভাব, ছন্দরীতি সেখানে কলাবৃত্ত। কিন্তু, রুদ্ধদল যেখানে শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে ১-মাত্রার, শব্দের শেষে ২-মাত্রার, সেখানে তার দুটি স্বভাবের মিশ্রণ—১ মাত্রার দলবৃত্ত-স্বভাব আর ২-মাত্রার কলাবৃত্ত-স্বভাব। ছন্দরীতিও তখন দুটি রীতির মিশ্রণে তৈরি। অতএব, এ রীতির নাম 'মিশ্রবৃত্ত'।

একই রীতির কবিতা পড়তে পড়তে একটা টানা সুর অমূল্যধনের কানে বাজতে থাকে বলে এই সুরের টানা বা 'তান'-কেই তাঁর এ রীতির বিশেষ লক্ষণ বলে মনে হত। অতএব, এ ছন্দরীতির নাম হল 'তানপ্রধান'। এ রীতেতে পূর্ণপর্বে সাধারণ ৬, ৮ বা ১০ মাত্রা।

২৪.৫ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৪ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ

দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত

(খ) কেন এই নামকরণ, বুঝিয়ে দিন ঃ

শ্বাসাঘাতপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান।

২. (ক) নীচের ছন্দরীতিতে কোন দলে কত মাত্রা, লিখুন ঃ দলবৃত্ত, কলাবৃত্ত, মিশ্রবৃত্ত।

(খ) নীচের দৃষ্টান্তগুলিতে দলের মাথায় মাত্রা বসান, যতিচিহ্ন দিন, পূর্ণযতির পরে প্রতিপর্বের মাত্রাসংখ্যা লিখুন, নীচে ছন্দরীতির নাম লিখুন ঃ

i) বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপ-মালা

ii) এ গোঁফ যদি আমার বলিস করবো তোদের জবাই,
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।

iii) আকাশে অসংখ্য তারা
চিন্তাহারা ক্লান্তিহারা,
হৃদয় বিস্ময়ে সারা
হেরি একদিঠি

iv) হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।।

(গ) কোন ছন্দরীতিতে সাধারণত কত মাত্রার পূর্ণপর্ব থাকে, লিখুন।

৩. (ক) বিকল্প পরিভাষা কী, লিখুন ঃ

দলবৃত্ত, তানপ্রধান, কলাবৃত্ত

(খ) কোন ছন্দরীতিতে প্রতিটি রুদ্ধদলে ১-মাত্রা, লিখুন।

(গ) কোন ছন্দরীতিতে প্রতিটি রুদ্ধদলে ২-মাত্রা, লিখুন।

(ঘ) কোন ছন্দরীতিতে রুদ্ধদলে কখনো ১-মাত্রা, কখনো ২-মাত্রা, লিখুন।

(ঙ) কোন ছন্দরীতিতে মুক্তদলে কখনো ১-মাত্রা কখনো ২-মাত্রা, লিখুন।

SBG–2 (M–6-10)—4

২৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

ছন্দরীতি বিষয়ে ব্যাবহারিক পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দরীতি	পৃ-৩১, ৩২	পৃ-৯৮	×
দলবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫, ২৪৬	×	পৃ-৬৫, ৭১-৮৬
শ্বাসঘাতপ্রধান	×	পৃ-১০৯-১২	পৃ-৬৯
কলাবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫,২৩৭	×	পৃ-৬৫,৬৬,৮৭-৯৮
ধ্বনিপ্রধান	×	পৃ-১০৬-০৮	পৃ-৬৮
মিশ্রবৃত্ত	পৃ-৩১-৩৫, ২৬৫	×	পৃ-৬৬-৬৯,১০০-০৮
তানপ্রধান	×	পৃ-৯৯-১০৬	পৃ-৬৮

একক ২৫ ❐ বাংলা ছন্দোবন্ধ

গঠন

২৫.১ উদ্দেশ্য

২৫.২ প্রস্তাবনা

২৫.৩ মূলপাঠ-১ ঃ পয়ার

২৫.৪ সারাংশ-১

২৫.৫ অনুশীলনী-১

২৫.৬ মূলপাঠ-২ ঃ অমিত্রাক্ষর

২৫.৭ সারাংশ-২

২৫.৮ অনুশীলনী-২

২৫.৯ মূলপাঠ-৩ ঃ চতুর্দশপদী

২৫.১০ সারাংশ-৩

২৫.১১ অনুশীলনী-৩

২৫.১২ সামগ্রিক অনুশীলনী

২৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

২৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গো পড়ার পর—

- এমন একটি কৌশল আয়ত্ত হওয়া সম্ভব, যার সাহায্যে বুঝে নিতে পারবেন—একটি কবিতায় ছত্রের পর ছত্র ধরে ছন্দ আর অর্থ পাশাপাশি কীভাবে চলতে থাকে, চলতে চলতে এরা কে কোথায় সীমানা খুঁজে পায় আর থামে, এবং এই চলা আর থাা থেকে ছন্দ-অর্থের কী সম্পর্ক তৈরি হয়।
- ছত্রের পর ছত্র সাজাতে গিয়ে ছন্দ আর অর্থের সম্পর্ককে কবি কোন শাসনে বাঁধলেন, তা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।
- ছত্রের বিন্যাসে আর ছন্দ-অর্থকে পাশাপাশি চালানোতে কবির দক্ষতা কতখানি, তার পরিমাপ করতে পারবেন।
- প্রথার একঘেয়ে শাসন থেকে কবিরা ক্রমশ বাংলা কবিতার ছন্দকে কীভাবে মুক্ত করে আনলেন, তা আন্দাজ করতে পারবেন।

২৫.২ প্রস্তাবনা

ছত্রনির্মাণ ছত্রবিন্যাস মিলের ব্যবহার আর ছত্রের পর ছত্র ধরে চলতে-থাকা ছন্দ-অর্থের সম্পর্ক—এসব নিয়ে ছন্দের দিক থেকে কবিতার শরীর গঠনের প্রক্রিয়া প্রায় নির্দিষ্ট বাঁধা ছিল বহুকাল। প্রথার শাসনকে অমান্য করার মতো জোরা বাঙালি কবির ছিলই না। ছন্দের এই বাইরের বন্ধন কী ধরনের ছিল, তা থেকে বাংলা কবিতার মুক্তির পথ কীভাবে তৈরি হল, সেইসঙ্গো বিরক্তিকর একঘেয়েমি কাটিয়ে কবিতার শরীর গঠনে ক্রমশ বৈচিত্র্য কীভাবে এল—তার খানিকটা আভাস এই এককের পাঠে তুলে ধরা হল।

ছন্দরীতির আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন, দলের (বা অক্ষরের) সঠিক উচ্চারণ (টেনে-টেনে বা কেটে-কেটে) থেকে বেরিয়ে আসে দলের সঠিক মাত্রা, পর্বের মধ্যে সেই মাত্রার বিন্যাস থেকেই ক্রমশ ধরা পড়ে পর্বের পঙ্ক্তির (বা চরণের) স্তবকের, অবশেষে একটি গোটা কবিতার ছন্দ-স্বভাব—ছন্দের ভেতরকার পরিচয়। এবারে এগিয়ে চলুন ছন্দের বাইরের একটা পরিচয়ের দিকে, ছান্দসিকেরা যাকে বলেন **ছন্দোবন্ধ**। ছন্দরীতি হল ছন্দের প্রকৃতি, আর 'ছন্দোবন্ধ' ছন্দের আকৃতি। ছন্দরীতি নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, **'ছন্দোবন্ধ'** নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের ওপর। কোন্ দল কত মাত্রা ধরে উচ্চারণ করব—এর ওপর নির্ভর করে ছন্দরীতি। মাত্রাবিন্যাসের পর যতি কোথায় পড়বে, অর্থাৎ পর্বের মাপ কত মাত্রার হবে, পর্বের পর পর্ব সাজিয়ে কীভাবে পঙ্ক্তি বা চরণ তৈরি করব—এর ওপর নির্ভর করে 'ছন্দোবন্ধ'

নীচের দৃষ্টান্ত-দুটি দেখুন—

২ ১ ১   ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ২ ||
১. তাল্‌গাছে   তাল্‌গাছে | পল্লবচয় || = ৮ + ৬

২ ২   ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ২ ||
চন্‌চল্   হিল্‌লোলে | কল্‌লোলময় || = ৮ + ৬

১ ১   ১ ১   ১ ১   ১ ১ | ১ ১ ১   ১ ১ ১ ||
২. পুণ্‌ণে   পাপে   দুক্‌খে   সুখে | পতনে   উত্‌থানে || = ৮ + ৬

১ ২   ১ ১ ১   ২ | ১ ২   ১ ১ ১ ||
মানুষ   হইতে   দাও | তোমার্   সন্‌তানে || = ৮ + ৬

প্রথম দৃষ্টান্তে প্রতিটি রুদ্ধদলের উচ্চারণ ২-মাত্রায়—অতএব, রীতি কলাবৃত্ত (বা ধ্বনিপ্রধান)। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রুদ্ধদল শব্দের প্রথমে ১-মাত্রার (পুণ্ দুক্ উত্ সন্), শব্দের শেষে ২-মাত্রার (নুষ্ মার্)—অতএব, রীতি মিশ্রবৃত্ত (বা তানপ্রধান)। ২টি দৃষ্টান্তে পৃথক্ ছন্দরীতি। এবারে যতিচিহ্ন, পর্বের মাপ আর পর্ববিন্যাসের দিকে তাকান।

২টি দৃষ্টান্তেই—

(১) অর্ধযতি (বা পর্বযতি) পড়েছে ৮-মাত্রার পর।

(২) পূর্ণবতি (পঙ্‌ক্তিযতি) পড়েছে ৮ + ৬ বা ১৪-মাত্রার পর

(৩) পূর্ণযতি (পঙ্‌ক্তিযতি) ৮-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব বা পদ ৬-মাত্রার।

(৪) প্রতি চরণে (বা পঙ্‌ক্তিতে) ৮ + ৬ মাত্রার পর্ববিন্যাস (বা পদবিন্যাস)।

২টি দৃষ্টান্তের এই মিল আসলে চরণ বা পঙ্‌ক্তি-গঠনের মিল। এ মিল বাইরের, এ পরিচয় বাইরের। এরই নাম 'ছন্দোবন্ধ'। ভেতরকার পরিচয়ে ভিন্ন হলেও বাইরের পরিচয়ে স্তবক-দুটি এক। ছন্দরীতি পৃথক্ হলেও এদের 'ছন্দোবন্ধ' এক।

এই এককে বাংলা কবিতার তিনরকম ছন্দোবন্ধ নিয়ে তিনটি ভাগে আলোচনা হবে—পয়ার, অমিত্রাক্ষর আর চতুর্দশপদী।

২৫.৩ মূলপাঠ-১ ঃ পয়ার

পয়ার একটি 'ছন্দোবন্ধে'র নাম। ৮ + ৬ মাত্রার পর্ববিন্যাসে চরণ (বা ৮ + ৬ মাত্রার পদবিন্যাসে পঙ্‌ক্তি) তৈরি হলে তার ছন্দোবন্ধের নাম 'পয়ার'। হয়তো 'পদাকার' (পদ + আকার) কথাটি থেকে 'পয়ারে এসেছে। প্রাচীন বাংলা কাব্যের ৮ + ৮ মাত্রার চরণ ক্রমশ ৮ + ৭ এবং তা থেকে ৮ + ৬-এ নেমে এসে 'পয়ারে'-র বাঁধা নিয়মে স্থির হয়ে রইল আধুনিক বাংলা কাব্য পর্যন্ত। একটু আগে যে-দুটি দৃষ্টান্ত থেকে 'ছন্দোবন্ধে'র পরিচয় পেলেন, সেই দৃষ্টান্ত-দুটি 'পয়ার' ছন্দোবন্ধের। 'পয়ার' নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ। একাবলি ত্রিপদী চৌপদী—এইসব প্রাচীন ছন্দোবন্ধ বাংলা কবিতা থেকে ক্রমশ সরে গেছে অথবা সরে যাবার পথে। কিন্তু, 'পয়ার' এখনো টিকে আছে। অবশ্য তার রূপে বৈচিত্র্য এসেছে। সে বৈচিত্র্যের পরিচয় ক্রমশ পাবেন, দেখবেন—'পয়ার' কীভাবে একটি আধুনিক ছন্দোবন্ধ হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে তার নামেরও বদল ঘটেছে।

প্রাচীন ছন্দোবন্ধ হিসেবে পয়ারের মূল শর্ত ৪টি—

১. প্রতি স্তবকে ২টি চরণ (বা পঙ্‌ক্তি) থাকবে।

২. চরণ-দটির অন্ত্যমিল থাকবে (মিত্রাক্ষর)।

৩. প্রতি চরণে (বা পঙ্‌ক্তিতে) ২টি করে পর্ব (বা পদ) থাকবে।

৪. প্রথম পর্ব (বা পদ) ৮-মাত্রার, দ্বিতীয় পর্ব বা পদ ৬-মাত্রার হবে।

নীচের দৃষ্টান্তটি লক্ষ করুন—

১ ১ ১ ১ ২		১ ১	১ ১ ১	১ ২	
মহাভারতের্		কথা	অমৃত	সমান্	= ৮ + ৬
১ ১ ২	২	১ ১	১ ১	১ ১ ২	
কাশীরাম্	দাস্	কহে	শুনে	পুণ্‌ণবান্	= ৮ + ৬

স্তবকটিতে পয়ারের ৪টি শর্তেরই পূরণ হয়েছে। এটাও জেনে রাখা ভালো—পয়ার ছন্দোবন্ধে লেখো সব পুরোনো কবিতারই ছন্দ-রীতি ছিল মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান। আসলে ছন্দ-রীতির এসব আধুনিক নাম চালু হবার আগে পর্যন্ত অমূল্যধন তো তানপ্রধান রীতির পরিচয় দিতেন পয়ারজাতীয় ছন্দ হিসেবেই।

ক্রমশ বৈচিত্র্য এল আধুনিক কবিতার পয়ারের রূপে। প্রবোধচন্দ্র তিনি দিক থেকে এ বৈচিত্র্য তুলে ধরলেন—আয়তনের দিক থেকে, ছন্দ-রীতির দিক থেকে, গতিভঙ্গির দিক থেকে। দৃষ্টান্তের সাহায্য নিয়ে পর পর পয়ারের বৈচিত্র্য লক্ষ করুন—

১. আয়তনের দিক থেকে পয়ারের ২টি রূপ ঃ পয়ারের যে ৪টি মূল শর্তের কথা আগে জেনেছে, তার চতুর্থ শর্তে ছিল পয়ারের একটিমাত্র আয়তন বা দৈর্ঘ্যের উল্লেখ। পয়ারের আয়তন ছিল নির্দিষ্ট—৮ + ৬ মাত্রা। প্রথম পর্বের (বা পদের) ৮-মাত্রা ঠিক রেখে দ্বিতীয় পর্বের (বা পদের) দৈর্ঘ্য কোনো কোনো পয়ারে বাড়ানো হল—৬-মাত্রার বদলে ১০-মাত্রা। এর নাম হল বড়ো পয়ার বা মহাপয়ার। অতএব, ৮ + ৬ মাত্রার পয়ার যেমনটি ছিল, তেমনই রইল, এর সঙ্গো যুক্ত হল ৮ + ১০ মাত্রার 'মহাপয়ার'। ৮ + ৬ মাত্রার 'ছোটো পয়ারে'র দৃষ্টান্ত ('মহাভারতের কথা....') একটু আগে দেখলেন। এবারে দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার 'মহাপয়ারে'র দৃষ্টান্ত—

১ ১ ১   ১ ১ ১   ১ ১ | ১ ২   ১ ২   ১ ১ ২ ||
একথা   জানিতে   তুমি | ভারত্-ঈশ্‌শর্   শা-জাহান্ || = ৮ + ১০

১ ১ ১ ১   ১ ১   ২ | ১ ২   ১ ২   ১ ১ ২ ||
কালস্রোতে   ভেসে   যায়্ | জীবন্ - যৌবন্   ধনমান্ || = ৮ + ১০

২. ছন্দ-রীতির দিক থেকে পয়ারের ৩টি রূপ ঃ পয়ার-বন্ধে লেখা পুরেনো সব কবিতারই একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান, এ কথা একটু আগে জেনেছেন। কিন্তু, পয়ার-বন্ধে বাঁধা একটি আধুনিক কবিতার ছন্দরীতি **দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান)** হতে পারে, **কলাবৃত্ত (ধ্বনিপ্রধান)** হতে পারে, **মিশ্রবৃত্তও (তানপ্রধান)** হতে পারে। দৃষ্টান্ত দেখুন—দলবৃত্ত পয়ার।

১   ১ ১ ১ | ১ ১   ১ ১ || ১ ১   ১ ১   ১ ১
আজ্   বিকালে | কোকিল্   ডাকে || শুনে   মনে   লাগে   = ৮ + ৬

১ ১ ১ ১ | ১ ১   ১ ১ || ১   ১   ১ ১ | ১ ১
বাংলাদেশে | ছিলাম্   যেন || তিন   শো   বছর | আগে   = ৮ + ৬

(প্রবোধচন্দ্রের পদ-বিভাগ)

কলাবৃত্তের পয়ার ঃ

২ ১   ১ ১ ১   ১ ১ | ২ ১   ১ ২ ||
নিম্নে   যমুনা   বহে | স্বচ্ছ   শীতল্ || = ৮ + ৬

২ ১   ১ ২ ২ | ২   ১ ১ ২ ||
ঊর্ধ্বে   পাষাণ্-তট্ | শ্যাম্   শিলাতল্ || = ৮ + ৬

মিশ্রবৃত্ত পয়ার ঃ

১ ১ ১   ১ ২   ১ ১ | ১ ১   ১ ১ ২ ||
দুয়ারে   প্রস্তুত্   গাড়ি | বেলা   দ্বিপ্রহর || = ৮ + ৬

১ ১ ২   ১ ১   ১ ১ | ১ ১ ১   ১ ২ ||
শরতের্   রৌদ্র   ক্রমে | হতেছে   প্রখর্ || = ৮ + ৬

লক্ষ করছেন, ৩-রকম ছন্দরীতির ৩টি দৃষ্টান্তই পয়ারের প্রতিটি শর্ত (৮ + ৬ মাত্রার অন্ত্যমিল-থাকা ২টি চরণ বা পঙ্‌ক্তি) মেনে চলেছে। কেবল ভেঙে দিয়েছে মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতির একঘেয়ে প্রথার দেয়ালটি।

৩. গতিভঙ্গির দিক থেকে পয়ারের ৩টি রূপ ঃ

পয়ার-বন্ধের চতুর্থ শর্তকে (৮ + ৬ মাত্রার চরণ) খানিকটা শিথিল করে ৮ + ১০ মাত্রার 'মহাপয়ার' তৈরি হল কীভাবে, তা লক্ষ করেছেন। এবার প্রথম শর্তের ওপর আঘাত। পয়ার-বন্ধের প্রথম শর্ত—২টি চরণ (বা পঙ্‌ক্তি) নিয়ে স্তবক তৈরি হবে। এই শর্তটির অর্থ ১টি চরণে না হলে ২টি চরণের মধ্যে একটি বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে কবি বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ, একটি বক্তব্যের মাপ ২-চরণের বেশি নয়। অন্য ৩টি শর্তের সঙ্গে পয়ারের এই শাসনও বাংলা কবিতার কবিরা মেনে চললেন উনিশ শতক পর্যন্ত। এর পর থেকে কোনো কোনো পয়ার সব শর্ত মেনে তৈরি হল, কোনো কোনো পয়ার প্রথম শর্ত পুরোপুরি মানল না। এমনি করে গড়ে উঠল পয়ারের ৩টি রূপ—অপ্রবহমান, **প্রবহমান** আর **মুক্তক**।

পুরোনো সব শর্ত মেনে ২-চরণের সীমানায় বক্তব্যকে ধরে রেখে যেসব পয়ার লেখা হল সেখানে নির্দিষ্ট সীমানা পেরিয়ে ঐ বক্তব্য বা ভাব পরের চরণগুলিতে প্রবাহিত হবার সুযোগ পেল না। এ-ধরনের পয়ারকে বলা হল **অপ্রবহমান পয়ার**। এ পর্যন্ত পয়ারের যে-কটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তার সবই অপ্রবহমান পয়ার-এর।

যে-পয়ারে চরণের মাপ ৮ + ৬ বা ৮ + ১০ মাত্রায় স্থির রেখে, চরণের অন্ত্যমিল রেখে বা না-রেখে কোনো বক্তব্য বা ভাব ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে পরের চরণগুলিতে প্রবাহিত হতে পারে, ২-চরণের সীমানার মধ্যেও অবাধে চলতে পারে, তার নাম হল **প্রবহমান পয়ার**। নীচের দৃষ্টান্তটিতে ভাবের এই প্রবাহ লক্ষ করুন—

১ ১ ২   ১ ১   ২ | ১ ১ ১   ১ ১ ১ ||
কবিবর,   কবে   কোন্ | বিস্মৃত   বরষে || = ৮ + ৬

২   ১ ১   ১ ১ ২ | ১ ২   ১ ১ ১ ||
কোন্   পুণ্ণ   আষাঢ়ের | প্রথম্   দিবসে || = ৮ + ৬

লিখেছিলে মেঘদূত। ....।

ব্যাকরণের নিয়মে একটি বক্তব্যকে পুরোপুরি ধরে রাখার জন্য চাই কমপক্ষে একটি বাক্য। অথচ, ওপরের ২টি চরণ মিলেও পূর্ণ বাক্য তৈরি হল না। 'কোন্' শব্দটিতে একটা প্রশ্নের সংকেত আছে, কিন্তু কী নিয়ে এ-প্রশ্ন তার উল্লেখ চরণ-দুটিতে নেই। তার পরে ভাব অসম্পূর্ণই থাকল। মেঘদূত-লেখার উল্লেখ পাবার সঙ্গো সঙ্গো বাক্য পূর্ণ হল, বক্তব্যও পুরোপুরি ধরা পড়ল। ভাব ততক্ষণে ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে প্রবাহিত হল তৃতীয় চরণের দিকে। অতএব, স্তবকটি হয়ে উঠল প্রবহমান পয়ারের দৃষ্টান্ত। দেখাই যাচ্ছে, দৃষ্টান্তটি ৮ ঃ ৬ মাত্রার—ছোটো পয়ারের। আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার প্রবহমান মহাপয়ারের—

```
১ ১ ১     ১ ২     ১ ১   | ১ ১ ২        ১ ১      ১  ১     ১ ১  ||
সংসারে    সবাই    যাবে  | সারাক্ক্ষণ্     শত       কর্মে      রত  ||   = ৮ + ১০

২      ১ ১      ১ ১ ১ ১  | ১ ১ ২      ১ ১ ২     ১  ১  ||
তুই    শুধু      ছিন্নবাধা  | পলাতক্     বালকের্     মতো  ||      = ৮ + ১০

১  ১  ২  ১  ২  ১ ১ | ১ ১ ১     ১ ১ ১     ১ ১ ১ ১ ||
মদ্ধ্যান্নে   মাঠের   মাঝে | একাকী     বিষণ্ণ     তরুচ্ছায়ে ||     = ৮ + ১০

১১১১১১১১    ||  ১ ১ ১ ১    ১ ১    ১  ১    ১  ১  ||
দুরবনগধবহ    ||  মন্দগতি     ক্লান্ত    তপ্ত      বায়ে  ||  = ৮ + ১০

১ ১ ২        ১ ১ ১ ১     ১ ১
সারাদিন       বাজাইলি      বাঁশি।................
```

একটি বক্তব্য বা ভাব পরপর ৪টি চরণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে অবশেষে পঞ্চম চরণের মাঝামাঝি গিয়ে থামল।

এতক্ষণ ধরে আপনারা লক্ষ করেছেন—'অপ্রবহমান পয়ার' পয়ারের সব শর্ত মেনে চলে, 'প্রবহমান পয়ার' কেবল ২-চরণের সীমানায় ভাবকে ধরে রাখার শাসনটুকু মানে না, আর সব শর্ত মেনে নিতে বাধা নেই। তবে, পয়ারের এই ২টি রূপেই প্রতিটি চরণের মাপ নির্দিষ্ট— ৮+৬ মাত্রা বা ৮ + ১০ মাত্রা। ক্রমশ পদ্যের স্তবক-রচনায় কবিরা চরণের এই নির্দিষ্ট আয়তন অস্বীকার করতে চাইলেন। ভাবকে ২-চরণের সীমানার বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে আনা ত হল-ই, সেইসঙ্গো চরণের মাপও নানারকম হতে লাগল, কখনো কখনো একটি চরণকে ছোটো-বড়ো নানা ছত্রে সাজিয়ে স্তব তৈরি করা হল। প্রতি চরণে ২টি পর্ব রাখার শর্তও ভেঙে গেল, ১টি পর্বেই তৈরি হল চরণ। তবে স্তবকটি যে মূলত পয়ারের, এটা বোঝা যাবে সবচেয়ে বড়ো চরণটির মাপ দেখে (৮ + ৬ বা ৮ + ১০)। কোনো-না-কোনো চরণের এই মাপ থাকবেই। অন্য সব চরণের মাপ এর সমান হতে পারে, এর চেয়ে ছোটোও হতে পারে (৬, ৮ বা ১০-মাত্রা—যা পয়ারের ১টি পর্ব বা পদের মাপ)। এ-ধরনের পয়ারের নাম হল মুক্তক পয়ার। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন—

১ ২ ১ ২
তোমার্ চিকন্ ‖ = ০ + ৬

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
চিকুরের্ ছায়াখানি | বিশ্‌শ হতে যদি মিলাইত ‖ = ৮ + ১০

১ ১
তবে

২ ২ ১ ১
এক্‌দিন্ কবে |

১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
চন্‌চল্ পবনে লীলায়িত ‖ = ০ + ৬

১ ২ ১ ২ ১ ১ | ১ ১১ ১ ২
মর্‌মর্ মুখর্ ছায়া | মাধবী-বনের্ ‖ = ৮ + ৬

১ ১ ১ ১ ২
হত স্বপনের্ = ০ + ৬

সতর্কতার সঙ্গো ছত্রের পর ছত্র উচ্চারণ করে চলুন। অর্ধযতি (।) আর পূর্ণযতির (॥) চিহ্ন দিয়ে যে জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করা হল, তা নিজের ছন্দোবোধের সাহায্যে মিলিয়ে নিন। এবারে লক্ষ করুন ঃ

(১) স্তবকটিতে ছত্র ৭টি, কিন্তু চরণ ৫টি। এর মধ্যে দ্বিতীয় আর তৃতীয় চরণ মহাপয়ারের (৮+১০ মাত্রা), চতুর্থ চরণ সাধারণ পয়ারের (৮+৬ মাত্রা)। অর্থাৎ পয়ারের নির্দিষ্ট মাপ এই চরণগুলিতে মানা হয়েছে।

(২) প্রথম আর শেষ চরণ ৬-মাত্রার। ছোটো পয়ারের (৮+৬) দ্বিতীয় পর্বের (বা পদের) ৬-মাত্রা দিয়েই এক-একটি চরণ তৈরি হয়েছে, ২টি পর্ব (বা পদের) নির্দিষ্ট বরাদ্দ এখানে মানা হয়নি।

এ-দুটি চরণ উচ্চারণ করতে গেলেই প্রথম পর্বটির অভাব কানে লাগে। O-মাত্রা সেই অভাবের চিহ্ন।

(৩) একটি বক্তব্যই প্রথম চরণ থেকে প্রবাহিত হতে হতে পঞ্চম চরণে এসে সম্পূর্ণ হয়েছে। ২-চরণের সীমানার বাঁধ ভেঙে গেল এখানেও।

(৪) তৃতীয় ছত্রের যতি নেই, চতুর্থ ছত্রের শেষে অর্ধযতি (।) পূর্ণযতি (॥) পড়েছে পঞ্চম চরণের শেষে। এর অর্থ, ৮ + ১০ মাত্রার তৃতীয় চরণটিকে ২-মাত্রা, ৬-মাত্রা, আর ১০-মাত্রার, ৩-টি পৃথক্ মাপের ছত্রে ভেঙে সাজানো হয়েছে।

(৫) চরণ-শেষের মিল এ-স্তবকে অনেকটাই রাখা হয়েছে। তবে কবির চোখে যে ছত্রশেষের দিকে, তা বোঝা যায় তৃতীয়-চতুর্থ ছত্রের মিলের দিকে তাকালেই (তবে-কবে), চরণ যেখানে ৩টি ছত্রে ভাগ হয়ে গেছে।

পয়ারের প্রতিটি শর্তই স্তবকটিতে শিথিল। তবু এটি যে পয়ারেরই স্তবক, তার কারণ, এর প্রতিটি চরণই হয় পয়ারের চরণ (৮+৬ বা ৮+১০) না হয় পয়ারের পর্ব (বা পদ) দিয়ে তৈরি (৬-মাত্রার)?

আমরা দেখলাম, 'পয়ার' নামের একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ ৮+৬ মাত্রার মাপের ২টি মিত্রাক্ষর (অন্ত্যমিল-থাকা) চরণের শরীর নিয়ে মধ্যযুগের রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গালকাব্যের দীর্ঘ পথ ধরে ক্রমশ পৌঁছল বাংলা কাব্য-কবিতার আধুনিক ঠিকানায়। পৌঁছল বটে, কিন্তু ততদিনে পুরোনো শর্তের শাসন একটি করে অমান্য করা চলল, প্রাচীন চেহারার একটু একটু করে বদল শুরু হল, মধুসূদন-দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথের মতো কবির হাতে পড়ে নানা রূপের পয়ার তৈরি হতে লাগল। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট মাপের ছোটো পয়ারের পাশাপাশি এল ৮+১০ মাত্রার বড়ো মাপের মহাপয়ার, মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতির একঘেয়েমি কাটিয়ে গড়ে উঠল দলবৃত্ত আর কলাবৃত্ত রীতির পয়ার, ২-চরণের বাঁধন ছিড়ে ভাব মুক্তি খুঁজে পেল প্রবহমান আর মুক্তক পয়ারে। এমনি করে প্রাচীন পরিচয়ের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল 'পয়ার' নামের একটি আধুনিক ছন্দোবন্ধ।

২৫.৪ সারাংশ-১

ছন্দরীতি হল ছন্দের প্রকৃতি, ভেতরকার পরিচয় **ছন্দোবন্ধ** ছন্দের আকৃতি—বাইরের পরিচয়। ছন্দরীতি নির্ভর করে দলের মাত্রা আর মাত্রাবিন্যাসের ওপর, 'ছন্দোবন্ধ' নির্ভর করে পর্বের মাপ আর পর্বনিব্যাসের ওপর।

পয়ার একটি প্রাচীন ছন্দোবন্ধ। কিন্তু, রূপের বৈচিত্র্য নিয়ে 'পয়ার' ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠেছে। তবে বহাল রেখেছে তার ৮+৬ মাত্রার প্রাচীন শরীরটি। প্রাচীন পয়ারে ৪টি শর্ত—স্তবকে ২টি চরণ, চরণশেষে মিল, প্রতি চরণে ২টি করে পর্ব, ৮+৬ মাত্রার/এ পয়ারের একমাত্র ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান।

আধুনিক পয়ার বৈচিত্র্য পেল আয়তন ছন্দরীতি আর গতিভঙ্গির দিক থেকে। ৮+৬ মাত্রার নির্দিষ্ট আয়তনের পাশে এল ৮+১০ মাত্রার 'বড়ো পয়ার' বা 'মহাপয়ার'। মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতির পাশাপাশি তৈরি হতে লাগল দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান) আর কলাবৃত্ত (ধ্বনিপ্রধান) রীতির পয়ার। যে পয়ারে ভাবের গতি ছিল একটি-দুটি চরণে বন্ধ—'অপ্রবহমান', তা ক্রমশ 'প্রবহমান' হল ঐ সীমানা পেরিয়ে। চরণে ৮ + ৬ বা ৮+১০ মাত্রার নির্দিষ্ট ছকও এরপর ভেঙে যেতে লাগল। একটি চরণকে ছোটো-বড়ো নানা ছত্রে সাজিয়ে তৈরি করা স্তবকে পয়ারকে চিনতে হল সবচেয়ে বড়ো চরণের মাপ দেখে। সে মাপ ৮ + ৬ বা ৮ + ১০, স্তবকের অন্য সব চরণ ৬, ৮ বা ১০-মাত্রার হতে পারে, (যা পয়ার চরণের একটি পর্ব)। এমনি করে তৈরি হল **'মুক্তক' পয়ার**।

২৫.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ১০৪ পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গো মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ মহাপয়ার, অপ্রবহমান পয়ার।

(খ) প্রবহমান পয়ার আর মুক্তক — এদের মধ্যে কোথায় মিল কোথায় পার্থক্য, বুঝিয়ে দিন।

২. (ক) কমপক্ষে ২টি ছত্রের ২টি করে দৃষ্টান্ত লিখুন ঃ

কলাবৃত্ত পয়ার, প্রবহমান পয়ার, মহাপয়ার।

(খ) আধুনিক পয়ারের কী কী রূপ, লিখুন।

৩. (ক) নীচের দৃষ্টান্তে প্রবহমানতা আছে কিনা, বুঝিয়ে লিখুন ঃ

(i) কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশ,
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি,

(ii) তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়।
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।

(খ) নীচের দৃষ্টান্তে পয়ারের কোন রূপ রয়েছে, লিখুন ঃ

(i) সমুখে অজানা পথ ইঙ্গিত মেলে দেয় দূরে

(ii) চারদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে শুনি ;

(iii) বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।

(iv) তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা

২৫.৬ মূলপাঠ-২ ঃ অমিত্রাক্ষর

'প্রবহমান পয়ার'-এর কথায় ফিরে চলু। এখানে চরণের মাপ সাধারণত ৮+৬ (মহাপয়ার হলে ৮+১০) মাত্রা, ভাব বা বক্তব্য ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যায়, চরণশেষের মিল সাধারণত থাকে, না-থাকলেও চলে। এই চরশেষের মিল-না-থাকা প্রবহমান প্রবোধচন্দ্র বলতেন অমিল প্রবহমান পয়ার। এই পয়ারেরই সবচেয়ে পরিচিতি নাম **অমিত্রাক্ষর**। আর, বাংলা কবিতায় শরীরে 'অমিত্রাক্ষর'-এর পোষাকটি প্রথম পরিয়ে দিলেন মধুসূদন দত্ত, তাঁর তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে মেঘনাদবধকাব্যে বীরাঙ্গানাকাব্যে। মেঘনাদবধকাব্যের শুরু কীভাবে লক্ষ করুন ঃ

সম্মুখ সমরে পড়ি, । বীরচূড়ামণি ॥ = ৮ + ৬
বীরবাহু চলি যবে । গেলা যমপুরে ॥ = ৮+ ৬
অকালে, কহ, হে দেবি । অমৃতভাষিণি, ॥ = ৮ + ৬
কোন্ বীরবরে বরি । সেনাপতি-পদে ॥ = ৮ + ৬
পাঠাইলা রণে পুনঃ । রক্ষঃ কুলনিধি ॥ = ৮ + ৬
রাঘবারি ? . . . . (দৃষ্টান্ত - ১)

পদ্য উচ্চারণের অভ্যাস থেকে আপনারা সহজেই আন্দাজ করছেন—ওপরের স্তবকটির প্রতিটি ছত্রের মাঝখানে ১টি অর্ধযতি, ছত্রশেষে পূর্ণযতি। যতিস্থাপনের পর যে ৫টি চরণ পাওয়া গেল, তার প্রত্যেকটির মাপ ৮ + ৬ মাত্রা। স্তবকটিতে, ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে তো বটেই, এমনকী ৫টি চরণে প্রবাহিত হতে হতে ষষ্ঠ চরণ ছুঁয়ে একটি ভাব সম্পূর্ণ হয়েছে। উদ্ধৃত স্তবকটির ছন্দোবন্ধ নিঃসন্দেহে প্রবহমান পয়ার। এবারে দেখুন, চরণশেষে মিল নেই কোনো জোড়া-চরণে (মনি-পুরে, ষিণি-পদে, নিধি)। অতএব, স্তবকটি প্রবোধচন্দ্রে অমিল প্রবহমান পয়ার, আমাদের 'অমিত্রাক্ষর'

প্রতি জোড়া-চরণের শেষে মিল থাকলেই যদি পদ্যকে বলি 'মিত্রাক্ষর', তাহলে মিল না-থাকা যেকোনো পদ্যকেই তো বলতে পারি 'অমিত্রাক্ষর', তা সে পয়ার হোক বা না-হোক প্রবহমান হোক বা না-হোক। কিন্তু, 'অমিত্রাক্ষর'-এর পরিচয় এ-রকম সংকীর্ণ নয়। 'অমিত্রাক্ষর' হবার জন্য কোনো পদ্যের অন্ততপক্ষে এই ৪টি গুণ থাকা জরুরি ঃ

(১) প্রতিটি ছত্রই একটি করে চরণ।

(২) প্রতিটি চরণের মাপ ৮+৬ (বা ৮+১০) মাত্রার।

(৩) একটি ভাব বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া।

(৪) চরণশেষে কোনো মিল না-থাকা।

প্রথম ২টি গুণ থাকলেই পদ্য হয় পয়ার, তৃতীয় গুণটির জোরে তা হয়ে ওঠে প্রবহমান পয়ার, চতুর্থ গুণটি তাকে করে দেয় অমিল প্রবহমান পয়ার বা 'অমিত্রাক্ষর'।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন —

ইন্দ্রানী নামেতে দেশে । পূর্বাপর স্থিতি। ॥ = ৮ + ৬
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা । বৈসে ভাগীরথী ॥ = ৮ + ৬ (দৃষ্টান্ত-২)

এখানে ২টি ছত্র। প্রতি ছত্রের শেষে পূর্ণযতি, অতএব প্রতিটি ছত্রই একটি করে চরণ। প্রতিটি চরণ ৮ + ৬ মাত্রার। সন্দেহ নেই, দৃষ্টান্তটি পয়ারের। এর অন্তর্গত বক্তব্যটি ২টি চরণের মধ্যেই সম্পূর্ণ, ২-চরণের সীমানা তাকে পেরতে হয়নি। তাই পয়ারটি প্রবহমান হল না, এই কারণে 'অমিত্রাক্ষর' হবার সম্ভাবনাও তার তৈরি হল না। ধরা যাক, চরশেষের মিলটুকু মুছে দিয়ে পয়ারটিকে 'অমিল' করে দেওয়া হল এইভাবে—

ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা ভাগীরথী বৈসে॥

পয়ারটি এখন 'মিত্রাক্ষর' রইল না, 'অমিত্রাক্ষর'ও হল না, হয়ে রইল শুধু 'অমিল' পয়ার। কেননা, 'অমিত্রাক্ষর' হবার জন্য আবশ্যক তৃতীয় গুণটি (বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরনোর সাহস) এখনো সে অর্জন করে নি। এবার দেখুন নীচের দৃষ্টান্তটি—

ধবল নামেতে গিরি । হিমাদ্রির শিরে— ॥ = ৮ + ৬
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, । ভীষণ দর্শন ; ॥ = ৮ + ৬ (দৃষ্টান্ত-৩)

এটি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম ২চি চরণ। 'অমিত্রাক্ষর'-এর স্রষ্টা মধুসূদনের হাতে শুরুটা এ-রকমই হল। কিন্তু একটি বক্তব্য বা ভাব স্থির হয়ে রইল ২টি চরণেরই সীমানায়। অতএব, এ দৃষ্টান্তটি একান্তই 'অমিল' পয়ারের, 'অমিত্রাক্ষরে' নয়।

একই কাব্যের কয়েকটি ছত্র পেরিয়ে দেখুন—

যেন মরকতময় । কনককিরীট ॥ = ৮ + ৬
না পরে এ গিরি, সবে । করি অবহেলা, ॥ = ৮ + ৬
বিমুখ পৃথিবীপতি । পৃথ্বীসুখ যেন ॥ = ৮ + ৬
জিতেন্দ্রিয় !................. (দৃষ্টান্ত - ৪)

এ দৃষ্টান্ত নিতান্ত ‘অমিল’ পয়ারের নয়। এর সঙ্গো লেগেছে তৃতীয় গুণটির ছোঁয়া। লক্ষ করুন, এর নিহিত বক্তব্য পর পর ৩টি চরণ অতিক্রম করে চতুর্থ চরণে প্রবেশ করার সাহস দেখাল। এই সাহসের জোরেই এ পয়ার ‘অমিত্রাক্ষর’ হয়ে উঠল। তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যের শুরু থেকে উদ্ধার-করা এই অংশটির সঙ্গো মিলিয়ে পড়ুন একটু আগে মেঘনাদবধকাব্যের শুরু থেকে নেওয়া অংশটুকু (সম্মুখ সমরে পড়ি...)। আন্দাজ করা যাবে, ‘অমিত্রাক্ষরে’র তৃতীয় গুণটির (একটি বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া) জোর কতটা বাড়ল, কীভাবে বাড়ল।

ভাবের বা বক্তব্যের সীমানা পেরিয়ে যাবার এই গুণটিকে সংক্ষেপে বলুন প্রবহমানতা। এর সঙ্গো ভাবুন ছেদ আর যতির পার্থক্যটি। ছেদেরে সঙ্গো অর্থের যোগ, যতির সঙ্গো ছন্দের—এটা গোড়া থেকেই আপনারা জানেন। এ-ও আপনাদের জানা, একটি ভাব বা বক্তব্য অর্থকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। সেই কারণে, বাব বা বক্তব্যকে যেখানে অপূর্ণ রেখে একটুখানি থামতে হয় সেখানে পড়ে অর্ধচ্ছেদ, যেখানে তাকে সম্পূর্ণ করে পুরোপুরি থামতে হয় সেখানে পড়ে পূর্ণচ্ছেদ। অর্ধচ্ছেদের একমাত্র চিহ্ন কমা, (,), পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন দাঁড়ি (।) জোড়া-দাঁড়ি (॥) বিস্ময়চিহ্ন (!) প্রশ্নচিহ্ন (?) ড্যাস্ (—), কোলন (ঃ) সেমিকোলন (;)। অন্যদিকে, সমান সমান মাত্রার পরে নিয়মিত থামার জায়গায় পড়ে যদি—পর্বের পরে অর্ধযতি (।) চরণের পূর্ণযতি (॥)। যে ৪টি পয়ার-স্তবকের দৃষ্টান্ত এর আগে দেওয়া হল, তাদের প্রত্যেকটিতে যতির স্থান নির্দিষ্ট—৮-মাত্রায় অর্ধযতি, ১৪-মাত্রায় পূর্ণযতি। পয়ারে এ-রকমই হয়। কিন্তু, ছেদের স্থান কোথাও নির্দিষ্ট, কোথাও অনির্দিষ্ট।

লক্ষ করুন ঃ (১) দৃষ্টান্ত-২ আর দৃষ্টান্ত-৩ স্তবকে ভাব বা বক্তব্য ২-চরণেই বাঁধা, প্রবহমান নয়। ২টি স্তবকের প্রতিটি ছত্রেই পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি ছত্রশেষে এক জায়গায় মিলেছে। এমনকী, অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতিও মিলেছে দৃষ্টান্ত-৩ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রে। অর্থাৎ, পূর্ণযতির সঙ্গো পূর্ণচ্ছেদেরও স্থান এসব ক্ষেত্রে ছত্রশেষে নির্দিষ্ট (১৪-মাত্রায়)।

(২) এবার তাকান দৃষ্টান্ত-৪ আর দৃষ্টান্ত-১ স্তবকের দিকে। স্তবকদুটিতে ভাব ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে প্রবহমান ২টি স্তবকের মধ্যে কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত-৪ স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রে আর দৃষ্টান্ত-১ এর তৃতীয় ছত্রে অর্ধচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন, আর সব জায়গাতেই ছেদ আর যতির বিচ্ছেদ। অর্থাৎ, ছেদ-যতি আর কোথাও এক জায়গায় মেলেনি।

তাহলে, ওপরের (১)-অনুচ্ছেদ থেকে বুঝতে পারি, ভাব যেখানে ২-চরণের সীমানায় বাঁধা, ছেদ-যতির সেখানে মিলন। অন্ততপক্ষে পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি ছত্রশেষে মিলবেই। আর, (২)-অনুচ্ছেদ থেকে জানা গেল, ভাব যেখানে প্রবহমান, ছেদ আর যতির সেখানে বিচ্ছেদ। অন্ততপক্ষে পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি কখনো মিলবে না। অর্থাৎ, পয়ার প্রবহমান হলে পয়ার-স্তবকে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ থাকবেই। ‘অমিত্রাক্ষর’ মূলত প্রবহমান পয়ার, অতএব, এখানেও ছেদ-যতির বিচ্ছেদ অনিবার্য। তবে এটা কোনো পদ্যের ‘অমিত্রাক্ষর’ হবার পক্ষে বাড়তি কোনো গুণ নয়, এটা প্রবহমানতরাই একটা লক্ষণ। এ লক্ষণ চোখ দিয়েও চেনা যায় ছেদ-যতির চিহ্নি দেখে।

আপনারা জানেন, পয়ারের দু-রকম আয়তন—৮+৬ মাত্রা আর ৮+১০ মাত্রা। ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার কীভাবে অমিত্রাক্ষর হয়ে ওঠে, দেখলেন। এবারে দেখুন ৮ + ১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের অমিত্রাক্ষর-রূপ। একটি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ‘প্রান্তিক’ কাব্য থেকে নেওয়া হল—

পুরস্কার প্রত্যাশায় । পিছু ফিরে বাড়ায়ো না হাত ॥ = ৮ + ১০
যেতে যেতে ; জীবনে যা । কিছু তব সত্য ছিল দান ॥ = ৮ + ১০
মূল্য চেয়ে অপমান । করিয়ো না তারে ; এ জনমে ॥ = ৮ + ১০
শেষ ত্যাগ হোক তব । ভিক্ষাঝুলি, নবববসন্তের ॥ = ৮ + ১০
আগমনে . . . .

৮+১০ মাত্রার মাপের এক-একটি বড়ো পয়ার বা মহাপয়ারের চরণ ২টি করে যতিচিহ্ন নিয়ে এক-একটি ছত্র জুড়ে রয়েছে। লক্ষ করুন ঃ প্রথম চরণে কোনো ছেদচিহ্ন নেই, দ্বিতীয় চরণে পর্ণচ্ছেদ (;) ৪-মাত্রায়, তৃতীয় চরণে পূর্ণচ্ছেদ। (;) ১৪-মাত্রায়, চতুর্থ চরণে অর্ধচ্ছেদ (,) ১২-মাত্রায়। অথচ, যতিচিহ্ন প্রতি চরণে ৮ আর ১৪-মাত্রায় নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, প্রতিটি ছেদই যতি থেকে বিচ্ছিন্ন। ছেদ-যতির এই বিচ্ছেদ থেকে ধরা পড়ে স্তবকটিরে অন্তর্গত ভাবের প্রবহমানতা। ভাব প্রবাহিত হয়ে চলেছে আগের চরণ থেকে পরের চরণে, থেমে যাচ্ছে চরণের যেখানে-সেখানে। এবার প্রতিটি চরণের শেষপ্রান্তের দিকে তাকিয়ে দেখুন—মিল নেই (হাত্-দান্ নমে-তের্)। অতএব, ৮ + ১০ মাত্রার ৪টি চরণ নিয়ে তৈরি পয়ার-স্তবকটি ছেদ-যতির বিচ্ছেদ আর চরণশেষে মিলের অভাব নিয়ে অমিত্রাক্ষর হয়ে উঠেছে।

আয়তনের দিক থেকে ছোটো পয়ার আর বড়ো পয়ার—দু-রকম অমিত্রাক্ষরই আপনারা দেখলেন। কিন্তু রীতির দিক থেকে প্রতিটি পয়ারই ছিল মিশ্রবৃত্ত (বা তানপ্রধান)। একমাত্র মিশ্রবৃত্ত রীতির হাত ধরেই বাংলা কবিতার অমিত্রাক্ষর পয়ার শতায়ু হয়েছে। কলাবৃত্ত (বা ধ্বনিপ্রধান) অমিত্রাক্ষর কোনোকালে চালু হয়নি। তবে দলবৃত্ত রীতির অমিত্রাক্ষর চালু না হলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র নমুনা তৈরি করে খানিকটা চমক উপহার দিলেন ছন্দ-ভাবুক বাঙালিকে। নমুনাটি পড়ুন—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গা হল । বীরবাহু বীর যবে ॥ = ৮ + ৬
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ । গেলেন মৃত্যুপুরে ॥ = ৮ + ৬
যৌবনকাল পার না হতেই । কত মা সরস্বতী, ॥ = ৮ + ৬
অমৃতময় বাক্য তোমার, । সেনাধ্যক্ষপদে ॥ = ৮ + ৬
কোন্ বীরকে বরণ করে । পাঠিয়ে দিলেন রণে ॥ = ৮ + ৬
রঘুকুলের পরম শত্রু, । রক্ষঃকুলের নিধি ॥ = ৮ + ৬

একটু আগে অমিত্রাক্ষরের প্রথম দৃষ্টান্তে মেঘনাদবধকাব্যের যে ৬টি ছত্র ব্যবহার করা হয়েছে, (সম্মুখ সমরে পড়ি.....) তার সঙ্গো মিলিয়ে পড়ুন ওপরের ৬টি ছত্র। লক্ষ করুন—২টি স্তবকের অন্তর্গত বক্তব্য হুবহু এক, ভাষা দু-রকম। দৃষ্টান্ত-১ এর ভাষা সাধু, দৃষ্টান্ত-৫ এর চলতি। ২টি স্তবকের ছন্দরীতি মিলিয়ে দেখুন—দৃষ্টান্ত-১ এ মিশ্রবৃত্ত, দৃষ্টান্ত-৫ এ দলবৃত্ত। এবারে ২টি স্তবকেই দলের মাথায় মাত্রা বসিয়ে দেখুন, প্রতিটি ছত্রে আছে ১৪ মাত্রা। দৃষ্টান্ত-১ এ যতি স্থাপন করে আগেই দেখা গেছে, স্তবকটি ৮ + ৬ মাত্রার ৫টি ছোটো পয়ারের চরণে তৈরি। দৃষ্টান্ত-৫ দলবৃত্ত। অতএব এর প্রতিটি পূর্ণপর্ব ৪ মাত্রার হবার কথা, প্রতিটি চরণে ১৪-মাত্রার বিভাজন হবার কথা ৪ + ৪ + ২। প্রবোধচন্দ্র এর বদলে ১৪-মাত্রাকে ৮ + ৬ মাথায় ভাগ করে

বলেছেন, দৃষ্টান্ত-৫ এর স্তবকটিও পয়ারের। তাহলে মেনে নিন, এটি দলবৃত্ত রীতির পয়ার। এখন দেখুন, স্তবকটির শরীরে ছেদ-যতি কোথায় এক বিন্দুতে মিলেছে, আর কোথায় বিচ্ছিন্ন। ছেদ-যতির মিলন-স্থল এই কটি—৩য় চরণে পূর্ণচ্ছেদ-অর্ধচ্ছেদ-পূর্ণযতি, চতুর্থ চরণে অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতি, ষষ্ঠ চরণে অর্ধচ্ছেদ-অর্ধযতি আর পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতি। দেখা গেল, প্রথম ৫টি চরণে পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন-বিন্দু একটিও নেই। এর অর্থ, স্তবকটির শরীরে রয়েছে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ, ভেতরে চলছে ভাবের প্রবাহ। এর সঙ্গে মিলেছে চরণশেষে মিলের অভাব (যবে-পুরে স্বতী-পদে রণে-নিধি)। অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর হয়ে ওঠার সব-কটি গুণই এ-স্তবকে দেখতে পেলেন। অথচ, স্তবকটি কিন্তু দলবৃত্ত রীতিতেই লেখা। এখনো পর্যন্ত এটিই দলবৃত্ত রীতিতে লেখা অমিত্রাক্ষরের একমাত্র পরিচিত দৃষ্টান্ত।

জেনে রাখুন, বাংলা কবিতায় কলাবৃত্তে অমিত্রাক্ষর হয়নি, দলবৃত্তে অমিত্রাক্ষর চলেনি, আর মিশ্রবৃত্তে অমিত্রাক্ষরের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে ৪০ বছর আগে।

২৫.৭ সারাংশ-২

চরণশেষের মিল-না-থাকা প্রবহমান পয়ারকে প্রবোধচন্দ্র বলেন 'অমিল প্রবহমান পয়ার'। এই পয়ারেরই অন্য নাম 'অমিত্রাক্ষর'। অমিক্ষাররে প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত, 'প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। একটি পদ্যের পক্ষে 'অমিত্রাক্ষর' হবার মূল শর্ত প্রতিটি ছত্রকে ৮+৬ (বা ৮+১০) মাত্রার মাপের চরণ হিসেবে পাওয়া এবং চরণশেষে মিল না-রাখা। কিন্তু, সবচেয়ে জরুরি শর্ত—একটি ভাব বা বক্তব্যের ২-চরণের সীমানা পেরিয়ে যাওয়া। এই শর্তের জোরেই মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে'র তুলনায় 'মেঘনাদবধকাব্যে'র অমিত্রাক্ষর অনেক বেশি সমার্থক। ভারের এই সীমানা-পেরোনা বা প্রবহমানতার লক্ষণ চরণ-শেষে ছেদ না-থাকা, চরণের মাঝখানেও ৮-মাত্রার শেষে অর্ধযতির সঙ্গে অর্ধচ্ছেদ না-থাকা। ছেদ-যতির বিচ্ছেদে প্রবহমানতা, মিলনে প্রবহমানতার অভাব।

মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষরে' কেবল ৮+৬ মাত্রার পয়ার, ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের কাঠামোয় তৈরি 'অমিত্রাক্ষর' রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' কাব্যে। 'অমিত্রাক্ষর'-এর ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান। একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথের তৈরি ৬-চরণের একটি দলবৃত্ত (শ্বাসাঘাতপ্রধান) রীতির স্তবক, যা 'মেঘনাদবধকাব্যে'র প্রথম ৬টি চরণের রূপান্তর—দলবৃত্ত রীতিতে 'অমিত্রাক্ষর' তৈরির পরীক্ষানিরীক্ষা।

২৫.৮ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর পৃষ্ঠার উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. একটি অমিত্রাক্ষর স্তবক বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিন যে ঐ স্তবকে অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধের সবকটি গুণই আছে।

২. নীচের দৃষ্টান্ত অমিত্রাক্ষরের কিনা, কারণ জানিয়ে লিখুন ঃ

(ক) ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন ;

(খ) যেন মরকতময় কনককিরীট
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি, পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয় !

(গ) বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততরাশশী
আষাঢ়সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজনবেদন।

(ঘ) যুদ্ধ তখন সাঙ্গা হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই।

৩. নীচের দৃষ্টান্তে কোন ছত্রে কত মাত্রার পরে ছেদ-যতির বিচ্ছেদ আর মিলন, লিখুন ঃ

শুনেছি সরযুতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ?
স্তবকটি অমিত্রাক্ষর কিনা জানান।

২৫.৯ মূলপাঠ—৩

আপনারা দেখলেন, 'অমিত্রাক্ষর' পয়ারেরই একটি বিশেষ রূপ। এবারে দেখবেন, চতুর্দশপদীর জন্মও মূলত পয়ার-বন্ধেরই আর-একটি বিশেষ রকমের প্রয়োগ থেকে। আবার, অমিত্রাক্ষরে'র মতো 'চতুর্দশপদী'ও বাংলা সাহিত্যে এসেছে যুরোপীয় ছন্দোবন্ধের আদলে। দুটি ছন্দোবন্ধই অনেকটা দেশি টবে ফুটে-ওঠা বিদেশি ফুলের মতো, এদেশে ফুটিয়েছিলেন মধুসূদন দত্ত। ইতালীয়—ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম সনেট, বাংলায় তারই নাম হল **চতুর্দশপদী**। তবে, বিকল্প নাম হিসেবে 'সনেট' শব্দটিও বাংলায় চালু।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা সনেটের প্রথম কবি। যোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারোর প্রবর্তনায় শুরু হল ফরাসি সনেটের চর্চা। প্রায় একই সময়ে ইংরেজি সনেট-চর্চা শুরু হলেও সতেরো শতকের কবি সেক্স্পিয়ারের হাতেই গড়ে উঠল স্বতন্ত্র রীতির সেক্স্পিরীয় সনেট। এমনি করে তৈরি হল যুরোপীয় সনেটের ৩টি আদর্শ—পেত্রার্কীয় ফরাসি আর সেক্স্পিরীয়। এই ৩টি আদর্শই মধুসূদনের মাধ্যমে ক্রমশ বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী'র আশ্রয় হয়ে উঠল।

'চতুর্দশপদী' কথাটির সরল অর্থ '১৪টি পদ দিয়ে তৈরি' কবিতা। কিন্তু, বাংলায় যে ধরনের কবিতা 'চতুর্দশপদী' নামে চিহ্নিত, তার শরীর ১৪টি চরণ দিয়ে গড়া, ১৪টি পদ দিয়ে নয়। 'পদ' কথাটির বিশেষ অর্থ

এখানে ‘চরণ’। এক সময়ে কোনো কোনো ছন্দশাস্ত্রে অবশ্য ‘পদ’ আর ‘চরণ’ একই অর্থে প্রয়োগ করা হত। এই ১৪টি চরণের সমষ্টি হওয়া ‘চতুর্দশপদী’ কবিতার প্রথম শর্ত, তবে একমাত্র নয়। একটি কবিতাকে ‘চতুর্দশপদী’ হবার জন্য কমপক্ষে আরো ৪টি শর্ত মানতেই হয় ঃ

(১) প্রতিটি চরণ হবে পয়ারের—৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ার বা ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ার। বাংলা সনেট বা ‘চতুর্দশপদী’র প্রথম কবি মধুসূদনের মোট ১০৮টি কবিতার প্রতিটি চরণ ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ার। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ আর মোহিতলাল মজুমদার ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারও প্রয়োগ করেছিলেন ‘চতুর্দশপদী’তে।

(২) গোটা কবিতাই লেখা হবে কেবল মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান রীতিতে।

(৩) স্তবক-বিভাগ হবে নির্দিষ্ট ছকে। সে ছক তৈরি হবে এই ৩টি আদর্শের যেকোনো ১টিতে—পেত্রার্কীয় ফরাসি সেক্‌স্‌পিরীয়।

পেত্রার্কীয় আদর্শে একটি কবিতায় স্তবক থাকবে ২টি—প্রথমটি ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ৬-চরণের (ষট্‌ক)। **ফরাসি** আদর্শে ৩টি স্তবক—প্রথম স্তবক ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ২-চরণের (যুগ্মক), তৃতীয়টি ৪-চরণের (চতুষ্ক)। **সেক্‌স্‌পিরীয়** আদর্শে স্তবকের সংখ্যা ৪ — প্রথম ৩টি ৪-চরণের (চতুষ্ক), শেষেরটি ২-চরণের (যুগ্মক)।

এ সব বিভাগ রূপের দিক থেকেও, ভাবের দিক থেকেও।

(৪) চরণশেষে মিল (অন্ত্যমিল) থাকবে। তবে সে মিল প্রতি ২-চরণের একঘেয়ে অন্ত্যমিল নয়। মিল তৈরি হবে নির্দিষ্ট ছকে, সে ছক উঠে আসবে নীচের ৩টি য়ুরোপীয় আদর্শের যেকোনো ১টি থেকে।

পেত্রার্কীয় মিল—কখখখ-কখখক চছজ-চছজ = অষ্টক + ষট্‌ক

ফরাসি মিল—কখখখ-কখখক গগ চছচছ = অষ্টক + যুগ্মক + চতুষ্ক

সেক্‌স্‌পিরীয় মিল—কখকখ-গঘগঘ পফপফ চচ = চতুষ্ক + চতুষ্ক + চতুষ্ক + যুগ্মক

চরণের শেষ দলের (বা অক্ষরের) উচ্চারণ থেকেই সাধারণ অন্ত্যমিল তৈরি হয়। ক খ গ ঘ চ ছ জ প ফ—এক-একটি বর্ণ ‘চতুর্দশপদী’ এক-একটি চরণের শেষ দলের উচ্চারণের চিহ্ন। পরের দৃষ্টান্তগুলিতে চরণশেষে এসব চিহ্ন পরপর সাজিয়ে মিলের ছক নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন। তখন দেখবেন, প্রতিটি ‘চতুর্দশপদী’র মিলের ছক কোনো-না-কোনো আদর্শের আদলে তৈরি। তবে দুটি-একটি এমন দৃষ্টান্তও চোখে পড়বে, যেখানে নির্দিষ্ট আদর্শ পুরোপুরি মানা হয় নি। বাঙালি কবিরা ‘চতুর্দশপদী’ লিখতে গিয়ে একটু স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতাই কেবল ৭টি যুগ্মকের সমষ্টি—অর্থাৎ, ২-চরণের ৭টি অন্ত্যমিল সাজানো এক-একটি ‘চতুর্দশপদী’।

অতএব, একটি ১৪-চরণের কবিতা ওপরের ৪-টি শর্ত মানলে তবেই হয়ে ওঠে ‘চতুর্দশপদী’। এর অন্তর্গত ভাব প্রবহমান হতে পারে, না-ও হতে পারে। অর্থাৎ, ছেদ-যতির মিলন থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে।

এবারে পর পর ৩টি দৃষ্টান্ত সতর্কতার সঙ্গে পড়ুন। লক্ষ করুন, কীভাবে এক-একটি কবিতা ‘চতুর্দশপদী’ হয়ে উঠেছে।

দৃষ্টান্ত-১.	কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে	ক	
	কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে	খ	
	(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে	খ	
	মনোহরা !) বাম করে সাপটি হেলনে	ক	
	গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।	ক	অষ্টক
	গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,	খ	
	বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।	খ	
	কার না ভোলে রে মন ঃ, এ হেন ছলনে !	ক	
	কবিতা-পঙ্কজে রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,	চ	
	ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে	ছ	
	অমর করিলা তোমা অমরকারিণী	জ	ষট্ক
	বাগ্‌দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,	চ	
	এব কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?	ছ	
	বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী॥	জ	[কমলে কামিনী ঃ মধুসূদন দত্ত]

১৪-চরণের এই কবিতার প্রতিটি চরণ উচ্চারণ করে করে মনে মনে অর্ধযতি-পূর্ণযতির জায়গা খুঁজে বের করুন, দলের মাত্রা আন্দাজ করুন, তা থেকে এক-একটি পর্বের মাপ স্থির করুন। দেখবেন, মুক্তদল যেখানেই থাকুক ১-মাত্রার, রুদ্ধদল শব্দের শুরুতে বা মাঝখানে থাকলে ১-মাত্রার, শেষে থাকলে ২-মাত্রার হচ্ছে। বোঝা গেল কবিতাটি মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে লেখা। যতির অবস্থান দেখে এও বোঝা যাবে, প্রতিটি চরণ ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ারে বাঁধা।

এবারে লক্ষ করুন, কবিতাটির স্তবক-বিভাগ আর অন্ত্যমিলের ছক ওপরে-নীচে লেখা চরণশেষের বর্ণ-চিহ্নগুলি পাশাপাশি সাজালে অন্ত্যমিলের এইরকম একটা ছক পাওয়া যাবে—

কখখক-কখখক চছজ-চছজ

একটু আগেই আপনারা দেখলেন, এটা পেত্রার্কীয় মিলের ছক। তাহলে ধরে নিতে পারেন, কবিতাটির স্তবক-বিভাগও হবে পেত্রার্কীয় আদর্শে। অর্থাৎ, এর স্তবক ২টি—প্রথমটি ৮-চরণের (অষ্টক), দ্বিতীয়টি ৬-চরণের (ষট্ক)। রূপের দিক থেকে কবিতাটি যে এ-রম ২টি স্তবকে ভাগ হয়ে আছে, তা বোঝা যায় অন্ত্যমিলের ছক থেকেই—

কখখক-কখখক চছজ-চছজ = অষ্টক্ + ষট্ক 'কখ' মিলদুটি ৪-বার ঘুরে ঘুরে এসে ৮-চরণের (অষ্টক) প্রথম স্তবকটি গড়ে তুলেছে। দ্বিতীয় স্তবক তৈরি হয়েছে 'চছজ' মিল-তিনটির ২-বারের আবর্তনে, ৬টি চরণ নিয়ে (ষট্ক)।

এবারে কবিতাটির অন্তর্গত বক্তব্য বা ভাবের দিকটা দেখুন। ৮-চরণের প্রথম স্তবকে চণ্ডীমঙ্গাল-কাব্যের মূলচরিত্র ধনপতি সদাগত-প্রসঙ্গা, ৬-চরণের দ্বিতীয় স্তবকে চণ্ডীমঙ্গালের কবি প্রসঙ্গা। অতএব, ভাবের দিক থেকেও ২টি স্তবকে কবিতাটি ভাগ হয়ে গেছে সহজেই।

ছেদ-যতির সম্পর্ক লক্ষ করুন। ছেদের যত্রতত্র প্রয়োগ (চরণের ৩, ৪, ৮, ১১, ১৪ মাত্রার পরে) ভাবের প্রবহমানতার লক্ষণ হয়ে আছে। পূর্ণচ্ছেদ-পূর্ণযতির মিলন ৫টি চরণের শেষে ঘটলেও বাকি ৯টি চরণেই তো বিচ্ছেদ। অতএব, কবিতাটি প্রবহমান পয়ারেই লেখা।

সব মিলিয়ে দাঁড়াল এই—সব শর্ত মেনে নিয়ে কবিতাটি পেত্রার্কীয় লেখা একটি 'চতুর্দশপদী'।

দৃষ্টান্ত-২.

নয়ন-গোলাপ তব করিতে উজ্জ্বল ক
বুল্‌বুলের সুরে আজি বেঁধেছি সেতার। খ
গাহিব প্রেমের গান পারসী কেতার খ
ফুলের মতন লঘু রঙিলা গজল। ক
যে সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল, ক
সে সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার। খ
মম গীতে নত তব চোখের পাতার খ
সীমান্তে রচিয়া দিব দু ছত্র কাজল। ক

বাজিয়ে দেখেছি ঢের বীণ ও রবাব, গ
পাইনি সে সুরে তব প্রাণের জবাব। গ

আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার চ
টুট্‌কিতে রাখি সব আশা ভালোবাসা ছ
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার— চ
সুরে ভাবে মিল আছে, দুই ভাসা-ভাসা। ছ

[গজল ঃ প্রমথ চৌধুরী]

এইমাত্র দৃষ্টান্ত-১ বিশ্লেষণ করলেন। একই পদ্ধতিতে দৃষ্টান্ত-২ বিশ্লেষণ করুন। দেখা যাবে, এ কবিতার ১৪টি চরণও আগের মতোই ৮+৬ মাত্রার ছোটো পয়ারে নিবদ্ধ, ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত। অবশ্য, স্তবক-বিভাগ আর অন্ত্যমিলের ছকে একটুখানি ফারাক রয়েছে। এই ফারাকটি লক্ষ করুন—

কবিতা	**মিলের ছক**	**স্তবক-বিভাগের ছক**	**য়ুরোপীয় আদর্শ**
দৃষ্টান্ত-১	কখখক-কখখক চছজ-চছজ	অষ্টক + ষট্‌ক	পেত্রার্কীয়
দৃষ্টান্ত-২	কখখক-কখখক গগ-চছচছ	অষ্টক + যুগ্মক + চতুষ্ক	ফরাসি

২টি দৃষ্টান্তেই অষ্টক পুরোপুরি এক। কেবল, দৃষ্টান্ত-১ এর ষট্ক (৬টি চরণের দ্বিতীয় স্তবক) দু-টুকরোয় ভেঙে দৃষ্টান্ত-২-এর যুগ্মক (২-চরণের দ্বিতীয় স্তবক) আর চতুষ্ক (৪-চরণের তৃতীয় স্তবক) তৈরি করেছে। এর ফলে দৃষ্টান্ত-২ এর কবিতায় স্তবক পেলাম ৩টি, দৃষ্টান্ত-১ এ ছিল ২টি স্তবক। ফারাক এইটুকুই। কিন্তু, এইটুকুতেই আদর্শের ফারাক ঘটে গেল অনেকখানি। দৃষ্টান্ত-২ এর আদর্শ ছিল পেত্রার্কীয়, দৃষ্টান্ত-৩ এর আদর্শ হয়ে গেল ফরাসি। স্তবক-বিভাগ আর মিলের ছক—দুদিক থেকেই এ কবিতায় পুরোপুরি ফরাসি আদর্শের ছাপ।

ধ্রুপদ-ধামার ছেড়ে লঘু গজলের সুর রচনার উদ্যোগ গোটা কবিতার বক্তব্য বা ভাব। এই ভাবটিকে ৩টি ভাগে ভাগ করে ৩টি স্তবকে কবি সাজালেন, সহায়ক হিসেবে পেলেন ফরাসি মিলের ছকটি। প্রথম স্তবকের অষ্টক লঘু গজলের সুরে সেতার বাঁধার কথা, দ্বিতীয় স্তবকের ২টি চরণে বীণা-রবারের ব্যর্থতার কথা, আর তৃতীয় স্তবকের চতুষ্কে অনিচ্ছার সঙ্গেই ধ্রুপদ-ধামার ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্তের কথা—স্তবক-বিন্যাসের এই পদ্ধতি পুরোপুরি ফরাসি সনেটের পদ্ধতি।

অতএব, দৃষ্টান্ত-২ এর কবিতাটি নিঃসন্দেহে ফরাসি আদর্শে লেখা একটি নিটোল 'চতুর্দশপদী'। ছেদ-যতির অবস্থানে প্রবহমানতার কোনো লক্ষণ কবিতায় নেই।

দৃষ্টান্ত-৩.

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,	ক
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে	খ
হয়ে আসে দুরস্মৃত কাহিনী কেবলি—	ক
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।	খ
তবু মনে রেখো, যদি বড়ো কাছে থাকি,	গ
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন	খ
দেখো না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি-	গ
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।	ঘ
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে	প
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধ্যাবেলা	ফ
অথবা শারদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে	প
অথবা বসন্ত-রাতে থেমে যায় খেলা	ফ
তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে আর	চ
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধারা	চ

[তবু/ মানসী ঃ রবীন্দ্রনাথ]

দৃষ্টান্ত-১-এর পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করুন। ১৪-চরণের এ কবিতাতেও পাবেন ৮ + ৬ মাত্রার ছোটো পয়ার, মিশ্রবৃত্ত রীতি। তবে, পুরোপুরি অন্যরকম এর মিলের ছক আর স্তবক-বিভাগ। মিলের ছক **কখকখ গঘগঘ**

পফপফ চচ ; ৩টি চতুষ্ক আর ১টি যুগ্মক—এই ৪টি স্তবকে ভাগ হয়ে আছে কবিতাটি। রূপের পাশাপাশি ভাবের দিকটাও দেখুন। 'তবু মনে রেখো' কথাটি দিয়ে শুরু-হওয়া প্রতিটি স্তবকে একটি করে আবেদনের করুণ সুর বাজছে। এমনি করি কবিতাটির ভাগ হল সেক্স্‌পিরীয় মিলের ছকে ৪টি স্তবকে। অতএব, এটি নিখুঁত সেক্সপিরীয় আদর্শে তৈরি 'চতুর্দশপদী'।

'চতুর্দশপদী'-র ৩টি নিখুঁত দৃষ্টান্ত পরপর দেখলেন। এবার দেখুন শর্ত-না-মানা এমন ৩টি দৃষ্টান্ত, যার কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মিশ্রবৃত্ত পয়ারে বাঁধা ১৪টি চরণের কাঠামো ছাড়া 'চতুর্দশপদী' হবার মতো আর কোনো গুণ কবিতা তিনটির নেই।

দৃষ্টান্ত-১. বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ক
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় ক
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার খ
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার খ
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত গ
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো গ
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায় ঘ
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায় ঘ
তোমার মন্দির-মাঝে
ইন্দ্রিয়ের দ্বার চ
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার। চ
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে ছ
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ছ

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া, জ
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া। জ

[মুক্তি ঃ নৈবেদ্য]

দৃষ্টান্ত-২. কী লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছে কার লাগি, ক
প্রলয়ের পরপারে নেহারিছ কার আগমন, খ
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ, খ
চিরবিরহীর মতো চিররাত্রি রহিয়াছ জাগি। ক
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস, গ
আকাশপ্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়বাতাস, গ
জগতের ঊর্নাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি। ক

অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিস দোসর, ঘ
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ, গ
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখিদের স্বর। ঘ
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস, গ
সহস্র শরদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর— ঘ
হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি, নাই তব হাসি কান্না মায়া— চ
আসি, থাকি, চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া॥ চ

দৃষ্টান্ত-৩. এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে। অকস্মাৎ মহা-একা
ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।
অসংখ্য অপরিচিত জ্যোতিষ্কের নিঃশব্দতামাঝে
মেলিনু নয়ন ; জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।
বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মিলন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।

[প্রান্তিক-৩]

দৃষ্টান্ত-১ এর কবিতাটিতে ১৪টি চরণ আছে, প্রতিটি চরণে ৮+৬ মাত্রা আছে, ছন্দরীতিও মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, মিলের ছক **কক খখ গগ ঘঘ চচ ছছ জজ**। অর্থাৎ, ৭-রকমের অন্ত্যমিলে তৈরি ৭-জোড়া চরণ বা ৭টি যুগ্মকে কবিতাটি ভাগ হয়ে আছে। অথচ, ভাবের দিক থেকে কবি নিজেই কবিতাটিকে ভাগ করেছেন ৩টি স্তবকে—প্রথম স্তবকে ৮.৫টি, দ্বিতীয় স্তবকে ৩.৫ টি আর শেষ স্তবকে ২টি চরণ। এ-রকম অদ্ভুত স্তবক-বিভাগ 'চতুর্দশপদী'র ইতিহাসে কেবল রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। অন্ত্যমিল আর স্তবক-বিভাগে কোনো আদর্শ বা প্রথাকে এ কবিতায় গ্রাহ্যই করা হয়নি।

দৃষ্টান্ত-২ এ ১৪ চরণের এমন একটি কবিতা এই প্রথম পেলেন, যার প্রতিটি চরণ ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারে বাঁধা। ছন্দরীতি অবশ্য আগের মতোই মিশ্রবৃত্ত। কিন্তু, মিলের ছক **কখখক গগকঘ গঘগঘ চচ** যা এতকাল ধরে চালু ৩টি আদর্শের ১টিকেও মানছে না। ছকটি দেখে মনে হবে, পরপর ৩টি চতুষ্ক আর ১টি

যুগ্মক নিয়ে সেক্‌স্‌পিরীয় আদর্শের স্তবক-বিভাগ। অথচ, ভাবের দিক থেকে স্তবক-চারটি এইরকম—প্রথমে ১টি চতুষ্ক, মাঝখানে পরপর ২টি ত্রিতক (৩-চরণ), শেষে ১টি চতুষ্ক। এর অর্থ, স্তবক-বিভাগও কোনো আদর্শের তোয়াক্কা করে না।

দৃষ্টান্ত-৩-এর কবিতাটি ৮+১০ মাত্রার বড়ো পয়ারের আর-একটি নমুনা। ১৪-চরণের আয়তনে মিশ্রবৃত্ত রীতির পয়ারের বাঁধন ছাড়া আর কোনো গুণ এর নেই, যার ওপর ভর করে কবিতাটি চতুর্দশপদী' হবার দাবি তুলতে পারে। প্রথমে ২টি দৃষ্টান্তে মিল আর স্তবক-বিভাগে কোনো-না-কোনো ছক ছিল-ই। আলোচ্য দৃষ্টান্তে লক্ষ করুন—চরণশেষে মিল নেই, স্তবক-সাজানোর দায় নেই।

২৫.১০ সারাংশ-৩

ইতালি-ইংরেজ-ফরাসি সনেটের আদলে তৈরি বাংলা কবিতার ছন্দোবন্ধের নাম **চতুর্দশপদী**।

চোদ্দ শতকের ইতালীয় কবি ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা, ষোলো শতকের ফরাসি কবি ক্লেঁসে মারো, আর সতেরো ইংরেজ কবি সেক্‌স্‌পিয়ার—এঁদের হাতে তৈরি হল সনেটের ৩টি আদর্শ। এই ৩টি আদর্শেই লেখা হতে লাগল বাংলা সনেট বা 'চতুর্দশপদী', প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত।

'চতুর্দশপদী' কবিতাকে ১৪-চরণের কাঠামো নিয়ে আরো ৪টি শর্ত মেনে চলতে হয়—প্রতিটি চরণ পয়ারের, ছন্দরীতি মিশ্রবৃত্ত বা তানপ্রধান, পেত্রার্কীয় ফরাসি বা সেক্‌স্‌পিরীয় ছকে স্তবক-বিভাগ, একই ছকে চরণ-শেষের মিল। ছক-তিনটি এইরকম—

ছক	**স্তবক-বিভাগ**	**চরণশেষের মিল**
পেত্রার্কীয়	৮-চরণ (অষ্টক) + ৬-চরণ (ষটক)	কখখক-কখখক চছজ-চছজ
ফরাসি	৮-চরণ (অষ্টক) + ২-চরণ (যুগ্মক) + ৪-চরণ (চতুষ্ক)	কখখক-কখখক গগ চছচছ
সেক্‌স্‌পিরীয়	৪-চরণ (চতুষ্ক) + ৪-চরণ + ৪-চরণ + ২-চরণ (যুগ্মক)	কখখক-গঘগঘ পফপফ চচ

ক খ গ ঘ প ফ চ ছ জ — এগুলি চরণশেষের মিলের চিহ্ন।

তবে য়ুরোপীয় আদর্শের ছক বাঙালি সনেট-কারেরা সবসময় মেনে চলেন নি। এমনকী, রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু কবিতা কেবল ১৪-চরণের মিশ্রবৃত্ত পয়ার, অথচ 'চতুর্দশপদী' নামেই চালু।

২৫.১১ অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৫ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. চতুর্দশপদী-ছন্দোবন্ধের 'চতুর্দশপদী' নাম সংগত কিনা, কথাটির অর্থ এবং এ ছন্দোবন্ধের পক্ষে আবশ্যক শর্তগুলি উল্লেখ করে আলোচনা করুন।

২. (ক) চতুর্দশপদীর আশ্রয় কী কী আদর্শ, লিখুন।

(খ) চতুর্দশপদীর স্তবক-গঠনের ছক কী কী রকমের, লিখুন।

(গ) চতুর্দশপদীর মিলের ছক কী কী রকমের, লিখুন।

৩. (ক) নীচের স্তবকগুলির প্রতিটি ছত্রের শেষে মিল-চিহ্ন (ক খ গ ঘ ইত্যাদি) বসান, তারপর দৃষ্টান্তটি চতুর্দশপদীর কী ধরনের স্তবক আর মিলের ছক হতে পারে, লিখুন ঃ

(i) স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,
‘ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।’

(ii) হে রবীন্দ্র, তোমার ও সুন্দর-সনেট
কি সরল ! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,
মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে।

(iii) মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।

(খ) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(i) য়ুরোপীয় সাহিত্যে যে ছন্দোবন্ধের নাম ______, বাংলায় তারই নাম চতুর্দশপদী।

(ii) ______ শতকের ইতালীয় কবি ______, ______ শতকের ফরাসি কবি ______ আর ______ শতকের ইংরেজ কবি ______ এর হাতেই গড়ে উঠল চতুর্দশপদীর মূল য়ুরোপীয় আদর্শ।

২৫.১২ সামগ্রিক অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর ২৫ এককে উল্লিখিত উত্তর-সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. (ক) কাকে বলে, লিখুন ঃ পয়ার, অমিত্রাক্ষর, চতুর্দশপদী।

(খ) পার্থক্য কী, বুঝিয়ে দিন ঃ
ছন্দরীতি আর ছন্দোবন্ধ, সাধারণ (অপ্রবহমান) পয়ার আর অমিত্রাক্ষর।

(গ) নীচের ছন্দোবন্ধে কী কী গুণ থাকা জরুরি, লিখুন ঃ পয়ার, অমিত্রাক্ষর, চতুর্দশপদী।

২. নীচের দৃষ্টান্ত কোন শ্রেণির ছন্দোবন্ধের, কারণ জানিয়ে লিখুন ঃ

(ক) তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।

(খ) জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!

(গ) প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে?

(ঘ) যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দ্বীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
তাদের প্রাণের ঝরণা—স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার ধারা

২৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

ছন্দরীতি বিষয়ে ব্যাবহারিক পরিভাষা	প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ নূতন ছন্দ-পরিক্রমা	অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র	পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ
ছন্দোবন্ধ	পৃ-২৪১	পৃ-১৮	পৃ-৫৪
পয়ার	পৃ-২৪৯, ৫০,১৭০-৮৯	পৃ-১৮, ৭৬	×
প্রবহমানতা	পৃ-২৫৭	×	পৃ-১০৭, ১১২
মুক্তক	পৃ-১৮০-৮৯, ২৬৮	×	পৃ-১২, ১৩, ১০৭, ১১৭-২০, ১৪৭
অমিত্রাক্ষর	পৃ-২৩২, ২৩৩, ১৭৬-৮০	পৃ-১৯, ৭০-৭২	পৃ-১১১-১৫
চতুর্দশপদী	×	পৃ-৮৫, ৮৬	পৃ-১৪৫, ১৪৬

বাংলা অলংকার ও তার পরিচয়

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ঐচ্ছিক পাঠক্রম ৪টি পত্রে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্গত খ-২ পর্যায়। এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় বাংলা কবিতার অলংকার। আলোচনার মূল বিভাগ দুটি—অলংকারের পরিচয় আর অলংকার-নির্ণয়। পরিচয় পর্বটি সম্পূর্ণ হয়েছে তিনটি এককে, নির্ণয় পর্বের জন্য বরাদ্দ হয়েছে পুরো একটি একক। এই চারটি থেকে গোটা পর্যায়টি বিভক্ত। প্রতিটি এককের আশ্রিত বিষয়বস্তু এইরকম ঃ

- **একক ২৬ ঃ** এই এককে কবিতার অলংকার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটুকু শিক্ষার্থীর মনে সহজে তৈরি করে দেবার জন্য 'অলংকার' কথাটির চেনা অর্থের সঙ্গে কবিতার অলংকারের অচেনা অর্থের সংযোগটি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে অতি সংক্ষেপে জানানো হল প্রাচীন ভারতের অলংকার ভাবনার কথা, অলংকারের তাৎপর্য নিয়ে কথা, আর অলংকারের মূল বিভাগের কথা।

- **একক ২৭ ঃ** অলংকারের দুটি মূল বিভাগের একটি শব্দালংকার। শব্দালংকার এই এককের বিষয়। 'শব্দ' কথাটির দুটি অর্থের (ধ্বনি, অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি) মধ্যে একমাত্র ধ্বনির মাধুর্যই যে শব্দালংকার, আবশ্যকমতো উদাহরণের সাহায্য নিয়ে তার আলোচনা এখানে করা হল। এরপর সবচেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য চারটি শব্দালংকারের (অনুপ্রাস-যমক-শ্লেষ-বক্রোক্তি) বিশদ বিশ্লেষণ করা হল সংজ্ঞায়, উদাহরণে ব্যাখ্যায়।

- **একক ২৮ ঃ** অলংকারের বড়ো বিভাগটির নাম অর্থালংকার। বড়ো বলেই বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে তার বিশদ আলোচনা করে দেওয়া হল এই এককে। প্রথমভাগে অর্থালংকারের কথা সাধারণভাবে, পরের দুটি ভাগে অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণির কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হল। এই পাঁচটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল এগারোটি অলংকার—সাদৃশ্যমূলক 'উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি-অতিশয়োক্তি-ব্যতিরেক' বিরোধমূলক 'বিরোধাভাস', শৃঙ্খলামূলক 'একাবলি', ন্যায়মূলক 'অর্থান্তরন্যাস', গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক 'ব্যাজস্তুতি-স্বভাবোক্তি'।

এই পর্যায়ের এককগুলি তৈরি করতে এই ৩টি বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

১. অলংকার চন্দ্রিকা ঃ শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

২. বাঙলা অলঙ্কার ঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়।

৩. বাংলা কবিতার অলংকার ঃ সুধীন্দ্র দেবনাথ।

একক ২৬ ❒ অলংকার

গঠন

২৬.১ উদ্দেশ্য
২৬.২ প্রস্তাবনা
২৬.৩ মূলপাঠ
২৬.৪ সারাংশ
২৬.৫ অনুশীলনী

২৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গো পড়লে—

- বাংলা কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, এ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা আপনার মনে তৈরি হবে।
- কাব্যের অলংকার নিয়ে ভারতীয় আলংকারিকদের ধারাবাহিক চিন্তাভাবনা বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানবার জন্য আপনি আগ্রহী হবেন।
- কবিতার অলংকারের মূল বিভাগ এবং তাদের ভেতরকার সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে আপনি একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে পারবেন।

২৬.২ প্রস্তাবনা

কবিতার সৌন্দর্য অনুভব করার পাশাপাশি উৎসুক পাঠকের, আগ্রহী শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত দায়িত্ব সেই সৌন্দর্যের রহস্য কী, তা ধাপে ধাপে বুঝে নেবার চেষ্টা। এর প্রথম ধাপ কবিতায় অলংকার সন্ধান। ভারতীয় অলংকার চর্চার ধারা থেকেই বাংলা কবিতার অলংকারের ভাবনা এসেছে, আবশ্যক পরিভাষা নেওয়া হয়েছে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র থেকেই। অলংকার সম্পর্কে আপনার মনে প্রাথমিক ধারণাটুকু তৈরি করে দেবার জন্য যেটুকু আবশ্যক, সংক্ষেপে তাই করা হল একক ৩৭-এ।

২৬.৩ মূলপাঠ

সংস্কৃত ‘অলম’-এর একটি অর্থ ‘ভূষণ’ বা সাজসজ্জা। ‘অলংকার’ তাহলে সাজসজ্জার কাজ। শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য শরীরকে সাজানো হয় গয়না দিয়ে, তাই গয়না শরীরের অলংকার। রচনাকে সুন্দর করার জন্য যে আয়োজন, তাও অলংকার। সেই অলংকারে সাজানো হলে তবেই কোনো রচনা হবে কাব্য।

ভরতমুনির ‘নাট্যশাস্ত্রে’ অলংকারের উল্লেখ হয়েছিল দু-হাজার এক-শ বছর আগে—উপমা দীপক রূপক যমক, এই চারটি অলংকার। ভারতবর্ষে অলংকার-চর্চার এই হল সূচনা। দেড় হাজার বছর আগে থেকে শুরু

হয়েছিল অলংকার নিয়ে নানা বিতর্ক। ছ-শতকের আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' ভরতমুনির চারটি অলংকার বেড়ে হল ছত্রিশটি। তাঁর মতে, যেসব ধর্ম কাব্যে শোভা এনে দেয় তার নাম অলংকার ('কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে')। সাত-শতকেরক আচার্য ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের বক্রোক্তি-তত্ত্ব পেরিয়ে যখন আট শতকে পৌঁছই, তখন দেখি, বামনাচার্য অলংকার সম্পর্কে একটি মূল্যবান সূত্র নির্দেশ করছেন তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে—কোনো রচনা মানুষের কাছে উপাদেয় এবং কাব্য বলে গ্রাহ্য হয় অলংকারের জন্যই, আর সৌন্দর্যই হচ্ছে সেই অলংকার ('কাব্যং গ্রাহ্যং হ্যলঙ্কারৎ। সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ')। বামনাচার্যের এই সূত্রটি আজকের বাংলা কবিতার অলংকার বুঝতেও অত্যন্ত জরুরি। সংস্কৃত কাব্যের অলংকার নিয়ে আলোচনা পাল্টা আলোচনা চলেছে সতেরো-শতক পর্যন্ত। বামনাচার্যের সূত্রটি ক্রমশ দুটি মাত্রা পেল—এক, অলংকার কাব্যের সাধারণ (আত্মভূত) সৌন্দর্য ; দুই অলংকার কাব্যের বিশেষ (অঙ্গাভূত) সৌন্দর্য। চৌদ্দ-শতকের বিশ্বনাথ কবিরাজ অলংকারের এই দ্বিতীয় মাত্রাটি ধরে ছিয়াত্তরটি অলংকারের আলোচনা করলেন তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে।

সেই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সন্ধান কিছুকাল ধরে চলছে। এখানে আমরাও তাই করব—বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো উদাহরণ সংগ্রহ করে অলংকার নির্ণয় করে যাব। তবে তার সীমানা পনেরোটি অলংকার।

কবিতার মতো অলংকারের আয়তনও অনির্দিষ্ট। একটি অলংকার একটিমাত্র শব্দকে আশ্রয় করতে পারে, একটি-দুটি চরণ বা বাক্য জুড়ে থাকতে পারে, কবিতার একটি স্তবক বা ছোটোমাপের একটি কবিতার শরীরেও ছড়াতে পারে। কবিতা বা তার অন্তর্গত স্তবক-চরণ বাক্য শব্দের দুটি রূপ—একটি ধ্বনিরূপ, আর একটি অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, তার আবেদন শ্রুতির কাছে ; অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে, তার আবেদন বোধের কাছে। কবিতা স্তবক-চরণ বাক্য বা শব্দ উচ্চারিত হলে উচ্চারণজনিত ধ্বনির মাধুর্য সরাসরি শ্রোতার কানকে তৃপ্ত করতে পারে, অথবা অর্থের সৌন্দর্য শ্রোতার বোধকে উদ্দীপিত করতে পারে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম, শব্দালংকার আর অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

২৬.৪ সারাংশ

শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য গয়না দিয়ে শরীরকে সাজানো হয়। তাই, গয়না শরীরের অলংকার। তেমনি, কথাকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য যে আয়োজন, তা কথার অলংকার। আর, এই অলংকার দিয়ে সাজানো কথাই কাব্য বা কবিতা।

ভারতবর্ষে অলংকারের ইতিহাস ২১০০ বছরের। প্রথমে ভরতমুনি জানালেন ৪টি অলংকারের কথা, তারপর আচার্য দণ্ডী ৩৬টি এবং ভামহ বামনাচার্যের যুগ পেরিয়ে সবশেষে বিশ্বনাথ কবিরাজ ৭৬টি অলংকারের আলোচনা করলেন। বামনাচার্যের একটি মত, অলংকার হচ্ছে কবিতার শরীরের সৌন্দর্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ এই অর্থ ধরেই অলংকার ব্যাখ্যা করলেন, আমরাও এই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সন্ধান করব।

একটিমাত্র শব্দ অথবা একটি-দুটি চরণ বা একটি স্তবক, এমনকী একটি গোটা কবিতা জুড়েও থাকতে পারে অলংকার। কবিতা বা স্তবক-চরণ শব্দের দুটি রূপ—ধ্বনিরূপ আর অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম শব্দালংকার, অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

২৬.৫ অনুশীলনী

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ৬০-এর উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, লিখুন।

২. (ক) পাঁচজন প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকের নাম, তাঁদের গ্রন্থের নাম আর অলংকার-চর্চার কাল (শতক) উল্লেখ করেন।

(খ) কোন আলংকারিকের কোন সূত্রের কী অর্থ ধরে বাংলা কবিতায় অলংকার সন্ধান করা হয় লিখুন।

৩. (ক) একটি কবিতার কতটুকু আয়তন জুড়ে একটি অলংকার থাকতে পারে, লিখুন।

(খ) উচ্চারিত কবিতা বা তার অংশের কী কী রূপ, কোন রূপ শ্রোতার কোন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে লিখুন।

৪. অলংকারের মূল বিভাগ কী কী, কবিতা বা তার অংশের উচ্চারণ থেকে অলংকার কীভাবে তৈরি হয়—লিখুন।

একক ২৭ ❒ শব্দালংকার

গঠন

২৭.১ উদ্দেশ্য

২৭.২ প্রস্তাবনা

২৭.৩ মূলপাঠ

২৭.৩.১ অনুপ্রাস

২৭.৩.২ যমক

২৭.৩.৩ শ্লেষ

২৭.৩.৪ বক্রোক্তি

২৭.৪ সারাংশ

২৭.৫ অনুশীলনী

২৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গে পড়লে—

- আপনি বাংলা কবিতার উচ্চারণ থেকে ধ্বনিমাধুর্য আস্বাদন করার সমর্থ শ্রোতা হয়ে উঠতে পারবেন।
- বাংলা কবিতায় ধ্বনির প্রয়োগে বা সমাবেশে কবির দক্ষতা বিচার করার ক্ষমতা ক্রমশ আপনার মধ্যে তৈরি হবে।
- বাংলা কবিতায় ধ্বনিপ্রয়োগের নানারকম কৌশল বুঝে নেওয়া ক্রমশ আপনার পক্ষে সহজ হবে।

২৭.২ প্রস্তাবনা

একক ৫ থেকে জানলেন বাংলা কবিতার অলংকারের দুটি মূল বিভাগের কথা। এর প্রথমটি শব্দালংকার। এ অলংকার তৈরি হয় শ্রোতার কানে, কবিতার উচ্চারণ থেকে মধুর ধ্বনি শুনতে শুনতে। বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে অলংকারের এই বিভাগটির পরিচয় আপনার কাছে তুলে ধরা হল। কিছু কিছু সূক্ষ্ম কৌশলগত পার্থক্যের কারণে শব্দালংকারেও যে ধরনের বৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে, দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাও দেখানো হল।

২৭.৩ মূলপাঠ

বাংলায় 'শব্দ' কথাটির দুটি অর্থ—একটি ধ্বনি, অন্যটি অর্থবোধক বর্ণসমষ্টি (লেখায়) বা ধ্বনিসমষ্টি (উচ্চারণে)। প্রথমটি ইংরেজি Sound অর্থে, দ্বিতীয়টি ইংরেজি Word অর্থে। 'শব্দালংকার'-এর 'শব্দ' তাহলে কোন অর্থে? চারটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে অর্থটি বুঝে নেওয়া যাক।

প্রথম উদাহরণ, 'কষিত কনক কান্তি কমনীয় কায়'—এই ছত্রটিতে পাঁচটি শব্দ (Word) আছে, আবার পাঁচটি ক-ধ্বনিও আছে। পাঁচটি পৃথক শব্দ, কিন্তু একই ক-ধ্বনি পাঁচবার। ছত্রটি উচ্চারণ করলে ক-ধ্বনিটিই পরপর পাঁচবার কানে মৃদু আঘাত দেয়, একই ধ্বনি বারে বারে আবৃত্ত হয়ে মাধুর্য সৃষ্টি করে, তৈরি হয় ধ্বনির অলংকার—শব্দালংকার। পৃথক পৃথক শব্দ (Word) এখানে কোনো অলংকার তৈরি করে না।

ওপরের উদাহরণটি থেকে বোঝা গেল, অলংকার তৈরি করে যে শব্দ তা Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি নয়, Sound বা ধ্বনি। অর্থাৎ, শব্দালংকারের 'শব্দ' ধ্বনি। কিন্তু এ বিষয়ে একটু তর্ক আছে। আরও দুটি উদাহরণ থেকে তর্কও উঠবে, সে তর্কের মীমাংসাও হবে।

দ্বিতীয় উদাহরণ,

আটপণে কিনিয়াছি আধসের চিনি।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।।

এখানে 'চিনি' শব্দটি দুটি ছত্রে দুবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রথম 'চিনি' এক ধরনের মিষ্টি, দ্বিতীয় 'চিনি'-র অর্থ 'জানি' বা 'বুঝি'। একই শব্দ 'চিনি' দুবার উচ্চারিত হল দুটি পৃথক অর্থ নিয়ে। 'চিনি'-র পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ কানে মধুর লাগে, কানকে তৃপ্ত করে। এই মাধুর্যের সঙ্গে একটুখানি চমক লাগে 'চিনি' শব্দটি দুবার দুটি পৃথক অর্থ পাচ্ছে বলে। একই অর্থে দুবার উচ্চারণে ওই আস্বাদটুকু পাওয়া যাবে না, যেমন পাওয়া যায় না যদি বলি—'তোমাকে ত চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে!' অথবা 'ছেলেটা চিনি চিনি করে চেঁচায় শুধু, বেশি খেতে পারে না।' 'চিনি' শব্দের দুটি পৃথক অর্থে দুবার উচ্চারণ থেকে যে মাধুর্য তৈরি হল তা-ও শব্দালংকার। এ অলংকার তো 'চিনি' শব্দটাকে ঘিরেই তৈরি হল এবং 'শব্দ' এখানে Word বা অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, sound বা ধ্বনি নয়।

তৃতীয় উদাহরণ,

'পূজাশেষে কুমারী বললে, 'ঠাকুর, আমাকে মনের মতো
একটি বর দাও।'

'বর' শব্দটি একবার মাত্র উচ্চারিত হল উদ্ধৃত বাক্যে। এতে চমকাবার মতো কিছুই থাকত না, যদি 'বর' সাধারণভাবে একটিমাত্র অর্থই বোঝাত। কিন্তু বিদগ্ধ শ্রোতা জানেন, 'বর'-এর দুটি অর্থ—'আশীর্বাদ' আর 'স্বামী'। কুমারী মেয়ে ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ চাইতে পারে, 'মনের মতো' স্বামীও চাইতে পারে। 'বর' শব্দটি যখন দুটি অর্থের ইঙ্গিত নিয়ে শ্রোতার কানে বেজে ওঠে, তখন সেই উচ্চারণে তৈরি হয় চমক আর মাধুর্য। চকমসহ এই মাধুর্যই শব্দালংকার। এ-অলংকারের কেন্দ্রে আছে 'বর' শব্দটি, একটিমাত্র উচ্চারণে দুটি অর্থ নিয়ে। 'শব্দ' এখানেও Word, Sound নয়।

তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, শব্দালংকারের 'শব্দ' ধ্বনি (sound) হতে পারে, অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিও (Word) হতে পারে? ধরে নেওয়াই যায়, ওপরের তিনটি উদাহরণ তো সে-কথাই বলে। কিন্তু দ্বিতীয় আর তৃতীয় উদাহরণ অন্য কথাও বলে এবং সেই কথাই চূড়ান্ত। ধ্বনি আর শব্দের (Sound আর Word) এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত আছে আর একটি কথা। সেটি হল 'অর্থে'র ভূমিকা। শব্দ Word যখন অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি, তখন শব্দে ধ্বনিও আছে, অর্থও আছে। দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণের 'চিনি' আর 'বর' যখন শব্দালংকার সৃষ্টি করে, তখন ওই শব্দদুটির ধ্বনি আর অর্থই অলংকার-সৃষ্টির কাজ করে যায়। 'চিনি'র দুবার উচ্চারণে দুটি অর্থ আর

'বর'-এর একবার উচ্চারণে দুটি অর্থ—এই অর্থের চমকেই তো এদের অলংকার। তবু এরা অর্থালংকার নয়, শব্দালংকারই। এর কারণ, উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি বা ধ্বনিগুচ্ছই শ্রোতার কানে মাধুর্য সঞ্চার করে, অলংকার তৈরি করে। আর, সে অলংকার-সৃষ্টিতে কেবল সহায়তা করে একই ধ্বনিগুচ্ছের দুটি অর্থ—ধ্বনির মধ্যে চমক জাগিয়ে। অতএব, 'চিনি' আর 'বর'-এর অলংকার নির্মাণে ধ্বনি দেয় মাধুর্য, অর্থ দেয় চমক। ধ্বনিমাধুর্যই তো শব্দালংকার, অর্থ তার সহায়কমাত্র। ধ্বনির এখানে মুখ্য ভূমিকা, অর্থ নিতান্ত গৌণ। অন্যদিকে, প্রথম উদাহরণের অলংকার নির্মাণে একমাত্র ধ্বনিরই ভূমিকা (ক-ধ্বনি)।

ওপরের তিনটি উদাহরণের সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এই সত্যটিই বেরিয়ে এল—শব্দালংকার মূলত ধ্বনি নির্ভর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে অর্থের সহায়তা নিতে হয়। এ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, শব্দের (Word) উচ্চারণ থেকেও আসতে পারে। অর্থাৎ, শব্দালংকারের 'শব্দ' কখনো বর্ণধ্বনি (প্রথম উদাহরণে), কখনো শব্দধ্বনি (দ্বিতীয়-তৃতীয় উদাহরণে)। চতুর্থ উদাহরণের সাহায্য নিয়ে দেখব, 'শব্দ' কখনো কখনো বাক্যধ্বনি।

যেমন,

'রজনীগন্ধা বাস বিলালো,
সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো?'

—এখানে দুটি বাক্য। দুটি বাক্যেরই গোটা শরীরে ছড়ানো রয়েছে এই ধ্বনিগুলি : 'অজনী-অন্ধা-আসবি-আলো'। অতএব এটি বাক্যধ্বনি, এবং একই বাক্যধ্বনির দুবার আবর্তনে শব্দালংকার।

সুতরাং শব্দালংকারের 'শব্দ' মূলত ধ্বনিই—বর্ণধ্বনি শব্দধ্বনি বাক্যধ্বনি, যা-ই হোক ('শব্দধ্বনি'র 'শব্দ' অবশ্যই Word)। তবে, শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার। কবিতার একটি স্তবকের উচ্চারণ থেকে তার অন্তর্গত বর্ণ শব্দ (Word) বা বাক্যের ধ্বনি যদি প্রয়োগ বা সমাবেশের কৌশলে মধুর শোনায়, এবং সেই মাধুর্য যদি শ্রোতার কানে তৃপ্তিদায়ক ঠেকে, তাহলে সেই ধ্বনিমাধুর্যই হবে শব্দালংকার।

বাংলা কাব্য-কবিতায় প্রয়োগ-পরিমাণের দিক থেকে প্রথম চারটি শব্দালংকার—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ আর বক্রোক্তি।

২৭.৩.১ অনুপ্রাস

সংজ্ঞা : একই ব্যঞ্জনধ্বনির বা সমব্যঞ্জনধ্বনির একাধিকবার উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের একাধিকবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণে, অথবা বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অনুপ্রাস অলংকার।

(একই ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনগুচ্ছের একাধিকবার উচ্চারণে অনুপ্রাস।)

বৈশিষ্ট্য :

১। একই ব্যঞ্জনের দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।

২। সমব্যঞ্জনের (জ-য, শ-ষ-স, ণ-ন) দুবার বা বহুবার উচ্চারণ।

৩। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত (ন্ব-ন্ব, ন্ধ-ন্ধ) বা বিযুক্ত (শিষের-শিশির, শাখার-শিখরে) উচ্চারণ।

৪। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত (বরী-রবী, বাক্-কাব্) উচ্চারণ।

৫। একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত বা বিযুক্ত উচ্চারণ।

৬। বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার (ক-খ, চ-ছ, ট-ঠ) বা বহুবার (ত-থ-দ-ধ-ন) উচ্চারণ।

৭। স্বরধ্বনির সাম্য থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। একমাত্র প্রয়োগস্থানগত অনুপ্রাসে (আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস) স্বরধ্বনির সাম্য আবশ্যক।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

● প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—

(ক) বৃত্ত্যনুপ্রাস (বৃত্তি + অনুপ্রাস) ; (খ) ছেকানুপ্রাস (ছেক + অনুপ্রাস) ;

(গ) শ্রুত্যনুপ্রাস (শ্রুতি + অনুপ্রাস)।

● প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—

(ঘ) আদ্যানুপ্রাস (আদ্য + অনুপ্রাস) ; (ঙ) অন্ত্যানুপ্রাস (অন্ত্য + অনুপ্রাস) ;

(চ) সর্বানুপ্রাস (সর্ব + অনুপ্রাস)।

বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

● **(ক) বৃত্ত্যনুপ্রাস ঃ**

সংজ্ঞা ঃ একই ব্যঞ্জনের বা সমব্যঞ্জনের একাধিক উচ্চারণে, অথবা একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণে বা ক্রম অনুসারে বহুবার (যুক্ত বা বিযুক্ত) উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস।

১. একই ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনের ‘ব’ দুবার (বিদায়, বিষাদ) ধ্বনিত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস।

২. সমব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

জেগেছে যৌবন নব বসুধার দেহে। —শ্যামাপদ চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন ‘জ’ ‘য’ দুবার উচ্চারিত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস।

৩. একই ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—

চলচপলার চকিত চমকে করিছ চরণ বিচরণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জন ‘চ’-এর ছয়বার এবং ‘র’-এর চারবার উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে।

৪. সমব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—

শরতের শেষে সরিষা রো। —খনার বচন

ব্যাখ্যা : সমব্যঞ্জন ‘শ’ ‘ষ’ ‘স’ পাঁচবার ধ্বনিত হয়ে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

৫.   ব্যঞ্জনগুচ্ছের স্বরূপ অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক)—

(i) কবরী দিল করবীমালে ঢাকি।   —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : ‘কবরী’ আর ‘করবী’ শব্দদুটিতে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘বর’-এর বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে দুবার—প্রথমবার ‘বরী’ এবং দ্বিতীয়বার ‘রবী’। ‘ব-র’-এর বিন্যাস বদলে যাওয়ার (বরী > রবী)-এর উচ্চারণ ক্রম অনুসারে হয়নি, হয়েছে স্বরূপ অনুসারে। অতএব, কবরী-করবী উচ্চারণে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়েছে।

(ii) বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য।

সংকেত : বাক্য > কাব্য।

৬. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী।   —জগদানন্দ

সংকেত : ‘ঞ্-জ’-এর যুক্ত উচ্চারণ (ঞ্জ) তিনবার।

(ii) দিনান্তে, নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।   —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : একই স্বরধ্বনিসমেত ‘ন্-ত্’-এর যুক্ত উচ্চারণ (আন্তে) তিনবার।

৭. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে বহুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া।   —নজরুল

সংকেত : ‘লক’-এর তিনবার উচ্চারণ স্বরধ্বনিসমেত (‘লোক’)।

(ii) কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।

সংকেত : ‘কল’-এর চারবার উচ্চারণ (স্বরসাম্য নেই—‘কল’, ‘কিল’ - ‘কুল’ - ‘কুল’)।

● **(খ) ছেকানুপ্রাস ঃ**

সংজ্ঞা ঃ একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে মাত্র দুবার যুক্ত অথবা বিযুক্ত উচ্চারণে ছেকানুপ্রাস।

(‘ছেক’ শব্দের অর্থ বিদগ্ধ পন্ডিত। ছেকানুপ্রাস বিদগ্ধজনের প্রিয় অনুপ্রাস।)

উদাহরণ :

১. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত উচ্চারণ—

(i) উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে।   —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ ‘ম্-ব্’-এর ক্রম অনুসারে যুক্ত উচ্চারণ (ম্ব) হয়েছে দুবার (কলম্ব, অম্বর)। অতএব, ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

(ii) কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।   —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : ‘ন্-ধ্’-এর যুক্ত উচ্চারণ (ন্ধ) দুবার।

২. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ (স্বরসাম্য থাক বা না থাক)—

একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'শ-ষ-র'-এর ক্রম অনুসারে দুবার বিযুক্ত উচ্চারণ হয়েছে 'শিষের' ও 'শিশির' শব্দ দুটিতে। লক্ষণীয়, এখানে স্বরসাম্য নেই (ই-এ, ই-ই)। তবু ছেকানুপ্রাস হয়েছে।

মন্তব্য : 'শ-ষ-র' এবং 'শ-শ-র' ধ্বনিগতভাবে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ। 'শ-ষ'-এর বর্ণগত পার্থক্য থাকলেও বাংলা উচ্চারণে এরা একই রকম ধ্বনি। ধ্বনিদুটিকে সমব্যঞ্জন বলা যায়।

৩. ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার যুক্ত এবং বিযুক্ত উচ্চারণ—

(i) মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর-পিঞ্জরে। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'প-ঞ্-জ-র' ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হয়েছে 'পঞ্জর' ও 'পিঞ্জরে' শব্দদুটিতে। এখানে 'প-র' ব্যঞ্জনদুটির উচ্চারণ বিযুক্তভাবে হলেও 'ঞ্-জ্'-এর উচ্চারণ হয়েছে যুক্তভাবে. স্বরধ্বনির সাম্যও এখানে নেই (পঞ্জর-পিঞ্জরে > অ-অ-অ > ই-অ-এ)। কিন্তু, ব্যঞ্জনগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থাকার কারণে এখানে ছেকানুপ্রাসই হয়েছে।

(ii) আমি কবি ভাই কর্মের ও ঘর্মের। —প্রেমেন্দ্র মিত্র

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'র্-ম-র' ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারিত হওয়ায় ছেকানুপ্রাস হয়েছে নিঃসন্দেহে (প্রথম উচ্চারণ 'কর্মের >'র্মের', দ্বিতীয় উচ্চারণ 'ঘর্মের >'র্মের')। কিন্তু লক্ষণীয়, 'র্ম'-এর উচ্চারণ যুক্ত আর 'মের'-এর উচ্চারণ 'এ' স্বরধ্বনির দ্বারা বিযুক্ত।

●(গ) শ্রুত্যনুপ্রাস :

সংজ্ঞা : বাগযন্ত্রের একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশে শ্রুত্যনুপ্রাস।

(একই ধ্বনির অনুপ্রাস নয়, তবে একই স্থানে উচ্চারিত ধ্বনি বলে তারা শ্রুতিতে বা শুনতে একইরকম। শ্রুতিতে অনুপ্রাস বলেই এর নাম শ্রুত্যনুপ্রাস।)

উদাহরণ :

১. একই স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন ব্যঞ্জনের দুবার উচ্চারণ—

(i) বাতাস বহে বেগে, ঝিলিক মারে মেঘে।

ব্যাখ্যা : 'গ-ঘ' ভিন্ন দুটি ব্যঞ্জন হলেও তারা বাগযন্ত্রের একই স্থান কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত। ফলে, ওই দুটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও তারা অনুয়াসে অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে 'বেগে' আর 'মেঘে' শব্দদুটিতে। এ অনুপ্রাস শ্রুতিগত বলে এটি শ্রুত্যনুপ্রাস।

(ii) চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : 'ক-খ' (কণ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যনুপ্রাস 'চিকন'-'লিখন'-'লিখন' শব্দটিতে

(iii) নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : 'ব-ভ' (ওষ্ঠে উচ্চারিত)-এর শ্রুত্যনুপ্রাস 'নিরাবরণ' আর 'নিরাভরণ' শব্দদুটিতে।

২. একই স্থানে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের বহুবার উচ্চারণ—

ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণের 'ছন্দোবন্ধগ্রন্থীগীত' অংশে 'দ-ন্-ধ-থ-ত' ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির সমাবেশ ঘটেছে। এই সমাবেশ মূলত চারটি ধ্বনির—ত-থ-দ-ধ। এদের উচ্চারণস্থান দন্তমূল। ধ্বনিগতভাবে ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণ পৃথক হলেও শ্রুতিতে এরা একইরকম। সেই কারণে, মিলিতভাবে পাঁচবার উচ্চারিত হয়ে এরা শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

■ **(ঘ) আদ্যানুপ্রাস :**

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের বা পদের বা পর্বের আদিতে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে আদ্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) বড়ো কথা শুনি, বড়ো কথা কই
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : চরণের আদিতে 'বড়ো'-'জড়ো' শব্দে 'আড়ো' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে আদ্যানুপ্রাস।

(ii) নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণের প্রথম পর্বের আদিতে 'নিত্য' এবং দ্বিতীয় পর্বের আদিতে 'চিত্ত'—এই দুটি শব্দে 'ইত্ত' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 'ইত্ত' ধ্বনিগুচ্ছে আছে স্বরধ্বনি 'ই-অ' সমেত ব্যঞ্জনধ্বনি 'ত্ত' (ই-ত্-ত্-অ)। অতএব, এখানে আদ্যানুপ্রাস হয়েছে।

■ **(ঙ) অন্ত্যানুপ্রাস :**

সংজ্ঞা : পদ্যে পরপর দুটি চরণের শেষে, পদের শেষে, পর্বের শেষে, এমন-কী পঙক্তির (line) শেষে স্বরসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে অন্ত্যানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) অজানু গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এ উদাহরণে প্রথম চরণটি সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় চরণ অপূর্ণ। প্রথম চরণের শেষে 'চমকি' আর দ্বিতীয় চরণের শেষে 'থমকি'—এই দুটি শব্দে 'অমকি' ধ্বনিগুচ্ছের (অ-ম্-অ-ক্-ই) অন্তর্গত তিনটি স্বরধ্বনিসমেত 'ম্-ক্' ব্যঞ্জনগুচ্ছ পুনরাবৃত্ত হয়ে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

(ii) অমি নাব মহাকাব্য সংরচনে। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : প্রথম দুটি পর্বের শেষে 'আর্ব' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

মন্তব্য : একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'ব্-ব'-এর ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণ থেকে ছেকানুপ্রাসও হয়েছে।

(i) তবে

একদিন কবে —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : এ উদাহরণে আছে দুটি পঙক্তি (line)। এর কোনোটিই চরণ নয়, পদ বা পর্বও নয়। এদের শেষে 'অবে' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি থেকে অন্ত্যানুপ্রাস।

('বলাকা' কাব্যে এ-ধরনের কোনো কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে পঙ্‌ক্তিশেষে অন্ত্যানুপ্রাস রচনা করে গেছেন।)

■(চ) **সর্বানুপ্রাস :**

সংজ্ঞা : পদ্যে দুটি চরণের সর্বশরীরে (প্রতিটি শব্দে) অনুপ্রাস থাকলে, অর্থাৎ প্রথম চরণের প্রতিটি শব্দের কোনো ধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে দ্বিতীয় চরণের প্রতিটি শব্দে পরপর পুনরাবৃত্ত হলে সর্বানুপ্রাস।

উদাহরণ :

(i) গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : এখানে প্রতিটি চরণে তিনটি করে শব্দ। প্রথম শব্দযুগল 'গগনে-চরণে', দ্বিতীয় শব্দযুগল 'ছড়ায়ে জড়ায়ে' এবং তৃতীয় শব্দযুগল 'এলোচুল-বনফুল'—এই তিনটি শব্দযুগলে যথাক্রমে 'অঅনে', 'অড়ায়ে' এবং 'উল' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এভাবে সর্বানুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে।

(ii) সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা। —যতীন্দ্রমোহন

সংকেত : 'অন্ধ্যা', 'উকের', 'ঔরবী', 'আশা' ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি।

২৭.৩.২ যমক

সংজ্ঞা : একই ধ্বনিগুচ্ছ নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিকবার উচ্চারিত হলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম যমক অলংকার।

(ধ্বনিগুচ্ছের নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে একাধিক ব্যবহারের নাম যমক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। ধ্বনিগুচ্ছে স্বরধ্বনি থাকবে, ব্যঞ্জনধ্বনিও থাকবে।

২। বাংলায় সমধ্বনির (ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য, শ-ষ-স) উচ্চারণে পার্থক্য নেই। অতএব যমকে সমধ্বনির প্রয়োগ হতে পারে। যেমন—রবি-রবী, বঁধু-বধূ, ঋণী-রিণী, জেতে-যেতে, আশা-আসা।

৩। ধ্বনির পরিবর্তন হলে যমক থাকবে না, অনুপ্রাস হয়ে যেতে পারে। যেমন—'ধানের শীষে আগুনের শীষ' যমক (শীষ-শীষ), কিন্তু 'ধানের শিষের উপরে শিশির' অনুপ্রাস (শিষের-শিশির—স্বরধ্বনির পরিবর্তন), 'পূরবীর রবি' যমক (রবী-রবি), কিন্তু 'পূরবীর ছবি' অনুপ্রাস (রবী-ছবি—ব্যঞ্জনের পরিবর্তন)।

৪। ধ্বনিগুচ্ছের একাধিক উচ্চারণ হবে নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে। বিন্যাস-ক্রমের পরিবর্তন হলে যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন—'যৌবন বন' যমক, কিন্তু 'যৌবন নব' অনুপ্রাস।

৫। ধ্বনিগুচ্ছের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিক উচ্চারণ হবে। অর্থাৎ প্রতিটি উচ্চারণেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অর্থযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছের নাম শব্দ। অতএব এটি হবে একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ, কিন্তু একই অর্থে নয়। এর নাম সার্থক যমক।

৬। ধ্বনিগুচ্ছের সার্থক-নিরর্থকভাবে একাধিক উচ্চারণ হতে পারে। এর অর্থ, ধ্বনিগুচ্ছের একবার সার্থক বা অর্থযুক্ত উচ্চারণ, অন্যবার নিরর্থক বা অর্থহীন উচ্চারণ। অর্থাৎ, একবার শব্দের উচ্চারণ, অন্যবার শব্দাংশের উচ্চারণ। এর নাম নিরর্থক যমক।

৭। ৫ম-৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা গেল, ধ্বনিগুচ্ছের একটি প্রয়োগ অর্থযুক্ত হবেই, অন্যপ্রয়োগ অর্থযুক্ত বা অর্থহীন হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি প্রয়োগেই ধ্বনিগুচ্ছ অর্থহীন হতে পারে না, হলে তা যমক না হয়ে অনুপ্রাস হবে। যেমন, 'সৌরভ-রভসে'। এখানে 'রভ' ধ্বনিগুচ্ছ দুবারই উচ্চারিত হয়েছে নিরর্থক শব্দাংশ হিসেবে। অতএব, এটি যমক নয়, অনুপ্রাস।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের—

  (ক) সার্থক যমক ; (খ) নিরর্থক যমক।

- প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের—

  (গ) আদ্যযমক ; (ঘ) মধ্যযমক ; (ঙ) অন্ত্যযমক ; (চ) সর্বযমক।

বিবিধ প্রকরণের সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■ **(ক) সার্থক যমক :**

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারের একই বা সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ হয় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, তার নাম সার্থক যমক।

উদাহরণ :

১. একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ—

(i) কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার। —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : একই শব্দ 'কীর্তিবাস' দুবার উচ্চারিত। প্রথম 'কীর্তিবাস' এখানে রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস অর্থে ভুল বানানে লেখা, দ্বিতীয় 'কীর্তিবাস' অর্থ কীর্তির বসতি যেখানে। অতএব, এটি সার্থক যমক।

(ii) টেবিলেতে ভালো করে দিয়েছিস বার্নিস ?
দাম চাস্ ? আজ নয়, মঙ্গল-বার নিস্। —উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সংকেত : 'বার্নিস' (চকচমে করার জন্য প্রলেপ) আর 'বার নিস্' (ওই দিনে নিয়ে যাস্) একই শব্দ না হলেও উচ্চারণে এক, অথচ অর্থে ভিন্ন।

২. সমধ্বনিযুক্ত শব্দের একাধিক উচ্চারণ—

(i) যেতে নারি জেতে নারী আমি হে —ঈশ্বর গুপ্ত

ব্যাখ্যা ঃ 'যেতে নারি' 'জেতে নারী'—এই দুটি শব্দযুগল সমধ্বনিযুক্ত, একই শব্দযুগলের পুনরাবৃত্তি নয়। 'জেতে-যেতে' শব্দদুটিতে জ-য সমব্যঞ্জন, আবার 'নারি-নারী' শব্দদুটিতে ই-ঈ সমস্বর। এই সমস্বর আর সমব্যঞ্জনের সহযোগে উচ্চারিত শব্দযুগল উচ্চারণে এক থেকেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে—'যেতে নারি' অর্থ 'যেতে পারি না', 'জেতে নারী' অর্থ 'জাতিতে স্ত্রীলোক'। অতএব, এটি সার্থক যমকের উদাহরণ।

(ii) তিনখানা নোট আনে সে 'দশ টাকার'
কিছুতে বুঝিতে পারে না দোষটা কার। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত ঃ 'দশ টাকার' (অর্থমূল্য) আর 'দোষটা কার' (কার দোষ)। 'অশ্' (দশ) আর 'ওষ্' (দোষ) সমধ্বনিযুক্ত (অ-ও সমস্বর, শ-ষ সমব্যঞ্জন) দুটি শব্দযুগল। এদের উচ্চারণ এক, অর্থ আলাদা।

■ **(খ) নিরর্থক যমক :**

সংজ্ঞা : যে যমক অলংকারে একই ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ হয়, তার নাম নিরর্থক যমক।

উদাহরণ :

(i) যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল। —জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'বন' প্রথমে উচ্চারিত হয়েছে 'যৌবন' শব্দের অংশ হিসেবে। এখানে তার উচ্চারণ অর্থহীন বা নিরর্থক। ঐ 'বন' পরে উচ্চারিত হল একটি পূর্ণশব্দের মর্যাদা নিয়ে, যখন তার অর্থ হল 'অরণ্য'। এখানে তার উচ্চারণ অর্থযুক্ত বা সার্থক। অতএব, এ উদাহরণ নিরর্থক যমকের।

(ii) বাজে পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : 'রবি' ধ্বনিগুচ্ছ 'পূরবী' শব্দের অংশ, অতএব নিরর্থক। 'রবি' স্বতন্ত্র শব্দ, অতএব সার্থক। 'রবী: আর 'রবি' মূলত একই ব্যঞ্জনগুচ্ছ (র-ব), সমস্বরধ্বনি 'ঈ' আর 'ই'-র সহযোগে তাদের গঠন। এই দুটি ধ্বনিগুচ্ছের একই উচ্চারণ। সুতরাং, এটি নিরর্থক যমক।

■ **(গ) আদ্যযমক :**

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের আদিতে যমক থাকলে তার নাম আদ্যযমক।

উদাহরণ :

(i) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে। —ভারতচন্দ্র রায়

ব্যাখ্যা : 'ভারত' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ 'কবি ভারতচন্দ্র রায়' অর্থে, দ্বিতীয় প্রয়োগ 'ভারতবর্ষ' অর্থে। অতএব এটি সার্থক যমক। যমকটি হয়েছে উদ্ধৃত চরণের আদিতে। অতএব, এটি আদ্যযমক।

■ (ঘ) মধ্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে চরণের মাঝখানে যমক থাকলে তার নাম মধ্যযমক।

উদাহরণ :

(i) পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা। —ভারতচন্দ্র রায়

ব্যাখ্যা : প্রথম 'তরি' অর্থ নৌকা, দ্বিতীয় 'তরি' অর্থ পার হই। এটি সার্থক যমক। যমকটি চরণের মাঝখানে রয়েছে। অতএব, এটি মধ্যযমকের উদাহরণ।

■ (ঙ) অন্ত্যযমক :

সংজ্ঞা : পদ্যে একটি বা পরপর দুটি চরণের শেষে অথবা দুটি পদের শেষে, যমক থাকলে তার নাম অন্ত্যযমক।

উদাহরণ :

মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়। —জ্ঞানদাস

ব্যাখ্যা : একই শব্দ 'হয়' চরণের শেষে দুবার উচ্চারিত দুটি ভিন্ন অর্থে—প্রথম অর্থ ঘোড়া, দ্বিতীয় অর্থ 'হয়ে যায়'। অতএব এটি সার্থক যমক, এবং চরণের শেষে রয়েছে বলে অন্ত্যযমক।

■ (চ) সর্বযমক :

সংজ্ঞা : একটি চরণের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পরের চরণে আর একবার করে উচ্চারিত হলে অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ চরণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারিত হলে যে বাক্যগত শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সর্বযমক।

উদাহরণ :

কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে।।

ব্যাখ্যা : প্রথম চরণে 'কান্তার' অর্থ বনভূমি, 'আমোদ' অর্থ সৌরভ, 'কান্ত' অর্থ বসন্তকাল আর 'সহকারে' অর্থ সমাগমে। দ্বিতীয় চরণে 'কান্তার' অর্থ প্রিয়তমার, 'আমোদ' অর্থ আনন্দ, 'কান্ত' অর্থ প্রিয়তম, 'সহকারে' অর্থ সঙ্গে। অতএব, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুবার উচ্চারণে প্রতিটি শব্দেই একটি করে সার্থক যমক হয়েছে। আবার সামগ্রিকভাবে প্রথম চরণের অর্থ—বনভূমি বসন্তসমাগমে সৌরভপূর্ণ, দ্বিতীয় চরণের অর্থ—প্রিয়তমের সঙ্গলাভে প্রিয়তমার আনন্দ সম্পূর্ণ। অতএব, এটি বাক্যগত সার্থক যমক এবং সর্বযমক।

২৭.৩.৩ সংশ্লেষ (শব্দশ্লেষ)

সংজ্ঞা : একটি শব্দের একটিমাত্র উচ্চারণে একাধিক অর্থ প্রকাশ পেলে যে শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম শ্লেষ (শব্দশ্লেষ) অলঙ্কার।

(একটি শব্দের একবার ব্যবহারে একাধিক অর্থ বোঝালে শ্লেষ।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

২। উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে।

প্রকারভেদ

● বাংলায় শ্লেষ বলতে শব্দ শ্লেষকেই বোঝায়। এই শ্লেষ বা শব্দশ্লেষ দু-রকমের—

(ক) অভঙ্গ শ্লেষ (খ) সভঙ্গ শ্লেষ।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

■ **(ক) অভঙ্গ শ্লেষ :**

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একাধিক অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম অভঙ্গ শ্লেষ।

উদাহরণ :

(i) মধুহীন করো নাগো তব মনঃকোকনদে। —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই চরণটিতে বিদায়-মুহূর্তে কবি মধুসূদন মাতৃভূমির কাছে বিস্মৃত না হবার যে আবেদন রাখছেন, সেই প্রসঙ্গে 'মধু' শব্দটিকে দুটি অর্থে তিনি প্রয়োগ করছেন। প্রথম অর্থ 'কবি মধুসূদন দত্ত', দ্বিতীয় অর্থ 'মউ'। একটি প্রয়োগে শব্দটিকে না ভেঙেই দুটি অর্থ পাওয়া গেল। অতএব, এটি অভঙ্গ শ্লেষ।

(i) বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ। —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণের ষাট-বছর পেরিয়ে যাওয়া কবি তাঁর আয়ুষ্কার ফুরিয়ে আসার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে 'পূরবী' আর 'রবি' শব্দ দুটি দুটি করে অর্থে প্রয়োগ করেছেন। 'পূরবী'র একটি অর্থ কবির নিজের লেখা 'পূরবী' কাব্য, আর-একটি অর্থ 'সূর্য'। দুটি শব্দেরই দুটি করে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে শব্দদুটিকে না ভেঙে এবং একবার মাত্র উচ্চারণ করে। অতএব, এখানকার অলংকার অভঙ্গ শ্লেষ।

মন্তব্য : 'পূরবী আর 'রবি' শব্দের শ্লেষ গোটা বাক্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। বাক্যটির প্রথম অর্থ, 'পূরবী-কাব্যের ছন্দে রবীন্দ্রনাথের জীবন-শেষ হয়ে আসার করুণ ভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে।' দ্বিতীয় অর্থ, 'পূরবী রাগিণীর করুণ সুরে বীণা বাজছে সূর্যাস্তের মুহূর্তে। অন্যদিকে, 'পূরবী'র নিরর্থক অংশ 'রবী' আর সার্থক 'রবি'—এই দুটি শব্দ শব্দাংশ দিয়ে নিরর্থক যমক অলংকারও তৈরি হয়েছে।

■ **(খ) সভঙ্গ শ্লেষ :**

সংজ্ঞা : যে শ্লেষ অলংকারে উচ্চারিত শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ এবং ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া যায়, তার নাম সভঙ্গ শ্লেষ।

উদাহরণ :

(i) আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মুলতানে
গুঞ্জন তার রবে চিরনি, ভুলে যাবে তার মানে।

ব্যাখ্যা : 'রোগশয্যায়' কাব্য থেকে উদ্ধৃত অংশের প্রথম চরণে 'মূলতান' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন দুটি অর্থে। প্রথম অর্থ 'সূর্যাস্তকালীন রাগিণীবিশেষ'—এটি অখণ্ড 'মূলতান' শব্দেরই অর্থ। 'মূলতান' শব্দটিকে 'মূল' আর 'তান' এই দুটি অংশে ভাঙলে যে অর্থটি মেলে তা এই—'বিশ্ববীণার মুল বা উৎস-তন্ত্রীতে আনন্দের যে তান বা সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে।' প্রথমে না ভেঙে একটি অর্থ, পরে ভেঙে আর-একটি অর্থ 'মূলতান' শব্দটি থেকে পাওয়া গেল। অতএব, এটি সভঙ্গ শ্লেষের উদাহরণ।

(ii) অপরূপ রূপ কেশবে —দাশরথি রায়

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে 'কেশবে' শব্দটিকে না ভাঙলে এর অর্থ কৃষ্ণ। শব্দটিকে 'কে' - 'শবে' এই দুটি অংশে ভাঙলে এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায়—'মৃতদেহের ওপর কে?' এর নিহিত অর্থ 'শবরূপী শিবের ওপর দাঁড়িয়ে যে নারী, তিনি কে?' এর উত্তর 'কালী'। আর 'কেশবে' অর্থ কৃষ্ণ। 'কেশবে' শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ আর ভেঙে আর-একটি অর্থ পাওয়া গেল বলে এটি সভঙ্গ শ্লেষ।

২৭.৩.৪ বক্রোক্তি

সংজ্ঞা : যেখানে বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে বাঁকাভাবে অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে বলা হয়, অথবা বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা হয়, সেখানে কণ্ঠভঙ্গি অথবা শ্লেষের কারণে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়। এর নাম বক্রোক্তি অলংকার।

(বক্তা কোনো কথা ঘুরিয়ে বললে অথবা শ্রোতা কথাটির সহজ অর্থ ছেড়ে দিয়ে অন্য অর্থ ধরলেই বক্রোক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। 'বক্রোক্তি' (বক্র + উক্তি) অর্থ বাঁকা কথা। কথায় সৌন্দর্য ফোটানোর লক্ষ্যেই এ বক্রতা আবশ্যক। উক্তির এই বক্রতা সৃষ্টির জন্য কবিরা দুটি কৌশল প্রয়োগ করেন—একটি 'কাকু' বা কণ্ঠভঙ্গি, আর একটি 'শ্লেষ' বা দ্ব্যর্থকতা (কথাটির দুটি অর্থ)।

২। বক্রোক্তির প্রথম লক্ষণ, বক্তার তরফে বক্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে বলা। 'কাকু' বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যেই কথায় বক্রতা আনা যেতে পারে। ভঙ্গিটা যদি এমন হয় যে, হাঁ-প্রশ্নবাক্য দিয়ে না-বোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্য দিয়ে হাঁ-বোধক বক্তবা প্রকাশ পায়, তাহলে হবে কাকু-বক্রোক্তি।

৩। বক্রোক্তির দ্বিতীয় লক্ষণ, শ্রোতার তরফে বক্তব্যকে সহজ অর্থে গ্রহণ না করে অন্য অর্থে গ্রহণ করা। অর্থাৎ, বক্তা যে কথাটি প্রয়োগ করেছেন তার দুটি অর্থ—একটি বক্তার অভিপ্রেত অর্থ, অন্যটি শ্রোতার গৃহীত অর্থ। অতএব, কথাটির প্রয়োগে শ্লেষ আছে। দেখা যায়, শ্লেষের সুযোগ নিয়ে শ্রোতা প্রতিবারই কথাটিকে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের দিকে টেনে নিচ্ছেন, অভিপ্রেত অর্থটি বারে বারে উপেক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে বক্তা এবং শ্রোতার উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এক ধরনের শ্রুতিমাধুর্য তৈরি হতে থাকে। এরই নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

প্রকারভেদ

● বক্রোক্তি দু-রকমের—

(ক) কাকু-বক্রোক্তি ; (খ) শ্লেষ-বক্রোক্তি।

■ (ক) কাকু বক্রোক্তি :

সংজ্ঞা : যে বক্রোক্তি অলংকারে কাকু বা বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির হাঁ-প্রশ্নবাক্যে না-বোধক বক্তব্য অথবা না-প্রশ্নবাক্যে হাঁ-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পায়, তার নাম কাকু-বক্রোক্তি।

উদাহরণ :

(i) রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ? —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'মেঘনাদবধকাব্য' থেকে উদ্ধৃত এই চরণদুটি হাঁ-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত। এর উত্তরে শ্রোতাকে উপলব্ধি করতে হয় যে, প্রমীলা ভিখারি রাঘবকে একটুও ভয় করে না। উপলব্ধিটি না-বোধক। বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত হাঁ-প্রশ্নবোধক না-বোধক বক্তব্য প্রকাশ পেল বলে এখানে কাকু-বক্রোক্তি হয়েছে।

(ii) মাতা আমি নহি ? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ? —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : 'গান্ধারীর আবেদন' থেকে উদ্ধৃত গান্ধারীর এই উক্তি না-প্রশ্নবাক্যের ভঙ্গিতে উচ্চারিত ('নহি' 'বহি নাই')। স্নেহ-দুর্বল ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর বক্তব্য—তিনিও মা, দুর্যোধনকে গর্ভে বহন করার দুঃখ তিনি বরণ করেছেন। বক্তব্যটি হাঁ-বোধক। কিন্তু এটি প্রকাশ পেল বিশেষ কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত না-প্রশ্নবাক্য থেকে। অতএব, অলংকার এখানে কাকু-বক্রোক্তি।

■ (খ) শ্লেষ-বক্রোক্তি :

সংজ্ঞা : যে বক্রোক্তি অলংকারে বক্তার কথায় শ্লেষ বা দুটি অর্থ থাকে এবং শ্রোতা বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অন্য অনভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ করেন, তার নাম শ্লেষ-বক্রোক্তি।

উদাহরণ :

বক্তা—দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন ?
শ্রোতা—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।
বক্তা—বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?
শ্রোতা—সুরে না সেবিলে বল মুক্তি কিসে হয় ?

ব্যাখ্যা : বক্তার প্রথম কথায় 'দ্বিজ' এবং 'বারুণী' শব্দের দুটি করে অর্থ। 'দ্বিজ' শব্দের একটি অর্থ ব্রাহ্মণ এবং 'বারুণী'-র একটি অর্থ মদ। অতএব বক্তার অভিপ্রেত অর্থ—ব্রাহ্মণ হয়ে মদ খাও কেন ? 'দ্বিজ' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ চাঁদ, 'বারুণী'-র অর্থ পশ্চিমদিক। শ্রোতার গৃহীত অর্থটি এইরকম—চাঁদ পশ্চিমদিকে যাচ্ছে কেন ? এই অর্থ ধরেই তার উত্তর—সূর্য উঠছে, তাই চাঁদ ডুবছে। এটি বক্তার অনভিপ্রেত অর্থ। এইভাবে শ্রোতা শ্লেষের সুযোগে বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি গ্রহণ না করে অনভিপ্রেত অন্য অর্থটি গ্রহণ করায় শ্লেষ-বক্রোক্তি হয়েছে।

বক্তার দ্বিতীয় বাক্যেও একইভাবে 'সুরাসক্ত' শব্দটিকে কেন্দ্র করে বক্রোক্তি হয়েছে। 'সুরাসক্ত' থেকে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ 'সুরায় আসক্ত' বা মদখোর (সুরা + আসক্ত), কিন্তু শ্রোতার গৃহীত অর্থ 'সুরে আসক্ত' বা দেবভক্ত (সুর + আসক্ত)। বক্তার এই অনভিপ্রেত অর্থটি ধরেই শ্রোতার উত্তর—দেবসেবা ছাড়া মুক্তি নেই। অতএব, এখানেও শ্লেষ-বক্রোক্তি।

২৭.৪ সারাংশ

বাংলায় 'শব্দ' কথাটির দুটির অর্থ—'ধ্বনি' (sound) 'অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি' (word)। শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, ধ্বনিমাধুর্যই শব্দালংকার। তবে অর্থের চমক কখনো কখনো ধ্বনিমাধুর্যকে সহায়তা করে। যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ মধুর হয়ে উঠলে ধ্বনিমাধুর্য বা শব্দালংকার তৈরি হয়, তা একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, একটি শব্দ (word) বা 'অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি'র উচ্চারণ থেকে আসতে পারে, একটি বাক্যের উচ্চারণ থেকেও আসতে পারে। সুতরাং, শব্দালংকারের 'শব্দ' মূলত ধ্বনিই—বর্ণধ্বনি শব্দধ্বনি বা বাক্যধ্বনি। কবিতার একটি স্তবক বা একটি চরণের উচ্চারণ থেকে তার অন্তর্গত বর্ণ শব্দ (word) বা বাক্যের ধ্বনি যদি প্রয়োগের কৌশলে মধুর শোনায়, তাহলে সেই ধ্বনিমাধুর্যই হবে শব্দালংকার। বাংলা কবিতায় প্রধান শব্দালংকার চারটি—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি।

অনুপ্রাস : একই ব্যঞ্জনধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের একবারের বেশি উচ্চারণ অনুপ্রাস। প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অনুপ্রাস তিন রকমের—বৃত্ত্যনুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, শ্রুত্যনুপ্রাস। একই ব্যঞ্জনধ্বনির একবারের বেশি উচ্চারণে (বিদায় বিষাদশ্রান্ত, চলচপলার চকিত চমকে), একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম না মেনে দুবার উচ্চারণে (কবরী-করবী), একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবারের বেশি উচ্চারণে (কুঞ্জর-গঞ্জি-মঞ্জুল, কল-কিল-কুল) **বৃত্ত্যনুপ্রাস**। একই ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে দুবার উচ্চারণে **ছেকানুপ্রাস** (গন্ধ-অন্ধ, শিষের-শিশির)। শুনতে একই রকম কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে **শ্রুত্যনুপ্রাস** (চিকন-লিখন, ছন্দোবন্ধগ্রন্থ)।

প্রয়োগ-স্থানের দিক থেকেও অনুপ্রাস তিন রকমের—আদ্যানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, সর্বানুপ্রাস। কবিতার চরণের বা পর্বের শুরুতে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে **আদ্যানুপ্রাস** (বড়ো কথা শুনি......./জড়ো করে নিয়ে ....., নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া ....)। ছত্রের, চরণের বা পর্বের শেষে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে **অন্ত্যানুপ্রাস** (তবে/একদিন কবে,...... পুলকে চমকি/দাঁড়াবে থমকি, আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে)। দুটি চরণের প্রতিটি শব্দে স্বরধ্বনিসমেত একই ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে **সর্বানুপ্রাস** (গগনে ছড়ায়ে এলোচুল/চরণে জড়ায়ে বনফুল)।

যমক : একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা একবার অর্থযুক্ত আর অন্যবার অর্থহীন উচ্চারণে যমক অলংকার। প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যমক দু-রকমের—সার্থক যমক, নিরর্থক যমক। একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে উচ্চারণে **সার্থক যমক** ('কীর্তিবাস, কীর্তিবাস কবি .....।' প্রথম 'কীর্তিবাস' = কৃত্তিবাস, দ্বিতীয় 'কীর্তিবাস' = যশস্বী)। একই ধ্বনিগুচ্ছের ক্রম অনুসারে একবার অর্থযুক্ত আর একবার অর্থহীন উচ্চারণে নিরর্থক যমক (যৌবনের বনে.....।' প্রথম 'বনে' অর্থহীন শব্দাংশ, দ্বিতীয় 'বনে' অর্থযুক্ত শব্দ)।

প্রয়োগ স্থানের দিক থেকে যমক চার রকমের—আদ্যযমক, মধ্যযমক, অন্ত্যযমক, সর্বযমক। কবিতার চরণের শুরুতে থাকলে আদ্যযমক (ভারত ভারতখ্যাত.....), মাঝখানে থাকলে মধ্যযমক (পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা), শেষে থাকলে অন্ত্যযমক (মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়), গোটা চরণ জুড়ে থাকলে সর্বযমক (কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে / কান্তারে আমোদ পূর্ণ কান্তসহকারে)।

শ্লেষ : একটি শব্দের একবার উচ্চারণে একের বেশি অর্থ বোঝালে শ্লেষ। শ্লেষ দু-রকমের—অভঙ্গ শ্লেষ, সভঙ্গ শ্লেষ। শব্দ না ভেঙে একের বেশি অর্থ পাওয়া গেলে **অভঙ্গ শ্লেষ** (মধুহীন করো নাগো তব মনঃ কোকনদে। 'মধু' = কবি মধুসূদন দত্ত, মউ।) শব্দ না ভেঙে একটি অর্থ, ভেঙে আর একটি অর্থ পাওয়া গেলে **সভঙ্গ শ্লেষ** (অপরূপ রূপ কেশবে। 'কেশবে' = কৃষ্ণে, 'কে শবে' = 'মৃতদেহের ওপর কে ?')।

বক্রোক্তি : কোনো কথা বাঁকাভাবে বললে অথবা কথার অর্থ বাঁকাভাবে ধরলে বক্রোক্তি। বক্রোক্তি দু-রকমের—কাকু-বক্রোক্তি, শ্লেষ-বক্রোক্তি। 'কাকু' বা কণ্ঠভঙ্গির সাহায্যে 'হাঁ' বোঝাতে 'না' অথবা 'না' বোঝাতে 'হাঁ', বললে কাকু-বক্রোক্তি ('মাতা আমি নহি ?' = আমিও তো মা, 'আমি কি ডরাই ?' = আমি মোটেই ডরাই না)। শ্লেষের (কথার দুটি অর্থের) সুযোগ নিয়ে সুবিধাজনক অর্থটি ধরলে শ্লেষ-বক্রোক্তি ('বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন' = 'বামুন হয়ে মদের নেশা কেন,' 'ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবভক্তি কেন।' সুবিধাজনক দ্বিতীয় অর্থটি ধরে মদখোর ব্রাহ্মণের জবাব—'দেবসেবা ছাড়া কারো মুক্তি নেই')।

২৭.৫ অনুশীলনী

১. শব্দালংকার বলতে কী বোঝায়, সংক্ষেপে লিখুন।

২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—শব্দালংকার ধ্বনিরই অলংকার, অর্থের অলংকার নয়।

৩. প্রধান চারটি শব্দালংকারের নাম এবং তাদের বিভাগগুলির নাম উল্লেখ করুন।

৪. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—ছেকানুপ্রাস, নিরর্থক যমক, অভঙ্গ শ্লেষ, কাকু-বক্রোক্তি।

৫. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) পৃথিবী টাকার বশ !

(খ) ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।

(গ) ধরি তার কর দুটি আদেশ পাইলে উঠি।

(ঘ) লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।

(ঙ) কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি।

৬. সঠিক অলংকার কোনটি, লিখুন—

(ক) কবির বুকের দুখের কাব্য—ছেকানুপ্রাস না বৃত্ত্যানুপ্রাস ?

(খ) আর কি শুধু আসার আশায় থাকি—যমক না ছেকানুপ্রাস ?

(গ) একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু—যমক না ছেকানুপ্রাস ?

একক ২৮ ❒ অর্থালংকার

গঠন

২৮.১ উদ্দেশ্য

২৮.২ প্রস্তাবনা

২৮.৩ মূলপাঠ-১ : অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়

২৮.৪ সারাংশ-১

২৮.৫ অনুশীলনী-১

২৮.৬ মূলপাঠ-২ : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

২৮.৬.১ উপমা

২৮.৬.২ রূপক

২৮.৬.৩ উৎপ্রেক্ষা

২৮.৬.৪ সমাসোক্তি

২৮.৬.৫ অতিশয়োক্তি

২৮.৬.৬ ব্যতিরেক

২৮.৭ সারাংশ-১

২৮.৮ অনুশীলনী-২

২৮.৯ মূলপাঠ-৩ : অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণি

২৮.৯.১ বিরোধমূলক : বিরোধাভাস (বিরোধ)

২৮.৯.২ শৃঙ্খলামূলক : একাবলি

২৮.৯.৩ ন্যায়মূলক : অর্থান্তরন্যাস

২৮.৯.৪ গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক : ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি

২৮.১০ সারাংশ-৩

২৮.১১ অনুশীলনী-৩

২৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন, তাহলে—

- বাংলা কবিতার কোনো স্তবকের অর্থে নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মতো বোধ ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠবে।
- বাংলা কবিতার কোনো স্তবকে বা বাক্যে বা শব্দে অর্থগত সৌন্দর্য তৈরি করার দক্ষতা কবি কতটা দেখাতে পারলেন, তা বিচার করা সম্ভব হবে।
- বাংলা কবিতার স্তবকে বাক্যে শব্দে অর্থগত সৌন্দর্য তৈরি করার নানারকম কৌশল কবিরা কীভাবে প্রয়োগ করে থাকেন, তা অনুসরণ করা ক্রমশ সহজ হবে।

২৮.২ প্রস্তাবনা

একক ৫ থেকে অলংকারের যে দুটি মূলবিভাগের কথা জেনেছিলেন, তার প্রথমটির (শব্দালংকার) পরিচয় পেলেন একক ৬-এ। একক ৭-এ পাবেন দ্বিতীয় বিভাগটির পরিচয়। এ বিভাগটির নাম অর্থালংকার।

এসব অলংকার তৈরি হয় কবিতার মনস্ক পাঠকের বোধে—তাঁর মনে-মস্তিষ্কে। বিভাগটি আয়তনে শব্দালংকারের তুলনায় অকেনটাই বড়ো, অনেক তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখা। সেই কারণে, মূলপাঠকে তিনটি অংশ ভাগ করে নেওয়া হল।

প্রথম অংশে অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়, দ্বিতীয় অংশে সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার আর তার অন্তর্গত কয়েকটি শ্রেণির পরিচয়, তৃতীয় অংশে অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণির পরিচয় সংক্ষেপে সাজিয়ে দেওয়া হল। বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো দৃষ্টান্ত চয়ন করে প্রাসঙ্গিক অলংকারের ব্যাখ্যা করা হল।

২৮.৩ মূলপাঠ-১ : অর্থালংকারের সাধারণ পরিচয়

স্তবক বা তার অন্তর্গত চরণ বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তাহলে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। 'অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে' বলতে এই বোঝাতে চাই, বাক্য বা শব্দের অর্থ অক্ষত রেখে শব্দ বদল করে দিলেও অলংকার যা ছিল, তাই থাকবে। কিন্তু শব্দ বদলের সঙ্গো সঙ্গো অর্থটিও যদি বদলে যায়, তাহলে অলংকারটি আর টিকবে না। একটি উদাহরণ থেকে অর্থালংকারের এই স্বভাবটা বুঝে নেওয়া যাক :

'কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে
গগনের নীলগাঙে।'

'মেঘের মউজ'-এর অর্থ 'মেঘের ঢেউ', 'গগনের নীলগাঙ'-এর অর্থ 'আকাশের নীলরঙা নদী।' এই অর্থের ওপর নির্ভর করেই দুটি শব্দগুচ্ছ মিলেমিশে একটি দৃশ্য রচনা করেছে নীল আকাশের বুকে। সে-দৃশ্য মেঘের খেলার পাশাপাশি ঢেউ-তোলা নদীর। যে নদীর দৃশ্য মাটির ওপরে দেখতেই দ্রষ্টা অভ্যস্ত, কবি কল্পনার জোরে তাঁর মনের দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেন নীল আকাশের মেঘের খেলার দিকে, সেই আকাশের বুকে পাশাপাশি দেখিয়ে দিলেন ঢেউ-তোলা নদীর দৃশ্যটি। কল্পানার চোখে দেখা এই দৃশ্যের সৌন্দর্যই অলংকার, এ অলংকারটি তৈরি দল অর্থের ওপর নির্ভর করেই। অতএব, এটি অর্থালংকার। অলংকারটি যে কেবল অর্থের ওপরই নির্ভর করছে, শব্দের ওপর নয়—তা বোঝা যাবে, যদি দেখি, বাক্যটির অর্থ ঠিকঠাক রেখে দুটো-একটা শব্দ বদলে দিলেও অলংকারটি বেঁচে গেল।

প্রথমে দেখা যাক 'মউজ' আর 'গগন' শব্দদুটির বদলে একই অর্থের 'ঢেউ' আর 'আকাশ' বসিয়ে। তাহলে কথাটি দাঁড়াবে এই :

'কোদালে মেঘের ঢেউ উঠেছে
আকাশের নীলগাঙে।'

দেখা যাচ্ছে, মেঘের খেলা থামে নি, 'গগন' 'আকাশ' হয়েও তার বুকে নীলরঙা নদীটি বইয়ে দিয়েছে আগের মতোই, 'মউজ'-এর সৌন্দর্য 'ঢেউ' উঠেছে বলে এতটুকু কমে নি। অর্থাৎ, 'মউজ-গগনে'র তৈরি অর্থসৌন্দর্য 'ঢেউ-আকাশে'ও অব্যাহত। এই অর্থসৌন্দর্যই তো অর্থালংকার। শব্দ বদলালেও অর্থ বদলায়নি, অলংকারও সরে যায়নি।

একটু দেখে নিই শব্দবদলের অন্য পরিণাম। শব্দবদলের আগে 'মেঘের মউজ' আর 'গগনের গাঙ' শব্দগুচ্ছ-দুটির মধ্যে অর্থালংকারের একটুখানি আড়াল থেকে উঁকি মারছিল একটি শব্দালংকার। 'মেঘের মউজ'-এ ম-ধ্বনির দুবার এবং 'গগনের গাঙ'-এ গ-ধ্বনির তিনবার উচ্চারণে ধ্বনিমাধুর্যের আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি শব্দালংকার। কিন্তু, শব্দবদলের পরে 'মেঘের মউজ' যখন 'মেঘের ঢেউ' হল, তখন ম-ধ্বনিটি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। তেমনি, 'গগনের গাঙ'-এর বদলে 'আকাশের গাঙ' আসার ফলে গ-ধ্বনির গাঙটিও শুকিয়ে গেল। অর্থাৎ, একই সঙ্গে ম-ধ্বনি আর গ-ধ্বনির শব্দালংকারটি হারিয়ে গেল। শব্দবদলের সঙ্গে সঙ্গে শব্দালংকারের এই অপমৃত্যু জানিয়ে দিল, শব্দবদল এ অলংকারের পক্ষে অসহ্য। অথচ, অর্থালংকার একটু আগেই তা সহ্য করেছে।

অর্থালংকার শব্দবদল সহ্য করে ততক্ষণ, যতক্ষণ বদলে-যাওয়া শব্দের অর্থটুকু অক্ষত থাকে। এটাই দেখা গেল 'মউজ' থেকে 'ঢেউ' আর 'গগন' থেকে 'আকাশ'-এর বদলে। এবারে 'মউজ উঠেছে'-র 'টুকরো ছড়ানো' আর 'গাঙে'-র বদলে 'রঙে' বসিয়ে দেখা যাক, সঙ্গে সঙ্গে অর্থবদল ঘটলে তার পরিণাম কী ঘটে :

'কোদালে মেঘের টুকরো ছড়ানো
গগনের নীলরঙে।'

দেখতে পাচ্ছি, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ছড়ানো থাকলেও তার খেলা নেই, অর্থবদলের আগে ঢেউ-তোলা নদীর যে দৃশ্য আকাশে রচনা করেছিল অর্থালংকার, 'মউজ' আর 'গাঙ' তাদের অর্থ নিয়ে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা অদৃশ্য। আকাশের গায়ে পড়ে রইল এদিক-ওদিকে ছড়ানো কয়েক টুকরো মেঘ—তার রং নেই, কোনো আকর্ষণ নেই, তার গায়ে কোনো অলংকারই নেই—না শব্দালংকার, না অর্থালংকার। শব্দবদলে শব্দালংকারের লোপ, অর্থবদলে অর্থালংকারের লোপ। অর্থাৎ, শব্দ না টিকলে শব্দালংকার বাঁচে না, অর্থালংকার বাঁচতে পারে। কিন্তু, শব্দের সঙ্গে অর্থও সরে গেলে শব্দালংকারের সঙ্গে অর্থালংকারের সহমরণ ঘটে।

অতএব, শব্দালংকার আর অর্থালংকারের পার্থক্য মূল তিনটি :

১. শব্দালংকার ধ্বনির অলংকার, অর্থালংকার অর্থের অলংকার—প্রথমটি ধ্বনির মাধুর্য, দ্বিতীয়টি অর্থের সৌন্দর্য।

২. শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে, অর্থালংকারের আবেদন বোধের কাছে।

৩. শব্দালংকার শব্দের বদল সহ্য করে না, শব্দবদলে এর অপমৃত্যু। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে ; শব্দ-অর্থ দুই-ই বদলে গেলে অর্থালংকারেরও অপমৃত্যু।

সংস্কৃত কাব্যে যেসব অর্থালংকারে সন্ধান পাওয়া গেছে, তার সংখা অনেক। বাংলা কবিতায় এর প্রয়োগ তুলনায় অনেকটা সীমিত। যে কটি লক্ষণ অলংকারগুলিকে শ্রেণিবন্ধ করছে, সেগুলি এইরকম—সাদৃশ্য, বিরোধ, শৃঙ্খলা, ন্যায় আর গূঢ়ার্থপ্রতীতি। নামগুলি সংস্কৃত আলংকারিকেদের দেওয়া।

২৮.৪ সারাংশ

কবিতার স্তবক বাক্য বা শব্দের অলংকার যদি একান্তই অর্থের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তবে সে অলংকার হবে অর্থালংকার। অর্থালংকার অর্থের অলংকার—অর্থের সৌন্দর্য। অর্থালংকার শব্দের বদল সহ্য করে, যদি অর্থ অক্ষত থাকে। অর্থ বদলে গেলে অর্থালংকার বাঁচে না। অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণি—সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক, গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক।

২৮.৫ অনুশীলনী-১

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ৬১-এর উত্তর সংকেতের সঙ্গো মিলিয়ে দেখুন।)

১. অর্থালংকার বলতে কী বোঝায় ? সংক্ষেপে লিখুন।

২. একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিন—অর্থালংকার অর্থেরই অলংকার, শব্দের (ধ্বনির) অলংকার নয়।

৩. শব্দালংকার আর অর্থালংকারের মূল পার্থক্য কী কী লিখুন।

৪. অর্থালংকারের শ্রেণিগুলির নাম লিখুন।

২৮.৬ মূলপাঠ-২ : সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

দুটি বস্তুর সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা একটিকে আর একটির সঙ্গো তুলনা করে থাকি। বলি, সতীর চোখদুটি শীলার চোখের মতো 'উজ্জ্বল' অথবা দার্জিলিঙের পাহাড় সিমলার মতো 'সুন্দর নয়' ইত্যাদি। এসব কথায় কোনো সৌন্দর্য নেই, অলংকার নেই। কিন্তু যদি বলি, 'ছেলেটা ব্যাঙের মতো লাফায়', 'বাচ্চাটি ফুলের চেয়েও সুন্দর', তা হলে মনে মনে লাফিয়ে চলা ছেলেটার পাশে একটা ব্যাং-কেও লাফাতে দেখব, বাচ্চাটির মুখ তখন ফুল হয়ে ফুটে উঠবে। অর্থাৎ ছেলেটার চলন আর বাচ্চাটির চেহারা এক-একটা ছবি হয়ে উঠবে আমাদের মনের চোখে। এখানেই সৌন্দর্য, এখানেই অলংকার। সাদৃশ্য এর লক্ষণ। সতীর চোখ, দার্জিলিঙের পাহাড় ছবি হয়ে ওঠেনি, তার কারণ, একজনের চোখের তুলনা হল আর-একজনের চোখেরক সঙ্গো, ঐ পাহাড়টাকে তুলনা করা হল আর একটা পাহাড়ের সঙ্গো—অর্থাৎ, সদৃশ দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা। এমন তুলনায় সৌন্দর্য নেই, অলংকারও নেই। অন্যদিকে, ছেলেটা ব্যাং বাচ্চাটি ফুল—এরা বিসদৃশ বলেই এদের তুলনায় সৌন্দর্য বা অলংকার হয়। এমনটা কেন হয় ? দার্জিলিং-সিমলা সুন্দর হয়েও অলংকার পেল না, ছেলেটা ব্যাঙের মতো কুৎসিত লাফিয়েও অলংকার পেল কোন জাদুতে ? এর কারণ, দার্জিলিং-সিমলার মতো সদৃশ বস্তুর তুলনায় কল্পনার প্রয়োজন নেই, যে দেখেছে সেই তুলনা করতে পারে তার অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়ে। কিন্তু ছেলেটা-

ব্যাংটার মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা একটা আবিষ্কারের মতো দুরূহ কাজ। এ কাজে কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সেই কল্পপনার জোরেই কেউ আকাশের চাঁদে ধান-কাটা কাস্তের সাদৃশ্য খুঁজে পান, কেউ পূর্ণিমার চাঁদে ঝলসানো রুটি দেখতে পান। এঁরা নিতান্ত বিসদৃশ দুটি বস্তুর মধ্য থেকে এমন-এমন সূক্ষ্ম সাদৃশ্য বের করে আনেন, সেই সাদৃশ্য দিয়ে এমন-এমন কথার ছবি নির্মাণ করেন, যা পাঠকের মনকে সৌন্দর্যে বিস্ময়ে ভরে দেয়। তখনই গড়ে উঠে সাদৃশ্যমূলক অলংকার। কালিদাসের, রবীন্দ্রনাথের, মধুসূদনের কাব্য-কবিতা এই গুণেই এতো মহৎ—এক-একটি কাব্য যেন এক-একটি চিত্রশালা।

অতএব, অলংকার-নির্মাণের জন্য যে-সাদৃশ্য কবিরা খোঁজেন, তার মূল শর্তই হল দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের সন্ধান। বস্তুদুটি বাইরে থেকে যত বেশি বিসদৃশ বা বিজাতীয় হবে, সাদৃশ্য তত বেশি সূক্ষ্ম হবে, অলংকার তত আকর্ষণীয় হবে। এই সাদৃশ্য কবিরা প্রধানত তিনটি উপায়ে দেখিয়ে থাকেন :

১. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়েও তাদের জন্য সমান মূল্য বরাদ্দ।

২. বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে তাদের মধ্যে অভেদ কল্পনা।

৩. বস্তুদুটির পার্থক্য বা ভেদকে প্রাধান্য দেওয়া।

তিনটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যাক :

১. ননীর মত শয্যা কোমল পাতা।

২. আসল কথাটা চাপা দিতে, ভাই, কাব্যের জাল বুনি।

৩. এলো ওরা / নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে।

প্রথম উদাহরণে 'ননী' আর 'শয্যা' এই দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য। 'মত' শব্দটির প্রয়োগ বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'ননী' আর 'শয্যা' পৃথক দুটি বস্তু, এদের পার্থক্য আকারে আয়তনে জাতিতে। একই বস্তু হলে 'মত' শব্দ দিয়ে ব্যবধান তৈরি করতে হত না। অতএব, পার্থক্য পুরোপুরি মানা হল। এই 'মত' শব্দটিই আবার জানিয়ে দিচ্ছে—ননী কোমল, শয্যা ও কোমল। 'কোমলতা' গুণটি দুটি বস্তুতেই সমান, তাই বস্তুদুটির মূল্যও গুণের দিক থেকে সমান। অতএব, সমান মূল্যও বরাদ্দ হল 'ননী' আর 'শয্যা'র জন্য।

দ্বিতীয় উদাহরণে 'কাব্য' আর 'জাল'-এর মধ্যে সাদৃশ্য। বস্তুদুটি অবশ্যই বিসদৃশ, পুরোপুরি পৃথক। 'কাব্য' কবির লেখা, হয়তো মুদ্রিত একখানি বই—পড়ে আছে পড়ার টেবিলে। 'জাল' সুতো দিয়ে বোনা, হয়তো ছড়ানো আছে নদী-পুকুরের বুকে, মাছের প্রতীক্ষায়। কিন্তু এই পার্থক্যটা পুরোপুরি আড়ালে রেখে কবি 'কাব্য' আর 'জান'-কে এক করে দিলেন। কাব্য আর কাব্য রইল না, জাল হয়ে গেল। কলম ছেড়ে দিয়ে কবি সুতো তুলে নিলেন হাতে, বুনতে থাকলেন,জাল-কাব্যের জাল। এইভাবে তৈরি হল 'কাব্য' আর 'জালে'র অভেদ—কল্পনা।

তৃতীয় উদাহণে 'ওরা' মানে ইংরেজ, 'তোমার নেকড়ে' মানে আফ্রিকার নেকড়ে। ইংরেজদের নখ তীক্ষ্ণ, নেকড়ের নখও তীক্ষ্ণ। কিন্তু তীক্ষ্ণতা দুদিকে সমান নয়। ইংরেজের নখ বেশি তীক্ষ্ণ—এই কথাটিই বুঝিয়ে দিচ্ছে ইংরেজের সঙ্গে নেকড়ের পার্থক্য বা ভেদ। এই ভেদের ওপরই জোর দেওয়া হল 'চেয়ে' শব্দটি প্রয়োগ করে।

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের চারটি অঙ্গ বা অবয়ব :

১. যা তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু।

২. যার সঙ্গে তুলনা।

৩. যে-ধর্ম দুটি বস্তুতেই থাকে এবং বস্তুদুটিকে তুলনীয় করে।

৪. যে ভঙ্গিতে তুলনা করা হয়।

প্রথমটি উপমেয়, দ্বিতীয়টি উপমান, তৃতীয়টি সাধারণ ধর্ম, চতুর্থটি ভঙ্গি।

উদাহরণ ব্যাখ্যা করে অঙ্গ-চারটি বোঝার চেষ্টা করা যাক :

'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল!' —রবীন্দ্রনাথ

'রক্ত' আর 'জবাফুল'—এই দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য সন্ধান করে অলংকার তৈরি হয়েছে উদ্ধৃত উদাহরণে। অতএব, এটি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার। বাক্যটিতে তুলনার বিষয় বা বর্ণনীয় বস্তু 'জবাফুল।' 'এও' নির্দেশক সর্বনাম নির্দেশ করছে দুটি জবাফুল-কেই। কবির বক্তব্য জবাফুল নিয়েই, জবাফুল দুটি যে টুকটুকে লাল, এটাই কবি বলতে চান। অতএব, 'জবাফুল' প্রথম অঙ্গ—উপমেয়। জবাফুলের তুলনা হয়েছে রক্তের সঙ্গে। রক্ত যে কত লাল, তা সবার জানা আছে। সেই কারণেই রক্তের সঙ্গে তুলনা। অতএব, 'রক্ত' দ্বিতীয় অঙ্গ—উপমান।

রক্ত রাঙা, জবাফুলও রাঙা। রাঙা হওয়ার ধর্ম রক্তেও আছে জবাফুলেও আছে এবং এই ধর্মই জবাফুলকে তুলনীয় করেছে রক্তের সঙ্গে। অতএব, 'রাঙা' বিশেষণটিতে আছে এ শ্রেণির অলংকারের তৃতীয় অঙ্গ—সাধারণ ধর্ম।

'মতো' অব্যয়টি উপমান 'রক্ত'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে উপমেয় 'জবাফুল' আর উপমান 'রক্ত'কে বেঁধে রেখেছে একটি বাক্যে। এই বাঁধন-প্রক্রিয়াতেই ভিন্ন গোত্রের দুটি শব্দ জবাফুল-রক্ত একই বাক্যের মধ্যে ধরা দিল, 'মতো'-র ইঙ্গিতে বিসদৃশ বস্তুদুটি সদৃশ হিসেবে চিহ্নিত হল। অতএব, সাদৃশ্যবাচক 'মতো' অব্যয়ের সংযোজন ক্রিয়াটিই এ শ্রেণির অলংকারের চতুর্থ অঙ্গ-ভঙ্গি, সাদৃশ্য-প্রকাশের বিশেষ পদ্ধতি।

অর্থালংকারের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যমূলকে। ওই বৈচিত্র্য নির্ভর করে মূলত ভঙ্গির ওপর। কীভাবে ভঙ্গির ওপর অলংকারটি টিকে থাকছে, দেখা যাক। আগের পাতায় উদ্ধৃত উদাহরণটিতে যে অলংকার হয়েছে, তার নাম 'উপমা' (একে একে অলংকারগুলির আলোচনা এর পরেই হবে)। এর অন্তর্গত উপমেয়-উপমান-সাধারণ ধর্ম—এই তিনটি অঙ্গের পরিবর্তনেও 'উপমা' উপমাই থাকবে :

মূল উদাহরণ—'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল!'

পরিবর্তিত উদাহরণ—'এও যে দুধের তো সাদা, দুটি কাশফুল!'

এ দুটি উদাহরণের অলংকার যে একই, তা আন্দাজ করা যায়। এবারে ভঙ্গির পরিবর্তন করে দেখা যাক কী ঘটে :

	ভঙ্গি	ভঙ্গির চিহ্ন	উদাহরণ	অলংকার
১.	উপমানের সঙ্গে সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ।	'মতো'	'এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি জবাফুল!'	উপমা
২.	অভেদ-আরোপে উপমেয়-উপমান পাশাপাশি	'জবাফুলের রক্তলেখা'	'জবাফুলের রক্তলেখায় রাঙা চরণদুটি!'	রূপক
৩.	উপমানের সঙ্গে সংশয়বাচক শব্দের প্রয়োগ	'যেন'	'এও দুটি জবাফুল, যেন দুটি রাঙা রক্তাধার।'	উৎপ্রেক্ষা
৪.	উপমানের অনুল্লেখে একমাত্র উপমেয়	'জবা ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা,	'জবা ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা দেবীর চরণতলে।'	সমাসোক্তি
৫.	উপমেয়ের অনুল্লেখে একমাত্র উপমান	—'রক্ত'	'রাঙা রক্তের অঞ্জলিতে মায়ের পূজা হবে!'	অতিশয়োক্তি
৬.	সাদৃশ্যবাচক শব্দ + না-বোধক শব্দ = ভেদের প্রয়োগ	'মতো নয়'	'রক্ত এত রাঙা নয়, জবাফুলের মতো'	ব্যতিরেক

ওপরের আটটি উদাহরণ মূলত একই বাক্যের আটটি পরিবর্তিত রূপ। এ পরিবর্তন কেবল ভঙ্গির। উপমেয় (জবাফুল), উপমান (রক্ত), সাধারণ ধর্মের (রাঙা) কোনো পরিবর্তন নেই। আটটি ভঙ্গি থেকে পৃথক আটটি অলংকারের জন্ম, প্রতিটি অলংকারই সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের এক-একটি রূপ।

২৮.৬.১ উপমা

সংজ্ঞা : একই বাক্যে বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উপমা অলংকার।

(বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখালেই উপমা)

বৈশিষ্ট্য :

১। একটিমাত্র বাক্য থাকবে।

২। দুটি বিজাতীয় বা বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে তুলনা হবে (উপমেয়-উপমান)।

৩। বস্তুদুটির বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্যের উল্লেখ থাকবে না।

৪। বস্তুদুটির মধ্যে সাদৃশ্য বা মিলটুকু দেখানো হবে (সাধারণ ধর্ম)।

৫। সাদৃশ্য দেখানো হবে সাধারণত বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে (সাদৃশ্যবাচক শব্দ)। উপমা অলংকারে ব্যবহার্য সাদৃশ্যবাচক শব্দের তালিকাটি এইরকম : মত, মতন, ন্যায়, রূপে, নিভ, পারা, প্রায়, তুলা, সম, তুল্য, হেন যেমতি, কল্প, সদৃশ, বৎ, যথা, যেন, রীতি ইত্যাদি।

অতএব, উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

৬। উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো—বিজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য-প্রতিষ্ঠার এটি প্রথম স্তর।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

● বাংলায় উপমার উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছ-টি—

(ক) পূর্ণোপমা ; (খ) লুপ্তোপমা ;

(গ) মালোপমা ; (ঘ) স্মরণোপমা ;

(ঙ) বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা ; (চ) বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা।

সংজ্ঞা-উদাহরণ ব্যাখ্যা

■ **(ক) পূর্ণোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারের উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকে, তার নাম পূর্ণোপমা (পূর্ণা + উপমা)।

উদাহরণ :

(i) আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় ‘ছুরি’, ‘উপমান ‘প্রভাতরশ্মি’, সাধারণ ধর্ম ‘তীক্ষ্ণদীপ্ত’, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ‘সম’।

(ii) সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারার- যথা ! —মধুসূদন

সংকেত : উপমেয় ‘সিন্দূরবিন্দু’, উপমান ‘তারার-’, সাধারণ ধর্ম ‘শোভাসৃষ্টি’, (‘শোভিল’—ক্রিয়াগত), সাদৃশ্যবাচক শব্দ ‘যথা’।

■ **(খ) লুপ্তোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয়ের উল্লেখ থাকেই, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গের (উপমান-সাধারণ ধর্ম-সাদৃশ্যবাচক শব্দ) যেকোনো একটি দুটি বা তিনটিই লুপ্ত থাকে (অর্থাৎ, এদের উল্লেখ থাকে না), তার নাম লুপ্তোপমা (লুপ্তা + উপমা)।

উদাহরণ :

১. সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে —সঞ্জীবচন্দ্র

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যে ‘বন্যেরা’ উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তুলনা করা হচ্ছে), ‘শিশুরা’ উপমান (অন্য বস্তু যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), সাধারণ ধর্ম ‘সৌন্দর্য’ (‘সুন্দর’ হওয়ার গুণটি উপমেয়-উপমান দু-পক্ষেই আছে), কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত। উদ্ধৃত পঙক্তিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে ‘বন্যেরা’ এবং ‘শিশুরা’ এই দুইটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে, কোনো বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ না করে।

অতএব, এটি উপমা অলংকার। অলংকারটিতে উপমেয় ছাড়া উপমান, সাধারণ ধর্মেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু একটি অঙ্গ সাদৃশ্যবাচক শব্দের উল্লেখ নেই বলে এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

২. সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
নাটোরের বনলতা সেন। —জীবনানন্দ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে 'চোখ' উপমেয় (বর্ণনীয় বস্তু, যাকে তলুনা করা হচ্ছে), 'পাখির নীড়' উপমান (অন্য বস্তু, যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে), 'মতো' সাদৃশ্যবাচক শব্দ, কিন্তু সাধারণ ধর্ম (প্রশান্তি) লুপ্ত। উদ্ধৃত চরণটিতে একটিই বাক্য। ওই একই বাক্যে 'চোখ' আর 'পাখির নীড়' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, অলংকার এখানে উপমা। অলংকারটিতে উপমেয় আছে, কিন্তু অন্য তিনুট অঙ্গের অন্যতম সাধারণ ধর্ম লুপ্ত বলে এটি 'লুপ্তোপমা'।

৩. সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত—

চকি কলাপাতা সন্ধ্যা। —জগন্নাথ চক্রবর্তী

ব্যাখ্যা : তিন শব্দের এই বাক্যে 'সন্ধ্যা' উপমেয়, 'কচি কলাপাতা' উপমান, সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম লুপ্ত। বাক্যটিতে 'সন্ধ্যা' আর 'কচি কলাপাতা' এই দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়েছে। অতএব, নিঃসন্দেহে এটি উপমা অলংকার। কিন্তু উপমেয়ের উল্লেখ থাকলেও অন্য তিনটি অঙ্গের একমাত্র উপমান ছাড়া আর দুটি অঙ্গাই (সাদৃশ্যবাচক শব্দ ও সাধারণ ধর্ম) লুপ্ত। সুতরাং, এখানে লুপ্তোপমা হয়েছে।

৪. উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ —রবীন্দ্রনাথ

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যের শেষ শব্দ 'হরিণ-চোখ'-এ সাদৃশ্যের সঞ্চার হয়েছে। 'হরিণ-চোখ' আসলে হরিণের চোখ নয়, ওটা কালো মেয়েরই চোখ। সাদৃশ্যের টানেও হরিণ আসেনি, এসেছে হরিণের চোখ-ই। কেননা, কবির দৃষ্টিপাত কালো মেয়ের চোখের প্রতি নিবদ্ধ। অর্থাৎ, এখানে বর্ণনীয় বস্তু বা উপমেয় কালো মেয়ের 'চোখ' যা কবি দেখেছিলেন, আর উপমান হরিণের 'চোখ' যা কবি কল্পনা করেছিলেন। 'হরিণ-চোখ'-এর অর্থ যদি 'হরিণের চোখ' হত, তাহলে ওই 'হরিণ-চোখ'-ই হত উপমান। কিন্তু, প্রয়োগ-কৌশলে 'হরিণ-চোখ'-এর অর্থ দাঁড়িয়েছে 'হরিণের চোখের মত চোখ'। 'হরিণ-চোখ'-এ সমাসবদ্ধ হয়ে তা উপমান 'চোখ' আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মত' দুটিকেই হারিয়েছে, রক্ষা করেছে কেবল কালোমেয়ের 'চোখ', যা হরিণের চোখের মতোই কালো, অতএব উপমেয়। সুতরাং, বাক্যটিতে দুটি বিজাতীয় বস্তু 'কালো মেয়ের চোখ' ও 'হরিণের চোখ'-এর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে, তৈরি হয়েছে উপমা অলংকার। আর, উপমান ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত রয়েছে বলে এটি নিঃসন্দেহে লুপ্তোপমা।

মন্তব্য : 'মেয়ে' আর 'হরিণ' বিজাতীয়, অতএব তাদের চোখও বিজাতীয়।

৫. উপমান সাধারণ ধর্মও সাদৃশ্যবাচক শব্দ লুপ্ত—

নীরবিলা বীণাবাণী —মধুসূদন

ব্যাখ্যা : 'মেঘনাদবধকাব্য' থেকে উদ্ধৃত উদাহরণটিতে উপমেয় প্রমীলা—'বীণাবাণী'-বিশেষণের রূপে। কিন্তু, উপমান সাধারণ ধর্ম সাদৃশ্যবাচক শব্দে এখানে লুপ্ত। বীণার বাণীর মতো বাণী যার, সেই প্রমীলা উপমেয় হলেও 'বীণা' তার উপমান নয়, 'বাণী'র সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে তা প্রমীলার বিশেষণ হয়ে আছে। তবে 'বাণী'র ধারক হিসেবে 'বীণা'র সঙ্গে প্রমীলা সাদৃশ্যসূত্রে বাঁধা পড়েছে। সুতরাং, বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখানো ফলে এখানে উপমা অলংকার হয়েছে এবং উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গই লুপ্ত থাকার কারণে এটি লুপ্তোপমা।

■ **(গ) মালোপমা :**

সংজ্ঞা : যে উপমা অলংকারে উপমেয় একটি এবং উপমান একের বেশি, তার নাম মালোপমা (মালা + উপমা)।

উদাহরণ :

(i) তোমার সে-চুল
জড়ানো সূতার মতো, নিশীথের মেঘের মতন। —বুদ্ধদেব বসু

সংকেত : উপমেয় 'চুল', উপমান 'সূতা' আর 'মেঘ'।

(ii) উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'সঞ্চয়', উপমান 'ধূলি' আর 'তৃণ'।

২৮.৬.২ রূপক

সংজ্ঞা : বিষয়ের অপহ্নব না ঘটিয়ে (উপমেয়কে লুপ্ত না করে) তার ওপর বিষয়ীর (উপমানের) অভেদ আরোপ করলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম রূপক অলংকার।

(উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। বাক্যে উপমেয় এবং উপমানের উল্লেখ থাকবে, সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকবে না।

২। উপমেয় এক হয়ে যাবে উপমানের সঙ্গে। এরই নাম অভেদ। সাদৃশ্যের প্রথম স্তর উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো (উপমা), দ্বিতীয় স্তরভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো (ব্যতিরেকে), তৃতীয় স্তর অভেদ (রূপক)।

৩। বাক্যে উপমানই প্রধান, ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বাক্যাংশ উপমানকেই অনুসরণ করবে। উপমেয় লুপ্ত নয়, তবে গৌণ।

৪। জীবন অঙ্গী, শৈশব-যৌবন বার্ধক্য তার অঙ্গ ; আকাশ অঙ্গী, মেঘ-তারা-নীলরং তার অঙ্গ ; নদী অঙ্গী—ধারা-ঢেউ-ফেনা-তীর তার অঙ্গ। অঙ্গী উপমেয়ের অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গী উপমানের অঙ্গের অভেদ হতে পারে।

বিভাগ বা প্রকরণ বা প্রকারভেদ

- বাংলায় রূপকের উল্লেখযোগ্য বিভাগ তিনটি—

  (ক) নিরঙ্গরূপক ; (খ) সাঙ্গরূপক ; (গ) পরম্পরিত রূপক।

- নিরঙ্গরূপক দু-রকমের—

  (ক) কেবল নিরঙ্গরূপক ; (খ) মালা নিরঙ্গরূপক।

সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■**(ক) নিরঙ্গরূপক :**

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে কোনো অঙ্গের অভেদ কল্পনা না করে কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম নিরঙ্গরূপক। একটি উপমানের অভেদ আরোপ হলে কেবল নিরঙ্গরূপক, আর একাধিক উপমানের অভেদ আরোপ হলে মালা নিরঙ্গরূপক (মালারূপক)।

উদাহরণ :

১. কেবল নিরঙ্গরূপক (একটি উপমেয়, একটি উপমান)—

(i) শিশুফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে। —যতীন্দ্রমোহন

সংকেত : উপমেয় 'শিশু', উপমান 'ফুলগুলি'। ক্রিয়াপদ 'ফুটে' ফুলগুলি'র অনুসারী। 'শিশু'র ওপর কেবল 'ফুলগুলি'র অভেদ আরোপ।

(ii) যৌবনেরি মৌবনে সে মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি। —মোহিতলাল

সংকেত : উপমেয় 'যৌবন', উপমান কেবল 'মৌবন'। 'মাড়িয়ে চলে ফুলগুলি'—এই বাক্যাংশ উপমান 'মৌবন'-এর অনুসারী।

মন্তব্য : এখানে 'যৌবনেরি মৌবনে' অংশে 'বনে' ধ্বনিগুচ্ছের একবার শব্দরূপে সার্থক উচ্চারণ (মৌ-'বনে') এবং অন্যবার শব্দাংশরূপে নিরর্থক উচ্চারণ (যৌ-'বনে'-রি) হচ্ছে বলে নিরর্থক যমক অলংকারও হয়েছে। লক্ষণীয়, 'মৌবনে' শব্দটি 'মৌ' এবং 'বনে'—এ দুটি স্বতন্ত্র শব্দের সমাসে তৈরি বলে 'বনে' শব্দের মর্যাদা পাবে।

২. মালা নিরঙ্গরূপক (মালারূপক একটি উপমেয়, একের বেশি উপমান)—

(i) অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে—
চারিদিকে চিরযামিনী। —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'তুমি একা', উপমান 'একটি স্বপ্ন', 'একটি পদ্ম', 'একটি চন্দ্র'। একটি উপমেয়ের ওপর তিনটি উপমানের অভেদ আরোপ।

(ii) আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপ্ন, করলগ্ন কাঁটা ? —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : উপমেয় 'আমি', উপমান 'উপদ্রব', 'অভিশাপ', 'দুরদৃষ্ট', 'দুঃস্বপন', 'কাঁটা'। একটি উপমেয়ের ওপর পাঁচটি উপমানের অভেদ আরোপ।

■(খ) সাঙ্গারূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে বিভিন্ন অঙ্গাসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর বিভিন্ন অঙ্গাসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তার নাম সাঙ্গারূপক।

(অর্থাৎ, উপমেয়-উপমান অঙ্গাসমেত এক হয়ে গেলে সাঙ্গারূপক।)

উদাহরণ :

(i) শঙ্খধবল আকাশগাঙে
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?

—যতীন্দ্রমোহন

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকে একদিকে উপমেয় 'আকাশ' অঙ্গী, অন্যদিকে উপমান 'গাঙ' অঙ্গী। অঙ্গী 'আকাশ'-এর অঙ্গা 'মেঘ' 'জ্যোৎস্না' 'ধরা'—কেননা, মেঘ-জ্যোৎস্নার আধার আকাশ, আকাশ থেকে যাত্রা শুরু, ধরায় যাত্রাসমাপন। অন্যদিকে অঙ্গী 'গাঙে'র অঙ্গা 'পাল' 'তরী' 'ঘাট'—পালসহ তরী গাঙেই ভাসে, ঘাট গাঙেরই সংলগ্ন হয়ে থাকে। উদ্ধৃত বাক্যে 'পালটি মেলে' বাক্যাংশ উপমান 'গাঙ'র সঙ্গো এক হয়ে যাওয়ার অর্থাৎ 'আকাশ'-এর ওপর 'গাঙ'-এর অভেদ আরোপে এখানে রূপক অলংকার হয়েছে। সেইসঙ্গো উপমেয় 'আকাশ'-এর অঙ্গা 'মেঘ', 'জ্যোৎস্না' আর 'ধরা'র ওপর উপমান 'গাঙ'-এর অঙ্গা যথাক্রমে 'পাল', 'তরী' আর 'ঘাট'-এর অভেদ-ও আরোপ করা হয়েছে (অর্থাৎ মেঘ-পাল, জ্যোৎস্না-তরী আর ধরা-ঘাট এক হয়ে গেছে।) অঙ্গাসমেত অঙ্গী উপমেয়ের ওপর অঙ্গাসমেত অঙ্গী উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়েছে বলে।

(ii) সৌন্দর্য-পাথারে
যে বেদনা-বায়ুভরে ছুটে মন-তরী
সে বাতাসে, কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল ; —রবীন্দ্রনাথ

সংকেত : অঙ্গী উপমেয় 'সৌন্দর্য', তার অঙ্গা 'বেদনা', 'মন', 'হৃদয়'। অঙ্গী উপমান 'পাথার' তার অঙ্গা 'বায়ু', তরী', 'পাল'।

■(খ) পরম্পরিত রূপক :

সংজ্ঞা : যে রূপক অলংকারে একটি উপমেয়ের ওপর ওকটি উপমানের অভেদ-আরোপের কারণে অন্য একটি উপমেয়ের ওপর অন্য একটি উপমানের অভেদ-আরোপের জন্ম হয়, তার নাম পরম্পরিত রূপক।

(একটি নিরঙ্গারূপক থেকে আর একটি নিরঙ্গারূপকের জন্ম—এইভাবে রূপকের পরম্পরা বা ধারা তৈরি হতে থাকে বলে এর নাম পরম্পরিত রূপক।)

উদাহরণ :

(i) মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধারপর্ণপুটে। —রবীন্দ্রনাথ

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় 'আলো'র ওপর প্রথম উপমান 'কমলকলিকা'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'আঁধারে'র ওপর দ্বিতীয় উপমান 'পর্ণপুট'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। সেইকারণে এখানে পরম্পরিত রূপক অলংকার হয়েছে।

মন্তব্য : 'আলো-আঁধার' আর 'কমলকলিকা-পর্ণপুট'-এ অঙ্গী-অঙ্গ সম্পর্ক থাকলেও কার্যকারণ-পরম্পরার ভাব প্রবল হওয়ায় এখানে সাঙ্গারূপক না হয়ে পরম্পরিত রূপকই হয়েছে।

(i) তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছো ভবিষ্যৎ আর
অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা । —সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : প্রথম উপমেয় 'দীর্ঘশ্বাস'র ওপর প্রথম উপমান 'ধোঁয়ার'-র অভেদ-আরোপের কারণে দ্বিতীয় উপমেয় 'অনুশোচনা'র ওপর দ্বিতীয় উপমান 'আগুন'-এর অভেদ-আরোপের জন্ম। আবার দ্বিতীয় অভেদ-আরোপ থেকে তৃতীয় উপমেয় 'উৎসাহ'-এর ওপর তৃতীয় 'কয়লা'র অভেদ-আরোপের জন্ম—এইভাবে রূপকের কার্যকারণ-পরম্পরা তৈরি হচ্ছে বলে এটি পরম্পরিত রূপক।

২৮.৬.৩ উৎপ্রেক্ষা

সংজ্ঞা : গভীর সাদৃশ্যের কারণে প্রকৃতকে (উপমেয়কে) যদি পরাত্মা (উপমান) বলে উৎকট (প্রবল) সংশয় হয় এবং যদি সে সংশয় কবিত্বময় হয়ে ওঠে, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম উৎপ্রেক্ষা অলংকার।

(উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়-উপমানের সাধারণ সাদৃশ্য থেকে উপমা, অভেদ থেকে রূপক, আর প্রবল সংশয় থেকে উৎপ্রেক্ষা। গভীর সাদৃশ্য এ সংশয়ের কারণ।

২। সংশয় একদিকে—উপমেয়কে উপমান বলে সংশয়।

৩। এ সংশয় কবিত্বময়, সাধারণ সংশয় থেকে অলংকার হয় না।

৪। কবিত্বের গুণে প্রত্যক্ষ উপমেয়েরে তুলনায় কাল্পনিক উপমানকেই বেশি সত্য বলে মনে হয়।

প্রকারভেদ

● উৎপ্রেক্ষা অলংকার দু-রকমের—

(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা (বাচ্যা + উৎপ্রেক্ষা)

(খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা (প্রতীয়মানা + উৎপ্রেক্ষা)

সংজ্ঞা-উদাহরণ-ব্যাখ্যা

■ **(ক) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা :**

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে 'যেন, 'বুঝি', 'জনু', 'মনে হয়', 'মনে গণি' জাতীয় কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে, তার নাম বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ :

(i) বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল। —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/৪র্থ সর্গ)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী' (অশোকবনে সীতার পদতলে বসা সরমা), উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' (প্রদীপ)। সীতার পদতলে বসা যুবতী সরমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুলসীতলায় জ্বলে উঠল সন্ধ্যার প্রদীপটি। দুটি দৃশ্যেই আছে একটি পবিত্র সৌন্দর্য। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে উপমেয় 'পদতলে বসা যুবতী'কে উপমান 'তুলসীর মূলে জ্বলে-ওঠা দেউটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। অতএব, এটি উৎপ্রেক্ষা অলংকার। সংশয়বাচক 'যেন' শব্দের সংযোগে, সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বলে এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(i) ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।। —সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : কলঙ্কিত গোলাকৃতির সাদৃশ্যে উপমেয় 'পূর্ণিমা-চাঁদ'-কে ক্ষুধাতুর মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপমান 'ঝলসানো রুটি' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে সংশয়ের ভাবটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অতএব, এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

■ **(খ) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা :**

সংজ্ঞা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে কোনো সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, কিন্তু অর্থ থেকে সংশয়ের ভাবটি অনুমান করে নেওয়া যায়, তার নাম প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

উদাহরণ :

(i) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গা।
তার পাছে ব্যাধ যেন উড়িছে পতঙ্গা।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত উদাহরণে প্রথম চরণে উপমেয় 'ভগবতী'তে উপমান 'দীঘল তরঙ্গা' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় জেগেছে। ভগবতীর চলনভঙ্গিাতে 'তরঙ্গো'র নাচন কবি লক্ষ করেছেন। এই গভীর সাদৃশ্য থেকেই কবির মনে সংশয়, এবং প্রকাশের ভঙ্গিতে তা কবিত্বময়। অতএব, অলংকার এখানে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়সূচক শব্দের উল্লেখ না থাকলেও অর্থ থেকে সংশয়ের ভাব অনুমিত হওয়ায় এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

দ্বিতীয় চরণেও উপমেয় 'ব্যাধ'-কে উপমান 'পতঙ্গা' বলে কবির মনে প্রবল সংশয়। এর মূলেও রয়েছে 'ব্যাধ' আর 'পতঙ্গো'র চলনভঙ্গির সাদৃশ্য। অতএব, এখানেও উৎপ্রেক্ষা, তবে সংশয়সূচক শব্দ 'যেন'-র উল্লেখে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

(ii) এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল। —যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'ব্রহ্মাণ্ড', উপমান 'মাকাল ফল'। বাইরের রূপে লোভনীয় অথচ ভেতরের সারশূন্য 'ব্রহ্মাণ্ড' এবং 'মাকাল ফল' দুই-ই। এই গভীর সাদৃশ্যের কারণে 'ব্রহ্মাণ্ড'-কে একটি ঝুলন্ত প্রকাণ্ড 'মাকাল ফল' বলে কবির মনে প্রবল সংশয় হচ্ছে। সংশয়ের কবিত্বময় প্রকাশে এখানে অলংকার হয়েছে উৎপ্রেক্ষা। তবে, সংশয়মূলক শব্দের কোনো উল্লেখ নেই বলে উদাহরণটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

২৮.৬.৪ সমাসোক্তি

সংজ্ঞা : **বর্ণনীয় বিষয়ের (উপমেয়) ওপর অন্যবস্তুর (উপমান) ব্যবহার আরোপ করা হলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম সমাসোক্তি অলংকার।**

(উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হলে সমাসোক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমানের কোনো উল্লেখ থাকে না, তবে তার ব্যবহার বা আচরণের উল্লেখ থাকে।

২। উপমেয় একা এবং তার ব্যবহার বা আচরণ পুরোপুরি উপমানের।

৩। উপমেয়ের ওপর আরোপিত ব্যবহার থেকেই উপমানকে চেনা যায়।

৪। ব্যবহার বা আচরণ সাধারণভাবে গুণগত বা ক্রিয়াগত।

৫। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপমেয় অচেতন বস্তু, তার ব্যবহার চেতনের।

উদাহরণ :

(i) শুনিতেছি আজো আইম প্রাতে উঠিয়াই,
'আয়' 'আয়' কাঁদিতেছি তেমনি সানাই। —নজরুল ইসলাম

সংকেত : যে কান্না মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অচেতন 'সানাই-এর ওপর তা আরোপিত। চেতন মানুষই এখানে উপমেয়, কিন্তু তার উল্লেখ নেই, আছে তার ব্যবহারের (কান্নার) উল্লেখ। এই ব্যবহারের আরোপ হল 'সানাই'-এর ওপর। অতএব, 'সানাই' এখানে অনুক্ত 'মানুষ'-এর উপমান। অলংকার সমাসোক্তি।

(ii) শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছে এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; —রবীন্দ্রনাথ
(সোনার তরী/যেতে নাহি দিব)

ব্যাখ্যা : 'বসুন্ধরা' উদ্ধৃত স্তবকের উপমেয় বা বর্ণনীয় বিষয়, উপমানের উল্লেখ নেই। আমাদের পরিচিত 'বসুন্ধরা' (মাটির পৃথিবী) অচেতন। কিন্তু এখানকার বর্ণিত 'বসুন্ধরা' মেঠোসুরে বাঁশির কান্না শুনে 'উদাসী', 'হিরণ্য-অঞ্চল বক্ষে' টেনে এলোচুলে বসে আছেন। বলা বাহুল্য, এ স্বভাব 'বসুন্ধরা'র নয়, আঁচল বুকে-টানা এলোচুলে বসে-থাকা উদাসিনী নারীর ব্যবহার বা আচরণ কবি আরোপ করেছেন, 'বসুন্ধরা'র ওপর। ওই 'নারী'ই 'বসুন্ধরা'-র উপমান। উপমান 'নারী'কে চেনা যায় উপমেয় 'বসুন্ধরা'র ওপর আরোপিত আচরণের বর্ণনা থেকেই। অতএব, উপমেয়ের উপর উপমানের ব্যবহার আরোপের সৌন্দর্যই উদ্ধৃত স্তবকের অলংকার, সে অলংকারের নাম সমাসোক্তি।

২৮.৬.৫ অতিশয়োক্তি

সংজ্ঞা : **বিষয়ীর (উপমানের) সিদ্ধ অধ্যবসায় হলে, অর্থাৎ উপমান উপমেয়কে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললে এবং সেই কারণে উপমেয়ের কোনো উল্লেখ না থাকলে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তারই নাম সাধারণ অতিশয়োক্তি।**

(উপমেয় লুপ্ত এবং উপমান প্রবল হলে অতিশেয়োক্তি।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমেয়ের উল্লেখ থাকে না, অর্থাৎ উপমেয় লুপ্ত।

২। বাক্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থেকে উপমেয়কে চেনা যায়।

৩। উপমান একা, সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

৪। উপমেয়-উপমানের সাদৃশ্য এখানে চূড়ান্ত, অভেদ সম্পূর্ণ।

৫। 'উপমা'য় উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো, 'ব্যতিরেকে' ওই ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো, 'রূপকে' অসম্পূর্ণ অভেদ, 'অপহ্নুতি'-তে অভেদ মেনে নিয়ে উপমেয়ের অস্বীকৃতি, 'অতিশয়োক্তি'তে সাদৃশ্যের চূড়ান্ত পরিণাম—অভেদ সম্পূর্ণ।

উদাহরণ :

(i) মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা ! —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/৬ষ্ঠ সর্গ)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলের দিকে পা-বাড়ানো মেঘনাদের বিদায়-মুহূর্তের একটি করুণ দৃশ্য উদ্ধৃত উদাহরণটি। বেদনার্ত প্রমীলার ক্রন্দন-দৃশ্য। নয়ন থেকে অশ্রধারাই তো বর্ষিত হল। কিন্তু অশ্রু এখানে অনুক্ত। প্রমীলার নয়ন বা বর্ষণ করল, কবের চোখে তা 'মুকুতা'। তারই উল্লেখ এখানে আছে। অর্থাৎ, প্রকৃত বা উপমেয় 'অশ্রু'-র উল্লেখ নেই, আছে কেবল অপ্রকৃত বা উপমান 'মুকুতা'র (মুক্তা) উল্লেখ। অতএব, অলংকার এখানে অতিশয়োক্তি (বিশেষ নাম 'রূপকাতিশয়োক্তি')।

(ii) হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ? ——মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/১ম সর্গ)

ব্যাখ্যা : বিধ্বংসী লঙ্কাযুদ্ধের জন্য রাবণ দায়ী করলেন সূর্পণখাকে। পঞ্চবটীবনে 'কালকূটে ভরা ভুজগ'টিকে দেখারই পরিণাম এ যুদ্ধ। কিন্তু, বিধ্বস্ত রাবণের দৃষ্টিতে যা 'ভুজগ' (সাপ), প্রকৃত অর্থে তিনি এখানে রামচন্দ্র। সূর্পণখা রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে দেখেই কামাসক্ত হয়ে রক্তারক্তি-কাণ্ডের সূচনা করেছিল, কোনো সাপ দেখে নয়। অতএব, 'ভুজগ' এখানে উপমান-মাত্র, তার উপমেয় 'রামচন্দ্র'।

বক্তার (রাবণের) মূল্যায়নে এবং কবির প্রকাশভঙ্গিতে উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং তাদের অভেদ এখানে পরিপূর্ণ। ফলে, বাক্যে উপমেয় 'রামচন্দ্র' পুরোপুরি লুপ্ত, উপমান 'ভুজগ' সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত। বলা যায়, উপমান সম্পূর্ণভাবে উপমেয়কে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং, এখানকার অলংকার অতিশয়োক্তি।

২৮.৬.৬ ব্যতিরেক

সংজ্ঞা : উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে যে অর্থ-সৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যতিরেক অলংকার।

(উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখানো হলে ব্যতিরেক।)

বৈশিষ্ট্য :

১। উপমান অপেক্ষা উপমেয় উৎকৃষ্ট হতে পারে। তখন অলংকার হবে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

২। উপমান অপেক্ষা উপমেয় নিকৃষ্ট হতে পারে। তখন অলংকার হবে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

৩। অধিক-চেয়ে-অপেক্ষা, নিন্দি-নিন্দিত-নিন্দু, জিনি-জিতল, গঞ্জি-গঞ্জন, লাজ-লজ্জা, ছার ইত্যাদি তারতম্যবোধক শব্দের প্রয়োগে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়।

৪। সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে থাকে।

৫। কখনো কখনো বর্ণনায় অন্তর্নিহিত থাকে উৎকর্ষ-অপকর্ষ, ভাব বা অর্থ থেকে বুঝে নিতে হয়।

৬। ব্যতিরেক অলংকারে উপমেয়-উপমানের ভেদ মেনে নিয়ে তারতম্য দেখানো হয়। এটি সাদৃশ্যের দ্বিতীয় স্তর। (প্রথম স্তর উপমায়, যেখানে কেবল সাদৃশ্যটুকু দেখানো হয়।)

উদাহরণ :

(i) কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি। —রবীন্দ্রনাথ
(কথা/ সামান্য ক্ষতি)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত চরণে উপমেয় 'নারীকণ্ঠের কাকলি', উপমান 'কলকল্লোল'। এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ নেই, আছে তারতম্য-বোধক 'লাজ দিল' কথাটি—এর সাহায্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝা যাচ্ছে। উপমেয় 'নারীকণ্ঠের কাকলি' লজ্জা দিল উপমান 'কলকল্লোল'কে। লজ্জা যে দেয়, সে তার শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষের কারণেই দেয়। এখানে 'নারীকণ্ঠের কাকলি'রই উৎকর্ষ। কিন্তু, কোন্ গুণে এই উৎকর্ষ, সে কারণটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তা অনুমান করা যায়। কলধ্বনি নারীর কণ্ঠেও আছে, কল্লোলের (ঢেউ) মৃদু আঘাতেও আছে। এই ধ্বনির উচ্চতায় 'কলকল্লোল' অপেক্ষা নারীকণ্ঠের কাকলি'রই উৎকর্ষ। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এ উদাহরণে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকার হয়েছে।

(i) কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে। —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য /১ম সর্গ)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : উপমেয় 'রাবণের রাজসভা' (ইহা), উরমান 'ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডব-সভা'। দুটি সভাই ঐশ্বর্যময়। তবে, তারতম্য-বোধক 'ছার' শব্দের প্রয়োগে ঐশ্বর্যের পরিমাণের দিক থেকে দুটি রাজ্যসভার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে 'রাবণের রাজসভা'রই উৎকর্ষ। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হয়েছে বলে এখানকার অলংকার উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

২৮.৭ সারাংশ-২

সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার

'ছেলেটা ব্যাঙের মতো লাফায়'—কথাটি বললে ছেলেটার চলন একটা ছবি হয়ে ওঠে আমাদের মনে। এখানেই সৌন্দর্য, এখানেই অলংকার—অর্থালংকার। 'ছেলেটা' আর 'ব্যাং'—এই দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে কল্পনার

জোরে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা হল। সাদৃশ্যই এখানকার অলংকারের লক্ষণ। তাই, এটি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার। প্রধানত তিনটি উপায়ে এ সাদৃশ্য দেখানো হয়—বস্তুদুটির পার্থক্য পুরোপুরি মেনে নিয়ে ('ননীর মতো শয্যা'), পার্থক্য পুরোপুরি আড়ালে রেখে ('কাব্যের জাল'), পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে ('নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে')। সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের চারটি অঙ্গ—উপমেয় (বর্ণনীয় বিষয়), উপমান (যার সঙ্গে তুলনা), সাধারণ ধর্ম (যা দুটি বস্তুতেই থাকে), ভঙ্গি (তুলনার)। কেবল ভঙ্গির পরিবর্তনে সাদৃশ্যমূলকে নানারকম অলংকার তৈরি হয়ে যায়—উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক ইত্যাদি।

উপমা : বিজাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখালেই উপমা। উপমার চারটি অঙ্গ—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম, সাদৃশ্যবাচক শব্দ। উপমার প্রধান বিভাগ তিনটি—পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, মালোপমা। উপমার চারটি অঙ্গেরই উল্লেখ থাকলে পূর্ণোপমা, উপমেয় থাকলেও আর কোনো অঙ্গের লোপ হলে লুপ্তোপমা, একটি উপমেয়ের একের বেশি উপমান থাকলে **মালোপমা।**

রূপক : উপমেয়ের ওপর উপমানের অভেদ আরোপ করলে রূপক। রূপক প্রধানত তিন রকমের—নিরঙ্গরূপক, সাঙ্গরূপক, পরম্পরিত রূপক। কেবল একটি উপমেয়ের ওপর একটি বা একের বেশি উপমানের অভেদ আরোপ করলে **নিরঙ্গরূপক** (উপমেয়-উপমানের কোনো অঙ্গের অভেদ থাকবে না)। উপমেয়-উপমানের অঙ্গসমেত অভেদ হলে **সাঙ্গরূপক।** একটি উপমেয়-উপমানের অভেদ থেকে আর একটি উপমেয়-উপমানের অভেদ তৈরি হলে **পরম্পরিত রূপক।**

উৎপ্রেক্ষা : উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় হলেই উৎপ্রেক্ষা। উৎপ্রেক্ষা দু-রকমের—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকলে **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** (পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি), সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ ছাড়াই সংশয় অনুমান করা গেলে **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা** (আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গ)।

অতিশয়োক্তি : উপমেয় লুপ্ত আর উপমান প্রবল হলে অতিশয়োক্তি। 'নয়ন বর্ষিল .... মুকুতা'—এখানে উপমেয় 'অশ্রু' লুপ্ত, উপমান 'মুকুতা' প্রবল।

সমাসোক্তি : উপমেয়ের ওপর উপমানের ব্যবহার আরোপ হল সমাসোক্তি। 'বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে'—উপমেয় 'বসুন্ধরা'র ওপর উপমান 'নারী'-র ব্যবহার।

ব্যতিরেক : উপমেয়-উপমানের মধ্যে সাধারণ ধর্মের কমবেশি দেখানো হলে ব্যতিরেক। 'কলকল্লোর লাজ দিল আজ / নারীকণ্ঠের কাকলি'—সাধারণ ধর্ম 'কলধ্বনি' উপমান 'কল্লোল'-এর চেয়ে উপমেয় 'নারীকণ্ঠে-ই বেশি।

২৮.৮ অনুশীলনী-২

১. সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার কীভাবে গড়ে ওঠে, লিখুন।

২. কী কী উপায়ে কবিরা দুটি বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে থাকেন, উদাহরণসহ লিখুন।

৩. সাদৃশ্যমূলক অলংকারের কী কী অঙ্গ, একটি উদাহরণে সেসব দেখিয়ে দিন। কোন অঙ্গ বদলালে অলংকার বদলে যায়, লিখুন।

৪. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন :

পূর্ণোপমা, সাঙ্গ রূপক, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক।

৫. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।

(খ) নয়ন বর্ষিল উজ্জ্বলতর মুকুতা।

(গ) তটিনী চলেছে অভিসারে।

(ঘ) আগে যান ভগবতী দীঘল তরঙ্গ।

(ঙ) অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।

(চ) কচি কলাপাত সন্ধ্যা।

২৮.৯ মূলপাঠ -৩ : অর্থালংকারের অন্যান্য শ্রেণি

পাঁচটি লক্ষণ থেকে যে অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ হয়েছে, এ কথা মূলপাঠ-১ থেকে আপনারা জেনেছেন। প্রথম লক্ষণ সাদৃশ্য, তা থেকে তৈরি সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের পরিচয় পেলেন মূলপাঠ-২-এ। এবার জেনে নিন অর্থালংকারের বাকি চারটি লক্ষণ থেকে তৈরি আরও চারটি শ্রেণির কথা—বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক আর গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকারের কথা।

২৮.৯.১ বিরোধমূলক অর্থালংকার

কোনো কবির লেখায় যদি দেখি, কার্য-কারণ-ঘটনাক্রম তার স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অন্যপথ বা উল্টোপথে চলছে, তখনই বুঝব সেখানে 'বিরোধ' আছে। যেহেতু তা কবির লেখা, সেই কারণে ধরে নিতে হবে—সেখানে যা-কিছু বিরোধ সবই বাইরে থেকে বিরোধ বলে মনে হয়, একটু তলিয়ে ভাবলেই তার মীমাংসা খুঁজে পাব, বিরোধ মিলিয়ে যাবে। কাব্য-কবিতার বিরোধের ব্যাপারটি কয়েকটি উদাহরণ থেকে বুঝে নেওয়া যাক :

১. ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।

২. মেঘ নাই তবু অঝোরে ঝরিল জল।

৩. আছে চক্ষু, কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।

৪. তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

৫. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

৬. এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে বাঁধিতে গলায় ?

প্রথম উদাহরণে আছে একটি শিশু আর শিশুর পিতা। শিশুটি তার পিতার কোলে ঘুমিয়ে আছে, এই তথ্য অভিজ্ঞ মানুষের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু, শিশুর পিতাটি ঘুমিয়ে আছে শিশুর মধ্যে—এ ধরনের কথায় মনে খটকা লাগে, অভিজ্ঞতা ধাক্কা খায় একটা বিপরীত ছবির কল্পনায়। পাঠককে ভাবায়, পাঠক কিছু সময়ের জন্য গভীর জলে পড়ে যায়, এর অর্থ খুঁজে বের করে অবশেষে কিনারা পায়। এটাই বিরোধ, এখানেই কথার সৌন্দর্য, অর্থের অলংকার।

দ্বিতীয় উদাহরণে মেঘশূন্য নীল আকাশ থেকে অঝোরে বর্ষণ, তৃতীয় উদাহরণে চোখ থেকেও দৃষ্টি না-থাকা-কারণ-কার্যের স্বাভাবিক সম্পর্ককে অস্বীকার করছে বলে বিরোধ। চতুর্থ উদাহরণে শ্রাবণের ধারা ঝরল একটি বনে, কদম ফুটল অন্য একটি বনে। এমন ঘটনা প্রকৃতি-বিজ্ঞানের আইন অমান্য করছে। অতএব, খবর হিসেবে এটি মিথ্যা, অন্ততপক্ষে অবিশ্বাস্য। বনে বনে সন্ধান করেও এর সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু ওই বিরোধের খোলসটা ছাড়িয়ে পাঠকের মনে যে কদম ফুটে উঠল ক্রমশ, তার সৌন্দর্য পাঠকই উপভোগ করবেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী তার আস্বাদ পাবেন না। পঞ্চম উদাহরণে সুখের আশায় বাঁধা ঘর আগুনে পুড়ে দুঃখ এনে দিল, বস্তুজীবনেও এমনটি ঘটে। এই স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেও তো বিরোধ আছেই। এই বিরোধটাই কবি কাজে লাগাচ্ছেন তাঁর কবিতায়, যেখানে সত্যি সত্যি ঘর-বাঁধা বা ঘর-পোড়ার ঘটনা ঘটছে না, ঘটছে কারো মনে সুখের বদলে দুঃখের আনাগোনা। শেষ উদাহরণের দৃশ্যটা অদ্ভুত এবং কিঞ্চিৎ ভয়ংকর। এমন সাপের কথা কবি বলছেন, যাকে দেখলে ভয়ে শিউরে ওঠার বদলে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে। খবর হিসেবে এটাও অবিশ্বাস্য। এখানেই এর বিরোধ। কেন সাপটাকে গলায় বাঁধতে ইচ্ছে করবে বুঝতে পারলেই চমক, চমৎকারিত্ব। গলায় বাঁধা ওই সাপটা তখন সত্যি সত্যি হয়ে উঠবে অলংকার—গলারও, মনেরও।

বিরোধাভাস (বিরোধ)

সংজ্ঞা : যদি দুটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখানো হয়, কিন্তু অর্থবোধে সে বিরোধির অবসান ঘটে, তাহলে সে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার।

(দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখানো হলে বিরোধাভাস।)

উদাহরণ :

(i) বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। —রবীন্দ্রনাথ
(কথা/পরিশোধ)

ব্যাখ্যা : 'মুক্তি'র বিপরীত 'বন্ধন'। 'শৃঙ্খলমুক্ত করা' আর 'শৃঙ্খলে বাঁধা' বিরুদ্ধ দুটি কাজ। অতএব, শ্যামা বজ্রসেনকে শৃঙ্খলমুক্ত করে শৃঙ্খলেই বেঁধেছে—এ কথা শুনে মনে হয়, শ্যামার এ দুটি কাজের মধ্যে বিরোধ আছে। কিন্তু এ শৃঙ্খলমুক্তি 'ক্ষণিকে'র আর এ শৃঙ্খলে বাঁধা 'অনন্তে'র। এর অর্থ, কারাগারের লোহার শৃঙ্খল থেকে

মুক্তি (যা মুহূর্তেই ঘটে গেছে) আর প্রেমের শৃঙ্খলে বন্ধন (যা চিরকালের)। এই অর্থবোধ থেকে শ্যামার দুটি কাজের আপাত বিরোধের অবসান ঘটল। অতএব, এখানে বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার হয়েছে।

(ii) অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। —রবীন্দ্রনাথ
(নৈবেদ্য)

ব্যাখ্যা : 'বন্ধন' আর 'মুক্তি' বিপরীত দুটি শব্দ। অতএব, 'বন্ধনমাঝে' 'মুক্তির স্বাদ' পাবার কল্পনায় বিরোধ আছে। কিন্তু 'বন্ধন' যদি হয় 'অসংখ্য' আর 'মুক্তির স্বাদ' যদি হয় 'মহানন্দময়', তাহলে সে 'বন্ধন' আর 'মুক্তি'র অন্য অর্থ অবশ্যই আছে। আমাদের চারপাশের সীমানার যে বন্ধন, তা বাইরের। সেই বাইরের বন্ধনে বাঁধা থেকেই কবি চেয়েছেন মনের মুক্তি। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার অনুভবে যে আনন্দের সন্ধান কবি পেতে চান, কবির পক্ষে সেইটেই হবে সীমার বাহ্য বন্ধনের মধ্যে থেকেও অসীম আনন্দলোকে সত্যকার মুক্তি। এই অর্থবোধ থেকেই 'বন্ধন'-'মুক্তি'র আপাত বিরোধের অবসান ঘটে বলে এখানে বিরোধাভাস অলংকার আছে।

(iii) এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান। —রবীন্দ্রনাথ
(দেশবন্ধুর স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য)

ব্যাখ্যা : 'মৃত্যুহীন' যে প্রাণ, 'মরণে' তাকেই দান করা হল। 'মৃত্যুহীন প্রাণ'-এর সঙ্গে 'মরণ'-এর সংযোগ—এতে বিরোধ আছে। এ বিরোধ শব্দের সঙ্গে শব্দের, অতএব ভাষাগত বাহ্য বিরোধ। কিন্তু, কথাটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো মহান পুরুষ সম্পর্কে উচ্চারিত। এখানে 'প্রাণ'-এর অর্থ আত্মার বাণী, তার মৃত্যু বা বিনাশ নেই বলে সে-'প্রাণ' 'মৃত্যুহীন'। আর, 'মরণ' কেবল শরীরের, 'প্রাণে'র নয়। দেশবন্ধু তাঁর শরীরী মৃত্যুতে আত্মার অমর বাণী দেশবাসীর জন্য রেখে গেলেন—এই অর্থবোধ থেকে উদ্ধৃত স্তবকটির ভাষাগত আপাত বিরোধের অবসান ঘটে। অতএব, এখানে বিরোধাভাস বা বিরোধ অলংকার আছে।

২৮.৯.২ শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার

শৃঙ্খলা মনকে প্রসন্ন করে, বিশৃঙ্খলা মনকে বিরক্ত করে—এটাই সুস্থ মানুষের মনস্তত্ব। সৈন্যদলের কুচকাওয়াজকে মনে হয় সুন্দর, কাউন্টারের পাশে এমনকী সুশৃঙ্খল ক্রেতার পঙক্তিও সুন্দর, কিন্তু ভিড়-ঠাসা বাস বা ট্রেনের দরজায় ওঠা-নামার হুড়োহুড়ি বিরক্তিকর, অসুন্দর। আলমারির তাকগুলিতে থাকে থাকে সাজানো বই দেখতে সুন্দর, পড়া হোক বা না হোক। কারণ শৃঙ্খলা। টেবিলের এলোমেলো ছড়ানো বই গভীর পাঠের সহায়ক হলেও অসুন্দর। কারণ শৃঙ্খলার অভাব। কবিতায় বাক্য বা বাক্যাংশের বিন্যাসের শৃঙ্খলার এই সৌন্দর্য থাকলে সেটাই হবে শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। এ শৃঙ্খলা আসতে পারে কারকের বিন্যাস থেকে, পদের বিন্যাস থেকে, কারণ-কার্যের বিন্যাস থেকে, অনির্দিষ্ট বস্তুর ক্রমশ নির্দিষ্ট হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেকে।

দুটো-একটা উদাহরণ দিই :

'ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।'

দুটি বাক্য বা বাক্যাংশেই 'ছাড়ে' ক্রিয়াটি আছে। ক্রিয়ার সঙ্গো প্রথমে যুক্ত নারদ-বীণা, পরে যুক্ত বীণা-গীত। প্রথমে 'নারদ কর্তা, 'বীণা' কর্ম, পরে 'বীণাই কর্তা হয়ে ওঠে 'গীত'কে কর্ম বানিয়ে। এই শৃঙ্খলা থেকেই অলংকারের জন্ম।

'ফুল চাই সখা, সাদা ফুল, মধুগন্ধিত সাদা ফুল।'

তিনটি বাক্যাংশ বাক্যটিতে। প্রথম অংশের সঙ্গো যে কোনো 'ফুল' থেকে দ্বিতীয় বাক্যাংশে বেছে নেওয়া হল 'সাদা ফুল', সেই 'সাদা ফুল' থেকেও তৃতীয় বাক্যাংশের বাছাই হল একমাত্র সেই ফুল যেখানে মধুর গন্ধ আছে। এটাই শৃঙ্খলা, এখানেই অলংকার।

'পরশে চাহনি তার, দৃষ্টিতে চুম্বন,
আর চুম্বনে মরণ।'

বাক্যাংশ এখানেও তিনটি। প্রথম অংশে 'পরশ' বা স্পর্শ থেকে 'চাহনি' বা দৃষ্টি, দ্বিতীয় অংশে 'দৃষ্টি' থেকে'চুম্বন', তৃতীয় বাক্যে 'চুম্বন' থেকে 'মরণ'—স্পর্শ থেকে যার শুরু, দৃষ্টি আর চুম্বন পেরিয়ে মরণে তার চূড়ান্ত পরিণাম। বিন্যাসের একটা শৃঙ্খলা বাক্যটিতেও আছে। এই শৃঙ্খলার সৌন্দর্যই এখানকার অলংকার।

একাবলি

সংজ্ঞা : পূর্ব-পূর্ব বাক্য বা বাক্যাংশের বিশেষণ বা বিশেষ্যপদ উত্তরোত্তর বাক্য বা বাক্যাংশের যথাক্রমে বিশেষ্য বা বিশেষণপদরূপে ব্যবহৃত হতে থাকলে যে শৃঙ্খলাজনিত অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম একাবলি।

(পূর্ব-পূর্ব বিশেষণ বা বিশেষ্যের উত্তরোত্তর বিশেষ্য বা বিশেষণ হয়ে যাওয়ার নাম একাবলি।)

উদাহরণ :

(i) তাঁহার কাব্য বর্ণনাবহুল, ...বর্ণনা চিত্রবহুল.... চিত্র বর্ণবহুল।

—বুদ্ধদেব বসু

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যের প্রথম বাক্যাংশের বিশেষণ 'বর্ণনাবহুল' দ্বিতীয় বাক্যাংশে বিশেষ্য 'বর্ণনা'য় পরিণত, দ্বিতীয় বাক্যাংশের বিশেষণ 'চিত্রবহুল' তৃতীয় বাক্যাংশ বিশেষ্য 'চিত্র'তে পরিণত। এইভাবে পূর্ব-পূর্ব বাক্যাংশের বিষেণপদ উত্তরোত্তর বাক্যাংশে বিশেষ্যপদরূপে ব্যবহৃত হতে হতে একটা শৃঙ্খলাজনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

অতএব, এখানে 'একাবলি' অলংকার হয়েছে।

(ii) বাপী নিরমল, বাপীতে কমল ফুটে।
কমলে ভৃঙ্গা, ভৃঙ্গো গীতিকা উঠে।।

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকের দুটি বাক্যে চারটি বাক্যাংশ। প্রথম বাক্যাংশের বিশেষ্য 'বাপী' (দিঘি) দ্বিতীয় বাক্যাংশে 'কমল'-এর বিশেষণ পদে ('বাপীতে') পরিণত। দ্বিতীয় বাক্যাংশের বিশেষ্য 'কমল' তৃতীয় বাক্যাংশে 'ভৃঙ্গা'-এর বিশেষণপদে ('কমলে') পরিণত। তৃতীয় বাক্যাংশের বিশেষ্য 'ভৃঙ্গা' (ভ্রমর) চতুর্থ বাক্যাংশে 'গীতিকা'র (সংগীত) বিশেষণপদে ('ভৃঙ্গো') পরিণত। 'বাপীতে', 'কমলে', 'ভৃঙ্গো' পদগুলি বিশেষণ—কারণ,

এদের সংযোগে 'কমল', 'ভৃঙ্গ' আর 'গীতিকা' বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্ব-পূর্ব বাক্যাংশে বিশেষ্য উত্তরোত্তর বাক্যাংশে বিশেষণপদরূপে ব্যবহৃত হল বলে একটা শৃঙ্খলাজনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, এখানকার অলংকার 'একাবলি'।

২৮.৯.৩ ন্যায়মূলক অর্থালংকার

'ন্যায়'-এর অর্থ যুক্তি তর্কবিচার। 'ন্যায়দর্শন' দর্শনই, কবিতা নয়। 'ন্যায়' বা যুক্তি-তর্ক-বিচার দর্শনের বিশ্লেষণের বিষয়, আলোচনার বিষয়, কিন্তু কবিতার বিষয় নয়। ওটা হতে পারে কবিতার একটা পদ্ধতি। এইরকম একটা পদ্ধতি হচ্ছে 'সমর্থন-এর প্রয়োগ। একটি কথা বলতে গিয়ে বা সেই কথার সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আর একটি কথার সমর্থন আসতেই পারে। এলে সেইটিই হবে যুক্তি বা 'ন্যায়'। সেই কথাটি 'ন্যায়'-এর সহযোগে কবিতা হয়ে উঠলে অর্থাৎ সেই কথাটির সৌন্দর্য উপভোগ্য হলে তা হবে ন্যায়মূলক অর্থালংকার।

'ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান।'

'ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম'—এই কথাটি যে সত্য, তা প্রমাণ করার জন্য সমর্থনে এগিয়ে এল পরের কথাটি—বড় দুটি গাছেরই মাঝখানে ফাঁকা জায়গা থাকে, 'সমর্থন'ই এখানে যুক্তি বা ন্যায়। অলংকারও তাই ন্যায়মূলক।

'যত বড় হোক, ইন্দ্রধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা।
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা।'

ইন্দ্রধনু বা রামধনু আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে বর্ণের সমারোহ নিয়ে ছড়ানো থাকে। দেখতেও ভালোই লাগে। কিন্তু তাতে লাভ কী ? সে তো থাকে বহুদূরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে। কাছে থাকলে তবেই তো ভালোবেসে তৃপ্তি। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যটাই সমর্থিত হচ্ছে দূরের ইন্দ্রধনুকে সরিয়ে রেখে কাছের প্রজাপতি-পাখাকেই ভালোবাসার অভ্যাসে। কবিরা এই পথেই কবিতায় 'সমর্থন' তৈরি করেন, এইভাবেই তৈরি হয় ন্যায়মূলক অলংকার।

অর্থান্তরন্যাস

সংজ্ঞা : সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে যে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

বৈশিষ্ট্য :

১। এ অলংকারের বিশেষ লক্ষণ সমর্থন।

২। সাধারণত দুটি বাক্য থাকে, দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যকে সমর্থন করে।

৩। একটি বাক্যে সামান্য (বা সাধারণ বিবৃতি) থাকলে অন্য বাক্যে বিশেষ, একটি বাক্যে কারণ থাকলে অন্য বাক্যে কার্য।

৪। দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের বিশেষের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের বিশেষ দ্বারা প্রথম বাক্যের সামান্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কারণের দ্বারা প্রথম বাক্যের কার্যের সমর্থন, দ্বিতীয় বাক্যের কার্যের দ্বারা প্রথম বাক্যের কারণের সমর্থন—সমর্থন এই চার রকমে হতে পারে।

উদাহরণ :

১। সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন—

হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্ম্মতি। —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/ষষ্ঠ সর্গ)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকে দুটি বাক্য। প্রথম বাক্যে আছে একটি বিশেষ বিবৃতি—মেঘনাদের কাকা ('পিতৃব্য') বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণ-বানরের সঙ্গে বাস করে ('হেন সহবাসে') বর্বরতা শিখেছে। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যে ব্যক্তি নিম্নরুচির মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করে ('গতি যার নীচ সহ') তার নিজের রুচিও নীচেই নেমে যায় ('নীচ সে দুর্ম্মতি')। দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত মানব-স্বভাবের এই সামান্য বা সাধারণ নিয়মটি সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের অন্তর্গত বিভীষণের বর্বর হয়ে যাওয়ার পরিণামকে। সমর্থনসূচক বাক্যাংশ 'বর্বরতা কেন না শিখিবে ?' সমর্থনকে আরও জোরদার করে তুলছে। অতএব, সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থন থাকায় স্তবকটিতে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়েছে।

২. বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থন—

এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। —রবীন্দ্রনাথ
(কাহিনী/দুই বিঘা জমি)

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত বাক্যদুটির প্রথম বাক্যে আছে একটি সামান্য বা সাধারণ বিবৃতি—যার বেশি বেশি আছে, সে আরও বেশি চায়। দ্বিতীয় বাক্যে রয়েছে একটি বিশেষ উদাহরণ—বাবুর মতো রাজারাই উপেনের মতো গরিবের ধন চুরি করে নেয়। স্পষ্টত, দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ সত্যটি প্রথম বাক্যের অন্তর্গত সাধারণ সত্যকেই সমর্থন করছে। বিশেষের দ্বারা সামান্যের এই সমর্থন উদ্ধৃত স্তবকে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে।

৩. কারণ দ্বারা কার্যের সমর্থন—

হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী ? —মধুসূদন
(মেঘনাদবধ কাব্য/ষষ্ঠ সর্গ)

ব্যাখ্যা : শত্রুপক্ষের লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলায় এনে নিজের বংশকে বিনাশ করে দেবার যে আয়োজন বিভীষণ ('তাত') করল, সে কাজের অনৌচিত্য-ঘোষণা (উচিত কি তব একাজ') উদ্ধৃত স্তবকের প্রথম অংশে রয়েছে। স্তবকের পরবর্তী অংশে আছে বিভীষণের বংশকৌলিন্যের ব্যাখ্যা। এই বংশকৌলিন্যই পূর্ববর্তী অনৌচিত্যের কারণ। স্তবকের পরবর্তী অংশের অন্তর্গত এই কারণটি সমর্থন করছে পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্গত কার্যকে (অনৌচিত্যকে)। এই সমর্থন থেকেই স্তবকটিতে একটি অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার নাম অর্থান্তরন্যাস অলংকার।

মন্তব্য : লক্ষ করার বিষয়, প্রথম বাক্যের অন্তর্গত 'এ কাজ' অর্থাৎ বিভীষণের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ তার বংশগৌরবের অনুরূপ কার্য নয়, অভিজাত বংশের সন্তান বিভীষণের পক্ষে 'এ কাজ'-টি করার মধ্যে যে 'অনৌচিত্য' রয়েছে, সেইটিই এখানকার কার্য। এই কার্য সমর্থিত হচ্ছে বংশগৌরবের বর্ণনা দ্বারা।

৪. কার্য দ্বারা কারণের সমর্থন—

দীন্ দুনিয়ার মালিক যেজন তাঁর নাকি বড় ন্যায়বিচার।
মম্‌তাজ পায় তাজের শিরোপা, নূরজাহানের কাফন সার! —মোহিতলাল

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃত স্তবকের প্রথম বাক্যের 'তাঁর নাকি বড় ন্যায়বিচার!' বাক্যাংশে সংশয়াত্মক 'নাকি' শব্দ 'ন্যায়বিচার' কথাটির অর্থ উল্টে দিয়েছে। তার ফলে প্রথম বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় : দীন্ দুনিয়ার মালিকের ন্যায়বিচারের অভাব। এই অভাবের কারণেই দ্বিতীয় বাক্যের দুটি বাক্যাংশের অন্তর্গত কার্যে বৈষম্য—মৃত্যুর পর মম্‌তাজেরই প্রতি সম্মান ('তাজের শিরোপা') আর নূরজাহানের প্রতি অবজ্ঞা ('কাফন সার') বরাদ্দ করে মালিক এই বৈষম্যই তাঁর বিচারে দেখালেন। অতএব, দ্বিতীয় বাক্যের অন্তর্গত কার্য (মম্‌তাজ-নূরজাহানে বিষম বিচার) সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের অন্তর্গত 'ন্যায়বিচার'-এর প্রতি সংশয়কে অর্থাৎ ন্যায়বিচারের অভাবরূপ কারণকে। কার্য দ্বারা কারণের সমর্থন থেকে উদ্ধৃত উদাহরণে অর্থান্তরন্যাস অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে।

২৮.৯.৪ গূঢ়ার্থপ্রীতিমূলক অর্থালংকার

গূঢ় অর্থ (গূঢ়ার্থ) হচ্ছে কবিতার বা স্তবকের এমন অর্থ, যা লুকিয়ে থাকে শব্দ-বাক্যের আড়ালে। শব্দ-বাক্যের এক-একটা অর্থ থাকে, যা বোঝা যায় শব্দগুলি চেনা শব্দ হলেই। এই অর্থটা কথার বাইরের অর্থ। কিন্তু এই বাইরের অর্থে অনেক সময়ই কবির বক্তব্য ধরা পড়ে না, তখন কথাগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ :

'কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'

এই বাক্যের প্রতিটি শব্দ চেনা শব্দ, বাক্যের অর্থও অতি সহজ। কিন্তু সমস্যাটা তখনই তৈরি হয়, যখন লক্ষ করি, 'কেরোসিন-শিখা' আর 'মাটির প্রদীপ'—বিদ্যুৎহীন গ্রাম-বাংলার এতদিনের অতি প্রয়োজনীয় এই দুটি বস্তুর গলা টিপে ধরলে তাদের মৃত্যু ঘটবে, তারা নিবেই যাবে, কিন্তু একটি কথাও বলবে না। জাদুর কৌশলে

পাথরের গণেশ দুধ খায়, প্লাস্টিকের পুতুল কথা বলে, কিন্তু মাটির প্রদীপ ভাই ভলে ডাকে অথবা কেরোসিন-শিখা গলা টেপার হুমকি দেয়, এমন দুঃসংবাদ কখনো শোনা যায়নি। কবির কথাটাই তখন প্রলাপের মতো শোনায়। অতএব বাইরের অর্থ এখানে মূল্যহীন। এখানেই জরুরি হয়ে ওঠে চেনা শব্দ-বাক্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আর একটি অর্থ খুঁজে বার করা, যা কবির আসল বক্তব্য। ওই ভেতরের অর্থটিই গূঢ়ার্থ। সেই গূঢ়ার্থ যখন পাঠকেরক বোধে অনুভবে ধরা দেয়, তখন তার নাম গূঢ়ার্থপ্রতীতি। 'গূঢ়ার্থে'র এই 'প্রতীতি' যখন সৌন্দর্যের অনুভব হয়ে ওঠে অর্থের গুণে, তখনই তা হয় গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার। কূঢ় অর্থের উজ্জ্বল আলোতে এসে 'কেরোসিন-শিখা' আর 'মাটির প্রদীপ' তখন গৃহকোণটিকে আলোকিত করার তুচ্ছ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, এসে দাঁড়ায় সমাজের বৃহত্তর অঙ্গানে, নির্দেশ করে সমাজের দুটি স্তরকে। তখন তারা শুধু কথাই বলে না, কঠিন সত্যের উচ্চারক হয়ে ওঠে।

ব্যাজস্তুতি

সংজ্ঞা : ভাষায় বা বাইরের অর্থে (বাচ্যার্থে) যাকে নিন্দা বা স্তুতি বলে মনে হয়, গভীর অর্থে (গূঢ়ার্থে) যদি তা যথাক্রমে স্তুতি বা নিন্দা বলে বোঝা যায়, তাহলে যে অর্থসৌন্দর্য ফুটে ওঠে, তার নাম ব্যাজস্তুতি অলংকার।

(নিন্দার ছলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি।)

উদাহরণ :

১. নিন্দার ছলে স্তুতি—

(i) ভাঙ্‌ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে।

ব্যাখ্যা : শিবকে নেশাখোর (ভাঙ্‌ খান) মাতাল (মত্ত) বলা হল। দুটি বিশেষণই নিন্দাসূচক। এ কথাও বলা হল, প্রতিটি বিষয়েই তাঁর অসন্তোষ, অতৃপ্তি। কেবলমাত্র বেলপাতা (বিল্বদল) পেলেই তিনি খুশি। সুতরাং, সব মিলিয়ে যে চরিত্রটি প্রকাশ পেল, তা সাধারণভাবে অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু 'কেবল তুষ্ট বিল্বদলে' কথাটির গভীরতর তাৎপর্য এই, অন্তরের ভক্তিটুকু মিশিয়ে তাঁকে একটুখানি স্মরণ করলেই তিনি তুষ্ট। এ কারণে শিবের আর একটি নাম আশুতোষ। তুষ্ট হলে যেকোনো কাম্যবস্তু অতি সহজেই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব। এইখানেই তাঁর শ্রদ্ধেয় পরিচয়। বাক্যের নিন্দাসূচক ইঙ্গিত বাইরে থেকে পাওয়া গেলেও শিব প্রশংসিতই হলেন। নিন্দার ছলে স্তুতি প্রকাশ পেল বলে এখানকার অলংকার ব্যাজস্তুতি।

(ii) ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।।

সংকেত : আমার স্বামী ভূত নাচিয়ে বেড়ান, এমন বিয়ে যিনি দিলেন, সেই নিষ্ঠুর বাপের মৃত্যু হলেই ভালো। এ অর্থ নিন্দাসূচক। কিন্তু, আমার স্বামী ভূতনাথ—দেবাদিদেব মহাদেব, এমন স্বামীর সঙ্গে যিনি আমাকে ধন্য করেছেন, তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি হিমালয় পর্বত। এ অর্থ স্তুতিবাচক। নিন্দার ছলে স্তুতি।

২. স্তুতির ছলে নিন্দা—

(i) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! —মধুসূদন
(মেঘনাদবধকাব্য/প্রথম সর্গ)

ব্যাখ্যা : 'সুন্দর মালা' যার গলায়, তিনিও সুন্দর, শ্রদ্ধেয়। অতএ, উদ্ধৃত বাক্যের অন্তর্গত সম্বোধনে সমুদ্রের (প্রচেতঃ) প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করা হল, বাহ্যত তা স্তুতি বা প্রশংসার ভাষা। কিন্তু, বাইরের অর্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে (গূঢ়ার্থ) পৌঁছলেই বোঝায় যায়, এ 'মালা' আসলে বানরসৈন্যের তৈরি সেতু, যার বন্ধনে বাঁধা পড়ে অলঙ্ঘ্য অজেয় সমুদ্র আজ রামচন্দ্রের কাছে বন্দি। এ 'সুন্দর মালা'র গূঢ়ার্থ পরাক্রান্ত সমুদ্রের পায়ে বাঁধা শিকল'। সমুদ্রের পক্ষে এ লজ্জার, নিন্দার বিষয়। ভাষায় যাকে স্তুতি বলে মনে হয়, অর্থে তা নিন্দা বলে বোঝা গেল। সুতরাং উদ্ধৃত বাক্যে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়েছে।

(ii) বন্ধু ! তোমার দিলে নাক দান
রাজ সরকার রেখেছেন মান !
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন। —নজরুল ইসলাম
(সর্বহারা/আমার কৈফিয়ৎ)

ব্যাখ্যা : 'রাজ সরকার' (ইংরেজ সরকার) সত্যি যদি কবির লেখাকে অমূল্য সম্পদ (যার অসীম মূল্য) গণ্য করে থাকেন, তবে কবির পক্ষে অবশ্যই তা সম্মানের, শ্লাঘার বিষয় এবং এ আচরণ ইংরেজ সরকারের পক্ষে প্রশংসার বিষয়। তবে, এই অর্থটি উদ্ধৃত স্তবকের বাইরের অর্থ (বাচ্যার্থ)। এই বাইরের অর্থে অবশ্যই রয়েছে ইংরেজ সরকারের প্রতি কবির স্তুতি। কিন্তু এই বাচ্যার্থ পেরিয়ে ভেতরের অর্থে পৌঁছলেই বোঝা যাবে কবি প্রতি ইংরেজ সরকারের প্রকৃত আচরণটি। 'অ-মূল্য' শব্দটি প্রয়োগ করে (মূল্যহীন অর্থে) কবি ইঙ্গিত করলেন একটি তথ্যের দিকে—সরকার বিনামূল্যেই কবির লেখা সংগ্রহ করে নিয়েছিল ওগুলি বাজেয়াপ্ত করে। সরকারের এই আচরণটি অবশ্যই নিন্দনীয়। গূঢ়ার্থে সেই নিন্দাই উচ্চারিত। অতএব, স্তবকটিতে রয়েছে ব্যাজস্তুতি।

স্বভাবোক্তি

সংজ্ঞা : বস্তুর আচরণ এবং স্বভাবের সূক্ষ্ম সুন্দর যথাযথ বর্ণনা যখন ওই বস্তুটিকেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে, তখন সেই বর্ণনা থেকে সে অর্থসৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তার নাম স্বভাবোক্তি অলংকার।

(বস্তুর স্বভাবের সূক্ষ্ম সুন্দর যথাযথ বর্ণনাই স্বভাবোক্তি।)

উদাহরণ :

(i) কী জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে ?
সোনামুগ সরুচাল সুপারি ও পান ;

ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি ; কিছু ঝুনা নারিকেল ;
দুই ভাণ্ড ভালো রাই-সরিষার তেল ;
আমসত্ত্ব আমচুর ; সের দুই দুধ—
এই-সব শিশিকৌটা ওষুধবিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ো মনে করে।   —রবীন্দ্রনাথ
(সোনার তরী/যেতে নাহি দিব)

(ii) মাল চেনাচেনি দল জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে যত টানাটানি ;   —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ব্যাখ্যা : তিনটি বাক্যাংশে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত বাক্যটিতে তিনটি ক্রিয়ার উল্লেখ আছে—'মাল চেনাচেনি', 'দর জানাজানি' আর 'কানাকড়ি নিয়ে ......টানাটানি'। তিনটি ক্রিয়ায় ব্যক্ত হয়েছে কোনো বস্তুর স্বভাবের তিনটি বিশেষ লক্ষ্মণ। বস্তুস্বভাবের বর্ণনাটি ওই তিনটি লক্ষণের দ্বারা এতই সূক্ষ্ম সুন্দর এবং যথাযথ হয়ে উঠছে যে, বস্তুটি যে হাট, এটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। বর্ণনার মধ্য দিয়ে হাট-ই বিশেষভাবে চিহ্নিত হচ্ছে। অতএব, এখানকার অলংকার স্বভাবোক্তি।

২৮.১০ সারাংশ-৩

বিরোধমূলক :

কার্য-কারণ সম্পর্ক ঠিক রেখে কোনো ঘটনা যেমন ঘটবার কথা, তার উল্টোটা কোনো কবিতায় ঘটলেই বুঝব সেখানে 'বিরোধ' আছে। কিন্তু, এ বিরোধ বাইরের, ভেতরের অর্থে বিরোধ নেই। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে'—'শিশুর পিতা'-র ঘুমিয়ে থাকার উল্টো ছবিতে 'বিরোধ'। এখানেই কথার সৌন্দর্য, অর্থের অলংকার—বিরোধমূলক অর্থালংকার।

বিরোধাভাস : দুটি বস্তুর মধ্যে বাইরে থেকে বিরোধ দেখানো হলে বিরোধাভাস। 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়'—গ্রহীতা গ্রহণ করছে, দাতার ঋণ বাড়ছে, বাইরে থেকে এ কথায় রয়েছে বিরোধ। গ্রহীতা প্রেম যত গ্রহণ করছে, দাতা তত ধন্য হচ্ছে, ভেতরের এ অর্থ বুঝলেই বিরোধ মিলিয়ে যায়।

শৃঙ্খলামূলক :

সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ, কাউন্টারের পাশে সারিবদ্ধ ক্রেতা, আলমারির তাকে সাজানো বই দেখতে সুন্দর। কারণ শৃঙ্খলা। কবিতায় বাক্য বা বাক্যাংশের বিন্যাসে শৃঙ্খলার এই সৌন্দর্যই শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। 'পরশে চাহনি তার, দৃষ্টিতে চুম্বন, আর চুম্বনে মরণ' 'পরশ' থেকে 'চাহনি'-'চুম্বন' হয়ে 'মরণ'-এ উত্তরণ—তিনটি বাক্যাংশের এই বিন্যাসে রয়েছে শৃঙ্খলা।

একাবলি : আগের বাক্য-বাক্যাংশের থাকা বিশেষ্য-বিশেষণের পরের বাক্য-বাক্যাংশে বিশেষণ-বিশেষ্য হয়ে যাওয়ার নাম একাবলি। '.....কাব্য বর্ণনাবহুল, ...বর্ণনা চিত্রবহুল, ...চিত্র বর্ণবহুল'—বিশেষণ 'বর্ণনাবহুল' থেকে বিশেষ্য 'বর্ণনা', বিশেষণ 'চিত্রবহুল' থেকে বিশেষ্য 'চিত্র'।

ন্যায়মূলক :

'ন্যায়'-এর একটি অর্থ যুক্তি। এই 'ন্যায়' বা যুক্তির সহযোগে কোনো কথা কবিতা হয়ে উঠলে সেই কথার সৌন্দর্য হবে শৃঙ্খলামূলক অর্থালংকার। 'ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি / মধ্যে রাখে ব্যবধান'—ঈর্ষা যে বড়োর ধর্ম, এটা বোঝাতে দুটি বড়ো গাছের মাঝখানে-থাকা ফাঁকা জায়গার যুক্তি বা 'ন্যায়ে'র সাহায্য নেওয়া হল।

অর্থান্তরন্যাস : একটি বাক্যের কথা (সামান্য বিশেষ কারণ বা কার্য) আর-একটি বাক্যের কথাকে (বিশেষ সামান্য কার্য বা কারণ) সমর্থন করলে অর্থান্তরন্যাস।

'হেন সহবাসে .... বর্বরতা কেন না শিখিবে ? / গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্ম্মতি'—দ্বিতীয় বাক্যের কথা (নীচের সঙ্গে মিশলে নীচ হতেই হয়) সমর্থন করছে প্রথম বাক্যের কথাকে (রাম-লক্ষ্মণ-বানরের সঙ্গে বাস করে বিভীষণ তো বর্বরতা শিখবেই)।

গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক :

শব্দ-বাক্যের বাইরের তুচ্ছ অর্থ পেরিয়ে আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল অর্থ (গূঢ়ার্থ) যখন পাঠকের বোধে অনুভবে ধরা দেয়, তখন তা গূঢ়ার্থপ্রতীতি। গূঢ়ার্থের এই প্রতীতি অর্থের গুণে যখন সৌন্দর্যের অনুভব হয়ে ওঠে, তখনই তা হয় গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অর্থালংকার। 'মাটির প্রদীপে'র পক্ষে 'ভাই' বলে ডাকা আর 'কেরোসিন শিখা'র পক্ষে গলা টিপে দেওয়া—এই বাইরের অর্থটা তুচ্ছ, অর্থহীন। কিন্তু ভেতরের অর্থে সমাজের দুটি স্তরের প্রতীক হিসেবে এদের সম্পর্কটা বাস্তব, অর্থপূর্ণ। গূঢ়ার্থের এই প্রতীতিতেই রয়েছে কথার সৌন্দর্য, অলংকার।

ব্যাজস্তুতি : বাইরের অর্থে নিন্দা বা স্তুতি থেকে ভেতরের অর্থে স্তুতি বা নিন্দা বোঝালে ব্যাজস্তুতি। 'ভাঙ্ খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে'—নেশাখোর মাতাল অসন্তুষ্ট শিবের প্রতি নিন্দা বাইরের অর্থে, ভক্তজনের কাছে আশুতোষ শিবের প্রতি স্তুতি ভেতরের অর্থে—গূঢ়ার্থে। 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ'—সুন্দর মালা-পরা সমুদ্রের প্রতি স্তুতি বাইরের অর্থে, সেতুর বন্ধনে বন্দি সমুদ্রের প্রতি নিন্দা ভেতরের অর্থে—গূঢ়ার্থে।

স্বভাবোক্তি: বস্তুর স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা থেকে বস্তুটি বোঝা গেলেই স্বভাবোক্তি। 'মাল চেনাচেনি', 'দর জানাজানি', 'কানাকড়ি নিয়ে ...... টানাটানি'—এ সব বর্ণনা থেকে বোঝা যায় বস্তুটি হাট। বাইরের বর্ণনা থেকে ভেতরের বস্তুটির বোধ জেগে-ওঠা, এটা গূঢ়ার্থপ্রতীতি। এখানেই অলংকার।

২৮.১১ অনুশীলনী-৩

১. বিরোধ শৃঙ্খলা ন্যায় আর গূঢ়ার্থপ্রতীতি—অর্থালংকারের এই চারটি লক্ষণ থেকে কীভাবে চারটি শ্রেণির অলংকার গড়ে ওঠে, একটি করে উদাহরণের সাহায্য নিয়ে সংক্ষেপে দেখিয়ে দিন।

২. কাকে বলে লিখুন এবং একটি করে উদাহরণ দিন—বিরোধাভাস, একাবলি, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি।

৩. কী অলংকার এবং কেন, লিখুন—

(ক) না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।

(খ) পায়ের তলায় নরম ঠেকল কি।
আস্তে একটু চলনা ঠাকুর-ঝি।
** ** ** **
জ্যৈষ্ঠ আসতে কদিন দেরি ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?

(গ) গাছে গাছে ফল, ফুলে ফুলে অলি....

(ঘ) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।

একক ২৯ ❑ বৈষ্ণব পদাবলী—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

গঠন

২৯.১ উদ্দেশ্য
২৯.২ প্রস্তাবনা
২৯.৩ মূলপাঠ
২৯.৪ মূল পাঠের ভাববস্তু বিশ্লেষণ ও কাব্য মূল্যায়ন।
২৯.৫ বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও সারাংশ।
২৯.৬ সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ও তাঁদের কবিকৃতি আলোচনা
২৯.৭ অনুশীলনী
২৯.৮ উত্তরমালা
২৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের চিরন্তন রূপরেখাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের কবিকৃতির নানা দিক জেনে এই চারজন কবির সৃষ্টি সম্পদের মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়, যথা—গৌরাঙ্গ বিষয়ক, পূর্বরাগ-অনুরাগ, অভিসার, প্রেম বৈচিত্র ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবোল্লাস ও মিলন প্রার্থনা ইত্যাদির মূল তথ্য ও রস ব্যঞ্জনা আস্বাদন করে প্রতিটি পর্যায়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- চৈতন্যপূর্ব, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য পরবর্তী—এই তিনটি স্তরের কবিদের রাধা-কৃষ্ম প্রেমলীলার আস্বাদন সম্পর্কে ধারণা ও তার রূপদানের ক্ষেত্রে যে তারতম্য আছে তা জানতে পারবেন।
- বৈষ্ণব কবিগণ—‘দেবতারে প্রিয় করি—প্রিয়রে দেবতা।’ কিভাবে করেছেন—বিভিন্ন পদের ভাববস্তু জেনে বুঝতে পারবেন।
- ব্রজবুলি ভাষা, অলঙ্করণ মণ্ডণকলা, ছান্দসিক প্রকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিদের মৌলকত্ব কোথায় এবং কোন্ পদে কিভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আপনারা অর্জন করবেন।

- চণ্ডীদাসের সঙ্গো জ্ঞানদাসের এবং বিদ্যাপতির সঙ্গো গোবিন্দদাসের মিল কোথায়? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তা জানতে পারবেন।
- বৈষ্ণব পদাবলীর রসবিচার ও বিভিন্ন কবির পদ মূল্যায়ন করে আপনারা নিজের ভাষায় বৈষ্ণবতত্ত্ব সাহিত্যরস ও কবিকৃতি সম্পর্কে মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারবেন।

২৯.২ প্রস্তাবনা

চণ্ডীদাসের 'পূর্বরাগ' ও 'ভাবোল্লাস ও মিলন', বিদ্যাপতির 'মাথুর' ও 'প্রার্থনা', জ্ঞানদাসের 'প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ' ও 'রূপানুরাগ, এবং গোবিন্দদাসের 'অভিসার' ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পর্যায় থেকে মোট ৮টি পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় প্রত্যেক কবির পরিচিতি ও তাঁদের পদগুলির কাব্য মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন পদের বহু শব্দের শব্দার্থও দেওয়া হয়েছে। পদগুলি দু'তিনবার পাঠের পর, আলোচনা ও শব্দার্থ ভালোভাবে শিখে আপনারা প্রতিটি পদের ভাববস্তু ও কবিদের সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। পদাবলীর বিভিন্ন স্তরের পদগুলির ভাব-ভাবনা, রস-ব্যঞ্জনার দিকগুলিও স্পষ্ট অনুধাবন করে নানা প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে দিতে পারবেন।

চণ্ডীদাস - ১

পূর্বরাগ ও অনুরাগ

১

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গোঁ
আকুল করিল মোর প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গোঁ
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করলি গোঁ
কেমনে পাইব সই তারে।।
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গোঁ
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গোঁ
যুবতী-ধরম কৈছে রয়।।
পাসরিতে কবি মনে পাসরা না যায় গোঁ
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

ভাবোল্লাস ও মিলন

২

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল।।
চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার।।
প্রভাত-সময় কাক-কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িল বসিল তায়।।
মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব ভেল শুভ
বিহি ভেল অনুকূল।।

বিদ্যাপতি - ২

১

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।।
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া।।

তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।

বিদ্যাপতি কহ কৈছেঁ গোঙায়বি

হরি বিনে দিন রাতিয়া।।

২

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম

সুত-মিত-রমণী-সমাজে।

তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ

অব মঝু হব কোন কাজে।।

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।

তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,

অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।।

আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়লুঁ

জরা শিশু কতদিন গেলা।

নিধুবনে রমণী- বসরঙ্গে মাতলুঁ,

তোহে ভজব কোন বেলা।।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত

ন তুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,

সাগর-লহরী সমানা।।

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়

তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।

আদি-অনাদিক- নাথ কহায়সি,

অব তারণ-ভার তোহারা।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

জ্ঞানদাস - ৩

১

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়ে গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।
সখি কি মোর করমে লেখি।।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।।
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে।।
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম-দোষে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।।

২

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর্য়াছি মনে সেই সে করিব।।
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।

বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে।।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।।
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার।।
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে।।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।।
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে, ভেজাই আগুনি।।

গোবিন্দদাস — ৪

অভিসার

১

কন্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।।
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কন-পণ ফণিমুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে।।
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

গৌরাঙ্গ-বিষয়ক

১

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর।।
চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-wমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর।।
অবিরত প্রেম- রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।

বৈষ্ণব পদাবলীতে 'শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর' — এই পঞ্চরসের প্রকাশ থাকলেও মূলত 'মধুর' রসের ধারায় দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহের নানা সুরে ঝঙ্কৃত পদগুলি কেন হৃদয়স্পর্শী তা বুঝতে পেরে প্রতিটি পদের যাতে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন তার জন্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চণ্ডীদাসকে কেন সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি বলা হয়, জ্ঞানদাস কেন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, বিদ্যাপতি কেন ঐশ্বর্যের ও সুখের কবি, গোবিন্দদাস কেন 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে চিহ্নিত—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরও আপনারা পাবেন। বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্য ও চিরন্তনতার ভিত্তি কি? তার সন্ধানও এই এককের বিভিন্ন পদের মধ্য দিয়ে এবং আলোচনার নানা ধারার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। নির্দিষ্ট পদকর্তাদের পদগুলি ভালোভাবে পাঠ করুন এবং তার সঙ্গে কাব্য মূল্যায়ন অংশ অনুধাবন করুন।

২৯.৩ মূলপাঠ ঃ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের দুটি করে নির্বাচিত পদ

২৯.৪ মূলপাঠের সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন

— চণ্ডীদাসের পদ —

পূর্বরাগ (১ নং)

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম........"

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের কবি শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের এই পদটি 'শ্রবণজাত' পূর্বরাগের অন্যতম নিদর্শন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সঙ্গীত মূর্চ্ছনাময় নাম শ্রবণ করে আকুল হয়েছেন। তাঁর মর্ম লোকে সঞ্চারিত হয়েছে এমন এক ভাব বিহ্বলতা যা তিনি আগে অনুভব করেন নি। শ্যাম নামে যে এত মধু — তা রাধিকার কাছে ছিল অজ্ঞাত। শ্যাম-নামে বিমুগ্ধা রাধা সারাক্ষণ আপনমনেই উচ্চারণ করে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম। নাম জপ করতে করতে রাধার দেহ-মন অবশ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য তীব্র ব্যাকুল বাসনা রাধাকে করে তুলেছে পাগলিনী। যার নাম শ্রবণেই হৃদয় এমন উদ্বেল, তাঁর অঙ্গের স্পর্শে না-জানি কি অনির্বচনীয় সুধা লুকিয়ে আছে? শ্রীকৃষ্ণের বসতি কোথায়? তাঁর নয়ন-বিমোহন মূর্তি কীরূপ? এসব ভেবে শ্রীরাধিকার মনে প্রশ্ন জেগেছে যে তাঁর যুবতীধর্ম রক্ষা করাই হয়তো কঠিন হবে। শ্রীকৃষ্ণের মধুর নাম কিছুতেই বিস্মৃত হবার নয়। চণ্ডীদাসের মতে কুলগরবিনী ও যৌবন গরবিনী নারীরা নিরুপায় ভাবেই তাঁদের জীবন-যৌবন কুলমান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেন। তাই শ্রীরাধিকার উদ্বেগ ও উপায়ন্তর বিহীনতাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস এই পদটিতে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগের উদ্বেগ দশাটিকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "চণ্ডীদাস প্রেমকে জগত বলিয়া জানিয়াছেন।"— মন্তব্যটি যথার্থ। চণ্ডীদাসের কাছে জগৎ প্রেমময়। তাঁর সৃষ্ট রাধিকা প্রেম-সর্বস্বা। সখীদের সঙ্গে দিনকাটানোর মুহূর্তে শ্রুতিপথে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবেশমাত্রই সেই নামের প্রভাবে তাঁর হৃদয় মন আবিষ্ট হয়। হৃদয়ের গভীরে দেখা দেয় নব-অনুরাগরঞ্জিত পূর্বরাগের ভাবব্যাকুল ঢেউ। কৃষ্ণকে পাবার জন্য তাঁর মন হয় উতলা। নিরলঙ্কৃত ভাষায় ভগবৎ প্রেমের ভাব-ব্যঞ্জনা বাস্তব জীবন আঙ্গিনার ছোঁয়ায় বাণীমূর্তি লাভ করেছে। ভাবের প্রগাঢ়তায় ও রচনা নৈপুণ্যে পদটি নিঃসন্দেহে রস-সমৃদ্ধ হয়েছে।

"নাম-পরতাপে যার ঐছন করলগো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"

পদ্যাংশে কবি মনস্তত্ত্বের গভীরতায় প্রবেশ করে রাধার উপায়ন্তর বিহীনতার রূপটি সার্থক ভাবে অঙ্কিত করেছেন। ভক্ত তার অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পমের জন্য প্রস্তুত। ভগবৎ প্রেম ব্যাকুলতার উজ্জ্বল নিদর্শন এই পদটি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই পদটি শ্রবণজাত পূর্বরাগের। বাস্তব জীবনে শুধু নাম শুনেই প্রেম উৎপন্ন হয় না। এছাড়া নামে মাধুর্য ভগবৎ প্রেমেরই বিশেষ লক্ষণ। "জপিতে জপিতে নাম'— অর্থাৎ নাম জপের উল্লেখ আছে।

এর মধ্যেও ভগবৎ প্রেমেরই নির্দেশ রয়েছে।

শব্দার্থ ঃ পরতাপে — প্রতাপে, নাম-পরতাপে — নামের প্রতাপে বা শক্তিতে বা প্রভাবে।

ঐছন — এইরূপ, যাচায় — সেধে দান করে,

পাসরিতে — ভুলতে, ধরম — ধর্ম, কৈছে — কেমন করে।

চণ্ডীদাসের পদ (২ নং)

ভাবোল্লাস ও মিলন

"সই, জানি, কুদিন সুদিন ভেল।.......,"

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণার পর ভাব-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনের শুভমুহূর্ত আসন্ন — এই আশায় শ্রীরাধিকার মন প্রাণ পুলকবন্যায় ভেসে গেছে। সখীদের ডেকে রাধিকা বলেছেন যে তাঁর জীবনের অন্ধকার দিন শেষ হয়ে সুদিন ফিরে আসছে। মনোমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যে শীঘ্রই ফিরে আসবে তা তাঁর অদৃষ্টই যেন বারবার বলছে। মিলন আনন্দের স্বপ্নে বিভোর রাধার চুল স্ফূরিত হচ্ছে, বসন উড়ছে, যৌবন পুলকবন্যায় ভাসছে। রাধার বাঁ চোখ নাচছে—আনন্দে গলার হার দুলছে। কাকের মুখে প্রিয়ের আগমন বার্তা শুনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রাধা খাবার দেয়। এতদিন কাকেরা খাবার খেয়ে চলে যেতো। কিন্তু আজ অন্য ছবি। রাধার ডাকে কাকেরা মনের আনন্দে তাঁর কাছে উড়ে এসে বসেছে। মুখের পান আপনা-আপনি খসে পড়ছে। দেবতার মাথা থেকে আশীর্বাদী ফুল পড়ছে। চণ্ডীদাস বলেন—সব দিক থেকেই শুভ, বিধাতা অনুকূল হয়েছেন।

''ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বিদ্যাপতি চিহ্নিত হলেও এই পদে চণ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় ভাবের জগতে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন প্রত্যাশাটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। মঙ্গলসূচক লৌকিক বিশ্বাসের এক একটি দৃষ্টান্তের মালা গেঁথে শ্রীরাধিকার ভাব সম্মিলনের মানসিক প্রস্তুতি ও আশার আনন্দ রসঘন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। রাধার অন্তরে চির প্রশান্তির পূর্ব পর্বটি প্রকাশ পেয়েছে। ভণিতায় চণ্ডীদাস দীর্ঘ বিরহকাতরা শ্রীরাধার প্রত্যাশা বিশ্বাসকে দৃঢ় করবার জন্যই শুভদিনের আগমনবার্তা ও বিধাতার আনুকূল্যের কথা বলেছেন। নিরলঙ্কার সহজ সৌন্দর্যই চণ্ডীদাসের পদগুলির লাবণ্য। এই পদটিতেও তার ব্যতিক্রম নেই। 'মাথুর' পর্যায়ে চণ্ডীদাসের লেখনীতে বিচ্ছেদের বেদনার চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক গভীরতর প্রেম উপলব্ধি। সেই উপলব্ধিরই ক্রম-পরিণত প্রকাশ ঘটেছে এই পদে। বিরহের দহন জ্বালা সহ্য করে চিরন্তন বাঙালি নারীর মতো সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক রূপিনী রাধা এই পদে আশার প্রদীপ জ্বেলে মিলনোন্মুখ হয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ সই — সখি (সম্বোধন)। ভেল — হ'লো। কপাল কহিয়া গেল — অদৃষ্ট যেন বলে গেল। চিকুর ফুরিছে- আনন্দে চুলগুলি স্ফূরিত হচ্ছে। তাম্বুল — পান, বিহি — বিধি, পিয়া — প্রিয়া। তুরিতে ত্বরিতে — তাড়াতাড়ি, শীঘ্র।

— বিদ্যাপতির পদ —

মাথুর - (৩)

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।"

সার সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

প্রাণাধিক প্রিয় সখীর কাছে বিরহিনী রাধিকা তাঁর বিরহ বেদনার কাহিনী নিবেদন করছেন। কৃষ্ম দীর্ঘদিন ধরে বৃন্দাবন অন্ধকার করে মথুরায় চলে গেছেন। তার ফলে রাধার জীবনে দেখা দিয়েছে সীমাহীন বিরহ আর্তি। পূর্ণ বর্ষাকাল — ভাদ্রমাস। রাধার গৃহ মন্দির শূন্য। আকাশ মেঘে ঢাকা। সর্বদা মেঘের গুরু গরু গর্জন। পৃথিবী বৃষ্টি ধারায় স্নাত। কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রিয়তম কাছে নেই, হয়েছেন সুদূর প্রবাসী। কামদেবের বাণে তাঁর দেহ আজ জর্জর। মেঘের ডাকে মিলন পিপাসু ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নাচছে, ভেকেরা মত্ত, ডাহুকী, কলরবে মুখর। প্রকৃতি জগতের এই আনন্দরসঘন মুহূর্তে রাধার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। দিক-দিগন্ত-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ঘোর অন্ধকার রাত — আকাশের বুকে ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক-দমক। কবির প্রশ্ন, কৃষ্মবিহীন শ্রীরাধিকার রাত কাটবে কী করে?

এই পদটিতে বিদ্যাপতি শ্রীরাধিকার হৃদয় বেদনাকে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যে পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। সুরে-ছন্দে, ভাবে বর্ষা প্রকৃতির উন্মাদনাময় পরিবেশে শ্রীরাধার হৃদয় চাঞ্চল্যকে কবি অনুপমভাবে প্রকাশ করেছেন। এখানে হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা নেই, আছে রসাবেশ। হৃদয়ের বেদনাকে কবি ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতেই কবি বর্ষা দিনের মত্ততাকে পটভূমিকায় রেখেছেন। বিদ্যাপতির চরমরূপ দক্ষতার প্রকাশ এই পদে আছে। মদনের বাণে শ্রীরাধিকার হৃদয় জর্জরিত। শেষ চরণে কবি-প্রশ্ন করেছেন—

‘কৈ ছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।’

পদটিতে অলৌকিক আবেদনের চেয়ে লৌকিক আবেদনের প্রাধান্যই দেখা যায়। শ্রীরাধার অনির্বচনীয় মানসিক উদাসভাব পদটিতে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। শব্দের ঐশ্বর্যে ও ভাবের মাধুর্যে পদটি সার্থক।

শব্দার্থ ঃ ওর — সীমা। বাদর — বাদল, বর্ষা। মাহ — মাস, ঝম্পি — ঝাঁপিয়া। গরজন্তি — গর্জন করছে। সন্ততি — সতত। বরিখন্তিয়া — বর্ষণ করছে। পাহুণ — প্রবাসী। কুলিশ — বজ্র। দাদুরী — ভেক, ব্যাঙ। অথির — অস্থির। বিজুরিক পাঁতিয়া — বিদ্যুতের পঙ্‌ক্তি বা সারি। গোঙায়বি — কাটাবি। রাতিয়া — রাত্রি।

বিদ্যাপতির পদ — ২ নং

।। প্রার্থনা।।

“তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম
সুত-মিত-রমনী সমাজে।”

সার-সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

উত্তপ্ত বালুকাময় সমুদ্রতীরে বৃষ্টির ধারা পড়ামাত্র শুকিয়ে যায়, ঠিক তেমনি পুত্র-মিত্র-স্ত্রী পরিবৃত সংসারও ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বরই একমাত্র চিরন্তন। কিন্তু বিদ্যাপতি সেই শাশ্বত ঈশ্বরকে ভুলে ক্ষণকালের সংসারেই নিমগ্ন থেকেছেন। মায়াময় সংসারের মোহে আবদ্ধ থেকেই কবি জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবির ভাবনা — তিনি আজ কোনো কাজে লাগবেন ঈশ্বরের? তাঁর চোখের সামনে ব্যর্থতার ঘন অন্ধকার। তিনি বুঝতে পেরেছেন দীন দয়াময় ভগবানই একমাত্র মুক্তিদাতা। অগাধ বিশ্বাস নিয়ে ভাবছেন—ঈশ্বরই তাঁকে দেখাবে প্রকৃত মুক্তির পথ।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

কবির সমগ্র জীবন কেটে গেছে চেতনাহীন অবস্থায়। অর্দ্ধেক জীবন তিনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন, অজ্ঞানতায় শৈশবকাল, যৌবনে নারীসঙ্গ লাভের নেশায়, আর জরা ব্যাধিতে বার্দ্ধক্যকাল কাটানোর ফলে ঈশ্বরের ভজনার সময় কবি পাননি। স্রষ্টা ব্রহ্মারও মৃত্যু লয় আছে। কিন্তু ঈশ্বর অনাদি-অনন্ত। সমুদ্রের বুকে ঢেউ যেমন জাগে এবং সমুদ্রের বুকেই তা বিলীন হয়, ঠিক তেমনি ঈশ্বর থেকে জীব-জগতের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের মধ্যেই তার বিলয়। সেইজন্য ঈশ্বরের উপাসনা ছাড়া জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন, ভগবানই একমাত্র গতি, মুক্তিদাতা। কবির আত্ম বিশ্লেষণের পর ঈশ্বরের কাছে তাঁর করুণ প্রার্থনা—ভগবান যেন তাঁকে মুক্তি পথের যাত্রী করেন।

'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদ রচনায় বিদ্যাপতি তুলনারহিত। এই পদে কবির আত্মসমালোচনা ও আত্ম-বিশ্লেষণের সুর প্রাধান্য পেয়েছে। মায়া মোহে সারা জীবনে যে ভাবে দিন অতিবাহিত করেছেন তার জন্য কবি অনুতপ্ত। মরুময় জীবনে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে যে সুগভীর বিশ্বাস জন্মেছে তারই ঐকান্তিক নিবেদন—

'তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।''

হতাশার হাহাকারের পাশাপাশি ঈশ্বরের করুণাপ্রার্থী কবি ভক্তি বিনম্রচিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছেন ঈশ্বরেরই পদতলে। পরিশুদ্ধ আত্মনিবেদনের সুরে পদটি স্নাত। রূপ, মোহ, তৃষ্ণা, প্রেম সব মিথ্যা। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই একমাত্র ঈশ্বরের পূজা উপাচার এই দার্শনিক ভাবনায় উত্তরণে পদটি সুসমৃদ্ধ। পদলালিত্য, উপমা প্রয়োগ ইত্যাদি গুণে পদটি শিল্প-সুষমা মণ্ডিত হয়েছে।

শব্দার্থ ঃ তাতল — উত্তপ্ত, সৈকত — বালু।

সুত-মিত-রমণী সমাজে — পুত্র, মিত্র ও স্ত্রী-সমাবেশে বা সঙ্গে। তোহে — তোমাকে। বিসরি — বিস্মৃত হয়ে। বিশোয়াসে — বিশ্বাস। আধ-জনম — অর্ধেক জন্ম। নিন্দে — নিদ্রায়। জরা — বার্দ্ধক্য। চতুরানন — যাঁর চার মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মা। তুয়া — তোমার। সমাওত — প্রবেশ করে। ভণয়ে — বলে।

জ্ঞানদাসের পদ

।। প্রেম বৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ ।।

''সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।''

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

চণ্ডীদাসের 'ভাবশিষ্য' জ্ঞানদাস এই পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ শ্রীরাধিকার মর্ম ব্যথাকে আক্ষেপানুরাগের হাহাকারের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে সুখে দিন কাটাবার আশায় শ্রীরাধিকা তৈরী করেছিলেন যে স্বপ্নের ঘর তা চরম হতাশার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতসাগরে ডুব দিতে গিয়ে পেলেন বিষ। শ্রীরাধিকা জানেন না তাঁর কপালে কী আছে? স্নিগ্ধ চাঁদের আলো তার কর্ম দোষে পরিণত হয়েছে সূর্যের প্রখর রৌদ্রে, উঁচু পাহাড়ে উঠতে গিয়ে তিনি পড়েছেন অগাধ জলে। লক্ষ্মীদেবীর করুণা চেয়ে তাঁর ভাগ্যে জুটেছে চরম দারিদ্র্য। অবহেলায় মণি- মাণিক্য সব হারিয়েছেন। নগর পত্তন করেছেন, মাণিক্য লাভের আশায় সমুদ্রবন্ধন করেছেন, কিন্তু কপাল দোষে সমুদ্র শুকিয়ে গেছে, মাণিক্য হারিয়ে গেছে। পিপাসা নিবারণের জন্য মেঘের কাছে জল চেয়ে তাঁর

ভাগ্যে জুটেছে বজ্র। এই বজ্রপতনই যেন তাঁর ভাগ্যলিপি। জ্ঞানদাসের মতে, কৃষ্ণপ্রেম-মৃত্যু-যন্ত্রণার মতোই বেদনা কণ্টকিত।

এই পদটির রচয়িতাকে ঘিরে জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস দুই কবির নামই গবেষকগণ চিন্তা ভাবনা করে পদটি যে জ্ঞানদাসেরই রচনা এ সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন।

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।"

পদের সূচনায় এই চিরন্তন আশাহত জীবনের হৃদয়স্পর্শী বেদনার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বিষম-অলঙ্কারের সুখ—দুঃখ (অনল) অমিয় — গরল এই বৈষম্যই আলঙ্কারির সৌন্দর্য সঞ্চার করেছে। অপূর্ব প্রয়োগে শ্রীরাধার দীর্ঘ শ্বাসভরা হাহাকার ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। স্বচ্ছ অনাড়ম্বর ভাষার পারিপাট্যের পাশাপাশি বিষম অলঙ্কার সংযোজনায় কবির প্রকাশ ক্ষমতার কৌশল প্রকাশ পেয়েছে।

শব্দার্থ ঃ উচল — উঁচু। আনলে — অনলে, আগুনে। অচল — পর্বত। লছমী — লক্ষ্মী। বেঢ়ল — ঘিরে ধরলো। পিয়াস — তৃষ্মা। বজর — বজ্র। সেবিনু — সেবা করলাম। হেলে — অবহেলায়। জলদ — মেঘ। ভানু — সূর্য। অমিয় — অমৃত। মরণ অধিক শেল — মৃত্যুর চেয়েও বেদনাদায়ক।

জ্ঞানদাসের পদ (২ নং)

পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ের—
প্রকৃতপক্ষে 'রূপানুরাগের' পদ
"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

রূপানুরাগের এই পদটিতে শ্রীরাধিকা কৃষ্মের রূপে পাগলিনী হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে। কৃষ্মের গুণে তাঁর মন বিভোর। কৃষ্মের প্রতিটি অঙ্গের জন্য রাধার প্রতিটি অঙ্গ কাঁদে। হৃদয়ের স্পর্শের জন্য হৃদয় কেঁদে ওঠে। কৃষ্ম প্রেমের জন্য রাধার প্রাণ-মন অস্থির। মনের বাসনা, পূরণের জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুধা রূপসুধা পান করে রাধার হৃদয় আকাঙ্খা তৃপ্ত নয়। শ্রীকৃষ্মের দর্শন ও তাঁর শরীরের স্পর্শ লাভের জন্য রাধার দেহ মন উদ্বেলিত। সখীদের নিয়ে এমনকি গুরুজনদের সঙ্গে থাকার সময়েও শ্রীকৃষ্ম প্রসঙ্গ দেহ-মনকে পুলকবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সকলের সামনে তার জন্য অপদস্থ হতে হয় — এই ভেবে পুলক প্রচ্ছন্ন রাখতে গিয়ে চোখের জল অবিরল ধারায় বয়ে যাবার জন্য সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। রাধার এই অবস্থা দেখে ঘরের লোকজন কানাকানি করে।

কৃষ্মের রূপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ এই পদটিতে। যথাযথ ভাষার ব্যবহারে অনন্ত বাসনার তীব্র হাহাকার প্রতি চরণে ধ্বনিত হয়েছে। ভাব ও ভাষার গাঢ় বদ্ধতায় পদটি সমৃদ্ধ। চণ্ডীদাস গভীর অনুভূতির মর্মস্পর্শী গীতিকার।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

কিন্তু তাঁর ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস অন্তরতম প্রাণবেদনার সফল চিত্রকর। এর প্রমাণ পদটিতে আছে। অলংকারের সার্থক ব্যবহারে কবি রাধার ব্যাকুল হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছেন। কবির প্রকাশভঙ্গি সহজ ও সুন্দর। প্রাণ তন্ময় হয়েও জ্ঞানদাস-গুরুর মতো আত্মহারা নন। প্রকাশভঙ্গির আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর নজর আছে। হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার'। এখানে রাধার হাসি মধুর ধারার সঙ্গে তুলনা করে সার্থক উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন।

শব্দার্থ ঃ আঁখি ঝুরে — চোখের জল পড়ে। আরতি নাহি টুটে — আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় না। দরশ — দর্শন। পরশ — স্পর্শ। পহু — প্রভু। গুরু — গরিবত মাঝে — গুরু ও পূজনীয়দের মধ্যে। পরসঙ্গে — প্রসঙ্গে। লাজ — লজ্জা। পরকার — প্রকার। ভেজাই —জ্বালিয়ে দিলাম।

গোবিন্দদাসের পদ - (১নং)

।। অভিসার ।।

"কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে সংকেত স্থানে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অভিসারের পথ, দুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ। রাধা ঘরের দরজা বন্ধ করে মেঝেতে জল ঢেলে মেঝে কাদা করে তাতে কাঁটা পুঁতে পায়ের নূপুর দুটিকে কাপড়খণ্ড দিয়ে বেঁধে পায়ের আঙ্গুল চেপে চুপি চুপি চলার অভ্যাস করছেন। রাধার ঈশ্বর সাধনার এ যেন গোপন মহড়া। পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুচোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে অন্ধকার পথ অতিক্রমের অভ্যাস করছেন। বর্ষণসিক্ত অন্ধকার পথে সাপের ভয় আছে। সাপের দংশন থেকে বাঁচবার জন্য হাতের কঙ্কন বন্ধক রেখে সাপুড়ের কাছে সাপের মুখবন্ধনের কৌশল জেনে নিয়েছে। গুরুজনদের কথা তিনি শুনতে পান না। এককথা শুনে উত্তর দেন অন্যকথা। আত্মীয় পরিজনের কথা শুনে মুগ্ধার মতো শুধা হাসেন। রাধিকার এই মানসিক অবস্থার একমাত্র সাক্ষী গোবিন্দদাস কবিরাজ।

'অভিসার' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রজবুলি ভাষায় অলঙ্করণের চাতুর্যে, রসের নিবিড়তায় ও অভিনব পরিবেশ সৃষ্টিতে পদটি অতুলনীয়। এই পদে কবির সখ্যভাবের সঙ্গে সম্ভোগভাবও যুক্ত হয়েছে। চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্যের সমন্বয় ঘটেছে। রাধিকার অভিসারের দুস্তর পথ অতিক্রমের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ এর সঙ্গে দুঃখজয়ের সাধনা পদটি সমৃদ্ধ।

শব্দার্থ ঃ কণ্টক — কাঁটা। গাড়ি — প্রোথিত করে। কমলসম— পদ্মের মতো। মঞ্জীর — নূপুর। চীরহি — বস্ত্রে। গাগরি-বারি — কলসীর জল। পীছল — পিচ্ছিল। দূতর — দুস্তর। পন্থ — পথ। যামিনী — রাত্রি। ভামিণী — রমণী। পয়ানক — কাটানোর। আশে — আশায়। কর-কঙ্কন — হাতের কাঁকন। ভূজগ — সাপ, পরমান — প্রমাণ।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

গোবিন্দদাসের পদ — (২ নং)

।। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ ।।

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।"

ভাব সংক্ষেপ ও কাব্য মূল্যায়ন ঃ

গোবিন্দদাস রচিত এই পদটিতে শ্রীচৈতন্য দেবের কৃষ্ণ ব্যাকুলিত দেহ-মনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শ্রীরাধিকার মতো চৈতন্যদেবের দু চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে চলেছে। বর্ষার জলে যেমন গাছ সজীব হয়, ফুল ফোটে, তেমনি কৃষ্ণ প্রেমে আকুল চৈতন্যদেবের শরীর যেন কৃষ্ণের স্পর্শ লাভের জন্য রোমাঞ্চিত। কদম ফুলের মতো চৈতন্যদেবের পুলকিত দেহ থেকে যে বিন্দু বিন্দু ঘাম নিঃসৃত হচ্ছে, তা যেন 'ভাবকদম্ব।' নটবর গৌর কিশোরের রূপমাধুর্য দৃষ্টি নন্দন। কবির কল্পনায় তা যেন যমুনা তীরের স্বর্ণতরু, যা ভাবাবেগে সঞ্চরণশীল। তাঁর গতিময় শ্রীচরণ পদ্মতলে ভক্ত Ãwমরগণ প্রেমে ভক্তিতে আকুল হয়ে গুঞ্জরণ করছে। চৈতন্যদেবের শ্রীচরণকমলের সৌরভে বিমুগ্ধ দেব-দানবেরা রাত-দিন তাঁর প্রতি আত্মভোলা হয়ে ধাবিত হচ্ছে। চলমান, 'সোনার কল্পতরু (অর্থাৎ প্রেমামগ্ন শ্রীগৌরাঙ্গদেব সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করে প্রেমরত্ন ফল বিতরণ করছেন। গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে পারেননি বলে কবির অশেষ অনুতাপ।

বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে পরিচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শ ও বিদ্যাপতির শিল্প-সৌন্দর্য পূর্ণ কবি-কর্মের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোবিন্দ দাস যে পাদমঞ্জরী উপহার দিয়েছেন তা শিল্পরস ও লালিত্যে অনুপম। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল শ্রীগৌরাঙ্গের অশ্রুস্নাত ভাব-বিহ্বল-নৃত্যরস মূর্তিকে কবি "অভিনব হেম কল্পতরু" রূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর ভক্তিনম্র রূপ বিকশিত ভাব কদম্ব রূপে চিহ্নিত। বৈষ্ণব ভক্তদের গুঞ্জনমুখর Ãwমরের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের চঞ্চলপদ পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রতিটি উপমা সার্থক। পদের ভণিতায় কবির গভীর হৃদিবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ব্যথাহত প্রাণে কবি দূর থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তি-বিনম্র প্রণতি জানিয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ নীরদ — মেঘ। স্বেদ-মকরন্দ — ঘামরূপ ফুলমধু। পেখলুঁ — দেখলাম। নটবর — শ্রেষ্ঠ নর্তক। হেমকল্পতরু — কল্পিত সোনার গাছ। তাকর — তাঁর।

২৯.৫ বিভিন্ন পর্যায়ের পদগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ও সারাংশ

গোবিন্দদাসের 'গৌরাঙ্গবিষয়ক' পদটি বাদে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদসমূহে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিভিন্নস্তরের চিত্রও ফুটে উঠেছে। এই ভগবৎলীলার নানাস্তর এই এককে সন্নিবেশিত। সংক্ষেপে প্রতিটি স্তরের তত্ত্বগত দিক তুলে ধরা হলো।

চণ্ডীদাসের ১নং পদ 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'—'পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ের। যে রতি সঙ্গামের পূর্বে স্পর্শ ও শ্রবণাদির দ্বারা উৎপন্ন হয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের উন্মীলন অর্থাৎ বিভাবাদির সহযোগে চরম আস্বাদ হয়, পণ্ডিতগণ তাকেই পূর্বরাগ বলেছেন। এই দর্শন ও শ্রবণ নানা ভাবে হয়, যেমন—

১। দর্শন—(ক) সাক্ষাৎ দর্শন, (খ) চিত্রপট দর্শন, (গ) স্বপ্নে-দর্শন।

২। শ্রবণ—(ক) বংশীধ্বনি শ্রবণ, (খ) বন্দী বা ভাটমুখে শ্রবণ, (গ) দূতীমুখে শ্রবণ, (গ) সখীমুখে শ্রবণ, (ঙ) গুণিজনের কাছে শ্রবণ।

পূর্বরাগের দশ দশার কথা রূপ গোস্বামী বলেছেন—দশাগুলি হলো—(১) লালসা, (২) উদ্বেগ, (৩) জাগর্যা, (৪) তাণব, (৫) জড়তা, (৬) ব্যগ্রতা, (৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মোহ এবং (১০) মৃত্যু।

চণ্ডীদাসের পদটি শ্রবণজাত পূর্বরাগের। শ্যামনাম শ্রবণের মধ্য দিয়ে শ্রীরাধার হৃদয়ে পূর্বরাগ (Love at first sight) উৎপন্ন হয়েছে। কবি সহজ সরল ভাষায়-রাধার আকুল প্রাণের বার্তা তুলে ধরেছেন পদটিতে। পূর্বরাগের ধ্যানমগ্ন চিত্রের সঙ্গে রাধার হৃদয়-আর্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বরাগের উদ্বেগ দশা তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে।

চণ্ডীদাসের ২ নং পদটি 'ভাবোল্লাস ও মিলন' পর্যায়ের। 'সই, জানি কুদিন-সুদিন ভেল।'—এই পদটিতে মিলনানন্দ ছড়িয়ে পড়েছে। রাধা-কৃষ্মের ইন্দ্রিয়াতীত ভাবলোকে যে মিলন এবং রাধিকার মনে সেই মিলনজনিত অনির্বচনীয় ভাবের উল্লাস - তাকেই — 'ভাবোল্লাস' রূপে চিহ্নিত করা যায়। দীর্ঘ বিরহের পরে এই মিলনান্দ। তবে এ মিলন বাস্তব মিলন নয়, ভাববৃন্দাবনের মিলন। রাধিকা আশার প্রদীপ জ্বেলে বসে আছেন শীঘ্রই সুদিন ফিরে আসবে। সংস্কারের নান চিত্রের সাহায্যে কবি রাধার প্রত্যাশিত আনন্দ মধুর মিলন মুহূর্তটিকে এঁকেছেন।

মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতির ১ নং পদটি 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।' 'মাথুর' পর্যায়ের। 'মাথুর'কে প্রবাস বলা যায়। পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশ-দেশান্তরের দূরত্বকে প্রবাস বলে। ভাবী, ভবন, ভূত—এই তিন ভাগে প্রবাসকে ভাগ করা যায়। সকলের অজ্ঞাতসারে শ্রীকৃষ্ম বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যাবার সংবাদ শুনে 'ভাবী' বিরহ স্মরণ করে রাধার হৃদয় গভীরে যে বিরহের কল্পনা তাকে 'ভাবী বিরহ' এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্মের দীর্ঘ অবস্থানের ফলে রাধা যে বিরহ ভোগ করেন তাকে 'ভবনবিরহ' এবং কথা দিয়েও ফিরে না আসার যন্ত্রণাকে 'ভূতবিরহ' রূপে চিহ্নিত করা যায়। প্রবাসজনিত বিরহের দশ দশা-চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তাণব (কৃশতা), মলিনতা, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু।

বিদ্যাপতির পদটিতে বিরহিণী রাধিকা তাঁর রিবহ আর্তি প্রকাশ করেছেন প্রিয়সখীর কাছে। বর্ষাকালের মিলন-মধুর-মুহূর্তে-রাধিকার জীবনে নেমে এসেছে বিচ্ছেদের হাহাকার। রূপদক্ষ বিদ্যাপতি আনন্দ মধুর প্রকৃতির পটভূমিকায় রাধার অন্ধকারাচ্ছন্ন উদাসভাব সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বিদ্যাপতির ২ নং পদটি 'প্রার্থনা' পর্যায়ের। রাধা-কৃষ্ম অর্থাৎ ভক্ত-ভগবানের লীলা—এই প্রার্থনা পর্যায়ে কোথাও মুখ্যস্থান গ্রহণ করেনি। অন্যান্য স্তরের পদে কবির হৃদয়ানুভূতি রাধা-কৃষ্মকে অবলম্বন করে পল্লবিত হলেও বিদ্যাপতির এই পদে কবির হৃদয় আর্তি ভক্তিরসকে অবলম্বন করে বাধাবন্ধহীন ভাবে শ্রীভগবানের পাদ-পদ্ম স্পর্শ করেছে। প্রার্থনা বিষয়ক-পদের শ্রেষ্ঠ রূপকার বিদ্যাপতি আত্ম সমালোচনার মধ্য দিয়ে আত্মনিবেদনের নৈবেদ্যগুলি সাজিয়েছেন। সারা জীবনের ব্যর্থতা, গ্লানি, বিপথগামিতা সব কিছু তুলে ধরে জীবন সায়াহ্নে ভগবানের চরণ-প্রাপ্তিই যে মুক্তির একমাত্র পথ—এই উপলব্ধির জগতে পৌঁছেছেন।

জ্ঞানদাসের ১ নং পদটি প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পদ। এখানে কবি শ্রীরাধিকার হৃদয় আর্তিকে বিষম অলঙ্কারের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি জীবনকে মধুময় করতে যা যা চেয়েছেন কপালদোষে তার বিপরীত ফল পেয়েছেন। শ্রীরাধিকার মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস পদটির পরতে পরতে আছে।

প্রেমবৈচিত্ত্যের মূল কথা হলো, প্রেমের উৎকর্ষ এবং এই প্রেমের উৎকর্ষের জন্য নিজের ভাগ্যের প্রতি আক্ষেপ। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে এই মূল তত্ত্বটিই আক্ষেপানুরাগ নামে চিহ্নিত। রূপ গোস্বামীর মতে আট রকমের আক্ষেপ আছে।

(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, (২) নিজের প্রতি আক্ষেপ, (৩) সখীর প্রতি আক্ষেপ, (৪) দূতীর প্রতি আক্ষেপ, (৫) মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, (৬) বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, (৭) কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ এবং (৮) গুরুজনদের প্রতি আক্ষেপ।

জ্ঞানদাসের এই পদে শ্রীরাধিকা নিজের প্রতি ও বিধাতার প্রতি আক্ষেপকেই প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞানদাসের ২নং পদটি 'রূপানুরাগে'র পদ। কৃষ্ণের রূপে পাগলিনী শ্রীরাধিকার মন-প্রাণ অস্থির। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁর দেহের স্পর্শ পাবার জন্য রাধা তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থাকে হারিয়ে ফেলেছে। এইজন্য তাকে ঘিরে নানা কানাকানি। ভাব ও ভাষায় পদটি সুসমৃদ্ধ।

গোবিন্দদাসের ১ নং পদটি 'অভিসার' পর্যায়ের। 'পূর্বরাগে' যে প্রেমের সূচনা 'অভিসারে'র ক্ষুরধার পথে সেই প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা। প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে সংকেত কুঞ্জে যাত্রাকেই অভিসার বলা হয়। দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে চান। রূপ গোস্বামীর মতে ছয় প্রকার অভিসারিকার। উল্লেখ আছে। যথা— (১) জ্যোৎস্নাভিসারিকা, (২) তিমিরাভিসারিকা, (৩) লজ্জালীনা অভিসারিকা, (৪) নিঃশব্দাভরণা অভিসারিকা, (৫) কৃতাবগুণ্ঠিতা অভিসারিকা, (৬) স্নিগ্ধৈক সখীযুক্তা অভিসারিকা।' পীতাম্বর দাস অভিসারকে ৮টি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মতা, সঞ্চরা।

তামসী ও বর্ষা অভিসারের প্রস্তুতি রয়েছে, গোবিন্দদাসের পদে। শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-সাধনার গোপন মহড়া দেখা যায়। অন্ধকার রাত, বিদ্যুতের চমকদমক, বজ্রপাত, সর্প দংশনের ভয় ইত্যাদির কথা মেনে রেখে সব কিছুকে জয় করে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাবে তার জন্যই রাধিকার দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি। কবি রাধার দুঃখ জয়ের সাধনার চিত্রটিকে শিল্প সৌন্দর্য দান করেছেন।

গোবিন্দদাসের ২নং পদটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক। একই অঙ্গে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব সমাজে পূজিত। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর গোবিন্দদাস পদটি রচনা করেছেন। তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাননি বলে পদটিতে আক্ষেপের সুরও ধ্বনিত হয়েছে। কৃষ্ণ প্রেমে পাগল গৌরাঙ্গদেবের ভাববিহ্বল মূর্তিটি কবি সার্থক উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। পদটি শিল্পরস ও লালিত্যে মধুর।

২৯.৬ সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

১। চণ্ডীদাস ঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে 'চণ্ডীদাস' নামযুক্ত বহু কবি পদ রচনা করেছেন। তবে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত বিভিন্ন পদাবলীর মধ্যে রসগত পার্থক্য ও ক্রমভঙ্গজনিত ত্রুটি দেখা যায়। তাছাড়া বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থ আবিষ্কারের পর 'চণ্ডীদাস' সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করে। আজও এ সমস্যার সমাধান হয়নি। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নন। তবে দীন চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কিনা—এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক গবেষকগণ আজও একমত হতে পারেননি।

পদাবলীর চণ্ডীদাস প্রাক্ চৈতন্য যুগের কবি। বীরভূমের নান্নুর বা নানুর অথবা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের অধিবাসী। বাশুলী পূজারী চণ্ডীদাস গ্রামবাংলার ভোগ-বিলাসহীন অকৃত্রিমভাবে তন্ময় কবি। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। মিলনেও তাঁর সুখ নেই। তিনি শত দুঃখকে সহ্য করেছেন। কবি সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ অনুভব করেছেন। পূর্বরাগের পদে চণ্ডীদাসের রাধা আত্ম নিবেদিতা—'যোগিনীপারা'। তাঁর কাব্য সম্ভার নিরাবৃত প্রাণের শান্ত-কোমল স্নিগ্ধতায় ভরা। বাঙালির প্রাণের কবিরূপে চণ্ডীদাস চিহ্নিত। বিলাস-ঐশ্বর্যের ধারে কাছেও তিনি যাননি। তিনি বিরহ-বেদনার শান্ত রসের আত্মনিমগ্ন কবি। পূর্বরাগ অনুরাগ থেকে শুরু করে ভাবোল্লাস মিলন পর্যায় পর্যন্ত চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় মনের কথাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি যেন কবি সরস্বতীকে ডাক দিয়ে বলেছেন—"যেমন আছ তেমনি আসো আর করো না সাজ।" প্রেমের প্রগাঢ় রূপ চণ্ডীদাস তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখনীতে রাধা ও কৃষ্ণ 'পরাণে পরান বান্ধা আপনি আপনি।' মিলনমুহূর্তেও হারাই হারাই ভাব।

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।"

লৌকিক জীবনে এই প্রেম দুর্লভ।

অভিসারের পদেও চণ্ডীদাসের পদ মর্মস্পর্শী বেদনায় স্পন্দিত। নৈশ-বর্ষাভিসারের

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।"

পদটিতে কবি কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা ও প্রেম ব্যাকুলতাকে একাকার করে রাধার হৃদয় বেদনাকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। 'আক্ষেপানুরাগে'র পদগুলিতেও কবির ভাব-নিবিড়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিবেদনের পদে চণ্ডীদাস সুদূর বৈরাগ্যের মোহিনী মায়ায় সংযতবাক্, আত্মসমর্পণী ভাব রসে নিমগ্ন।

'ভাবোল্লাস'-এর পদে—'সহ্য করিবার কবি' রূপে চণ্ডীদাস চিহ্নিত।

পদাবলীর প্রতিটি পর্যায়ের পদেই চণ্ডীদাসের হাতে শ্রীরাধিকা বাঙালি নারীর চিরন্তন সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীকরূপে সু-অঙ্কিত।

২। বিদ্যাপতি ঃ বংশগত সূত্রে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসভা কবি রূপে বহু গ্রন্থাদি লিখলেও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর বৈষ্ণবপদগুলির জন্যই তিনি বাঙালির হৃদয়ে চির আসন লাভ করেছেন। কবি 'অভিনব জয়দেব' 'মৈথিল কোকিল' নামে চির পরিচিত। তাঁর হাতে রাধা ধীরে ধীরে মুকুলিত হয়ে যৌবন লগ্নে পূর্ণ লীলাময়ী রূপ লাভ করেছেন। পূর্বরাগ অনুরাগ পর্যায়ে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে নবানুরাগের চাপল্য। বিদ্যাপতি ঐশ্বর্য্যের কবি, সুখের কবি। রূপানুরাগের পদে তিনি দেহ-সম্ভোগের কবি হয়েছেন। রূপ ও ভাবে রাধাকে বিদ্যাপতি যেভাবে সাজিয়েছেন—তা তুলনারহিত।

অভিসারের যাত্রায় তাঁর রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্যোতি ও অলঙ্কারের দ্যুতিতে উজ্জ্বল। 'মাথুরে' রাধিকার করুণ আর্তি ধ্বনিত হয়েছে। 'ভাবোল্লাস' ও 'মিলনে' বিদ্যাপতির হাতে রাধার ভাবাকুতি এক আশ্চর্য রসাবেশে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। অপার্থিব ভাব-সম্মিলনের নিদর্শন।

"আজু রজনী হাম ভাগেপোঁ হায়লুঁ"—পদটি।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

ভাবের অতলান্ত গভীরতায়, শব্দ ঝংকারের লালিত্যে, ছন্দের অপরূপ সুষমায় ও অলঙ্কারের মণ্ডনকলায় বিদ্যাপতির মধুর রসাশ্রিত পদগুলি অতুলনীয়। তাঁর মতো রস-নিপুণ স্রষ্টা বিরল।

৩। জ্ঞানদাস ঃ চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর মহাজনবৃন্দের মধ্যমণি—কবি জ্ঞানদাস। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পদে কবির জন্ম। তিনি 'খেতুরী' উৎসবেও যোগ দিয়েছিলেন। কবি নিত্যানন্দ শাখার বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সংযত হৃদয় রূপদক্ষ শিল্পী। তাঁর রূপানুরাগের পদগুলি হৃদয়-স্পন্দিত অনুভূতিতে ও ভাব-ব্যাকুলতায় গাঢ়বন্ধ। 'রূপোল্লাসে'র

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবে সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।"

পদটি স্মরণীয়। আক্ষেপানুরাগের পদে শ্রীরাধার হৃদয় বেদনা ও প্রেম তন্ময়তা কবির লেখনীতে আধুনিক কালের সীমাকে স্পর্শ করেছে। রূপমুগ্ধতা ও শ্রীরাধিকার হৃদয়-বেদনা প্রকাশে কবির চিত্র প্রতীক ও আবেগ অপূর্ব সমন্বয় লাভ করেছে।

৪। গোবিন্দদাস ঃ বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য—'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'—গোবিন্দদাস মহাজনরূপে বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করেছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। কবির অতুলনীয় কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীজীব গোস্বামী কবিকে 'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। কবি বিদ্যাপতির ভাব-ভাষাকে আত্মস্থ করে অভিনব গীতি ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর 'গৌরাঙ্গ বিষয়ক' পদ বাক্‌মূর্তি ও আবেগে অনন্য। তিনি চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্য মিশিয়ে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। অভিসারে'র পদে গোবিন্দদাস সকলকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর

'মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিলপাট।।'

পদটি এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। অবিমিশ্র ব্রজবুলি ভাষা, ছন্দের বৈচিত্র্য ও অলংকারের সার্থক প্রয়োগে তাঁর সৃষ্টি সম্ভার চিরকালের সম্পদ হয়েছে। ভাব-মাধুর্য ও হৃদয়াবেগের ঐশ্বর্যে তাঁর পদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৯.৭ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর শেষে উত্তর সংকেত মিলিয়ে নিন।

১। নীচের শূন্যস্থানগুলিতে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন ঃ

(ক) গোবিন্দদাস ———— নামে পরিচিত।

(খ) বিদ্যাপতি অভিনব ———— রূপে চিহ্নিত।

(গ) জ্ঞানদাস ———— ভাবশিষ্য।

(ঘ) বিদ্যাপতি ———— ভাষায় পদ রচনা করেছেন।

(ঙ) অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ————।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

২। নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির ডানদিকে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তরগুলির মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটির পাশে (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

(ক) চণ্ডীদাস —
(১) সুখের কবি
(২) দুঃখের কবি
(৩) নৈরাশ্যবাদী কবি
(৪) আশাবাদী কবি

(খ) 'কবিরাজ' উপাধিধারী হলেন —
(১) চণ্ডীদাস
(২) বিদ্যাপতি
(৩) গোবিন্দদাস
(৪) জ্ঞানদাস

(গ) 'প্রার্থনা' পদের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন —
(১) চণ্ডীদাস
(২) বিদ্যাপতি
(৩) জ্ঞানদাস
(৪) গোবিন্দদাস

৩। 'ব্রজবুলি' ভাষা সম্পর্কে ৪ লাইনে আপনার বক্তব্য লিখুন।

....

....

....

....

৪। 'পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।'

এই পদ্যাংশটি কার লেখা? কোন্ পর্যায়ের? পদ্যাংশটি ৪টি চরণে ব্যাখ্যা করুন।

....

....

....

....

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

৫। ‘তুয়া বিনা গতি নাহি আর’

কে? কোন্ পর্যায়ে? কার কাছে এই আবেদন করেছেন?

....

....

....

৬। “এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর।”

এই পদ্যাংশটি কার লেখা? কোন্ পর্যায়ের? পদ্যাংশে কোন্ জীবনরস প্রকাশ পেয়েছে?

....

....

....

৭। নীচের শব্দগুলির শব্দার্থ লিখুন।

ঐছন, পাসরিতে, ভেল, ওর, পাহুন, অথির, তাতল, অমিয়, চীরহি, পরমান।

২৯.৮ উত্তরমালা

১। (ক) দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, (খ) জয়দেব, (গ) চণ্ডীদাসের, (ঘ) ব্রজবুলি, (ঙ) গোবিন্দদাস।

২। (ক) ২, (খ) ৩, (গ) ২

৩। ব্রজবুলি ভাষা মাগধী অপÃwংশ ভাষা থেকে জাত। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বিদ্যাপতির ব্রজবুলির প্রধান উপাদান মাগধী অপÃwংশ হলেও, তাতে শৌরসেনী অপÃwংশের কিঞ্চিৎ মিশ্রণ আছে। সুতরাং উপাদানের দিক থেকে ব্রজবুলি ভাষা মৈথিলী, বাংলা এবং আংশিক হিন্দী তথা শৌরসেনী অপÃwংশের মিশ্রণে গঠিত।

৪। অংশটি চণ্ডীদাসের লেখা। পদ্যাংশটি ‘পূর্বরাগ’ পর্যায়ের কৃষ্ণের নাম শ্রবণে রাধা দিশেহারা। কি করবেন—তার ভবিষ্যৎ কী—কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবেন—এই সব চিন্তায় রাধা রমন ব্যাকুল হয়েছে। কৃষ্ণকে ভুলে যেতে চান কিন্তু তা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

৫। এই অংশটির রচয়িতা ‘মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি। অংশটি ‘প্রার্থনা’ পর্যায়ের। ভগবানের কাছে কবি এই ঐকান্তিক করেছেন।

৬। পদ্যাংশ বিদ্যাপতির লেখা। পদ্যাংশটি ‘মাথুর’ পর্যায়ের। বিরহ-বেদনা দগ্ধ রাধার জীবনের করুণরস এই অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

৭ এইরূপ, ভুলে যেতে, হলো, শেষ, প্রবাসী, অস্থির, উত্তপ্ত, অমৃত, বস্ত্রখণ্ড, প্রমাণ।

২৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন,

(২) শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ— শশীভূষণ দাশগুপ্ত,

(৩) মধ্যযুগের কবি ও কাব্য— শঙ্করীপ্রদাস বসু

(৪) বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন)—

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র,

শ্রীসুকুমার সেন,

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী,

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী,

সম্পাদিত ৩ (ষষ্ঠ সংস্করণ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

একক ৩০ ❑ রামায়ণ — (অরণ্যকাণ্ড) — কৃত্তিবাস ওঝা

গঠন

৩০.১ উদ্দেশ্য
৩০.২ প্রস্তাবনা
৩০.৩ মূলপাঠ—অরণ্যকাণ্ড—কৃত্তিবাস
৩০.৪ সারাংশ
৩০.৫ সার সংক্ষেপ
৩০.৬ (ক) প্রকৃতি চিত্র, (খ) যুদ্ধ বর্ণনা, (গ) চরিত্র চিত্রণ
৩০.৭ অরণ্য কাণ্ডের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ
৩০.৮ কৃত্তিবাসের কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা
৩০.৯ অনুশীলনী
৩০.১০ উত্তরমালা
৩০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩০.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করিলে আপনি—

- কৃত্তিবাসের বাঙলা ভাষায় অনূদিত 'শ্রীরাম পাঁচালী'র—সাতটি কাণ্ডের অন্যতম 'অরণ্যকাণ্ড' সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সব কিছু জানতে পারবেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য ছ'টি কাণ্ড সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি জানবেন।
- অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা বিন্যাস, প্রকৃতি চিত্রণ, চরিত্রাদির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সব কিছু জেনে—এই খণ্ডের যে কোনো প্রশ্ন আলোচনা করতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- অনুবাদক হিসাবে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- কৃত্তিবাসের কল্পনাশক্তি, গল্পরসবোধ, বাঙালির হৃদিরসজাড়িত চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতা, সহজ সরল ভাষার প্রকাশ-নৈপুণ্য ইত্যাদি দিক থেকে কবির যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- কৃত্তিবাসের কাব্যকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে কেন ভাবানুবাদ বলা হয় তারও পরিচয় পাবেন।
- বাল্মীকির রামায়ণের বাঙলা ভাষায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থাদির মধ্যে কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের নানা তত্ত্ব ও তথ্যাদিও জানতে পারবেন।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

৩০.২ প্রস্তাবনা

এই পাঠে কৃত্তিবাসের ‘শ্রীরাম পাঁচালী’র ‘অরণ্যকাণ্ড’ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই কাণ্ডের ঘটনা বিন্যাস নিম্নরূপ—

(১) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দণ্ডকারণ্য প্রবেশ ও ঋষিগণের দ্বারা সংবর্ধনা।

(২) বিরাধের সীতাহরণ।

(৩) বিরাধের রাম-লক্ষ্মণ হরণ।

(৪) বিরাধ সম্পর্কে নানাকথা এবং বিরাধ বধ।

(৫) রাম-লক্ষ্মণ-সীতার শরভঙ্গের আশ্রমে গমন, ইন্দ্রদর্শন ও শরভঙ্গের আগুনে প্রবেশ।

(৬) নিশাচরগণের অত্যাচারের কথা শুনে রামচন্দ্রের আশ্বাসদান এবং সুতীক্ষ্ণের তপোবনে যাত্রা।

(৭) সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে রামচন্দ্রদের অভ্যর্থনা ও বাক্য বিনিময়।

(৮) দণ্ডকারণ্যের ঋষিগণের আশ্রম দর্শনের জন্য রামের ইচ্ছা।

(৯) দণ্ডকারণ্য Ãwমণ-সম্বন্ধে সীতাদেবীর কথা।

(১০) দণ্ডকারণ্য Ãwমণ সম্পর্কে রামের বক্তব্য।

(১১) পঞ্চাপসর সরোবরের কথা, অগস্ত্যমুনির আশ্রমের নানা কথা, ইযমাবাহের আশ্রমও অগস্ত্যমুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের যাত্রা।

(১২) অগস্ত্যের অতিথি ও আপ্যায়ন ও অস্ত্রপ্রদান।

(১৩) পঞ্চবটী বনে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার যাত্রা।

(১৪) জটায়ুর সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ, অর্চনা ও পঞ্চবটী বনে প্রবেশ।

(১৫) লক্ষ্মণের পঞ্চবটীবনে আশ্রম তৈরী ও সেখানে তিনজনের অবস্থান।

(১৬) শীত-ঋতুর বর্ণনা।

(১৭) লক্ষ্মণের কাছে শূর্পনখার আগমন ও তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের প্রস্তাব।

(১৮) লক্ষ্মণের দ্বারা শূর্পনখার নাক-কান ছেদন।

(১৯) শূর্পনখার অনুরোধে খরের রাক্ষস প্রেরণ।

(২০) রামের রাক্ষস বধ।

(২১) খরের কাছে শূর্পনখার বিলাপ ও ভর্ৎসনা।

(২২) খরের ক্রোধ ও যুদ্ধ যাত্রা।

(২৩) রাক্ষসগণের অত্যাচার, উৎপাত।

(২৪) দলবল সহ খরের আগমন।

M#2\D:\EBG-2\Unit-7 Pm6.5\1st proof

(২৫) রামচন্দ্রের সঙ্গে খরের যুদ্ধ বর্ণনা।

(২৬) চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ।

(২৭) রামের ত্রিশিরা বধ।

(২৮) খরের পরাজয়, নিধন এবং দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা রামের সংবর্ধনা।

(২৯) অকম্পনের লঙ্কায় গমন, রামের বীরত্ব কাহিনী, বর্ণনা, রাবণের মারীচ অশ্রমে গমন ও ফিরে আসা।

(৩০) শূর্পনখার লঙ্কায় গমন।

(৩১) রাবণকে শূর্পনখার ভর্ৎসনা।

(৩২) সীতাকে হরণের জন্য শূর্পনখার উৎসাহ দান।

(৩৩) রাবণ-মারীচ সংবাদ।

(৩৪) মারীচের কাছে রাবণের সাহায্য প্রার্থনা।

(৩৫) মারীচ ও রাবণের পারস্পরিক ভর্ৎসনা ও রাবণের আদেশ দান।

(৩৬) সোনার হরিণের রূপ ধরে মারীচের দণ্ডকারণ্যের প্রবেশ।

(৩৬) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৩৭) মারীচ বধ।

(৩৮) সীতা-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৩৯) ব্রাহ্মণবেশে রাবণের আগমন রাবণ-সীতার কথোপকথন, সীতাহরণ ও সীতার বিলাপ।

(৪১) রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ—জটায়ুর পরাজয়।

(৪২) সীতাকে নিয়ে রাবণের আকাশপথে গমন।

(৪৩) সীতার ভর্ৎসনা ও বিলাপ।

(৪৪) সীতার মনোরঞ্জনের নানা চেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়ে অশোক কাননে সীতাকে বন্দী করে রাখা।

(৪৫) রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ।

(৪৬) সীতাহারা রামের বিলাপ।

(৪৭) বনমধ্যে সীতার অন্বেষণ ও রামের কাতরতা।

(৪৮) রামের বিলাপ ও লক্ষ্মণের প্রবোধ দান।

(৪৯) জটায়ুর কাছ থেকে সীতাহরণের সংবাদ প্রাপ্তি।

(৫০) জটায়ুর মৃত্যু ও সৎকার।

(৫১) কবন্ধের সঙ্গে দেখা—তার বাহু ছেদন—লক্ষ্মণের পরিচয় দান।

(৫২) কবন্ধ-রাম সংবাদ এবং কবন্ধের দ্বারা সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মিত্রতা স্থাপনের উপদেশ ও তার বাসস্থান নির্দেশ করে কবন্ধের স্বর্গারোহণ।

(৫৩) রাম-শবরী সংবাদ ও শবরীর স্বর্গ গমন।

(৫৪) রাম-লক্ষ্মণের পম্পা দর্শনে গমন ও রামের বিলাপ।

অরণ্যকাণ্ডের ঘটনা বিন্যাসের ক্রম-পরম্পরার যেন বৈচিত্র্য তেমনি নিবিড় ঐক্য দেখতে পাবেন। রাম-সীতার দাম্পত্য জীবনের মধুর ও বিরহ রূপটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, রামচন্দ্রের শৌর্য-বীর্যের পাশাপাশি স্নেহ-ভালোবাসা নিবিড় রূপটি আকর্ষণীয়। প্রকৃতি চিত্রণে খণ্ডটিতে ভিন্নস্বাদ-সৃষ্টি হয়েছে। বাল্মীকির 'শূরধর্মী' কাব্য কৃত্তিবাসের হাতে কিভাবে 'গৃহধর্মী' হয়েছে তার স্পষ্ট প্রমাণ 'অরণ্যখণ্ড'টি। রামের প্রেম-করুণাঘন মূর্তি, লজ্জানম্রবধূরূপী সীতা ও সর্বত্যাগী লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি অতুলনীয়। 'বাঙালির জাতীয় কবি' রূপে চিহ্নিত কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী'র অনন্য খণ্ড হল 'অরণ্যখণ্ড।' এই খণ্ডের ঘটনা ধারার সারাংশ পরের এককে আপনারা পাবেন। সেই সারাংশে প্রস্তাবনায় চিহ্নিত ঘটনাধারার সংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে। কৃত্তিবাসের কল্পনা শক্তি, ঘটনা বিন্যাস, ভাষা ও ছন্দ শৈলী, অলঙ্কার প্রয়োগ ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়েও আপনারা সমৃদ্ধ হতে পারবেন।

৩০.৩ মূল □ পাঠ অরণ্যকাণ্ড

মূলং ধর্ম্মতরোধিবেকজলধঃ পূর্ণেন্দু মানন্দদং।
বৈরাগ্যম্বুজ ভাস্করং ত্বঘহরং ধান্তাপহং তাপহম্।।
মোহান্তৌধরপুঞ্জপাটর্নবৌ স্বেশম্ভবং শঙ্করং।
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিযম্।।
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌ ভগতনং পীতাম্বরং সুন্দরং।
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তুণীরভারং বরম্।।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজুটেন সংশোভিতং।
সীতালক্ষ্মণংসংযুতং পথিগতং রামানিরামং ভজে।।

চিত্রকূট পর্বতে শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান।

করিলেন অযোধায় ভরত গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহেন তিনজন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
ভালমন্দ যখন যে রামের জিজ্ঞাসে।।
মুনিগণ একদিন করে কাণাকাণি।
জিজ্ঞাসা করেন সবে রাম রঘুমণি।।
কহ কহ মুনিগণ কি কর মন্ত্রণা।
আমারে না কহ কেন বাড়াও যন্ত্রণা।।
আমরা সকলে করি একত্র বসতি।
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি।।
যদি কোনো বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
আমারে জানাও আমি করিব বিহিত।।
মুনিরা রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে।
বৃদ্ধ মুনি উঠিয়া বলেন তার মাঝে।।

যে মন্ত্রণা করিতে ছিলেন রঘুবর।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর।।
রাবণের দুই ভাই দুষ্ট নিশাচর।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর দূষণ অপর।।
তাহার সামন্তগণ চতুর্দ্দিকে wমে।
কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে।।
যজ্ঞ আরম্ভণ মাত্র আসিয়া নিকটে।
যজ্ঞ নষ্ট করে দ্বিজ পলায় সঙ্কটে।।
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি।
ফল মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গায়ে কলসী।।
এই বন ছাড়িয়া যাইব অন্য বন।
কাণাকাণি করিলাম এই সে কারণ।।
মূনিগণ ছাড়ে যদি শূন্য হবে বন।
শূন্যবনে কেমনে রহিবে তিন জন।।
সীতা অতি রূপবতী এই বন মাঝে।
কেমনে রাখিবে রাম রাক্ষস সমাজে।।
বিক্রমে বিশাল তুমি আমি জানি মনে।
কত সম্বরিয়া রাম থাকিবা কাননে।।
আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই।
তোমার সহিত আর দেখা হবে নাই।।
স্ত্রী-পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর।
যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর।।
উঠে গেল মুনিগণ শূন্য দেখা যায়।
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায়।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
গাইল অরণ্যকাণ্ডে প্রথম শিকলি।।

অত্রি মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত
মুনিপত্নির নিকট সীতার জন্মাদি কথন
এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরাধ বধ।

আমা নিতে ভরত আইল পুনর্ব্বার।
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার।।
চিত্রকূট অযোধ্যা নহেত বহু দূর।
ভরত wাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর।।
রঘুনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে।
চিত্রকূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে।।
কতদূর যান তারা করি পরিশ্রম।
সম্মুখে দেখেন অত্রি মুনির আশ্রম।।
প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন।
বন্দনা করেন অত্রি মুনির চরণ।।
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে।।
আপনার পত্নী ঠাঁই সমর্পিলা সীতা।
পালন করহ যেন আপন দুহিতা।।
দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।।
শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুক্ল সর্ব্ব বেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াচে কেশ।।
তপস্যা করিয়া মূর্ত্তি ধরেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা।।
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা।
আর্শীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা।।
মুনিপত্নী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে।
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে।।
রাজকুলে জন্মিয়া পড়িলে রাজকুলে।
দুই কুল উজ্জ্বল করিলে গুণে শীলে।
এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়।
হেন স্ত্রী পাইলা রাম বহু তপস্যায়।।
সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম।
সকল সম্পদ মম দূর্ব্বাদল শ্যাম।।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য্য কিবা ধনে।
অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে।।
জিতেন্দ্রিয় প্রভু মম সর্ব্বগুণে গুণী।
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি।।
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

আশীর্ব্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।।
শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্ট মুনি দারা।
আপনার যেমন সীতার সেই ধারা।।
সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন।
দিব্য অলঙ্কার আর বহু মূল্য ধন।।
তুষ্ট হ'য়ে সীতারে কহেন ভগবতী।
তব পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহ গো সীতা সতী।।
জানকী বলেন দেবী কর অবধান।
আমার জন্মের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।।
একদিন মেনকা যাইতে বস্ত্র উড়ে।
তাহা দেখি জনক রাজার বীর্য্য পড়ে।।
সেই বীর্য্যে জন্ম মোর হইল ভূমিতে।
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে।।
অযোনি সম্ভবা মম জন্ম মহীতলে।
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা মোরে নিল কোলে।।
নিজ কন্যা বলি রাজা মনে অনুমানি।
হেনকালে আকাশেতে হৈল দৈববাণী।।
দেবগণ ডাকি বলে জনক ভূপতি।
জন্মিল তোমার বীর্য্যে কন্যা রূপবতী।।
অযোনিসম্ভবা এই তোমার দুহিতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা।।
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে দিলেন বহু ধন।।
প্রধান দেবীর ঠাঞি দিলেন আমারে।
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে।।
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে।
আমা দেখি জনক চিন্তেন মনে মনে।।
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে।
তাঁরে সমর্পিব সীতা পরম কৌতুকে।।
দারুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার।
তের লক্ষ বর এল রাজার কুমার।।
ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাঁপে।
না সম্ভাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আগে না পান ভাবিয়া।
কেমনে সম্পন্ন হবে জানকীর বিয়া।।
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধনুক দেখিয়া হাস্য করেন তখন।।
ধনুকেতে দিতে গুণ সর্ব্বলোকে বলে।
ধনুখান ধরি রাম বাম হাতে তোলে।।
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে।
সবে স্তব্ধ তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে।।
ধনুকের শব্দে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেতে কাঁপিল সর্ব্বজনা।।
শিরে পঞ্চঝুঁটিরাম বিক্রম বিস্তর।
চূড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার।।
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে।
না করেন স্বীকার পিতার অগোচরে।।
রাজ্যসহ দশরথ আসিয়া সম্বাদে।
রামের বিবাহ দেন পরম আহ্লাদে।।
শ্রীরাম করিলেন আমার পাণিগ্রহ।
লক্ষ্মণের দারকর্ম্ম ঊর্ম্মিলার সহ।।
কুশধ্বজ খুড়ার যে দুই কন্যা ছিল।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে বিবাহ করিল।।
ভগবতী পূর্ব্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামীরাম।।
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী।
পরিতুষ্ট হইলেন মুনির গৃহিণী।।
ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দুর।
কণ্ঠে মণিময় হার বাহুতে কেয়ুর।।
কর্ণেতে কুণ্ডল করে কাঞ্চন কঙ্কন।
নূপুরে শোভিত হয় কমল চরণ।।
নাসায় বেসর দেন গজমুক্তা তায়।
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিত গৌর গায়।।
প্রদোষ হইল গত প্রবেশ রজনী।

রামের নিকটে যান শ্রীরাম রমণী।।
উমা রামা নাহি পান সীতার উপমা।
চরাচরে জনক দুহিতা নিরুপমা।।
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি।
মুনির আশ্রমে সুখে বঞ্চেন রজনী।।
প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তর্পণ।
তিন জন বন্দিলেক মুনির চরণ।।
আর্শীর্ব্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি।
কহিলেন উপদেশ উপযুক্ত বাণী।।
শুন রাম রাক্ষস প্রধান এই দেশ।
সদা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ।।
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান।
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।।
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি।।
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
জনক তনয়া মধ্যে কি শোভা তখন।।
ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরের কেকাধ্বনি wমরের গীত।।
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।।
বন মধ্যে অনেক মুনির নিবসতি।
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি।।
রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সম্মান।
যথা তথা থাক রাম তুমি ভগবান।।
রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ।।
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন।
তিন জনে মনসুখে করেন wমণ।।
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
নানা স্থলে কৌতুকে করেন নিরীক্ষণ।।
হেনকালে দুর্জ্জয় রাক্ষস আচম্বিত।
বিকট আকারেতে সম্মুখে উপস্থিত।।
রাঙ্গা দুই আঁখি তার কঠিন হৃদয়।
বনজন্তু ধ'রে মারে কারে নাহি ভয়।।
দুর্জ্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখ খান।।
শিরে দীর্ঘজটা কাটা দীর্ঘ সর্ব্বকায়।
লম্বোদর অস্থিসার শিরা গণা যায়।।
বান্ধিয়া লইয়া যায় মাংস ভার স্কন্ধে।
পলায় লইয়া প্রাণ সবে তার গন্ধে।।
মেঘের গর্জ্জনে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রাক্ষস বিরাধ।।
সীতায় রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে।।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে থাকে অন্তরীক্ষে।।
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়া বদন।
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জ্জন।।
তপস্বীর বেশে রাম wমিস্ কাননে।
দেখাইয়া কামিনী ভুলাস্ মুনিগণে।।
বলিল মনুষ্য আজি করিব ভক্ষণ।
ঝাঁট পরিচয় দেহ তোরা কোনজন।।
শ্রীরাম বলেন আমি ক্ষত্রিয় কুমার।
লক্ষ্মণ অনুজ জায়া জানকী আমার।।
দেখি হে তোমার কেন বিকৃতি বদন।
বনেতে বেড়াও তুমি হও কোন্ জন।।
রাক্ষস বলিল আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই।।
বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা।
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ব্বথা।।
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে।
অভেদ্য শরীর মম ভয় করি কারে।।
লক্ষ্মণেরে শ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয়।
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস দুর্জ্জয়।।
আইলাম নিজ দেশ ছাড়িয়া বিদেশে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

সীতারে খাইবে আজ দারুণ রাক্ষসে।।
লক্ষ্মণ বলেন দাদা না ভাবিও তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ।।
লক্ষ্মণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে।
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে।।
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে।
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষ্মণে।।
তাহা দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ।
জাঠাগাছ তখনি হইল খান খান।।
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ত্রাস।
অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ।।
ছাড়েন ঐষিক বাণ দশরথ সুত।
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত।।
খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রক্তে ভাসে।
মরি মরি করি যায় শ্রীরামের পাশে।।
আছাড়িয়া ফেলে সীতা ঘায়েতে ব্যগ্রতা।
ভূমেতে পড়েন সীতা হইয়া মূর্চ্ছিতা।।
যোড়হাতে রাক্ষস শ্রীরামে করে স্তুতি।
তব বাণ স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি।।
শাপে মুক্ত করিলা আমার এই শরীর।
লইলাম শরণ চরণে রঘুবীর।।
ধন্য ধন্য সীতাদেবী রাম যার পতি।
তোমা পরশিয়া হয় শাপ অব্যাহতি।।
পূর্ব্বকথা আমার শুনহ রঘুপতি।
কুবেরের শাপেতে এই আমার দুর্গতি।।
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর।
আমারে সর্ব্বদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর।।
একদিন কুবের লইয়া নারীগণে।
রণস্থলে কেলি করে মাতিয়া মদনে।।
কর্ম্মদোষে আমি তথা হই উপনীত।
আমারে দেখিয়া তারা হইল লজ্জিত।।
কোপে শাপ আমারে দিলেন ধনেশ্বর।
দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর।।
পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন।
শ্রীরামের শরে হবে শাপে বিমোচন।।
পাইলাম তোমার দর্শনে অব্যাহতি।
মৃতদেহ পোড়ালে পাইব নিষ্কৃতি।।
লক্ষ্মণের উদ্‌যোগে দানব দেহ পুড়ে।
দিব্য দেহ ধরিয়া সে দিব্যরথে চড়ে।।
রাম দরশনে চর গেল স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস।।

শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন
ও মুনি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্ব্বাণ দান
এবং মুনির স্বর্গে গমন।

শ্রীরাম বলেন চল জানকী লক্ষ্মণ।
গোমতীর পাড়ে শরভঙ্গ নিকেতন।।
হেথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন।
অদ্ভুত দেখিবা সে মুনির তপোবন।।
তপের প্রতাপ যেন জ্বলন্ত অনল।
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল।।
সেই দিন শ্রীরাম রহেন সেইস্থানে।
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে।।
হেনকালে উপনীত তথআ শচীনাথ।
করিবারে শরভঙ্গ মুনির সাক্ষাৎ।।
রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে।
দেবগণ বেষ্টিত তাঁহার চারিপাশে।।
রথ শোভা করে মণি মুকুতার ঝারা।
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথের ত্বরা।।
চারিদিকে শোভে নীল পীত পতাকায়।
দূরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তায়।।
অনুজেরে বলেন থাকহ এইক্ষণ।
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোন্‌জন।।
ইন্দ্র আসি মুনিরে করিয়া নমস্কার।
নিবেদন করেন যে কার্য্য আপনার।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

শুনি মুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ।
আসিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ।।
রাক্ষস বধের হেতু তাঁর অবতার।
ত্রিকালজ্ঞ আপনি জানাইব কি আর।।
তবস্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ব্বাণ।
আইলে তাঁহারে তুমি করিবা প্রদান।।
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর।
প্রবেশ করেন রাম যথা মুনিবর।।
প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে।
আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহেন মুনি তাঁরে।।
অনাথ ছিলাম বলে হইলা হে নাথ।
যোগে যাঁরে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ।।
আইলা আপনি বিষ্ণু আমার নিবাস।
তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস।।
শত বৎসরের তপ করিলাম দান।
এই লও ইন্দ্রদত্ত দিব্য ধনুর্ব্বাণ।।
শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন।
প্রাণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ।।
ক্ষণেক লক্ষ্মণ সহ বৈস এইখানে।
অগ্নিতে শরীর ত্যজি তব বিদ্যমানে।।
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন অনল।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগণমণ্ডল।।
কৌতুক দেখেন সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মুনিবর সাহস দেখি বিস্মিত ভুবন।।
রাম রাম উচ্চারিয়া মুনি ঊর্দ্ধতুণ্ডে।
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ঝাঁপ দেন কুণ্ডে।।
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার।।
গোলোকে গেলেন মুনি পুণ্যফলোদয়।
দেখিয়া সবার মনে হইল বিস্ময়।।
রাম দরশনে মুনি যান স্বর্গবাস।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস।।

দশবৎসর কাল শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে
wমণান্তর পঞ্চবাটীবনে তাঁহার অবস্থিতি
ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সূর্পনখার
নাসিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্র
কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ রাক্ষাস বধ।

সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী।
কেহ কেহ ফল খান কেহ উপবাসী।।
অনাহারে কেহ বা বরিষা চারিমাস।
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস।।
গাছের বাকল পরে শিরে জটা ধরে।
মৃগচর্ম্ম ধরে কেহ কমণ্ডলু করে।।
মুনিগণে দেখিয়া উঠিল রঘুনাথ।
করেন প্রণতি স্তুতি করি যোড় হাত।।
মুনিরা করেন স্তুতি রামেরে গোচর।
শ্রীরাম বলেন প্রভু না করিহ ডর।।
তপোবনে না রাখিব রাক্ষস সঞ্চার।
অবিলম্বে হইবে রাক্ষস সংহার।।
মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তপোবন দরশনে করেন গমন।।
ধনুকে টঙ্কার দিলে রামরঘুবীর।
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির।।
বনে প্রবেশে রাম হাতে ধনুর্ব্বাণ।
নিষেধ করেন সীতা রাম বিদ্যমান।।
রাক্ষসের সহ কেন করহ বিষাদ।
অকারণ প্রাণীবধে ঘটিবে প্রমাদ।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম কর অবধান।।
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে।
কহিলেন পিতা পূর্ব্ব আখ্যান আমারে।।
দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপোবনে।
তাঁর স্থানে স্থাপ্য খড়গ রাখে একজনে।।
পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্যধন।
তেঁই যত্নে খড়গ খানি রাখেন ব্রাহ্মণ।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

এক বৃদ্ধপাখী সেই তপোবনে বৈসে।
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে।।
মুনিরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন।
সে খড়েগর চোটে লয় পক্ষীর জীবন।।
হাতে অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে।
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোষে।।
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন।।
সরলা জনকবালা কহিল এমতি।
বুঝান প্রবোধ বাক্যে তাঁরে সীতাপতি।।
কনক কমলমুখী জনক কুমারী।
আমার নাহিক ভয় কি ভয় তোমারি।।
মহাতেজা মুনিগণ যাহার সহিতে।
তাহার কিসের ভয় বল দেখি সীতে।।
যাইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর।
শুনেন অপূর্ব্ব গীত তাহার ভিতর।।
বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতর গীত শুনি কেন মুনি।।
মুনি বলিলেন হেথা ছিল এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবস রজনী।।
তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর।
পাঠায় অপ্সরিগণে যথা মুনিবর।।
আইল অপ্সরিগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া পড়িল মুনি মদন সঙ্কটে।।
সেই স্থান খ্যাত পঞ্চ অপ্সরা বলিয়া।
অদ্যপি আইসে তারা তথা লুকাইয়া।।
নৃত্য-গীত করে তারা নাহি যায় দেখা।
এমন অপূর্ব্ব কথা পুরাণেতে লেখা।।
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম।
তপোবন দেখিয়া গেলেন নিজধাম।।
আতিথ্য করেন মুনি সমাদর করি।
তিন জন বঞ্চিলেন সুখে বিভাবরী।।

কোথা পাঁচ সাত মাস কোথা দশমাস।
কোথাও বৎসর রাম করেন প্রবাস।।
এইরূপে বনে বনে করেন wমণ।
অতীত হইল দশ বৎসর তখন।।
একদিন সীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ।।
সুতীক্ষ্ম মুনিরে রাম কহেন সুভাষ।
অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ।।
মুনি বলে যাহ রাম অগস্ত্যের ধাম।
তথা গিয়া তাঁহার পুরাও মনস্কাম।।
তাঁহার কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর বনে।
অদ্য গিয়া কর বাস তাঁর তপোবনে।।
কল্য গিয়া পাইবে অগস্ত্য-তপোবন।
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন।।
বিদায় হইয়া রাম চলেন দক্ষিণে।
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে।।
রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি।
তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি।।
প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন।
লক্ষ্মণে দেখান রাম অগস্ত্যের বন।।
এই বনে ছিল এক দুর্জ্জয় রাক্ষস।
তারে বধি মুনি করিলেন এ নিবাস।।
শুনিয়া লাগিল লক্ষ্মণের চমৎকার।
মুনি হ'য়ে রাক্ষসে মারেন কি প্রকার।।
শ্রীরাম বলেন ভাই শুন তদন্তর।
ইল্বল বাতাপি ছিল দুই সহোদর।।
মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে।
বাতাপি হইয়া মেষ ব্রহ্মবধ করে।।
তার ভাই ইল্বল সে জানিত সঙ্গীত।
লোক মধ্যে wমে যেন অদ্ভুত পণ্ডিত।।
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।
মেষ মাংস দিয়া তারে করায় ভোজন।।

ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে।
বাতাপি বাহির হয় ইল্বল যবে ডাকে।।
পেট চিরি বাহিরায় বিপ্রগণ মরে।
এইরূপ করি wমে দুই সহোদরে।।
ব্রহ্মবধ শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।
ইল্বলের ঠাঁই দান মাগিল আপনি।।
দূর হৈতে আইলাম পথিক ব্রাহ্মণ।
মেষ মাংস মোরে আজি করাও ভোজন।।
মুনির বচন শুনি ইল্বল উল্লাস।
কহিল কতেক মুনি খাবে মেষ মাংস।।
বাতাপি গাড়র হয় মায়ার প্রবন্ধে।
গাড়র কাটিয়া মাংস রান্ধিল আনন্দে।।
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বৈসে।
হাতে থালা করিলা ইল্বল তার পাশে।।
গঙ্গাদেবী ব'লে মুনি মনে মনে ডাকে।
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ডলু ঢোকে।।
মুনি বলে বহু দিন মম উপবাস।
ভোজন করিব আমি গাড়বের মাস।।
গঙ্গাস্নান করি মুনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে।
মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে।।
মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক।
বাহিরে ইল্বল ডাকে ঘন ঘন ডাক।।
মুনি বলে তুমি কোথা দেখ বাতাপিরে।
ইল্বল বলিল এস বাতাপি বাহিরে।।
যেমন গর্জ্জিয়া সিংহ ধরে ভক্ষ হাতী।
ইল্বল মারিতে যুক্তি করে মহামতি।।
পণ্ডিত হইয়া তোর বুদ্ধি নাহি ঘটে।
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে।।
সেই কথা পাসরিল রাক্ষস আপনা।
মুনি বাতকর্ম্ম করে যেমন ঝঞ্জনা।।
সে অগ্নিতে ইল্বল পুড়িয়া তবে মরে।
এই মত মুনি দুই রাক্ষসের মারে।।
এই মত মারিয়া সে রাক্ষস দুর্জ্জয়।
তপোবন রক্ষা করিলেন মহাশয়।।

রামায়ণ।

আইলাম সেই অগস্ত্যের তপোবনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয় যাঁর দরশনে।।
যাইতে ছিলেন রম অগস্ত্যের দ্বারে।
হেনকালে শিষ্য এই আইল বাহিরে।।
তাঁহারে দেখিয়া বলিলেন শ্রীলক্ষ্মণ।
আইলেন রাম অদ্য সম্ভাষ কারণ।।
এতেক বচনে শিষ্য গেল অভ্যন্তরে।
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা দ্বারে তিন জন।
আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগমন।।
রামের সংবাদে মুনি হ'য়ে আনন্দিত।
আজ্ঞা করিলেন শিষ্যে আনহ ত্বরিত।।
সবাকার পূজ্য রাম আইলেন দ্বারে।
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যাঁরে।।
সবারে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়।
দেখিয়া মুনির মনে wম দূরে যায়।।
অগস্ত্য বলেন কি অপূর্ব্ব দরশন।
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন।।
গোলোক ছাড়িয়া হে করিলে বনবাস।
না জানি তোমার আর কিসে অভিলাষ।।
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার।
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।।
পথশ্রান্ত আছে রাম করাও ভোজন।
আজ্ঞামতে শিষ্যেরা করিল আয়োজন।।
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন।
তিন নিশি তথায় বঞ্চেন তিন জন।।
করিয়া প্রভাত কৃত্য শ্রীনন্দনন্দন।
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন।।
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে।

আজ্ঞা কর অগস্ত্য থাকিব কোন্ স্থানে।।
অগস্ত্য বলেন শুনি রামের বচন।
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র ভবন।।
গোদাবরী তীরে রাম দিব্য শোভে বন।
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন।।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ দিব্য ধনুর্ব্বাণ।
রামেরে অগস্ত্য মুনি করিলেন দান।।
নানা আভরণ আর সোনার টোপর।
বস্ত্র রত্ন দিয়া মুনি করেন আদর।।
অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায়।
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়।।
জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি।
পাইয়া রামের বার্ত্তা আসে শীঘ্রগতি।।
শ্রীরামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত।
আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত।।
জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন।
তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন।।
পক্ষীরাজ সম্পাতি আমার ছোট ভাই।
আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই।।
পূর্ব্বে দশরথের করেছি উপকার।
তেঁই সে তাহার সঙ্গে মিত্রতা আমার।।
আইস আইস রাম কীতা ল'য়ে ঘরে।
ইহা কহি বাসা দিল অতি সমাদরে।।
তিন জন অনুব্রজি লৈয়া গেল পাখী।
পঞ্চবটি দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী।।
লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধ বাসাঘর।
গোদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর।।
লক্ষ্মণ বলেন রাম আপন প্রধান।
কোন স্থানে বান্ধি ঘর কর সন্নিধান।।
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী তীরে।
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে।।
নিকটে প্রসর ঘাট তাহে নানা ফুল।
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল।।
শ্রীরাম বলেন হেথা বান্ধ বাসঘর।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর।।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে বান্ধেন দিব্য ঘর।
একদিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর।।
পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি।
অগ্নি পূজা করি হইলেন গৃহবাসী।।
পাতা লতা নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া।।
জটায়ু বলেন রাম আসিহে এখন।
যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন।।
এত বলি পক্ষীরাজ উড়িল আকাশে।
দুই পাখা সারি গেল আপনার দেশে।।
রজনী বঞ্চিয়া রাম উঠি প্রাতঃকালে।
স্নান করিবারে যান গোদাবরী জলে।।
সুগন্ধ সুদৃশ্য নানা কুসুম তুলিয়া।
নিত্য নিত্য করেন শ্রীরাম নিত্যক্রিয়া।।
ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
অযত্ন সুলভ গোদাবরীর জীবন।।
ঋষিগণ সহিত সর্ব্বদা সহবাস।
করেন কুরঙ্গাগণ সহ পরিহাস।।
সীতার কখন যদি দুঃখ হয় মনে।
পাসরেন তখনি শ্রীরাম দরশনে।।
রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ।
আত্মারাম শ্রীরাম নাহি কোন ক্লেশ।।
লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি।
শ্রীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী।।
রহেন এরূপে পঞ্চবটি তিন জন।
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব ঘটন।।
রাবণের ভগ্নি সেই নাম সূর্পণখা।
অকস্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা।।
wমিতে wমিতে গেল রামের সদনে।

শ্রীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদনে।।
শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান।
সুখ হয় যদি মিলে সমানে সমান।।
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী।
নবরূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি।।
জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র ধার্ম্মিক শিরোমণি।
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্ম্মাচারিণী।।
পর্ব্বত নাড়িতে চাহে হইয়া দুর্ব্বলা।
ভুলাইতে রামেরে পাতিল নানা ছলা।।
হাবভাব আবির্ভাব করিয়া কামিনী।
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাস্য বদনী।।
রাজপুত্র বট কিন্তু তপস্বীর বেশ।
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ।।
দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস।
হেন বনে wম তুমি এ বড় সাহস।।
বহুদূর নহে তারা আইল নিকটে।
হেন রূপবান তুমি পড়িলে সঙ্কটে।।
সঙ্গে দেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার।
এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার।।
সরল হৃদয় রাম দেন পরিচয়।
মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয়।।
ইনি wাতা লক্ষ্মণ প্রেয়সী সীতা ইনি।
সত্য হেতু বনে wমি শুন লো কামিনী।।
শুনিয়া আমারে দেহ নিজ পরিচয়।
কে বট আপনি কোথা তোমার আলয়।।
পরমাসুন্দরী তুমি লোকে নিরূপমা।
মেনকা উর্ব্বশী কি হইবে তিলোত্তমা।।
জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল হৃদয়।
সূর্পণখা আপনার দেয় পরিচয়।।
লঙ্কাতে বসতি আমি রাবণ ভগিনী।
নানা দেশে wমি আমি হ'য়ে একাকিনী।।
দেশে দেশে wমি আমি কারে নাহি ভয়।
তোমার কামিনী হই মনে বাঞ্ছা হয়।।
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ wাতা মহাতেজা।।
অন্য wাতা সুশীল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ভাই খর দূষণ এখানে দুই জন।।
অতি আহ্লাদের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী।
তোমার হইলে কৃপা ধন্য করি মানি।।
সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমা সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর।।
তথা যাব যথা নাই মনুষ্য সঞ্চার।
তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার।।
মনসুখে বেড়াইব অন্তরীক্ষ গতি।
এত গুণ না ধরে তোমার সীতা সতী।।
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী লক্ষ্মণ।
রাখিয়া নাহিক কার্য্য করিব ভক্ষণ।।
আমার দেখহ রাম কেমন সুবেশ।
সীতার আমার রূপ অনেক বিশেষ।।
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই ঘৃণিত।
হেন ভার্য্যা সহ থাক মনে পেয়ে প্রীত।।
যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে তখনি।
বিহার করিব গিয়া দিবস রজনী।।
শ্রীরাম বলেন সীতা না করিহ ত্রাস।
রাক্ষসের সহিত করিব পরিহাস।।
পরিহাস করেন শ্রীরাম সুচতুর।
রাক্ষসীকে বাড়াইতে বলেন মধুর।।
আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও সে যে বড় গুণী।।
সুচারু লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ।
যৌবন সফল কর কহি উপদেশ।।
লক্ষ্মণ কনক বর্ণ পরম সুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই তুমি কর বর।।
সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষ্মণেরে বলে।

তোমা হেন রূপবান পাব কোন্ স্থলে।।
তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।।
লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের দাস।
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ।।
ভুবনের সার রাম অযোধ্যার রাজা।
তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা।।
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর।
তোমায় সীতায় দেখি অনেক অন্তর।।
শুনহ সুন্দরী তুমি আমার বচন।
শ্রীরামের সন্নিধানে করহ গমন।।
উপহাস না বুঝে বচন মাত্র ধায়।
লক্ষ্মণেরে ছাড়িয়া রামের কাছে যায়।।
পুনর্ব্বার আইলাম রাম তব পাশে।
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে।।
বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।
ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসের ডরে।।
ক্ষণে বামে ক্ষণেতে দক্ষিণে যায় সীতা।
দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা।।
যেই দিকে যান সীতা সেদিকে রাক্ষসী।
রাক্ষসীর ডরে কাঁপে জানকী রূপসী।।
শ্রীরাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস।
ইঙ্গিতে বলেন কর ইহারে বিনাশ।।
ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ।
এক বাণে কাটিল তাহার নাক কান।।
খান্দা নাকে খান্দা কানে রক্ত পড়ে স্রোতে।
ওষ্ঠাধর রাক্ষসীর ভিজিল শোণিতে।।
সূর্পণখা যায় খর দূষণের পাশে।
নাকে হাত দিয়া কান্দে গাত্র রক্তে ভাসে।।
কহে খর দূষণ রাক্ষস সেনাপতি।
কোন্ বেটা করিল ভগিনীর দুর্গতি।।
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি।

মরিবার ঔষধ কে বান্ধিল দুর্ম্মতি।।
দূষণ খরের থানা যমের সমান।
যোদ্ধা চৌদ্দহাজার যার নিরূপণ।।
রাবণেরে নাহি মানে আমারে না জানে।
মরিবার উপায় সৃজিল কোন জনে।।
বসি তবে সূর্পণখা কহে ধীরে ধীরে।
আসিয়াছে দুই নর বনের ভিতরে।।
মুনি তুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে মুনি।
সঙ্গে লয়ে wমে এক সুন্দরী কামিনী।।
এক কার্য্যে গিয়া wষ্টা কহে আর কাজ।
মনের বাসনা সে কহিতে বাসে লাজ।।
গেলাম মনুষ্য মাংস খাইবার সাধে।
নাক কাণ কাটে মোর এই অপরাধে।।
ছিল চৌদ্দ জন যে প্রধান সেনাপতি।
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি।।
রামেরে মারিয়া আন লক্ষ্মণ সহিত।
গৃধ্র আর কাক্ খাক্ তাহার শোণিত।।
যার ঠাঁই ভগিনী পাইল অপমান।
তার রক্ত মাংস সবে কর গিয়া পান।।
লইয়া ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
সেনাপতি ধায় যেন যমের কিঙ্কর।।
মার মার করিয়া ধাইল নিশাচর।
কোলাহলে পূর্ণিত হইল দিগান্তর।।
সকলে আইল যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন।।
ফল মূল খাই মাত্র বাস করি বনে।
বিনা অপরাধে আসি যুদ্ধ কর কেনে।।
এইমত বিনয়ে কহিল রঘুবর।
রামেরে ডাকিয়া বলে দুষ্ট নিশাচর।।
তপস্বীর মত থাক কে করে বারণ।
ভগিনীর নাক কাণ কাট কি কারণ।।
যেই কর্ম্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ।

কোন্ মুখে বলিস না করি অপরাধ।।
তোরা দুই মনুষ্য আমরা বহুজন।
আমাদের অস্ত্রাঘাতে মরিবি এখন।।
এইমত কহিয়া সে সকল রাক্ষস।
করে অস্ত্র বরিষণ করিয়া সাহস।।
এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল।
খণ্ড খণ্ড হইল সে মুদ্গর মুষল।।
চতুর্দ্দশ বাণ রাম পূরেণ সন্ধান।
চতুর্দ্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ।।
নেউটিয়া বাণ এল শ্রীরামের তূণে।
রাক্ষস বিনাশ হয় শ্রীরামের গুণে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।।

খর দূষণের যুদ্ধে আগমন।

চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে সূর্পণখা দেখে।
ত্রাস পেয়ে কহে গিয়ে খরের সম্মুখে।।
যুঝিবারে পাঠাইলে ভাই চৌদ্দজন।
অবশ করিল না সাধিল প্রয়োজন।।
যে চৌদ্দ রাক্ষস পাঠাইলে রণ স্থান।
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ।।
খর বলে দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ।।
লইয়া চলিল নিজ অস্ত্র খরশাণ।
নিশাচর চতুর্দ্দশ হাজার প্রধান।।
প্রবল প্রস্তর ছটা তাহে নানা মণি।
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ রথের সাজনি।।
রথগুলা চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
প্রবাল মুক্তার হার করে ঝলমল।।
কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বায়ুবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান।।
অস্ত্র শস্ত্র যাবৎ তুলিয়া রথোপর।
রথস্তম্ভ ধরি উঠে মহাবলী খর।।
আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে।
না চলে রথের ঘোড়া চলে মন্দ তেজে।।
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে রাক্ষস দূষণ।
রামেরে মারিব আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।।
রাক্ষস আইল যত পরম কৌতুকে।
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচে মনসুখে।।

শ্রীরামের সহ যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সহ দূষণ ও খরের মৃত্যু।

শ্রীরাম বলেন শুন সৈন্যের কলকলি।
সীতা ল'য়ে লক্ষ্মণ ত্যজহ রণস্থলী।।
থাকিয়া আমার কাছে হইতে দোসর।
কিন্তু হেথা থাকিলে পাবেক সীতা ডর।।
বিলম্ব না কর ভাই চলহ সত্বর।
সীতাকে রাখহ গিয়া গুহার ভিতর।।
এত যদি লক্ষ্মণেরে বলিলেন রাম।
দূরেতে লক্ষ্মণ সীতা গেলেন তখন।।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আইল সর্ব্বজন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকলে দেখে রণ।।
একা রাম চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
কেমনে জিনিবে রাম বড়ই সাহস।।
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন দূষণ।
মনুষ্য হইয়া তোর মোর সনে রণ।।
দূষণের বচন শুনিয়া রাম হাসে।
রাক্ষস হাজার খর সহিত আইসে।।
ত্রিশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষস।
খর সৈন্য যত তত দূষণের বশ।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি।
রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী।।
বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগাল বেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা।।
সারথি চালায় রথ তাহে অষ্ট ঘোড়া।
রামের উপরে ফেলি মারিল ঝকড়া।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

সন্ধান পুরিয়া রাম ছাড়িলেন বাণ।
তার বাণ কাটিয়া করিল খান খান।।
দুইজনে বাণ বর্ষে দোঁহে ধনুর্দ্ধার।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি বাণে করিল জর্জ্জর।।
উভয়ের গা বহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
উভয় গায়ের রক্তে দুই বীর তিতে।।
জুড়িয়া সহস্র বাণ শ্রীরাম ধনুকে।
অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে।।
নিশাচরগণের উঠিল কলকলি।
মার মার বলিয়া পলায় কতগুলি।।
সহস্র রাক্ষস পড়ে শ্রীরামের বাণে।
জোড়েন গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ধনুকের গুণে।।
সকল রাক্ষস হৈল যেন রক্ত ময়।
আপনা আপনি লড়ে নাহি পরিচয়।।
আপনা আপনি করে নির্ঘাত প্রহার।
খরের হাজার ছয় রাক্ষস সংহার।।
সকল পড়িল বীর খর মাত্র আছে।
দূষণের সেনাপতি দেখে তার কাছে।।
আপনি নিকট হ'য়ে প্রবেশ সংগ্রামে।
মহাশূল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে।।
যে বাণ ছাড়েন রাম শূল কাটিবারে।
শূলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পারে।।
পেয়েছে অক্ষয় শূল বিধাতার বরে।
ত্রিভুবনে সেই শূল অন্যথা কে করে।।
বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা বুদ্ধি ঘটে।
শূল সহ দূষণের দুই হাত কাটে।।
দূষণের দুই হাত চন্দনে ভূষিত।।
কাটা গেল পড়িল সে হইয়া মূর্চ্ছিত।।
জ্বালায় দূষণ বীর ত্যজিল পরাণ।
দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান।।
দূষণ পড়িলে খর লাগিল ভাবিতে।
কাতর হইল বীর নেত্র জলে তিতে।।
হাতে অস্ত্র করিয়া ধাইল আগুসরে।
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে।।
রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার।।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ এড়িয়া সে খর।
ডাক দিয়া খর বীর করিছে উত্তর।।
মানুষ হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
দেবগণ নাহি পারে তুই কোন্ ছার।।
কত বাণ মারিস্ অগ্রেতে যাক দেখা।
আমার হাতেতে তোর মৃত্যু আছে লেখা।।
শ্রীরাম বলেন খর লব তোর প্রাণ।
মুনি স্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুর্ব্বাণ।।
শরভঙ্গ দিয়াছেন এ অক্ষয় তূণ।
যত চাই তত পাই নাহি হয় ন্যূন।।
শ্রীরামের বচনেতে লাগে চমৎকার।
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার।।
ত্রাস বুঝি খরের এড়েন রাম বাণ।
খান খান করেন খরের ধনুখান।।
কাটা গেল ধনুক চিন্তিত হ'য়ে খর।
লইল ধনুক আর অতি শীঘ্রতর।।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
চতুর্দ্দিকে জলস্থল ছাইল গগণ।।
নানা অস্ত্র দশদিক করিল প্রকাশ।
জিনিলাম রামেরে বলিয়া মনে আস।।
যে ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ।
রাক্ষসের বাণে তাহা হইল ছেদন।।
যে ধনুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর।
সে ধনুকে সন্ধান পুরেন রঘুবর।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুবীর পুরিল সন্ধান।
কাটিলেন খরের হাতের ধনুর্ব্বাণ।।
রথধ্বজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে লোটায় রণে সারথির মুণ্ড।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চাড়া।
কাটিলেন শ্রীরাম রথের অষ্ট ঘোড়া।।
রামের দুর্জ্জয় বাণ তারা যেন ছোটে।
আরবার খরের হাতের ধনু কাটে।।
মন্ত্র পড়ি খরবীর মহা গদা এড়ে।
যত দূর যায় গদা তত দূর পোড়ে।।
গাছের নিকটে গেলে গাছ সব জ্বলে।
আলো করি আসে গদা গগণমণ্ডলে।।
অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে।।
আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র পড়ে।
পৃথিবীতে কত ধরে অন্তরীক্ষে যোড়ে।।
অগ্নিসম বাণ জ্বলে পর্ব্বত আকার।
অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার।
পাইলেন শ্রীরাম তখন অবসর।
খরের শরীর বাণে করেন জর্জ্জর।।
সর্ব্ব কলেবর তার ভিজিল শোণিতে।
রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে বীর চাহে চারিভিতে।।
হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিল রড়।
রামেরে রুষিয়া যায় খাইতে কামড়ে।।
রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে।
শ্রীরাম ঐষিক বাণ জুড়িলেন ত্রাসে।।
বজ্রাঘাতে যেমন পর্ব্বত দুইচির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খরবীর।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস পড়ে রণে।
শ্রীরামেরে বাখানে আসিয়া দেবগণে।।
বিরিঞ্চি বলেন রাম কর অবধান।
সকল দেবতা করে তোমার কল্যাণ।
আইলেন শঙ্কর তোমায় হয়ে সুখী।
মহেন্দ্র তোমায় তুষ্ট তব রণ দেখি।।
কুবের বরুণ আদি যত দেবগণ।
অষ্টলোক পাল আসি করেন স্তবন।।
তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বচ্ছন্দে।
যথা তথা দেব দেবী রহিবে আনন্দে।।
রামেরে বন্দেন গিয়া জানকী লক্ষ্মণ।
করেন সকলে বসি ইষ্ট সম্ভাষণ।।
অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে।
জানকীর নেত্রনীর ঝর ঝর ঝরে।।
তাঁহারে কহেন রাম রণ বিবরণ।
দেখি সীতা কৈকেয়ীকে করিল স্মরণ।।
রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে।
শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনোদুঃখে।।
রাবণে কহিতে যায় আত্ম সমাচার।
নাক কান কাটা তার বিভৎস আকার।।
যার কাছে যার রাঁড়ী সেই ভয় পায়।
খেয়ে খর দূষণে রাবণে খাইতে যায়।।
সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি।
সুরগণ সহিত যেমন সুরপতি।।
নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছে মন্ত্রীগণ।
হেনকালে সুর্পণখা দিল দরশন।।
নাক কাণ কাটা তার মূর্ত্তিখানি কালি।
সভা মধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি।।
শৃঙ্গার কৌতুকে রাজা থাক রাত্র দিনে।
রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে।।
স্ত্রী মাত্র তাহার সঙ্গে কেহ নাহি আর।
যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার।।
হস্তী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর।
কতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।।
শুনি সূর্পণখার মুখেতে বিবরণ।
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন।।
কতেক কটক তার কি প্রকার বেশ।
ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ।।
কাহার নন্দন রাম কেমন সম্মান।
কেমন বিক্রমী সে কেমন ধনুর্ব্বাণ।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

সূর্পণখা বলে দশরথের নন্দন।
পিতৃসত্য পালিয়া বেড়ায় বনে বন।।
তপস্বীর বেশ ধরে নহে কোন্ মুনি।
সঙ্গে করি ল'য়ে wমে সুন্দরী রমণী।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বনে ছিল।
একা রাম সকলেরে সংহার করিল।।
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর।
তার সহ সমরে হইবে কেবা স্থির।।
রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপে পরমা কামিনী।।
সীতার রূপের সম আর নাই নারী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা হারে রূপে তারি।।
যেমন মহৎ তুমি পুরুষ সমাজে।
তার রূপ কেবল তোমাকে মাত্র সাজে।।
রামেরে ভাঁড়াও আর ভাঁড়াও লক্ষ্মণে।
আনহ রমণী-রত্ন যত্নে এইক্ষণে।।
যেমন সন্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে।
তেমনি মরুক সেই সীতা শোকানলে।।
সূর্পণখা যত বলে রাজা সব শুনে।
সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে।।
যুক্তি করে রাবণ আসিয়া সভাস্থানে।
রামে ভাঁড়াইয়া সীতা আনিব কেমনে।।
রাক্ষসের মায়া নর বুঝিতে কে পারে।
সূর্পণখা কান্দিল রাবণ বধিবারে।।
কেহ সূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে।
গাইল অরণ্যকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

সীতা হরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ।।

আরদিন দশানন আইল বাহিরে।
বুঝিয়া রাজার মন সারথি সত্বরে।।
আনিল পুষ্পক রথ অপূর্ব্ব গঠন।
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ।।
হীরা মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতি রত্নগণে।
খচিত রচিত কত সঞ্চিত কাঞ্চনে।।
মনোরথে না আইসে রথের সৌন্দর্য্য।
অষ্ট অশ্ব বন্ধ তাহে দেখিতে আশ্চর্য্য।
সেই রথে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর।
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্বর।।
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ।
সাগর লঙ্ঘিয়া যায় শতেক যোজন।।
শ্যামবট পাদপ যোজন শত ডাল।
অশীতি যোজন মূল গিয়াছে পাতাল।।
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তর যোজন হয় সে গাছের গোড়া।।
তপ করি বালখিল্য আদি মুনিগণ।
মারীচ উদ্দেশে তথা চলিল রাবণ।।
যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর।
রথে চাপি তথা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর।।
মারীচ আইল ভয়ে রাবণেরে দেখি।
সর্প যেন ভীত হয় গরুড়ে নিরখি।।
ত্রাস পায় লোক যেন যম দরশনে।
পাইলা মারীচ ত্রাস দেখিয়া রাবণে।।
রাবণ বলিল তুমি মারীচ প্রধান।
লঙ্কায় না দেখি পাত্র তোমার সমান।।
অযুত হস্তীর বল তোমার শরীরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সদা ভীত তব ডরে।।
বড় দুঃখে আইলাম তোমার গোচর।
সাগর লঙ্ঘিয়া আসি বনের ভিতর।।
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল যত নিশাচর।
সবাকারে সংহারিলা রাম একেশ্বর।।
ত্রিশিরা দূষণ খর আদি যত ভাই।
সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই।।
ধিক্ ধিক্ আমারে তোমায় ধিক্ ধিক্।
তুমি আমি থাকিতে কলঙ্ক কি অধিক।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

সূর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক কান।
হইয়া মনুষ্য কীট করে অপমান।।
আপনি রাবণ আমি পুত্র মেঘনাদ।
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক প্রমাদ।।
না করি ইহার যদি আমি প্রতিকার।
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার।।
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ।
পাত্রকার্য্য কর পাত্র শুনহ বচন।।
শুনি তার পরমা সুন্দরী এক নারী।
তার রূপ গুণ কথা কহিতে না পারি।।
তাহারে হরিব করি তোমার সহায়।
শুনিয়া মারীচ কহে করি হায় হায়।।
আবোধ রাবণ একি তোমার যুকতি।
কে দিল এ কুমন্ত্রণা তোমারে সম্প্রতি।।
প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুন্দরী।
হরিলে তাঁহারে কী রহিবে লঙ্কাপুরী।.
রাম সহ বিবাদে যাইবে যমপুরী।
শ্রীরামের নিকটে না খাটিবে চাতুরী।।
কুম্ভকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ।
মরিবে কুমারগণ হবে সর্ব্বনাশ।।
লঙ্কাপুরী মনোহর নাহিক উপমা।
সৃষ্টি নষ্ট না করিহ চিত্তে দেহ ক্ষমা।।
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি।
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কার বসতি।।
আনহ যদ্যপি সীতা করহ বিবাদ।
সবাকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ।।
কুমন্ত্রীর বচনে রাজলক্ষ্মী ত্যজে।
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে।।
যেমন ছুটিলে হস্তী না রহে অঙ্কুশে।
লঙ্কাপুরী তেমন মজিবে তব দোযে।।
বিদিত রামের গুণ আছে সর্ব্বলোকে।
প্রাণ দিল দশরথ রাম পুত্রশোকে।।

সীতা বিনা রামের অন্যে না যায় মন।
সীতার শ্রীরাম পদে মন সমর্পণ।।
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে।
জ্ঞাতি পাত্র তোমার থাকুক কুতুহলে।।
বহু ভোগ করিবে হইবে চিরজীবী।
আনিতে না কর মন শ্রীরামের দেবী।।
রাম বিনা সীতাদেবী অন্যে নাহি ভজে।
তবে তারে রাবণ হরিবে কোন্ কাজে।।
পর-স্ত্রী দেখিলে তুমি বড় হও সুখী।
সবংশে মরিবে রাজা কিছু নাহি দেখি।।
রাজা বলে মারীচ হরিণ হও তুমি।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে হরিব সীতা আমি।।
মারীচ বলেন মৃগবেশে যার তাঁর কাছে।
আগেতে আমার মৃত্যু তব মৃত্যু পাছে।।
কার্য্য সিদ্ধি না হইবে পড়িবে সঙ্কটে।
অপরাধ না করিও রামের নিকটে।।
পরিণাম ভাল মন্দ বিভীষণ জানে।
জিজ্ঞাসা করিও সে ধার্ম্মিক বিভীষণে।।
ধার্ম্মিক ত্রিজটা আছে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা।
যদি বলে আনিতে সে তবে আন সীতা।।
নহেন মনুষ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ।
নতুবা অন্যের কার এত পরাক্রম।।
মনে না করিও সূর্পণখার অবস্থা।
মরিল রাক্ষস বহু তাহাতে কি আস্থা।।
দূষণ ত্রিশিরাদির না ভাবিহ দুঃখ।
আপনি বাঁচিলে হে ভুঞ্জিবে কত সুখ।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস যেই মারে।
সবংশে মরিবে রাজা আনিয়া সীতারে।।
তোমার বিক্রম জানি শুন লঙ্কেশ্বর।
শ্রীরাম তোমায় দেখি অনেক অন্তর।।
আপন বিক্রম তুমি বাখান আপনি।
তোমা হেন লক্ষ লক্ষ জিনে রঘুমণি।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

ছাড়িলাম ভার্য্যা পুত্র স্বর্গ লঙ্কাপুরী।
তপস্বী হইয়া তব শ্রীরামেরে ডরি।।
তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়ান।
পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ।।
আমার বচন তুমি শুন লঙ্কেশর।
সীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর।।
যত বলে মারীচ রাবণ তত রোষে।
রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাসে।।

রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান।

ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।
যত বলে মারীচ তা না শুনে রাবণ।।
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি।
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর শুনরে দুর্ম্মতি।।
নরের গৌরব রাখ মন্দ বল মোরে।
আমি তোরে মারিব কে রাখিতে পারে।।
আমার প্রতাপে সদা কম্পিতা মেদিনী।
মনুষ্যের কিবা কথা দেব দৈত্য জিনি।।
আইলাম আমি ঘরে কর তিরস্কার।
আমার সম্মুখে মনুষ্যের পুরস্কার।।
বল বুদ্ধি হীন রাম হয় নরজাতি।
নিশাচর কুলে তুমি রাখিলে অখ্যাতি।।
নিষেধ করেন যদি দেব পঞ্চানন।
তথাপি আনিব সীতা না যায় খণ্ডন।।
ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূর।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য পুর।।
আমার সহিত যাবে তোমার কি ভয়।
যুদ্ধ না করিব আমি দেখহ নিশ্চয়।।
মারীচ শুনিয়া তাহা বলিল বচন।
সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ।।
হ'রেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার।
না দেখি নিস্তার রাজা হরিলে এবার।।
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার।
এইবার সবাকার হইবে সংহার।।
এক স্ত্রী আনিয়া মজাইবে যত নারী।
এই লোভ ছাড়িয়া চলহ লঙ্কাপুরী।।
সাগরের দর্প কর সাগরে কি করে।
সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে।।
আগেতে মরিব আমি রাম দরশনে।
পশ্চাৎ মরিবে তুমি পরে পুরীজনে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণেরে ভাণ্ডাব কি মায়ায়।
না দেখি উপায় কিছু ঠেকিলাম দায়।।
আমার মায়ায় রাম যদি ছাড়ে ঘর।
একা না রহিবে সীতা থাকিবে দোসর।।
যে ঘরে থাকিবে বীর সুমিত্রানন্দন।
সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন্ জন।।
যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।।
হরিতে গেলাম সীতা না হরিলাম তায়।
দেশে গিয়া এই কথা জানাও সবায়।
যদি সীতা আনিতে নিতান্ত কর মন।
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ।।
রাজা পাত্রে করে যুক্তি হ'য়ে এক মতি।
রথে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগতি।।
ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড।
রাবণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড।।

—০—

মারীচের মৃগরূপ ধারণ।

তিন কাণ্ড পুঁথি গেল শ্রীরাম মাহাত্ম্য।
আর তিন কাণ্ড শুন রাবণ চরিত্র।।
সূর্পণখা বলে ভাই এই পঞ্চবটী।
এই স্থানে কাটা গেল নাক কাণ দুটি।।
রাবণ চড়িয়া রথে চলিল গগনে।
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল দুইজনে।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

মারীচের করে ধরি কহে লঙ্কেশ্বর।
মৃগরূপ ধর তুমি দেখিতে সুন্দর।
মৃগরূপ ধরিল মারীচ নিশাচরে।
বিচিত্র সুচিত্র তার সুবর্ণ শরীরে।।
নবনীত সদৃশ কোমল কলেবর।
শ্বেতবর্ণ চারি খর দেখিতে সুন্দর।।
দুই শৃঙ্গে তার যেন প্রবাল প্রস্তর।
সোনার বিম্বকি গলে যেন দিবাকর।।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণ-মৃগ মনোহর।
দুই ওষ্ঠ শোভে তাহে যেন নিশাকর।।
স্থানে স্থানে রাঙ্গা মধ্যে কজ্জলের রেখা।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজলী ঝলকা।।
লোমাবলি দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি।।
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতলী।
রত্নের কিরণ কিম্বা শোভিত বিজলী।।
মৃগরূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে।
গাইল অরণ্য কাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে।।

মায়া মৃগরূপধারী মারীচ বধ।

বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ।
আলো করি মায়া মৃগ করিল গমন।।
দেখিয়া আপন মূর্ত্তি আপনি উলটে।
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে।।
রাম সীতা বসিয়া আছেন দুইজন।
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন।।
রাক্ষসের বংশ, ধ্বংস করিবার তরে।
ডুবাইতে জানকীরে বিপদ সাগরে।।
দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ।
বিধাতা করিল হেন মৃগের নির্ম্মাণ।।
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন।
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন।।
এই মৃগচর্ম্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি।।
আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন।
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন।
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখি বিদ্যমান।
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ।।
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী।
ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলী।।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি।
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি।
দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ।
রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ।।
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম।
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা কর্ম্ম।
লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন।।
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি মুখে।
পাতিয়া মায়ার ফাঁদ আপনার সুখে।।
রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার।
বনে গিয়া রক্ত মাংস করিবে আহার।।
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুত্তলী।
আমা সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালী।।
অবশ্য রাক্ষস আছে সহিত ইহার।
নতুবা না দেখি হেন মৃগের সঞ্চার।।
ভালমতে ইহা আমি করিব নির্ণয়।
মারীচের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয়।।
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে।
যত যুক্তি বলেন সকলি সে ঘটে।।
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর।
মারীচ আইল কেন কর ভাই স্থির।।
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধ পাপী।
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি।।
সাথি থাকে যদ্যপি রাক্ষস অন্যজন।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন।।
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি।
রত্ন মৃগ ধরিলে পাইব মনঃপ্রীতি।।
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে।
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে।।
যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে।।
আমার বচন কভু না করিহ আন।
প্রমাদ না পড়ে যেন হ'য়ো সাবধান।
বৃক্ষ আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে।
মনে ভাবে জানকীরে হরিব এক্ষণে।।
যখন যা হবে তাহা বিধির লিখন।
সীতা হেন সতী দুঃখ পান সে কারণ।।
শ্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুশর।
যান মৃগ মারিতে লক্ষ্মণে রাখি ঘর।।
শ্রীরামেরে দেখিয়া মারীচ ভাবে মনে।
পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে।।
আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ।
আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ।।
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল।।
মারীচ সশঙ্ক হ'য়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে।।
ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে বহুদূর।
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ার প্রচুর।।
ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে।
শ্রীরাম নিকটে গেলে পলায় অন্তরে।।
প্রাণে মরিবেক মৃগ না মারেন বাণ।
নিকটে পাইলে মৃগ ধরি দুই কান।।
এমন চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ।
স্বরূপত মৃগ নহে হবে দুষ্ট জন।।
ক্ষণে অদর্শন হয় ক্ষণে মৃগ দেখি।
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী।।
ঐষিক বিশিখ রাম পুরেন সন্ধান।
মারীচের বুকে বাজ বজ্রের সমান।।
বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে।
রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরি হাহাকার করে।।
তখন মারীচ করে রাবণের হিত।
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত।।
আইস লক্ষ্মণ ঝাট কর পরিত্রাণ।
রাক্ষস মিলিয়া ভাই লয় মোর প্রাণ।।
মারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এমনি।
রামের বচন মানি আসিবে এখনি।।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে।।
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ ল'য়ে হাতে।
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে।।
মারীচের বুকে বাণ কসে টান দিতে।
কৃত্তিবাস মারীচ বধ গায় অরণ্যেতে।।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ।

দূরেতে রাক্ষস করে রামতুল্য ধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি।।
হেথা শুনিলেন সীতা করুণ বচন।
বলিলেন ঝাট যাও দেবর লক্ষ্মণ।।
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন যে তোমারে।
দেখ গিয়া তাহারে কি রাক্ষসেতে মারে।।
লক্ষ্মণ বলেন নাই শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়।
শ্রীরামের মুখে নাই কাতর বচন।
এত ব্যস্ত হও সীতা কিসের কারণ।।
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন জন।
তুমি কি জাননা সীতা ধনুক ভঞ্জন।।
রামের বচন সীতা আমি নাহি শুনি।
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী।।

কারে রাখি তোমার নিকট কেবা রহে।
শূন্য ঘরে থাকা তব উপযুক্ত নহে।।
তাহা না মানেন সীতা হ'য়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি।।
বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার কাছে মন।।
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের সনে সড় আছয়ে তোমারি।।
মনের বাসনা কী সাধিবে এই বেলা।
আমার আশাতে কী রামের কর হেলা।।
অপর পুরুষে যদি যায় মম মন।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন।।
লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ।।
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষ চর।
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর।।
প্রবোধ না মানে সীতা আরো বলে রোষে।
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে।।
গন্ডি দিয়া বেড়িলেক লক্ষ্মণ সে ঘর।
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর।।
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তার পত্নী সীতা।
শূন্য ঘরে রাখি ওহে সকল দেবতা।।
আমাকে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী।
আর কিছু না বলহ দুরক্ষর বাণী।।
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে।
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে।।
হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ।
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ।।
এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ।
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ।।
ভিক্ষা ঝুলি করি কান্ধে করে ধরে ছাতি।
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা গতি।।

পরমাসুন্দরী সীতা বচন মধুর।
তাঁর রূপ দেখিয়া রাবণ কামাতুর।।
রাবণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে।
কোন্ জাতি নারী তুমি থাক কোন্ দেশে।।
কাহার ঝিয়ারী তুমি কার প্রিয়তমা।
মনুষ্য নহত তুমি সোনার প্রতিমা।।
সুললিত দুই স্তন শোভা করে হারে।
উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে।।
বিষম দণ্ডক বনে সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
এমন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে।।
পরিচয় দেয় সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
অমৃত সেবিল যেন মধুর বচনে।।
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা।
দশরথ পুত্রবধূ রামের বনিতা।।
রহ দ্বিজ ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ।
সেই ফল দিব তুমি করিও ভক্ষণ।।
অতিথিরে ভক্তি রাম করেন যতনে।
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে।।
জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি শিরে ধরি শিখা।
কি জাতি কি না ধর কেন কর ভিক্ষা।।
এতেক বলেন সীতা তপস্বীর জ্ঞানে।
নিজ পরিচয় দেয় রাজা দশাননে।।
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী।
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি।।
রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমা দরশনে।।
ফল মূল দিয়া করি উদর পূরণ।
গৃহস্থের ঘরে গেলে করায় ভোজন।।
তোমার সহিত আজি অপূর্ব্ব দর্শন।
ভিক্ষা দিলে চলে যাই নিজ নিকেতন।।
হইল অনেক বেলা কর যে বিধান।
তোমার পুণ্যেতে গিয়া করি স্নানদান।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

শ্রীরামের আসিতে বিলম্ব বহু দেখি।
হইল স্নানের বেলা দেখ চন্দ্রমুখী।।
জানকী বলেন দ্বিজ করি নিবেদন।
পঞ্চফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ।।
রাবণ বলিল সীতা ব্রত করি বনে।
আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে।।
জানকী বলেন দ্বিজ এক কথা কহি।
আজ্ঞা বিনা প্রভুর ঘরের বাহির নহি।।
রাবণ বলেন ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।।
জানকী বলেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে প্রভু কী বলিবে।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না হয় অন্যথা।
বিধির লিখন মত ঘটিবেক তথা।
ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী।
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী।।
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।
জানকী বলেন হায় একি বিপরীত।।
দুরাচার দূর হ'রে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ।।
রাবণ বলিল সীতা শুনহ বচন।
আত্ম পরিচয় কহি আমি দশানন।।
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন।
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন।।
তপস্বীর বেশ ধরি আসি তপোবন।
অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন।।
ইন্দ্রের অমরাবতী যিনি লঙ্কাপুরী।
জগৎ দুর্লভ ঠাঁই দেখিবে সুন্দরী।।
তোমার রূপেতে আমি বড় ভালবাসি।
অন্য যত মহিষী তোমার হবে দাসী।
সর্ব্বোপরি তোমাকে করিব ঠাকুরাণী।
তুমি অন্ন দিলে পাবে অন্য সব রাণী।।
হইবে তোমার পূজা বাড়িবে সম্মান।
সুবর্ণ মাণিক্যময় রবে তব স্থান।।
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
করিলে আমার সেবা রবে নানা সুখে।।
ত্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পবান।
মনুষ্য রামেরে আমি করি কীট জ্ঞান।।
অল্প বুদ্ধি যে রামের অত্যল্প জীবন।
যুগ যুগে চিরজীবী আমি দশানন।।
সীতে তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে।।
কোপান্বিতা সীতাদেবী রাবণ বচনে।
রাবণেরে গালি দেয় আসে যত মনে।।
অধর্ম্মিষ্ঠ অগণ্য অধর্ম্ম দুরাচার।
করিবেন রাম তোমার সবংশে সংহার।।
শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে তাঁহারে বলিস কুবচন।।
বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর।
রাম আর তোকে দেখি অনেক অন্তর।।
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস কেমনে এ দুষ্ট আচরণ।।
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ।
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ।।
করে দুষ্ট কুড়িপাটী দন্ত কড়মড়ি।
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।।
প্রকাশে রাক্ষস মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
অধিক তর্জ্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর।।
কিগুণে রামের প্রতি মজে তোর মন।
বল্কল পরিয়া সে বেড়ায় বনে বন।।
দেখিবে কেমনে করি তোমারে পালন।
তাহা শুনি জানকীর উড়িল জীবন।।
জানকী বলেন আরে পাতকী রাবণ।
আপনি মজিলে বেটা আমার কারণ।।

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন।।
যিনি জনকের কন্যা রামের কামিনী।
যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি।।
আপনি ত্রিলোকমাতা লক্ষ্মী অবতার।
তাহারে রাক্ষসে হরে অতি চমৎকার।।
ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেল প্রভু রাম গুণের সাগর।।
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্যঘর পাইয়া মোরে হরিল রাবণ।।
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান।
ঝাট আইস দেবর কর পরিত্রাণ।।
অত্যন্ত চিন্তিত সীতা করেন রোদন।
এমন সময় রক্ষা করে কোন্ জন।।
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ।
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন।।
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম।
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্ব্বাদলশ্যাম।।
সীতা লয়ে রাবণ পলায় দিব্যরথে।
রাম আইল বলিয়া দেখে চারিভিতে।।
জানকী বলেন শুন যত দেবগণ।
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ।
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে।
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে।।
বনের ভিতর যত আছ বৃক্ষলতা।
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা।।
মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ।
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন।।
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষস বীর।
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির।।
হায় কেন লক্ষ্মণেরে দিলাম বিদায়।
লক্ষ্মণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায়।।

রাবণ বলিল সীতা ভাব অকারণ।
পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন্জন।।
জানকী বলেন শুন দুষ্ট নিশাচর।
অল্পায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর।।
কুপিল রাবণ রাজা সীতার বচনে।
চালাইল রথখান ত্বরিত গমনে।।
জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড় নন্দন।
দূর হৈতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন।।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দ্দিকে চায়।
দেখিল রাবণ রাজা সীতা ল'য়ে যায়।।
ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর।
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর।।
দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখসাট।।
ডাক দিয়া বলে পক্ষী শুন নিশাচর।
আপনা না জানিস তুই পাপী দুরাচার।।
কোন্ দোষে হরিলি রামের সুন্দরী।
রঘুনাথ নাহি হিংসে তোর লঙ্কাপুরী।।
সুর্পনখা গিয়াছিল রমণের সাধে।
নাক কাণ কাটে তার সেই অপরাধে।।
দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর।
হরিলি তাঁহার বধূ নাহি কোনো ডর।।
কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা।।
পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গালি।
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী।।
আকাশে উড়িয়া দেখে রাম বহুদূর।
আঁচড় কামড়ে তার রথ কৈল চূর।।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া সে পড়ে
রাবণের পৃষ্ঠের মাংস থাকে থাকে ফাড়ে।।
ছিঁড়িল ঠোঁটের ঘায় সারথির মুণ্ড।
রথধ্বজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

অতি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে।
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে।।
ভূমে রাখি সীতারে সে উঠিল আকাশে।
সম্বরেন বস্ত্র সীতা পলায়ন আশে।।
পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ।
চতুর্দ্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ব্বত।।
ভয়েতে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা।।
যুঝে পক্ষীরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস।
বৃক্ষডালে বৈসে তার ঘন বহে শ্বাস।
বলহীন পক্ষীরাজে দেখিয়া রাবণ।
মায়া করি রথখান করিল সাজন।।
আরবার রাবণ সীতারে তুলে রথে।
চলিল সে মহাবলী পূর্ণ মনোরথে।।
আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর।
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর।।
রাবণ বলিল পক্ষী শুনহ বচন।
পর লাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ।।
অতঃপর পক্ষীরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ।
যাবৎ তোমার নাহি কাটি দুই পক্ষ।।
দুইজনে ঘোর রবে হইল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী।।
অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কার করিতে নারিল নিবারণ।।
রাবণের মুকুট সে রত্নের নির্ম্মাণ।
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান।।
পূর্ব্বপুণ্যে রাবণের রহে দশমাথা।
শিবের প্রসাদে তাহা না হয় অন্যথা।
কিন্তু কেশ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
নিষ্কেশ হইল রাবণের দশমুণ্ড।।
পক্ষী যুদ্ধে তাহার হইল অপমান।
ধরিয়াছে সীতারে কেমনে ছাড়ে বাণ।।
আরবার সীতারে রাখিল ভূমিতলে।
রথ শুদ্ধ রাবণ উঠিল নভঃস্থলে।।
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল।
সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল।।
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
কি করিতে পারে তাহা পক্ষীর পরাণে।।
রামের অপেক্ষা করি রহে পক্ষীবর।
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর।।
রাবণ দেখিল পক্ষী বলে নাহি টুটে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার দুইপাখা কাটে।।
ভূমিতা পড়িয়া পক্ষী করে ছট ফট।
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট।।
আমা লাগি শ্বশুর হারালেন জীবন।
রাবণের হাতে পাছে আমার মরণ।।
আমার হইল জন্ম রাবণ কারণ।
আর না পাইব শ্রীরামের দরশন।।
যাবৎ না দেখা পান শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাবৎ কহিবে তুমি মম বিবরণ।।
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর।
বলিও তোমার সীতা নিল লঙ্কেশ্বর।।
সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী।
অন্তরীক্ষে ল'য়ে গেল তোমার সুন্দরী।।
জটায়ু বলে সীতা নাহি মোর হাত।
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ।।
আমার বচন শুন না কর ক্রন্দন।
তোমারে উদ্ধারিকেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে।
রথ দেখি জানকী কাঁপেন মহাত্রাসে।।
পুনর্ব্বার সীতারে তুলিল রথোপরে।
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে।।
অসার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কূল।
অতি কৃশা দীনবেশা কান্দিয়া আকুল।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী।
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী।।
সীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে।
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে।।
রাবণ পাখীর যুদ্ধে হৈল লণ্ড ভণ্ড।
কি জানি আসিয়া রাম কাটিবেন মুণ্ড।
এই ভয়ে রাবণ পলায় ঊর্দ্ধশ্বাসে।
তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে।।
রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভূষণ।
সীতার ভূষণ পুষ্পে ছাইল গগণ।।
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী।
সে ভূষণে সুশোভিত হইল পৃথিবী।।
ছিঁড়িয়া ফেলেন মণি মুকুতার ঝারা।
হিমালয় শৈল যেন বহে গঙ্গাধারা।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ।।
জানকী বলেন কোথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অভাগীরে দেহ দেখা আসি এইক্ষণ।।
ঋষ্যমুখ নামে গিরি অতি উচ্চতর।
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর।।
নল নীল গবাক্ষ পবন নন্দন।
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুইজন।।
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ।
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ।।
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি।
গায়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরী।।
রামের সহিত যদি হয় দরশন।
তাঁহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ।।
হেনকালে সুগ্রীবেরে বলে হনুমান।
সীতা রাখি রাবণের করি অপমান।।
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে।
সীতা ল'য়ে পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে।।
সীতা লৈয়া দক্ষিণদিকে চলিল রাবণ।
দৈবে পথে সুপার্শ্বের সহ দরশন।।
সম্পাতির নন্দন সুপার্শ্ব নাম তার।
বিন্ধ্যাচলে থাকি ভক্ষ্য যোগায় পিতার।।
জটায়ুর wাতস্পুত্র সম্পাতি-নন্দন।
সে না জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ।।
জটায়ুর মরণ সুপার্শ্ব যদি জানে।
রাবণেরে মারিত সে দিন সেইক্ষণে।
শূকর মহিষ হস্তী যত পায় বনে।
সহস্র জন্তু ঠোঁটে করি আনে।।
সাগরের জলজন্তু যখন সে ধরে।
তিন ভাগ জল তার আচ্ছাদন করে।।
এক ভাগ সাগরের জলমাত্র রয়।
এমন বৃহৎ কায় বিহঙ্গ দুর্জ্জয়।।
জটায়ুর wাতস্পুত্র গরুড়ের নাতি।
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি।।
পাকসাট মারে পাখী ঝড় যেন বহে।
ত্রাসেতে রাবণ মাথা তুলি ঊর্দ্ধে চাহে।।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করয়ে ক্রন্দন।
শুনিল সে পক্ষীরাজ উপর গগন।।
পাকসাট মারে পাখী তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে।
দুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে।।
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
সীতারে হরিয়া ল'য়ে যায় দশানন।।
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে।
রথশুদ্ধ গিরিবারে দুই ঠোঁট মেলে।।
রথ মধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী।
ভাবে নারী হত্যা করি হব কি নারকী।।
রথ খান বন্ধ করি রাখে পাখা দিয়া।
রাবণ বলিল তারে বিনয় করিয়া।।
লঙ্কায় বসতি আমার নাম যে রাবণ।
তোমার করিনা কোন্ শত্রু আচরণ।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

করিয়াছে রাঘব আমারে অপমান।
সহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কাণ।।
ভাই খর দূষণের রাম মহা অরি।
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের সুন্দরী।।
ত্রিভুবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে দুর্জ্জয়।
তব ঠাঁই পক্ষীরাজ মানি পরাজয়।।
সুপার্শ্ব করিয়া ক্ষমা ছাড়িল তখন।
সেইক্ষণে রথ ল'য়ে চলিল রাবণ।।
এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা।
সমুদ্র দেখিয়া হন ভয়েতে মূৰ্চ্ছিতা।।
দেখিয়া সমুদ্র তীর রাবণ উল্লাস।
জলনিধি উত্তরিল করিয়া প্রয়াস।।
ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার।
কৃপার আধার রাম করিবেন পার।।
অধোমুখী জানকী কান্দেন আশঙ্কায়।
উত্তরিল দশানন তখন লঙ্কায়।।
রথ হৈতে সীতারে নামায় লঙ্কেশ্বর।
কোথায় রাখিব বলি চিন্তিল অন্তর।।
শত্রুতা হইল রাম লক্ষ্মণের সনে।
নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুই জনে।।
রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর।
এতেক রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।।
এতেক যুঝির রাম লক্ষ্মণের সনে।
কি করিতে পারি মোরা আছি যত জনে।।
রাজা বলে শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর।
সাগরের পার থাক সতর্ক অন্তর।।
রাক্ষস হইয়া এত ভয় হয় নরে।
ধিক্ ধিক্ তোসবারে যারে স্থানান্তরে।।
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে।
লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে।।
রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন।
সীতারে রাখিব কোথা ভাবে সর্ব্বক্ষণ।।
সীতারে প্রবোধ বাক্য কহে দশানন।
লঙ্কাপুরী দেখ সীতা তুলিয়া বদন।।
চন্দ্র সূর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদা খাটে।
মোর আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে।।
চারিদিকে সাগর তার মধ্যে লঙ্কা গড়।
দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড়।।
দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করে রাখিব তোমার সে সবারে।।
নানা ধনে পূর্ণ দেখ আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সীতাদেবী সকলি তোমার।।
তোমার সেবক আমি তুমি ত ঈশ্বরী।
আজ্ঞা কর সীতা ল'য়ে যাই অন্তপুরী।।
সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা।
কোপ না করিও মোরে চন্দ্রমুখী সীতা।।
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে।
বিমুখী হইয়া বলিলেন ধীরে ধীরে।।
রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।।
শুনিয়া সীতার বাক্য নিরস্ত রাবণ।
তাঁর কাছে নিযুক্ত করিল চেড়িগণ।।
সীতারে রাখিল ল'য়ে অশোক কাননে।
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়িগণে।।
সূর্পণখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন।
গলে নখ দিয়া বেটীর বধিব জীবন।।
খান্দা মুখে গর্জ্জে খান্দী সভয় অন্তরে।
রাবণের ডরে কিছু বলিতে না পারে।।
সশোকা থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম সলিল নয়নে।।
জানকীর দুঃখে দুঃখী সদা দেবগণ।
ইন্দ্রেরে ডাকিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন।।
লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সীতা দশ মাস।
এতদিন কেমনে করেন উপবাস।।

জানকী মরিলে সিদ্ধ না হইবে কাজ।
এই পরমান্ন লৈয়া যাহ দেবরাজ।।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন তখন।
জানকী আছেন যথা অশোক কানন।।
বাসব বলেন সীতা না ভাবিহ চিতে।
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেল মৃগ মারিবারে।
হরিল তোমাকে সে রাবণ শূন্য ঘরে।।
সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার।।
শোক পরিহর সীতে স্থির কর মন।
পরমান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ।।
জানকী বলেন লঙ্কা নিশাচরময়।
ইন্দ্র যদি হও তবে দেহ পরিচয়।।
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবিলেন মনে।
সহস্র লোচন হইলেন সেইক্ষণে।।
ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহস্রলোচন।
তাঁহার প্রতীতি মনে জন্মিল তখন।।
দিলেন সীতাকে ইন্দ্র পরমান্ন সুধা।
যাহা ভক্ষণেতে যায় তৃষ্ণা আর ক্ষুধা।।
আগে পরমান্ন দেন রামের উদ্দেশে।
আপনি ভক্ষণ সীতা করিলেন শেষে।।
পায়স ভক্ষণে তৃপ্তি কী হইবে তাঁহার।
রামের বিরহানল জ্বলে অনিবার।।
মহেন্দ্র বলেন সীতা না হও বিকল।
প্রতিদিন আমি যোগাইব সুধা ফল।।
সীতারে আশ্বাস করি যান পুরন্দর।
অন্তরে জানকী দুঃখ পান নিরন্তর।।
লঙ্কাতে রহেন সীতা অশোক কাননে।
বনে রাম আইলেন শূন্য নিকেতনে।।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বড় অভিমান।
অরণ্যেতে গান রামশোকের নিদান।।
স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ।

—০—

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার
অন্বেষণ।

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইলেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল কত দেখেন গোচরে।।
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।।
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষ্মণ আসেন পাছে শূন্য রাখি ঘর।।
মারীচের আহ্বানে কী লক্ষ্মণ ভুলিবে।
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে।।
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা।
যা ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা।।
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা।
আজিকার দিনে মোর রক্ষা কর সীতা।।
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি।।
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্যঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি।।
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী।
জ্ঞান হয় যে ভাই হারালাম জানকী।।
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ।
রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্য ধন।।
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ পাব নাই।।
কি হইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে।
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে।।
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতলি।
শূন্যঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।

দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর।
হিংস্রজন্তু কতমত কত নিশাচর।।
কোন্ দণ্ডে কোন্ দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ।
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ।।
এই বনে দুষ্টগণ রাক্ষসের থানা।
মুনিগণ সকলে করেন সদা মানা।।
পূর্ব্বাপর লক্ষ্মণ তোমাকে আছে জানা।
তথাপি লক্ষ্মণ না করিলে বিবেচনা।।
তোমারে কি দিব দোষ মম কর্ম্মফল।
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল।।
আমার অধিক ভাই তব বুদ্ধি বল।
কর্ম্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল।।
মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে।
হের সেই রাক্ষস পড়েছে মম বাণে।।
ভয়ঙ্কর বিকট মুষল ডানি হাতে।
দেখ ভাই মারীচ পড়িয়া আছে পথে।।
এইমত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই।।
উপনীত হইলেন কুটিরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে।।
শূন্য ঘর দেখেন না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী।।
শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ রাখিব না আর।।
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে।
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল।।
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুইবীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর।।
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ।।
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ।
এইরূপে একস্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার।।
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্যপশু পাখী।।
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন যত প্রবোধ বচন।।
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।।
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।।
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বারে বারে করে দেবলোকে।।
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছে কি লক্ষ্মণ দেখ দেখি।।
বুঝি কোনো মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়।
গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন wমণ।।
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।।
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা wমে রাহু করিল গরাস।।
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কী আপন দুহিতা।।
রাজ্যহীন যদ্যপি হ'য়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

আমার সে রাজ লক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এত দিনে।।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে।।
কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।।
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ।।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার।।
দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে।।
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী।।
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।।
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান।।
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাহি ঘরে।।
শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা।।
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম wমেণ কানন।
দেখিলেন পথমধ্যে সীতার ভূষণ।।
দেখিল যে পড়ে আছে ভগ্নরথ চাকা।
কনক রচিত আছে পতিত পতাকা।।
রথচূড়া পড়িয়াছে আর তার জাঠি।
মণি মুক্তা পড়িয়াছে আর তার কাঁঠি।।
শ্রীরাম বলেন দেখ ভাইরে লক্ষ্মণ।
এখানে সীতারে করহ অন্বেষণ।।
সম্মুখে পর্ব্বত বড় অতি উচ্চ দেখি।
লুকাইয়া রাখিল পর্ব্বত চন্দ্রমুখী।।
যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনুর্ব্বাণ
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করি খান খান।।
মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ তার দেখ বিদ্যমান।।
লক্ষ্মণ বলেন ইহা নহে কোনোমতে।
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্ব্বতে।।
পর্ব্বত কাটিতে প্রভু চাহ অকারণ।
সীতা লয়ে অন্তরীক্ষে গেল কোনো জন।।
নানামতে শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ।
শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন।।
ধনুক দিলেন গুণ সর্প যেন গর্জ্জে।
বলেন দহিব বিশ্ব আছে কোন্ কার্য্যে।।
বিশ্ব পুড়াইতে রাম পুরেন সন্ধান।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন মহেশান।।
লক্ষ্মণ চরণ ধরি করেন মিনতি।
এক কথা অবধান কর রঘুপতি।।
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর।
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেব রঘুবর।।
সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী।
অপরাধে একের অন্যেরে নাহি বধি।।
তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার।
অকারণে কেন প্রভু পোড়াও সংসার।।
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার।
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার।।
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বত শিখর।
নদনদী দেখি আর গিয়া সরোবর।।
তবে যদি সীতার না পাই দরশন।
পশ্চাৎ করিহ চেষ্টা যেবা লয় মন।।
শুনি অস্ত্র সম্বরিয়া রাখিলেন তূণে।
সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুইজনে।।
ক্ষণেক উঠেন রাম বৈসেন ক্ষণেক।
যেমন উন্মত্ত রাম বলেন অনেক।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ।
বনে বনে wমিয়া অনেক পান ক্লেশ।।
যেখানে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে।।
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার।।
হে অরণ্য তুমি ধন্য বন্য-বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।।
এইরূপে শ্রীরাম wমে চারিদিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে।।
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই বধি তার প্রাণ।।
পক্ষীরূপে আছিলি রে তুই নিশাচর।
পাঠাইব একবাণে তোরে যমঘর।।
সন্ধান পুরেন রাম তাকে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে।।
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ।।
সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ।
সীতাকে লইয়া লঙ্কা গেল সে রাবণ।।
দু ভাই তোমরা যবে নাহি ছিলে ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বরে।।
আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ করি তায়।
রাখিয়াছিলাম রাম তোমার আশায়।।
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ জীবন।।
ইতঃস্তত wমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা কর রাম যাতে মরিবে রাবণ।।
তোমার পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি।
আপনি মারিলে রাম কি করিতে পারি।।
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন।
সম্মুখে দাঁড়াও রাম দেখি এইক্ষণ।।
আপনা নিন্দেন রাম জানি পরিচয়।
দুই ভাই রোদন করেন অতিশয়।।

জটায়ু বলেন যত লিখিব তা কত।
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত।।
শ্রীরাম বলেন পক্ষী তুমি মম বাপ।
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দূর কর তাপ।।
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা।
বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা।।
কোন্ বংশে জন্ম তার বৈসে কোন্ পুরে।
কোন্ দোষে হরিলেক বল জানকীরে।।
অনেক শক্তিতে পক্ষী তুলিলেক মাথা।
কহিতে লাগিল শ্রীরামেরে সর্ব্ব কথা।।
সংহারিলা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস।
লক্ষ্মণ করেন সূর্পণখার অযশ।।
এই কোপে রাবণ হরিল জানকীর।
রাখিল লঙ্কায় ল'য়ে সমুদ্রের তীরে।।
বিশ্বশ্রবা পুত্র সে রাবণ বড় রাজা।
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা।।
কোনো চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ।।
তব পাদদোক রাম দেহ মোর মুখে।
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে।।
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে।
কহিল সীতার বার্ত্তা শ্রীরামের সঙ্গে।।
মৃত্যু কালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দিব্য রথে চাপি স্বর্গে করিল গমন।।
জটায়ুর মরণ শ্রবণে ধর্ম্মজ্ঞান।
কৃত্তিবাস গান ইহা শুনিয়া পুরাণ।।

—০—

জটায়ু উদ্ধার

শ্রীরাম বলেন পক্ষী পিতার সমান।
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ।।
বনজন্তু খাইলে অধর্ম্ম অপযশ।
অগ্নিকার্য্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরুষ।।
তবেত লক্ষ্মণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি।
জ্বালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটি।।

তুলিলেন চিতায় জটায়ু পক্ষীরাজ।
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাজ।।
সৎকার করেন তার ব্যবস্থা যেমন।
গোদাবরী জলে তার করেন তর্পণ।।
রাম দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস।
অরণ্যেতে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।

কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গে গমন।

রজনী আইল স্থান থাকিবার নাই।
শূন্যঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই।।
বাহিরেতে ছিলেন রাম বরঞ্চ সুস্থ।
শূন্যঘর দেখি হইলেন আরো ব্যস্ত।।
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী তীরেতে ত্যজিব এ জীবন।।
এতেক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করি কোলে।
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে।।
রজনীতে নিদ্রা নাহি ঘন বহে শ্বাস।
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস।।
সীতার বিচ্ছেদে রাম পাইলেন ক্লেশ।
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেষ।।
রজনী প্রভাত হ'ল উদিত অরুণ।
সীতার উদ্দেশে রাম চলেন দক্ষিণ।।
ঘর ছাড়ি যান রাম দুই ক্রোশ পথে।
প্রবেশেন দুই ভাই কুশের বনেতে।।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষাদি চরে পালে পালে।
দুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে।।
বুদ্ধিতে বিক্রম বড় চতুর লক্ষ্মণ।
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন।।
কেন রাম হয় হস্ত লোচন স্পন্দন।
বামদিকে করিতেছে খঞ্জন গমন।।
বিষম কুশের বন দেখি করি ভয়।
নানা অমঙ্গল দেখি না জানি কি হয়।।
দুই ভাই পাশাপাশি বনে প্রবেশয়।
পথ আগুলিয়া রাখে অতি ভীমকায়।।

পেটের ভিতর নাক কাণ চক্ষু মাথা।
শতেক যোজন দীর্ঘ অপূর্ব্ব সে কথা।।
রাম লক্ষ্মণেরে দেখি করিয়া তর্জ্জন।
দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুইজন।।
কবন্ধ বলিল তোরা আমার আহার।
মোর হাতে পড়িলে কি পাইবে নিস্তার।।
এ বিষম বনে তোরা এলি কি কারণ।
পরিচয় দেহ শুনি তোরা কোন্ জন।।
শ্রীরাম বলেন ভাই হইল সংশয়।
প্রাণরক্ষা কর ভাই দেহ পরিচয়।।
লক্ষ্মণ বলেন ভাই বুদ্ধি কেন্ ঘাটি।
রাক্ষসের দুই হাত দুই ভাই কাটি।।
কবন্ধের ডান হাত কাটেন শ্রীরাম।
খড়্গাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম।।
দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত দুটি।
পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছটফটি।।
ডাক দিয়া রামেরে সে করে সম্ভাষণ।
কোন দেশে বৈস তুমি হও কোন্ জন।।
লক্ষ্মণ বলেন রাম জগতের রাজা।
রাজা দশরথের পুত্র সবে করে পূজা।।
শ্রীরামের ভাই আমি নামেতে লক্ষ্মণ।
পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে বন।।
তুমি কোন্ নিশাচর বিকৃতি আকৃতি।
বনের ভিতরে থাক হও কোন জাতি।।
এত যদি লক্ষ্মণ করেন সম্ভাষণ।
পূর্ব্ব কথা কবন্ধের হইল স্মরণ।
কুবের নামেতে দৈত্য ছিলাম সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ যেন নিশাকর।
সকল দেবতা নিন্দা করি নিজ রূপে।
ক্রোধে মুনিবর মোরে শাপ দিল কোপে।।
যেমন রূপের তেজে কর উপহাস।
বিরূপ হউক সব রূপ যাক নাশ।।
যখন হবেন বিষ্ণু রাম অবতার।
তাঁর বাণস্পর্শে তোর হইবে নিস্তার।।

আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ।
করিলেন আমার শরীরে বজ্রাঘাত।।
বজ্রাঘাত প্রবেশিল আমার উদরে।
চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ পদ না রহে বাহিরে।।
গতিশক্তি নাহি কিসে মিলিবেক ভক্ষ।
তেঁই মম দুই হস্ত দীর্ঘে দুই লক্ষ।।
দুই হস্ত মোর যেন দুইটা পর্ব্বত।
দুই হস্তে যুড়ি আমি বহুদূর পথ।।
দুই প্রহরের পথে যত বনচর।
দুই হাতে সাপটিয়া ভরি হে উদর।।
কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন।
তোমা দরশনে মোর শাপ বিমোচন।।
তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস।
কেন রাম বনে wম কোন্ অভিলাষ।।
শ্রীরাম বলেন সীতা হরিল রাবণ।
যুক্তি বল কেমনে পাইব দরশন।।
কবন্ধ বলিল রাম কহি উপদেশ।
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ।।
যাবৎ আমার তনু না হয় সৎকার।
তাবৎ না দেখি কিছু সব অন্ধকার।।
রাক্ষস শরীর গেলে পাব অব্যাহতি।
তবেত বলিতে পারি ইহার যুকতি।।
তখন লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি।
কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটী।।
শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার।
অগ্নি হৈতে উঠে বীর অদ্ভুত আকার।।
আকাশে উঠিয়া করে রামে সম্ভাষণ।
দেবমূর্ত্তি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন।।
পুরুষ বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন।।
সুগ্রীবের উদ্দেশ করিও ঋষ্যমুকে।
আজ্ঞা কর রামচন্দ্র যাই স্বর্গলোকে।।
রাম দরশনে কবন্ধের স্বর্গবাস।
কুশের বনেতে রাম করেন প্রবেশ।।
প্রভাত হইল নিশা উদয় মিহির।
চলিলেন দুই ভাই পম্পানদী তীর।।
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিনী সহিত।
দেখিলেন মৃগ মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত।।
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক সাগর উথলে।।
জিজ্ঞাসা করেন রাম ওহে মৃগ পাখী।
দেখিয়াছ তোমরা আমার চন্দ্রমুখী।।
পম্পাতে করিয়া স্নান করিয়া তর্পণ।
সুগ্রীব উদ্দেশে রাম করেন গমন।।
প্রবেশ করেন রাম মাতঙ্গ আশ্রমে।
তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রীরামে।।
শবরী আনন্দ ভরি ধরিতে না পারে।
শ্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অনুসারে।।
মাতঙ্গ মুনির সেবা করি বহুকাল।
বৈকুণ্ঠে গেলেন মুনি হ'য়ে প্রাপ্তকাল।।
কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি।
আসিবেন এখানে অবশ্য রঘুপতি।।
শবরী যখন পাবে রাম দরশন।
তখনি হইবে তব শাপ বিমোচন।।
রাম রাম শ্রীরাম রাঘব রঘুপতি।
হইয়া প্রসন্ন এ দাসীরে দেহ গতি।।
শবরী রামের আগে অগ্নিকুণ্ড কাটে।
আনিয়া জ্বালিল অগ্নি নানা শুষ্ক কাষ্ঠে।।
করে অগ্নি প্রবেশ স্মরিয়া নারায়ণ।
তাহার চরিত্রে রাম চমকিত মন।।
অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল অঙ্গার।
তাহার ভাগ্যের কথা কহিতে বিস্তার।।
যাঁহার স্মরণমাত্র মুক্তি সঙ্গে ধায়।
তাঁহারে সম্মুখে দেখি ত্যজিল সে কায়।।
শ্রীরাম প্রসাদে তার পাপ নাশ।
অনায়াসে শবরী করিল স্বর্গবাস।।
শ্রীরাম চরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল অরণ্যকাণ্ড।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

৩০.৪ সারাংশ

কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণের তৃতীয় খণ্ডের নাম 'অরণ্যকাণ্ড'। 'বালকাণ্ড' ও 'অযোধ্যাকাণ্ডে'র পর এই কাণ্ডটি বিন্যস্ত। দেবর্ষি নারদের নিকট বাল্মীকির রামচরিত শ্রবণ দিয়ে বালখণ্ডের শুরু। দশরথের অযোধ্যায় আগমন ও মঙ্গলাচারণ, ভরতের মাতুলালয়ে গমন এবং রাম-লক্ষ্মণের পৌর কাজকর্মে মগ্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে এই কাণ্ডের সমাপ্তি। 'অযোধ্যাকাণ্ডে'র শুরু রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার জন্য দশরথের সঙ্কল্প এবং শেষ রামের পাদুকা নিয়ে ভরতের প্রস্থান, রামচন্দ্রের চিত্রকূট পরিত্যাগ ও রাত্রিশেষে গহন কাননে প্রবেশ। 'অরণ্যকাণ্ডে' এই গভীর বনে প্রতিকূল অনুকূল পরিবেশে রামচন্দ্রের কর্মকাণ্ড, প্রকৃতি বর্ণনা ও মিলন-বিরহের নানা চিত্রাদিতে পরিপূর্ণ। চিত্রকূট পর্বতে রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাতের জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান।

'অরণ্যকাণ্ডে'র প্রারম্ভের এই অংশে রামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন এবং চিত্রকূট পর্বতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অবস্থানের কথা আছে। এই পর্বতে বহু মুনির বাস। তাদের কানাকানি শুনে রামচন্দ্র এর কারণাদি জানতে চায়। বৃদ্ধমুনি সবিস্তারে সব কিছু খুলে বলেন। রাবণের খর ও দূষণ নামে দুই দুষ্ট নিশাচর তাঁদের সাঙ্গা-পাঙ্গা নিয়ে এই আশ্রমে প্রায়ই উপদ্রব করে। তারা যজ্ঞ নষ্ট করে, ফল-মূল কেড়ে খায়। তাদের এই অত্যাচারের জন্যই এ বন ত্যাগ করে অন্য বনে চলে যাবার পরামর্শ করছে। সীতাদেবী রূপবতী। রাক্ষসবেষ্টিত এই বনে তাকে রামচন্দ্র কী করে রাখবে? বৃদ্ধমুনি রামচন্দ্রের বিপুল শক্তির কথা জানেন, তবু বন ছেড়ে যাবার আগে এই বনে রামচন্দ্রকে সাবধানে থাকবার কথা বলে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মুনিগণ তাঁদের আত্মীয়স্বজনের বাড়ির দিকে রওনা হন। মুনিগণ চলে যাবার পর নির্জন বনে কী করে তিনজন বাস করবেন তার চিন্তায় মগ্ন হন।

"অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরাধ বধ।" এই অংশে অযোধ্যা থেকে চিত্রকূটের দূরত্ব বেশি নয়। ভরতের ভ্রাতৃভক্তিও অসীম, যে-কোনো সময় সে আবার এসে যেতে পারে, হৃদয় দুর্বল হতে পারে—ইত্যাদি ভেবে চিত্রকূট ত্যাগ করে রামচন্দ্র দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। অনেক পথ হেঁটে তারা উপস্থিত হন অত্রিমুনির আশ্রমে। মুনির চরণ বন্দনা করে তাঁর কাছে সীতাকে সমর্পণ করেন এবং বলেন—'পালন করহ যেন আপন দুহিতা'। মুনিপত্নীকে দেখে সীতার মনে হলো তিনি যেন 'মূর্তিমতী-করুণা'। সীতা তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করলে মুনিপত্নী তাঁকে দু'হাতে আশীর্বাদ করেন। রাজ ঐশ্বর্য ও রাজকুলের মর্যাদা সব কিছু ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে বনবাসে আসার কথা বললে পতি ভক্তিই যে তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, পার্থিব জগতের অন্য কিছুই কাম্য নয়। আজীবন পতিভক্তি যাতে অটুট থাকে সে কথা বলেন। সীতার কথায় তুষ্ট হয়ে মুনিপত্নী সীতাকে অলঙ্কারাদিতে সাজিয়ে সমাদরে কাছে বসিয়ে তার জন্ম বৃত্তান্ত শুনতে চান। মেনকাকে দেখে জনক রাজার বীর্য মাটিতে পড়ে। মাটির অভ্যন্তরে তার জন্ম। জমি চাষের সময় লাঙলের ফলায় সে দিবালোকে আসে। রাজা নিজের কন্যা মনে করে আমাকে সাদরে ঘরে নিয়ে যায়। এই সময় দৈববাণীতে রাজা সব কিছু জেনে এবং ঐ বাণী অনুসারে তার নাম রাখেন সীতা। প্রধান দেবীর স্নেহ-মায়ায় সীতা বড় হন। যে হরধনুতে গুণ পরাতে পারবে তার গলায় বরমাল্য অপর্ণ করবে সীতা—এই বার্তা সর্বত্র প্রচারিত হয়। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করে। পিতার আদেশে রামচন্দ্রের গলায় বরমাল্য অর্পণ করেন সীতা। আর ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের বিয়ে হয়। কুশধ্বজের দুই কন্যার সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ সম্পন্ন হয়। মুনি গৃহিণী সব শুনে আনন্দিত হয়ে সীতার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। বিচিত্র অলঙ্কারে তাঁকে সজ্জিত করেন। মুনির আশ্রমে পরমানন্দে রাত কাটে। পরের দিন সকালে স্নান করে তিনজন মুনির চরণ বন্দনা করেন। সেই সময় অত্রিমুনি সেই স্থানে রাক্ষসদের ভয়ানক উৎপাতের কথা বলে

M#2\D:\EBG-2\Unit-8 Pm6.5\1st proof

তাঁদেরকে দণ্ডকারণ্যে থাকতে বলেন। মুনিকে প্রণাম করে তিনজন দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশ্যে পা বাড়ান। এই বনের প্রাকৃতিক শোভায় তিনজন বিমোহিত। ফল-পুষ্প-গন্ধে ভরা ময়ূরের কেকাধ্বনি, wমরের গুঞ্জনে চারদিক মুখর। নানারঙ-বেরঙের পাখীর কলকাকলি চারদিকে। সরোবরে পদ্মফুলের মেলা। এই বনে অনেক মুনির বাস। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে তাদের আনন্দ আর ধরে না। ফলমূল আহার করে পুনরায় তিনজন বন দেখতে বেরোয়। হঠাৎ সামনে এক দুর্জয় রাক্ষসকে দেখতে পায়। তার রক্তচোখ, রাঙা মুখ, মাথায় দীর্ঘ জটা, গোটা শরীরে কাটার দাগ, দীর্ঘ অস্থিসার দেহ, কাঁধে পচা মাংসের বোঝা—তার দুর্গন্ধে সবাই পালিয়ে যায়। মাঝে মাঝে মেঘের মতো গর্জন করে। এই বিকট রাক্ষসের নাম 'বিরাধ'। এই রাক্ষস সীতাকে কোলে তুলে নেয় এবং তর্জন-গর্জন শুরু করে। শুধু সীতা নয় দুই ভাইকে আজ সে ভক্ষণ করবে বলে ইচ্ছা প্রকাশ করে। শ্রীরামচন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে রাক্ষসকে তার পরিচয় দিতে বলেন। সে বলে তার পিতার নাম 'কাল'। সে বহুমুনিকে ভক্ষণ করেছে, আজ তাদের পালা। রামচন্দ্র দিশাহারা। রাক্ষসকে বধ করার জন্য লক্ষ্মণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। এরপর রাক্ষসের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সবশেষে 'ঐষিকবাণ' নিক্ষেপ করে 'বিরাধে'র দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন রামচন্দ্র। তাঁর পায়ের কাছে পড়ে থাকে রক্তাক্ত খণ্ডিত রাক্ষসের দেহ। মাটিতে পতিত সীতা মূর্চ্ছা যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বিরাধ রামের বাণের স্পর্শে শাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে—এজন্য রাম-সীতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার পূর্ব জীবন-কথা বলেন। কুবের শাপেই তার এই অবস্থা। তার নাম কিশোর। সে কুবেরের চর ছিল। একদিন নারীদের মাঝে কুবের তাকে নিয়ে যায়। তাকে দেখে নারীগণ লজ্জিত হয়। ধনেশ্বর কুবের সেই মুহূর্তে তাকে অভিশাপ দেয় 'দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর'। পরে বহু অনুনয়-বিনয়ের পর কুবের বলেন যে শ্রীরামের শরেই তার শাপমুক্তি ঘটবে। রামচন্দ্রকে দর্শন করে তার শরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বিরাধ তার দেহকে অগ্নিতে দাহ করতে বলে। লক্ষ্মণের উদ্‌যোগের দানবের দেহ পুড়ে ছাই হল এবং বিরাধ দিব্য দেহ ধারণ করে দিব্যরথে চড়ে স্বর্গারোহণ করে।

খর দূষণের যুদ্ধে আগমন ঃ চৌদ্দজন বীর রাক্ষসকে শ্রীরামের তীরে নিহত হতে দেখে ভয়ে সূর্পণখা খরের কাছে গিয়ে সব জানায়। খর উত্তেজিত হয়ে বলে, 'ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ" চৌদ্দ হাজার নিশাচরকে অস্ত্রে সজ্জিত করে স্বর্ণরথে চড়ে খর-দূষণ রাম-লক্ষ্মণকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করে। সীতাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে এক গুহায় রেখে আসার জন্য লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিয়ে রাম একাই বিশাল রাক্ষস দলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। অন্তরীক্ষ থেকে দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব সকলে এই যুদ্ধ দেখে। রামচন্দ্রকে ঘিরে ফেলে রাক্ষসগণ। খরের সঙ্গে রামচন্দ্রের তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয়ের দেহ রক্তাক্ত। সহস্রবাণ, গন্ধর্ব অস্ত্র ইত্যাদির দ্বারা শত শত রাক্ষস সৈন্য নিহত হয়। বাকী শুধু খর ও দূষণ। শূলের দ্বারা রাম দূষণের দুই হাত কেটে ফেলে। তারপর দূষণের মৃত্যু হয়। দূষণের ও অন্যান্য বীর রাক্ষস সৈন্যদের মৃত্যু দেখে খর সশস্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামচন্দ্রের উপর। নানা অস্ত্র ও তীরের দ্বারা রাম একে একে খরের হাতে ধনুর্বাণ ও তার রণধ্বজ পতাকাকে ছিন্ন ভিন্ন করে এবং রথের আটটি ঘোড়াকে নিহত ও সারথীর মুণ্ডকে ছেদন করে। এরপর খর গদাযুদ্ধ শুরু করে, ত্রিভুবনে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। অগ্নিবাণের দ্বারা খরের গদা ধ্বংস হয়। শেষ অস্ত্রহীন খর তীক্ষ্ম দাঁত দিয়ে রামচন্দ্রকে কামড় দিতে গেলে ঐষিক বাণের দ্বারা খর ধরাশায়ী হয়। চোদ্দ হাজার রাক্ষস সহ খর-দূষণের ভবলীলা সাঙ্গ করার জন্য দেবগণ তুষ্ট হন। রামচন্দ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখে সীতার দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে যায়। রামচন্দ্রের বীরত্ব দেখে সূর্পণখা ভয়ে ও দুঃখে লঙ্কায় পালিয়ে গিয়ে রাবণকে সব কিছু খুলে বলে। সেই সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার কথাও বলে। সীতার রূপ সৌন্দর্য, সে রাবণের কাছে তুলে ধরে। রাবণই তার উপযুক্ত বলে রাবণকে উত্তেজিত করে। সূর্পণখা রাম-লক্ষ্মণকে ধোঁকা দিয়ে সীতাকে হরণ করে আনবার জন্য পরামর্শ দেয়। সুন্দরী সীতার কথা রাবণ মনে মনে ভাবতে থাকে এবং কিভাবে তাকে হরণ করা যায় তার চিন্তায় মগ্ন হয়।

M#2\D:\EBG-2\Unit-9 Pm6.5\1st proof

'সীতাহরণ করিতে রাবণকে মারীচের নিষেধ'— অংশে দেখা যায় পুষ্পক রথে চড়ে রাবণ মারীচের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। রাবণকে দেখে মারীচ ভয় পায়। দণ্ডকারণ্যে নিশাচর রাক্ষসদের রামচন্দ্র কি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে সে সব খুলে বলে। ভাই-দূষণ-খরও বেঁচে নেই। বলশালী মারীচ থাকতে এ কলঙ্ক রাবণ সহ্য করতে পারছে না। সূর্পণখার নাক-কান কেটে দেবার জ্বালাও প্রকাশ করে। চরম বিপদে পড়েই রাবণ মারীচের শরণাপন্ন হয়েছে। তাই প্রতিশোধের জন্য সীতা হরণের কথা তুলে ধরে। মারীচ এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারে না, বরং সীতাকে হরণ করলে লঙ্কাপুরী ছারখার হবে রাবণের বংশ ধ্বংস হবে—এই ভবিষ্যৎবাণীও করে। রাবণ তাতে কর্ণপাত না করে মারীচকে সোনার হরিণের বেশ ধারণ করতে বলে। কিন্তু মারীচ এর ভয়ংকর ফলাফলের কথা তুলে ধরে সীতার প্রতি লোভ পরিত্যাগের জন্য রাবণকে অনুরোধ করে। কিন্তু তার পরামর্শে কর্ণপাত না করে রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়।

'রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান'—অংশে বারংবার মারীচ সীতাহরণ থেকে রাবণকে নিবৃত্ত থাকার জন্য সৎ পরামর্শ দিলে রাবণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করবে বলে গর্জন করে। শুধু তাই নয় 'দেব পঞ্চানন'ও যদি নিষেধ করেন রাবণ তাও গ্রাহ্য করবে না বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং মারীচকে মায়ামৃগ সেজে রামকে কুটীর থেকে বনের গভীরে আনতে পরামর্শ দেয় এবং রামহীন শূন্য কুটীর থেকে সে সীতাকে হরণ করবে বলে জানায়। সীতাহরণ অত সহজ নয়। রামচন্দ্রকে মায়ায় বুলিয়ে আনলেও লক্ষ্মণ সীতাকে পাহারা দেবে। লক্ষ্মণ থাকা অবস্থায় সীতা হরণ অসম্ভব। এই সব প্রতিকূল অবস্থার কথা জেনে শুনেও সীতাহরণ করলে লঙ্কাপুরী ছারখার হবে বলে মারীচ এই কুকর্ম থেকে রাবণকে নিরস্ত করার জন্য সুমন্ত্রণা দেয়।

'মারীচের মৃগরূপধারণ'—অংশে দেখা যায় সূর্পণখা রাবণকে নিয়ে পঞ্চবটী বনে যায় মারীচ সহ। সেখানে মারীচকে মৃগরূপ ধারণের নির্দেশ দিলে নিরূপায় মারীচ বিচিত্ররূপে স্বর্ণছটায় দেহকে সজ্জিত করে। তার নয়ন লোভন স্বর্ণরূপ দেখে রাবণ আনন্দিত হয়।

'মায়া মৃগরূপধারী মারীচ বধ'—অংশে দেখা যায় রাবণ অরণ্য মধ্যে লুকিয়ে আছে আর বনভূমি আলোকিত করে স্বর্ণ মৃগরূপী মারীচ রাম-সীতার সামনে হাজির। রাক্ষসবংশ ধ্বংস ও দেবতাদের বিপদ থেকে রক্ষার জন্যই যেন বিধাতার নির্দেশেই এই স্বর্ণ মৃগের নির্মাণ। সীতা এই হরিণকে চায়। তার সোনার চর্মে উপবেশনের আকাঙ্খা প্রকাশ করে। মায়াবী রাক্ষসদের কথা লক্ষ্মণ তুলে ধরে। মায়ার জাল বিস্তার করে তাদের সর্বনাশের জন্য এই মায়ামৃগের আগমন ঘটেছে বলে লক্ষ্মণ সংশয় প্রকাশ করে। সব কিছু শুনেও রামচন্দ্র সীতার মনবাঞ্ছা পূরণের জন্য মৃগ হত্যার জন্য বের হন। যাবার সময় লক্ষ্মণকে সীতা রক্ষার দায়িত্ব দেন। মারীচের উভয়সংকট। তার মৃত্যু হয় রাম নয় রাবণের হাতে। তবে রামের হাতে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে সে। রামচন্দ্রের সঙ্গে বনের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে শুরু করে। মারীচের মায়ারূপ ধরতে পেরে রাম 'ঐষিক বিশিষ্ট' বাণ নিক্ষেপ করে। আহত মারীচ মৃত্যুর আগে রামের কণ্ঠস্বর নকল করে লক্ষ্মণকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য আর্তনাদ ক'রে মৃত্যু বরণ করে। রামচন্দ্র সমগ্র ছলনা বুঝতে পেরে কুটীরের দিকে দ্রুত গমন করেন।

'রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ'— অংশে রামের কণ্ঠস্বর শুনে সীতা দেবর লক্ষ্মণকে রামের অনুসন্ধানে যাত্রার জন্য করুণ মিনতি করে। লক্ষ্মণ সীতাকে একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে না, রামচন্দ্রকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না ইত্যাদি নানা কথা বলাতে দিশেহারা সীতা কটু বাক্য প্রয়োগ করে।

"বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।

আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার আছে মন।” —লক্ষ্মণ ভাই এর উদ্দেশ্যে না গেলে সীতা আত্মহত্যা করবে বলে প্রস্তুত হয়। মন না মানলেও সীতার দুঃখ-বেদনা বুঝতে পেরে গণ্ডী কেটে তার বাইরে যাতে সীতা না যায় তার নির্দেশ দিয়ে লক্ষ্মণ রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এই সুযোগের তপস্বীর বেশ ধরে রাবণ কুটীর দ্বারে হাজির। সীতার রূপ মাধুর্যে রাবণ মুগ্ধ। রাম-লক্ষ্মণ ফিরে এলে ফলমূল দিয়ে অতিথি সৎকারের কথা সীতা বলে। সেই সঙ্গে নিজের পরিচয়ও দেয়। ভণ্ড তপস্বীরূপী রাবণ সীতাকে কুটীরের বাইরে এসে ভিক্ষা দিতে বলে। প্রভুর আদেশ ছাড়া সীতা বাইরে আসতে অস্বীকার করলে ধর্ম-কর্মের কথা বলে সীতাকে প্রলুব্ধ করে। সহজ সরল মনে সীতা লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরে ফল তপস্বীকে দিতে গেলে রাবণ তার হাত ধরে ফেলে এবং স্বমূর্তি ধারণ করে। সীতা রাবণকে অভিসম্পাত দিতে থাকে। রাবণ তার মনোবাসনার কথা বললে সীতা তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে। এদিকে ভীষণ রাক্ষস মূর্তি ধারণ করে জোর করে সীতাকে রথে ওঠায় অসহায় সীতা রামচন্দ্রকে স্মরণ করে, বনের গাছ-পালার উদ্দেশ্যে তার করুণ আবেদন— তার এই অসহায় অবস্থার কথা যেন রামকে তারা জানায়। দুচোখে অশ্রুবন্যা। দ্রুতগতিতে রথ ধাবিত। আকাশ পথে জটায়ু পাখী পথ রোধ করে। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের মহাযুদ্ধ শুরু। বত্রি হাজার বাণে ক্ষতবিক্ষত জটায়ু তবু প্রাণপণে যুদ্ধ করে। ‘অর্দ্ধচন্দ্র’ বাণে তার দুটি পাখা বিচ্ছিন্ন হয়। সীতা তাকে রাবণের এই কুকর্ম বার্তা পৌঁছে দিতে বলে। জটায়ু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—

‘তোমারে উদ্ধারিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।’

আকাশ পথে যাবার সময় সীতা তার দেহের অলংকারদি মাটিতে ছড়িয়ে দেন। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর উদ্দেশ্যে সীতার কাতর বাণী ধ্বনিত।

পথিমধ্যে জটায়ুর wাতুষ্পুত্র ‘সম্পাতিনন্দনে’র সঙ্গে দেখা। দুই পাখা দিয়ে সে রাবণের রথকে ঢেকে দেয়। সে জানতে পারেনি জটায়ুর অন্তিম দশার কথা। রাবণ তাকে সূর্পণখার কথা, খর-দূষণের হত্যার কথা বলে। সীতা হরণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করে সুপার্শ্বের হাত থেকে রক্ষা পায়। অসীম সমুদ্র পেরিয়ে লঙ্কাপুরীতে এসে রাবণ সীতাকে অশোক কাননে বন্দিনী করে রাখে। সীতার দুঃখে দেবগণ দুঃখিত। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র অশোক কাননে গিয়ে সীতাকে সান্ত্বনা দেয়—

‘সাগর বান্ধিয়া রাম সৈন্য করি পার।
রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার।।’

সীতাকে পরমান্ন দিয়ে এবং প্রতিদিন সুধা ফল দিয়ে যাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেন ইন্দ্র। অশোক কাননে একাকী বন্দিনী সীতা—আর পঞ্চবটী বনে সীতাশূন্য কুটীরের উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠায় রামচন্দ্রের যাত্রা।

‘শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ’-

হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে পথে অমঙ্গালের নানা চিহ্ন দেখে রামচন্দ্রের মনে জেগেছে নানা চিন্তা। মারীচের কপট আহ্বানে লক্ষণ কি সীতাকে একলা রেখে রামের খোঁজে বের হয়েছে? সীতাকে দেবতাগণ যেন রক্ষা করেন। বিধাতা কি দুঃখের উপর দুঃখ দিবে? ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে রাম যখন দিশেহারা ঠিক সেই মুহূর্তে লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁর দেখা। সীতাকে ভয়ংকর দণ্ডকারণ্যে একা রেখে লক্ষ্মণের আগমনে সীতার জীবনে নেমে এসেছে

M#2\D:\EBG-2\Unit-9 Bm6.5\1st proof

দুর্যোগ। একথা নিশ্চিতভাবে ঝুঁকি দেওয়ামাত্র একদিকে কর্মফল অন্যদিকে লক্ষ্মণকে বুদ্ধিনাশের অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন রাম। মারীচের মৃতদেহ দেখিয়ে দুইভাই অতিদ্রুত কুটীর দ্বারে উপস্থি হলেন। 'সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে।' কোনো উত্তর না পেয়ে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত প্রায়। পাগলের মতো দুই ভাই তন্ন তন্ন করে বনে, গোদাবরী তীরে সীতাকে খুঁজে বেড়ান। সীতাকে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে শ্রীরামচন্দ্র চারদিক অন্ধকার দেখেন। বনের পশু-পাখি, বনের মুনি-ঋষিগণ এসে তাঁকে প্রবোধ দেন। তাঁর মুখে শুধু 'সীতা, সীতা'। সীতার শোকে অস্থির রামচন্দ্রকে ভাই লক্ষ্মণ ভূমি থেকে তুলে কোলে নেন। ভাই-এর উদ্দেশ্যে তাঁর কাতর আর্তনাদ—

"কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।।"

রামচন্দ্রের মনে হয়—হয়তো সীতা মুনিপত্নীদের কাছে গেছেন, হয়তো গোদাবরী তীরের কমল কাননে লুকিয়ে আছেন, হয়তো বা রাহু তাকে গ্রাস করেছে। অথবা মা বসুন্ধরা রাজ্যহারা রামচন্দ্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সীতাকে নিজ কোলে আশ্রয় দিয়েছেন। সীতাকে হারিয়ে রামচন্দ্র চারদিক অন্ধকার দেখছেন। তাঁর জীবনে সীতাই একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান। সীতা ছাড়া রামচন্দ্র 'মনীহারা ফণী।' ভাই লক্ষ্মণের কাছে তার কাতর আবেদন—যে করেই হোক সে যেন সীতাকে খুঁজে বের করে এবং তাঁর জীবন বাঁচায়। সীতাহীন তপোবন শূন্যময়। পশু-পাখি-বৃক্ষ সবাইকে ডেকে ডেকে সীতার অনুসন্ধান করার সময় সীতার ভূষণ ও অলংকারাদি, রথের চূড়া, চাকা ইত্যাদি দেখে সেই স্থান ভালভাবে দেখবার জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলে। সামনে সুউচ্চ পর্বতের আড়ালে সীতা থাকতে পারে ভেবে রামচন্দ্র ধনুর্বাণে পর্বতকে ধূলিসাৎ করতে চাইলে লক্ষ্মণ তা বারণ করে। সীতাহারা পাগল প্রায় রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ নানাভাবে প্রবোধ দিতে গেলেও শোকাকুল রামচন্দ্র তার কথা শুনতে চান না। সীতার জন্য সৃষ্টি ধ্বংসের উদ্যোগ নিলে লক্ষ্মণ তাঁকে নিরস্ত করে। একের অপরাধে অন্যে কেন ধ্বংস হবে? অনেক বোঝানোর পর দুই ভাই মিলে সীতার অনুসন্ধানে পথ চলতে শুরু করেন। পথে নদী-গিরিকে সীতার খোঁজ দেবার জন্য রামচন্দ্র কেঁদে কেঁদে অনুরোধ জানায়। চারদিক ঘুরতে ঘুরতে রক্তাক্ত জটায়ুকে দেখে রামচন্দ্রের মনে হয়েছে নিশাচর রাক্ষস পাখীর বেশ ধরে সীতাকে ভক্ষণ করেছে। তাই তাকে হত্যা করার মূহুর্তে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্ত জটায়ু রামচন্দ্রকে বলে। শূন্য কুটীর পেয়ে রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় চলে গেছে। জটায়ু রামচন্দ্রের আশায় বহুক্ষণ তার রথের গতিপথ আটকে যুদ্ধ করেছে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। দশরথ জটায়ু মিত্র নিজের পরিচয় দিলে রামচন্দ্র অনুতপ্ত হন এবং রাবণ কেন সীতাকে হরণ করলো সেকথা শুনতে চান। চোদ্দ হাজার রাক্ষস বধ, সূর্পণখার নাক-কান কাটার প্রতিশোধ নেবার জন্যই সমুদ্রতীরে লঙ্কায় মহাতেজস্বী লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে নিয়ে গেছে। তবে জটায়ু রামকে চোখের জল মুছে চিন্তা দূর করতে বলে। স্পষ্টভাবে আশার বাণী শুনায়—

"কোন চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন।
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ।।"

তারপর শ্রীরামচন্দ্রের চরণামৃত মুখে নিয়ে সব দোষকে নাস করে জটায়ু পরলোকগমন করে। রাম-লক্ষ্মণ তার বন্দনা করেন। দিব্যরথে জটায়ু স্বর্গারোহণ করে।

জটায়ু উদ্ধার'—অংশে পিতৃতুল্য জটায়ুর শবদেহের সৎকার এবং গোদাবরীর জলে রাম-লক্ষ্মণ তর্পণ করেন। রামচন্দ্রের দর্শনেই জাটায়ুর স্বর্গবাস হলো।

M#2\D:\EBG-2\Unit-9 Pm6.5\1st proof

'কবন্ধ ও শবরীর স্বর্গে গমন'— রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে রাম-লক্ষ্মণ ফিরে আসেন শূন্য কুটীরে। রামচন্দ্র শূন্য ঘরে কেঁদে কেঁদে সারা—চোখে তার ঘুম নেই. ভোর হতেই দু-ভাই সীতার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কুশ বনে ভয়ংকর নানা অমঙ্গালের চিহ্ন দেখা দেয়। এক বিদ্ঘুটে বিশালদেহধারী কবন্ধ তাঁদের পথ আটকায় এবং দুজনকে ভক্ষণ করবে বলে জানায়। কবন্ধ তাঁদের পরিচয় জানতে এবং কেন এই বনে প্রবেশ করেছে তা জানতে চায়। এ সবের কোনো উত্তর না দিয়ে দু-ভাই কবন্ধের দুই হাত কেটে ফেলে। যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করতে করতে তাদের পরিচয় আবার জানতে চায়। লক্ষ্মণ নিজেদের বংশ পরিচয় ও বনে আসার কারণ বলার পর কবন্ধের পূর্বের স্মৃতি জেগে ওঠে। তার নাম ছিল কুবের। রূপের অহংকার তার ছিল। মুনির শাপে তার রূপ নষ্ট হয়। তবে বিষ্ণুর অবতার রামের বাণস্পর্শে আমার মুক্তি ঘটবে। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বজ্রাঘাত করলে তার হাত ছাড়া অন্য অঙ্গাগুলি উদরের মধ্যে ঢুকে গেছে। তার গতিশক্তি নেই। দুইহাতই একমাত্র সম্বল। তবে রামচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে সে আজ ধন্য। রামচন্দ্র তার কাছে সীতার সংবাদ জানতে চাইলে তার দেহের সৎকার আগে করতে বলে। দুই ভাই মিলে সযত্নে কবন্ধের দেহ সৎকার করলে আগুনের ভিতর থেকে অদ্ভুত আকারের জীব আকাশে উঠতে উঠতে দেবমূর্তি ধারণ করে রামের উদ্দেশ্যে বলে তাঁরা যেন ঋষ্যমুকে সুগ্রীবের কাছে যায়। রামচন্দ্রকে দর্শনের ফলে কবন্ধের স্বর্গবাস হয়। কুশবনে রাত কাটিয়ে দু-ভাই ভোরবেলা পম্পা নদীতীরে যান। সেখানে পক্ষী-পক্ষিণী, মৃগ-মৃগী, রাজহংস-রাজহংসী মিলনান্দে বিভোর। এদের মিলন মধুর জীবন দেখে রামচন্দ্রের বিচ্ছেদ বেদনা তীব্র রূপ নেয়। তিনি মৃগ পাখীদের ডেকে ডেকে সীতা কোথায় জানতে চান। দুঃখ-দহন জর্জরিত মন ও দেহ নিয়ে পম্পাতে স্নান ও তর্পণাদি করে সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র যাত্রা করেন। মাতঙ্গ আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্র শবর-শবরীর আনন্দ আর ধরে না। এতদিন ধরে তারা মাতঙ্গ মুনির সেবা করেছে। মুনি বৈকুণ্ঠধামে চলে যাবার আগে শ্রীরামচন্দ্র এই আশ্রমে আসবেনই বলে গেছেন। শ্রীরামের দর্শনের পর শবরীর শাপমোচন হবে। সে নিজেই অগ্নিকুণ্ড রচনা করে সে তাতে প্রবেশ করে। শ্রীরামের প্রসাদে শবরীর স্বর্গধামে যাত্রা। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই কৃত্তিবাস অরণ্যখণ্ডের সমাপ্তিতে লিকেছেন—

"শ্রীরাম চরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল অরণ্যকাণ্ড।।'

৩০.৫ সার সংক্ষেপ

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৭টি কান্ডে সমাপ্ত। কাণ্ডগুলি হলো—আদি কাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড। অরণ্যকান্ডে 'চিত্রকূট পর্বতে' শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের স্থিতি ও রাক্ষসের উৎপাত জন্য তথা হইতে মুনিগণের প্রস্থান'—দিয়ে শুরু এবং 'অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন ও উক্ত মুনিপত্নীর নিকট সীতার জন্মাদি কথন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক বিরাধ বধ', শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন ও মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দান এবং মুনির স্বর্গে গমন, ' 'দশবৎসর কাল শ্রীরামচন্দ্রের নানা বনে wমনান্তর, পঞ্চবটী বনে তাঁহার অবস্থিতি ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক চতুর্দশ রাক্ষস বধ', 'খর-দূষণের যুদ্ধে আগমন,' শ্রীরামের সহ যুদ্ধে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসহ দূষণ ও খরের মৃত্যু,' 'রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা প্রদান,' মারীচের মৃগরূপ ধারণ,' 'শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ'—এই কয়েকটি ঘটনা চিত্রের সন্নিবেশ দেখা যায়। এই খণ্ডের সার সংক্ষেপ হল—চিত্রকূট পর্বতে রাম-সীতা লক্ষ্মণের অবস্থান। মুনিদের কাছে রাক্ষসদের উৎপাত সম্পর্কে নানাকথা শ্রবণ। রাম-সীতা লক্ষ্মণেব প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে এবং সাবধানে থাকবার পরামর্শ দিয়ে মুনিদের বনত্যাগ। রামচন্দ্র গভীর ভাবনায় ভাবিত। এরপর অত্রিমুনির আশ্রমে শ্রীরামের

M#2\D:\EBG-2\Unit-9 Pm6.5\1st proof

গমন। সেখানে মুনিপত্নী সমাদরে সীতাকে গ্রহণ করেন। সীতার কাছ থেকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনে সীতাকে সস্নেহে কোলে তুলে নেন। অভিশপ্ত বিরাধের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের প্রচণ্ড যুদ্ধ। বিরাধের রামের হাতে মৃত্যুতে অভিশাপ মোচন ও তার স্বর্গারোহণ। শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের গমন। তাঁকে দেখে মুনি খুবই তুষ্ট। রামচন্দ্রের হাতে ইন্দ্রের ধনুর্বাণ দিয়ে মুনির স্বর্গারোহণ। দীর্ঘ দশবছর বিভিন্ন অরণ্যে ঘুরে ঘুরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণের পঞ্চবটী বনে আগমন। বনে wমণকালে অগস্ত্য মুনির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ। ইল্বল-বাতাপি এই দুই মায়াবী রাক্ষসের জীবনবৃত্তান্ত ও মৃত্যুকাহিনী রামচন্দ্র শোনেন। অগস্ত্যমুনি তাঁকে গোদাবরী নদীতীরে সুশোভিত পঞ্চবটী বনে বাস করতে বলেন। অগস্ত্যমুনির আশ্রম ত্যাগ করে চলে যাবার পথে জটায়ুর সঙ্গে তাঁদের দেখা। এই জটায়ু তাঁদের পঞ্চবটী বনে নিয়ে যায়। এই বনের সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। লতা-পাতা দিয়ে কুটীর নির্মাণ। পঞ্চবটীবনে তিনজনে সুখে দিনযাপন করছিলেন। হঠাৎ রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার আবির্ভাব। প্রথমে রামকে পতিরূপে পাবার জন্য তার অনুনয় বিনয়। পরে লক্ষ্মণকে পতিরূপে পাবার জন্য শত চেষ্টা। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে রাক্ষসী সীতাকে গিলে খেতে যায়। তখন লক্ষ্মণ তীর নিক্ষেপ করে তার নাক কান কেটে দেয়। ক্রোধে দিকহারা হয়ে সূর্পণখা খর ও দূষণের কাছে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে বলে। সুর্পণখার অবস্থা দেখে তার কান্নাকাটি শুনে দুই রাক্ষস সেনাপতি রাম-লক্ষ্মণকে হত্যার জন্য ছুটে যায়। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। চোদ্দশ রাক্ষস সৈন্য ও খর-দূষণ প্রচণ্ড যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে সূর্পণখার রাবণের কাছে গমন। প্রেম প্রত্যাখ্যান ও নাক-কান কেটে দেওয়ার প্রতিশোধ নেবার জন্য সূর্পণখা সীতার রূপ-মাধুর্য তুলে ধরে রাবণকে কামনা বাণে বিদ্ধ করে সীতাদেবীকে হরণের পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয় রামচন্দ্রের হাতে চোদ্দহাজার রাক্ষস ও খর-দূষণের মৃত্যুরও প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। রাবণ-সূর্পণখার প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে সীতাহরণের ব্যাপারে মারীচের কাছে যায়। মারীচ তাকে এই কু-পথে যেতে শত বারণ করে, অনেক সুমন্ত্রণা দেয়। কিন্তু রাবণ সব যুক্তি নস্যাৎ করে সীতাহরণের ব্যাপারে অটল থাকে এবং এই কাজে মারীচ সম্মত না হলে তাকে হত্যার হুমকিও দেয়। মারীচ বাধ্য হয়ে মৃগরূপ ধারণ করে। সোনার হরিণ দেখে সীতা প্রলুব্ধ হয় এবং রামচন্দ্রকে এই মৃগ ধরে আনতে বলে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রামচন্দ্র তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যাবার সময় সীতা ও লক্ষ্মণকে সাবধান করে। মায়াবী মারীচের রামের মতো কণ্ঠস্বরের আর্তনাদ শুনে সীতা-লক্ষ্মণকে রামের অনুসন্ধানে পাঠায়। লক্ষ্মণের সীতাকে একাকী রেখে যাবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। কিন্তু সীতার নানা কটূক্তি শুনে গণ্ডী এঁকে তার বাইরে যেতে সীতাকে বারণ করে। লক্ষ্মণ চলে যাবার পর, তপস্বীর ছদ্মবেশে রাবণের আগমন ও অভিনয়। তার অভিনয়ে ভুলে এবং গার্হস্থ্য ধর্মরক্ষা করার জন্য গণ্ডী পেরিয়ে ভিক্ষা দান। মূহুর্তে সীতাকে অপহরণ করে রাবণের আকাশপথে গমন। সীতার বক্ষভেদী আর্তনাদ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্বত গাছপালা পশু-পাখী সকলের উদ্দেশ্যে তার আকুল আবেদন—তারা যেন এই দুঃসংবাদ রামচন্দ্রকে দেয়। পথে জটায়ুর সঙ্গে তুমল যুদ্ধ। রক্তাক্ত জটায়ু পাখীর অবরোধ চূর্ণ। রক্তাক্ত জটায়ুর কাছ থেকেই রামচন্দ্র সীতাহরণের ঘটনা জানতে পারে। সীতাহীন শূন্য কুটীরে এসে রামচন্দ্রের বিলাপ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস-বনানী-বেদনা-বিধুর। পাতি-পাতি করে পর্বতের গুহাদি, গোদাবরীর তীরভূমি, বনভূমি খুঁজে খুঁজে রামচন্দ্র দিশেহারা। হঠাৎ কবন্ধের সঙ্গে দেখা। তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান ঘটান রামচন্দ্র। আগুনে তার দেহদাহের পর আগুনের শিখা থেকে আকাশে এই অভিশপ্ত মুক্ত রাক্ষস চলে যাবার সময় রামচন্দ্রকে ঋষ্যমুকে সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে বলে। তার সাহায্যেই সীতা উদ্ধার হবে। এই ইঙ্গিত দিয়ে যায়। এরপর রাম-লক্ষ্মণ কুশের বনে প্রবেশ করে। পম্পা নদীতে স্নান করে দুই ভাই মাতঙ্গ আশ্রমে যান। সেখানে রামদর্শনে শবরীর শাপমুক্তি ঘটে। আর দুই ভাই সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শবরীর মুক্তি ও শ্রীরামচরিত্রের গুণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অরণ্যকাণ্ডের সমাপ্তি।

M#2\D:\EBG-2\Unit-9 Pm6.5\1st proof

৩০.৬ (ক) প্রকৃতি চিত্র, (খ) যুদ্ধ বর্ণনা, (গ) চরিত্র চিত্রণ

(ক) প্রকৃতি চিত্র ঃ কোমল পেলব শস্য-শ্যামল বাংলার প্রকৃতি চিত্র বাংলা সাহিত্যে যুগে নানারূপ যুগে বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীনযুগে চর্যাপদে, আদি মধ্যযুগে কৃষ্ণ কীর্তনে এবং অন্ত্য মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্য শাখায়, বৈষ্ণব পদাবলীতে ও মঙ্গলকাব্য ধারায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। আপনারা কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে' এই প্রকৃতি চিত্রের মনোরম রূপ দেখতে পাবেন। আদি কবি মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণে প্রকৃতি বর্ণনায় বিস্তৃতি দেখা যায়। অনুবাদক কৃত্তিবাস মূল মহাকাব্যের মতো প্রকৃতির ব্যাপক বৈচিত্র্য বৈভব রূপ তুলে না ধরলেও এই খণ্ডের কয়েকটি অংশে প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শকে সার্থকভাবেই প্রকাশ করেছেন। এই অংশের কয়েকটি স্থানের প্রকৃতি চিত্রণের রূপরেখা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল। এর মধ্য দিয়েই প্রকৃতি প্রেমিক কৃত্তিবাসকে আপনারা চিনতে ও জানতে পারবেন।

দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা ঃ অত্রিমুনির কণ্ঠে শোনা যায়—

> "অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান.
> তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।।"

এই অতিরম্য স্থান' অংশটির মধ্য দিয়েই কৃত্তিবাস আমাদের হৃদয় গভীরে দণ্ডকারণ্য বনভূমির সৌন্দর্যের প্রতি ঔৎসুক্য বোধ জাগ্রত করেছেন।

অত্রিমুনির চরণধূলি নিয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ দণ্ডক কাননে প্রবেশ করেন। আগে রাম, মধ্যে সীতা ও পশ্চাতে লক্ষ্মণ। অরণ্য ভূমি ফল ও ফুলে পরিপূর্ণ। এ সবের গন্ধে বনভূমি আমোদিত। অবাধ উন্মুক্ত বনে ময়ূর-ময়ূরী প্রাণের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কেকাধ্বনিতে চারদিক মুখর। ফুলের মধু আহরণের জন্য wমরের দল গুঞ্জনে বনভূমি ভরিয়ে দিয়েছে। রঙ-বেরঙের নানাপাখী গাছের ডালে ডালে বসে, এদিক-ওদিক উড়ে বনভূমিকে মধুর কলরবে মুখর করে তুলেছে। বনের সরোবরে অগণিত পদ্মফুল যেন হাসিরাশির খেলা বসিয়েছে। এই বনের জল স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো, ফলগুলি রমণীয় শুধু নয়—উভয়ই সুস্বাদু।

বাল্মীকির রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের তাপসগণের আশ্রমের পরিবেশ-পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে মহাকবি প্রকৃতির স্পর্শ এনেছেন। এছাড়া বনমধ্যে প্রবেশের পর বনানীর দৃশ্য সজ্জায় হরিণ, বাঘ, ভালুকের অবাধ বিচরণ ছিন্ন তরুগুল্ম, ঝিল্লিরব এনে শঙ্কার ভাব জাগিয়েছেন। এই সব বর্ণনা অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণে নেই।

পঞ্চবটী বন ঃ 'পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী।' রামচন্দ্রের এই সুখের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে পঞ্চবটী বনের প্রকৃতি চিত্র। এই অংশে গোদাবরী নদী ও তার তীর বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। প্রকৃতির কোলে নদীতীরে কুটীর নির্মাণ করে সেখানে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ থাকবার জন্য মনস্থ করেন।

গোদাবরী নদীর দুই তীর 'শ্বেত-পীত-লোহিত' ইত্যাদি নানারঙের পাথরে ভরা। সূর্যের আলোয় এইসব পাথর থেকে নানারঙ ঠিকরে বের হয়। কুটীরের খুব কাছে বিস্তৃত ঘাট। ঘাটটি নানা ফুলে সুসজ্জিত। ফুলের মধু পানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে wমর ছুটে আসে। তাদের গুঞ্জন ধ্বনিতে পরিবেশ মুখর। কুটীরের দ্বার প্রান্তেও নানাফুলের ডালি। সবুজ লতাপাতা ঘেরা কুটীরটি মনোহর।

আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণে পঞ্চবটী বনের বিস্তৃত রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে. হেমন্তকালের পূর্ণিমার জ্যোৎস্না

স্নাত বন হিমে ম্লান হয়েছে। এরূপ প্রকৃতির বিপরীত-চিত্র সীতার মধ্যে মহাকবি দেখেছেন। বাষ্পাচ্ছন্ন অরণ্য, সোনার ধান কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। শীতকালীন প্রকৃতি দৃশ্য অনুপম। এমনটি কৃত্তিবাসের লেখায় নেই।

পম্পা নদী ঃ কুশবনে রাম-লক্ষ্মণ প্রবেশ করে ভোর হতেই দু-ভাই পম্পা নদীতীরে উপস্থিত। সেখানে—

'কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত।
দেখিলেন মৃগ-মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত।।
রাজহংস রাজহংসী ক্রীড়া করে জলে।
দেখিয়া রামের শোক-সাগর উথলে।।'

এই অংশে কৃত্তিবাস পম্পানদীতে অনাবিল প্রকৃতির বুকে অনাবিল মিলন আনন্দের চিত্রের পাশাপাশি সীতা-হারা রামচন্দ্রের বিরহ বেদনাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বৈসাদৃশ্য চিত্রকল্প এখানে যে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছে তা কাব্যগুণে ভরা।

বাল্মীকির বর্ণনায় পম্পা সরোবর স্বচ্ছ স্ফটিকের রূপ পেয়েছে। নদীটিতে শত শত পদ্মফুল বিকশিত, দুই তীরে কোমল বালুকারাশি, মাছ ও কচ্ছপ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদীর বুকে নানারঙের জলজ ফুল। নদীর দুই তীর তিলক, অশোক, বকুল প্রভৃতি গাছে ভরা। সখীর মতো লতা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। মালতী, কুন্দ, অশোক, কেতকী ইত্যাদি নানা ফুলের গাছ। আমগাছগুলি মুকুলে ভরে গেছে। প্রকৃতি জগত মধুর মিলনের কেন্দ্রস্থল।

(খ) যুদ্ধ বর্ণনা ঃ কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে' বহু যুদ্ধের বর্ণনা আছে। তার মধ্যে 'বিরাধ বধ', 'খর-দূষণের যুদ্ধ' রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধ'—বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আপনারা লক্ষ্য করবেন প্রতিটি যুদ্ধে কৃত্তিবাস ভিন্ন স্বাদে বীর রসকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাণ্ডটিতে যুদ্ধের ঘনঘটা থাকলেও বৈচিত্র্যের জন্য একঘেয়েমি হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পটভুমিকায় যুদ্ধগুলি আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়েছে।

বিরাধ বধ ঃ দণ্ডকারণ্যের অত্রিমুনির আশ্রমে আহারাদি শেষে মুনির আশীর্বাদ নিয়ে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ মনের আনন্দে দণ্ডাকারণ্যে wমণকালে বিকট আকৃতির দুর্জয় রাক্ষস বিরাধের উপস্থিতি। কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন—

"রাঙ্গা দুই আঁখি তার কঠিন হৃদয়।
বনজন্তু ধ'রে মারে কারে নাহি ভয়।।
দুর্জয় শরীর ধরে পর্ব্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখ খান।।"

এখানেই শেষ নয়, মাথায় লম্বা জটা, অস্থিসার দেহে দুর্গন্ধ, কণ্ঠে মেঘের গর্জন ইত্যাদি। এই বর্ণনায় প্রতিপক্ষ বিরাধের ভয়ংকরতাকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। এই রাক্ষস হুঙ্কার ছাড়ে—

"..........আমি যে হই সে হই।
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই।।"

বহু মুনিকে বধের কথা বলে সে বীভৎস রস সৃষ্টি করেছে। সীতাকে বগলদাবা করে নেয়। দুই ভাইকে আক্রমণের জন্য ছুটে আসে। শ্রীরামচন্দ্র বিরাধের মূর্তি ও হুঙ্কার শুনে ভয় পান। লক্ষ্মণ তাঁকে সাহস জোগায়। রামচন্দ্র প্রথম সাত বাণ নিক্ষেপ করে। কিন্তু তাতে রাক্ষসের কিছুই হয় না। বিরাধ বিশাল জাঠা গাছ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে

M#2\D:\EBG-2\Unit-9 Pm6.5\1st proof

ছুঁড়ে দেয়, তা দেখে রাম একটি তীর নিক্ষেপ করে। তাতে জাঠা গাছ খান খান হয়। নিশাচরের হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই। সে আকাশে উঠে যায়। রামচন্দ্র 'ঐষিক বাণ' নিক্ষেপ করেন। সেই বাণে রাক্ষস ভূমিতে পতিত হয়। তার দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত। গোটা দেহ রক্তাপ্লুত। এখানেই যুদ্ধ শেষ। পরবর্তী কাহিনী শাপমুক্তির কাহিনী।

শিহরণ জাগানো যুদ্ধ বর্ণনা সর্বাংশে সার্থক হয়েছে। রাক্ষসের ভীষণ রূপ বর্ণনায় শব্দ চয়নের যথার্থতা লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধের প্রাক্কালে রামচন্দ্রের ভীত হওয়ার কার্য-কারণও রয়েছে সীতাদেবীর কবলে পড়ার মধ্যে। লক্ষ্মণের সাহসিকতা, দাদাকে উদ্বুদ্ধ করার বর্ণনায় লক্ষ্মণের চারিত্রিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পেয়েছে।

খর-দূষণের যুদ্ধ ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণে খর-দূষণের যুদ্ধ বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে আছে। সূর্পণখার কাছে রামকর্তৃক চোদ্দজন রাক্ষসের মৃত্যুর কথা শুনে খরের গর্জন—

"............দেখ তুমি আমার প্রতাপ।
ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ।।"

এরপর খর ও দূষণ চোদ্দ হাজার নিশাচর রাক্ষস সহ রাম-লক্ষ্মণকে শায়েস্তা করে সূর্পণখার মনের জ্বালা জুড়াতে যাত্রা করে। আটঘোড়ার রথে চড়ে খরের যুদ্ধ যাত্রা। দূষণের গর্জন—'রামেরে মারিব আগে পশ্চাৎ লক্ষ্মণ' রাক্ষস সৈন্যের কোলাহল শুনে রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সীতাদেবীকে সরিয়ে নেবার কথা লক্ষ্মণকে বলেন। লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করে। এবার যুদ্ধ শুরু। একদিকে রামচন্দ্র একাকী অন্যদিকে চোদ্দহাজার রাক্ষস। অন্তরীক্ষ থেকে দেব-দৈত্য-গন্ধর্ব সকলেই এই যুদ্ধ দেখতে আসে। দূষণের হুংকার, অন্যদিকে রামচন্দ্রের মৃদু হাসি। হাজার হাজার রাক্ষস রামচন্দ্রকে ঘিরে ফেলেছে। কবির দৃষ্টিতে এ দৃশ্য বর্ণিত—

''বেষ্টিত রাক্ষসগণ মধ্যে রাম একা।
শৃগালবেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা।"

খর ও তার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু। খর ও রামচন্দ্র উভয়েই একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। দু'জনেই বাণে বিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত। 'সহস্রবাণে'র আঘাতে ছয় হাজার রাক্ষস মারা যায়। একমাত্র জীবিত খর। দূষণ এই দৃশ্য দেখে শ্রীরামের প্রতি মহাশূল নিক্ষেপ করে। রামচন্দ্রের বাণে শূলসহ দূষণের দুহাত ছিন্ন হয়। রক্তাক্ত দূষণ মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে এবং "জ্বালায় দূষণ ত্যজিল পরাণ।"

দূষণের মৃত্যুর পর খর ভেঙে পড়ে। তার দুচোখ জলে ভরা। প্রতিশোধের জন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয়। খর ও রামচন্দ্রের যুদ্ধ কৃত্তিবাসের ভাষায়—

"রাম আর খর বীর অগ্নির আকার।
দশদিক জলস্থল বাণে অন্ধকার।।"

উভয়ে উভয়ের প্রাণ হরণের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শরভঙ্গের কাছ থেকে, ধনুর্বাণ রামচন্দ্র পেয়েছিলেন। বাণ নিক্ষেপ করে খরের ধনুককে রামচন্দ্র টুকরো টুকরো করে ফেলেন। অন্য আর একটি ধনুক নিয়ে খর একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। নানা অস্ত্রে দশ দিক ঝলসিত। অগস্ত্যমুনি প্রদত্ত ধনুকের সাহায্যে রাম পুনরায় খরের ধনুর্বাণ কাটেন। তার রণধ্বজ পতাকা ছিন্ন-ভিন্ন করেন। একে একে খরের রথের সারথি ও রথের আটটি ঘোড়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। খর মন্ত্রপূতঃ গদা নিয়ে ধেয়ে যায়। গদার আগুন নেভানোর জন্য রামচন্দ্রের

M#2\D:\EBG-2\Unit-9 Pm6.5\1st proof

বাণ নিক্ষেপ। তবু

"অগ্নি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে।
ত্রিভুবন একাকার ছাইল আগুনে।।"

শেষে অগ্নিবাণের দ্বারা এই আগুন নেভে। এরপর বাণে বাণে খরের শরীর হয় জর্জরিত। তার হাতে আর কোনো অস্ত্র না থাকাতে শেষে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে খর রামচন্দ্রকে কামড়াতে যায়। রামচন্দ্র 'ঐষিক বাণে'র দ্বারা খরকে দ্বিখণ্ডিত করে। খরের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনায় দেখা যায়—

"বজ্রাঘাতে যেমন পর্বত দুই চির।
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খরবীর।।

বজ্রাঘাতে পর্বত যেমন দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভেঙে পড়ে ঐষিকবাণের আঘাতেও পর্বতসম বিপুল খরের দেহ খণ্ডিত হয়ে ভূতলে লুটায়।

খরের সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও রোমাঞ্চকর করে কৃত্তিবাস রামের বীর্য মহিমাকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা, উৎকণ্ঠা, গতি অক্ষুণ্ণ রেখে রামচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন।

জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ ঃ আকাশপথে সীতাকে হরণ করে রাবণ যখন রথেই লঙ্কাপুরীর দিকে ধাবিত তখন সীতার বক্ষভেদী আর্তিতে আকাশ বাতাস বেদনায় ম্লান। রাবণের রথ যখন দ্রুতগতিতে ধাবিত ঠিক সেই সময় 'গরুড় নন্দন' জটায়ু সীতার বুক ভাঙা কান্না শুনে আকাশে উড়ে চারদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে। তারপর রাবণের রথকে চিনতে পেরে জটায়ু—

"দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণের গালি দিয়া মারে পাখসাট।।"

তার পাখার ঝাপটানিতে রাবণ দিশেহারা। জটায়ু পাখী সীতা হরণের অপরাধের জন্য রাবণকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালি দেয় এবং তীব্র ঘৃণায় বলে—

"কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা।।"

একদিকে পাখার আঘাত অন্যদিকে গালা-গালি দিয়ে রাবণকে জর্জরিত করে। তুমুল যুদ্ধ চলে। জটায়ু ছোঁ মেরে রাবণের পিঠের মাংস খুবলে নেয়। নখের আঁচড়ে ও ঠোঁটের কামড়ে রাবণের রথ ভেঙে যায়। তীক্ষ্ণ ঠোঁট দ্বারা সে সারথির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও রণধ্বজা টুকরো টুকরো হয়। ক্রোধে উন্মত্ত রাবণ নিরুপায় হয়ে সীতাকে ভূমিতে রেখে আকাশে উঠে। জটায়ু শ্রান্ত-ক্লান্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন। সেই দেখে রাবণ ভগ্ন রথকে আবার নূতন করে সাজায় এবং সীতাকে পুনরায় রথে তুলে নেয়। তা দেখে জটায়ু দ্বিতীয়বার রাবণের সঙ্গে 'মহাযুদ্ধে' লিপ্ত হয়। সে যুদ্ধ ভয়ংকর। পরের জন্য জটায়ু কেন প্রাণ দিচ্ছে—একথা বলে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করলে ঘোর যুদ্ধ বেধে যায়। জটায়ু ঠোঁট দিয়ে রাবণের রাজমুকুট খান খান করে, তার মাথার চুল উপড়ে নেয়। এতে—

'নিস্কেশ হইল রাবণের দশমুণ্ড'।

রাবণ জটায়ুর উদ্দেশ্যে বত্রিশ হাজার বাণ নিক্ষেপ করে তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তবু সে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যায়। রামচন্দ্রের জন্য সাহসে ভর করে জটায়ুর লড়াই স্মরণীয়। রাবণ 'অর্দ্ধচন্দ্রবাণে' তার দু'পাখা

কেটে ফেলে। জটায়ু মাটিতে পড়ে ছট্ ফট্ করতে থাকে। তার ব্যথায় সীতা ব্যথিত আর রামচন্দ্রের ভয়ে যুদ্ধ ক্লান্ত রাবণ তড়িঘড়ি রথ নিয়ে লঙ্কার দিকে যাত্রা করে।

পাখীর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধকে কৃত্তিবাস ভিন্ন রসে বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রচনা করেছেন। অন্যান্য যুদ্ধে-শূল, গদা ও নানা বাণের ব্যবহার দেখেছি কিন্তু প্রতিপক্ষ ভিন্ন জাতীয় বলে কবি জটায়ুর তীক্ষ্ম ঠোঁট, বিশাল পাখা, নখ ইত্যাদিকে যুদ্ধাস্ত্র রূপে ব্যবহার করে এই যুদ্ধে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছেন। একের পর এক যুদ্ধ বর্ণনায় ঘটনা ধারা যাতে শিথিল না হয়, পাঠক-পাঠিকা ক্লান্ত না হয়, একঘেয়েমি দেখা না দেয়, এইজন্যই যুদ্ধটি এতো আকর্ষণীয়। জটায়ুর বলিষ্ঠ দৃপ্ত ভূমিকাও দৃষ্টান্তস্বরূপ।

(গ) চরিত্র চিত্রণ ঃ কবি কৃত্তিবাস সহজ সরল বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে মহামুনি বাল্মীকির মূল রামায়ণের কাহিনীকে অতি-সংক্ষেপে লিখেছেন। বাঙালি জনগণের উপযোগী করে, পাঁচালীর ঢঙে এই গ্রন্থ রচিত। যার ফলে তাঁর হাতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বাঙালির আপনজন হয়ে উঠেছে। মূল রামায়ণের চরিত্র বাঙলার কোমল-পেলব মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। অরণ্যখণ্ডে'র বিভিন্ন মূল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো। আপনারা 'মূলপাঠ' পড়ে এবং এই অংশটি চর্চা করে যে-কোনো চরিত্র সম্পর্কেই অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং নিজের ভাষায় তাদের জীবনচিত্র তুলে ধরতে পারবেন। নিম্নে বিশেষ বিশেষ চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

শ্রীরামচন্দ্র ঃ মূল রামায়ণে বাল্মীকিমুনি রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামচন্দ্রকে বীররসে মণ্ডিত করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের হাতে চরিত্রটি ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছে। অরণ্যখণ্ডে রামের ভক্তের ভগবানরূপের পাশাপাশি বীরত্বের মহিমাতেও উজ্জ্বল হয়েছে। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র এই খণ্ডে ÂÃwাতৃভক্তরূপে যেমন সুচিহ্নিত, তেমনি পত্নীর প্রতি প্রেমে-আদর্শ পতিরূপে চিত্রিত। ভক্তি নম্র রামচন্দ্র প্রয়োজনে যে রুদ্রমূর্তিও ধারণ করতে পারেন তার পরিচয় আছে। 'সীতাহারা' রামচন্দ্রের আকুল বিলাপ পাঠকের চোখে জল আনে।

অরণ্যখণ্ডের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় ও বিরহ যন্ত্রণায় চরিত্রটি বাস্তবধর্মী হয়েছে। চিত্রকূট পর্বতে অবস্থানকালে ভীতত্রস্ত মুনিদের কানাকানিতে বুদ্ধিদীপ্ত রামচন্দ্র তাঁদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেই দৃঢ় চিত্তে বলেন—

> "যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত।
> আমারে জানাও আমি করিব বিহিত।।"

এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যের বিপদে প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার মহান আদর্শ লক্ষণীয়। মুনিগণের চিত্রকূট ছেড়ে চলে যাওয়া, নির্জন বনভূমিতে রূপবতী সীতাকে নিয়ে কীভাবে দিন কাটাবেন—সে গভীর চিন্তায় রামচন্দ্র মগ্ন হন। এই চিন্তার মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে অনুধ্যানী রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

অযোধ্যা থেকে চিত্রকূট বেশী দূর নয়। যে-কোনো সময় wাতৃভক্ত ভরত এসে রামচন্দ্রের পিতৃসত্য রক্ষার আদর্শভূমিকা টলাতে পারে একথা ভেবে তিনি চিত্রকূট ত্যাগ করে সুদূর দক্ষিণে যাত্রা করেন। এই সিদ্ধান্ত নেবার মধ্যে আমরা রামচন্দ্রের আদর্শের প্রতি অটল নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাই। অত্রিমুনির আশ্রমে তাঁর ভক্তি বিনম্র রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এরপর দণ্ডকারণ্যে প্রকৃতি প্রেমিক রামচন্দ্রকে আমরা পাই। বিরাধ, খর-দূষণের সঙ্গে যুদ্ধে রামচন্দ্রের বীরত্বের পাশাপাশি, সীতার বিপদ আশঙ্কিত ভাবনা রামচন্দ্রের চরিত্রটিকে বীর্যবত্তা ও প্রেম

M#2\D:\EBG-2\Unit-9 Pm6.5\1st proof

আলিম্পনে শৌর্য ও মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছে। বিশেষ বিশেষ মূহূর্তে লক্ষ্মণকে উপদেশ দেবার মধ্যে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রের আগমন মূহুর্তে লক্ষ্মণকে দূরে থাকতে এবং পঞ্চবটী বনে স্বর্ণমৃগ ধরে আনার সময় লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর নির্দেশ—

'যাবৎ মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে।
তাবৎ করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে।।"

এছাড়া সীতার আশাপূর্ণ করার জন্য ধনুর্বাণ হাতে বনে গমন ইত্যাদির মধ্যেও পত্নীর প্রতি অনন্ত ভালোবাসার রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

সূর্পণখার রামচন্দ্রের প্রতি প্রেম নিবেদন কালে রামচন্দ্রের চরিত্রে রস রসিকতা ফুটে উঠেছে। রামের জীবন সঙ্গিনী হবার জন্য যখন সূর্পণখা নাছোড়বান্দা তখন পরিহাস ছলে রামচন্দ্র বলেন—

"আমার হইলে জায়া পাবে যে সতিনী।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা হও সে বড় গুণী।।"

তিনি আরো বলেন—

"লক্ষ্মণ কনকবর্ণ পরমসুন্দর।
লক্ষ্মণের ভার্য্যা নাই তুমি কর বর।।"

এইরূপ টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে রামচন্দ্রের পরিহাসপ্রিয় মধুর চারিত্রিক ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে পড়েছে।

'শ্রীরামচন্দ্রের বিপাল ও সীতার অন্বেষণ' পর্বে আশঙ্কাকুল রামচন্দ্রের রূপের পাশাপাশি লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর আকুল প্রশ্ন—

"শুনরে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতুলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।"

কর্মযোগী রামচন্দ্র হয়েছেন অদৃষ্টবাদী। পত্নী প্রেমের অনন্তরূপ রামচন্দ্রের আদর্শ পতিসত্তাকে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়েছে। তন্ন তন্ন করে সব জায়গায় খুঁজেও সীতাকে না পেয়ে 'সীতা-সীতা' করে পাগল পারা হন। তাঁর বুক ভাঙা কান্নায় বনের পশু-পাখীও কাঁদতে থাকে। মুনিগণ ছুটে আসেন। কিন্তু তাঁর মুখে শুধু 'সীতা'। ভাইকে বলেন—

"কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।"

বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কাতর রামচন্দ্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় গভীর পত্মী প্রেম। স্ত্রীর প্রতি রামচন্দ্রের অনন্ত প্রেম কবি প্রস্ফুটিত করতে লিখেছেন—

"সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।।"

অরণ্যখণ্ডের এই অংশটিতে প্রেম ভীরু কোমল মধুর রূপটি কৃত্তিবাস করুণ রসের ধারায় স্নাত করে বীর

রামচন্দ্রকে সার্থক প্রেমিকরূপে সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি শুধু চোখের জলের বুক ভাসিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। সীতা উদ্ধারের জন্য মন প্রাণ দৃঢ় করে এগিয়ে গেছেন। শবরীকে শাপমুক্ত করে ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে সুগ্রীবের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

সার্বিক বিচারে চরিত্রটি কোমলে কঠোরে আকর্ষক হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের শৌর্য ও মাধুর্য একাকার হয়ে গেছে। বীরত্ব, প্রেম, পরিহাসরসিকতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি সর্বগুণে গুণান্বিত চরিত্রটি নিঃসন্দেহে 'অমৃতের ভাণ্ড'।

সীতা ঃ কৃত্তিবাসের হাতে সীতা চরিত্রটি সর্বংসহা বাঙালি কুলবধূর রূপ লাভ করেছে। স্বামীর বনবাসী জীবনের সঙ্গিনী হয়ে সুখে-দুঃখে স্বামীর সম ভাগী হয়েছেন। বাঙলার কোমল-পেলব মাটির গন্ধ চরিত্রটিকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে। পতিভক্তির আদর্শ সীতার জীবনের পরতে পরতে লক্ষ্য করা যায়। রূপে-গুণে তিনি অতুলনীয়া।

'অরণ্যকাণ্ডে' সীতা ছায়ার মতো রামের সঙ্গে বনে বনে ঘুরেছে। অত্রিমুনি আশ্রমে মুনিপত্নীর স্নেহ ভালোবাসায় উদ্বেল সীতার জন্মবৃত্তান্ত পরিবেশন স্নিগ্ধ মধুর। দশবছর নানা বনে ঘুরে পঞ্চবটী বনে এসে সীতা স্বামীকে অনুনয়ের সুরে বলেন—

"সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ।
রাক্ষস মারিয়া তব কোন্ প্রয়োজন।।"

স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করেই সীতা কথাটি বলেছেন। স্বামী ভক্তির পবিত্রতা এতে প্রকাশ পেয়েছে। খর-দূষণের যুদ্ধে রামচন্দ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখে—

"জানকীর নেত্রনীর ঝর ঝর ঝরে।।"

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

স্বর্ণমৃগ দেখে মধুর বচনে সীতা রামকে অনুরোধ করেন—

"এই মৃগ চর্ম যদি দাও ভালবাসি।
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি।"

পত্নীর আশা পূরণে রামচন্দ্রের হরিণ শিকারে যাত্রা এবং মারীচের নকল আর্ত কণ্ঠস্বরে ভীত চকিত সীতার লক্ষ্মণের প্রতি করুণ আবেদনের মধ্যে শুচীশুw প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু শূন্য ঘরে সীতাকে একাকী ফেলে সে যেতে অস্বীকার করলে সীতা জ্ঞান শূন্যা হয়ে লক্ষ্মণকে বলেন—

"বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন।
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার আছে মন।।
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী।
ভরতের মনে সড় আছয়ে তোমারি।"

এই বক্তব্যের মধ্যে সীতার হীনমন্নতার পরিচয় থাকলেও গভীর ভাবে যদি ঘটনার পরিবেশ ও পটভূমিকা বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে স্বামীকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চিন্তাই সীতাকে পেয়ে বসেছিল। wাতৃভক্ত লক্ষ্মণকে চরম আঘাত না দিলে সে wাতৃ আদেশে অটল থাকবে এতে রামচন্দ্রের চরম বিপদ ঘটতে পারে—এই আশঙ্কাতেই সীতা কথাগুলি বলেছেন। এসব তাঁর মুখের কথা মনের কথা নয়।

অতিথি পরায়ণ সীতা আতিথ্য নিষ্ঠার জন্যই লক্ষ্মণের আদেশ অমান্য করে গণ্ডীর বাইরে এসে রাবণের হাতে

বন্দিনী হন। অনেকে একে হঠকারী বলে চিহ্নিত করতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় বাঙালির চিরন্তন আতিথেয়তার আদর্শেই সীতা এমনটি করেছেন। রাবণ সীতাকে আকাশ পথে নিয়ে যাবার দৃশ্যে হীনমন্ন রাবণের প্রতি সীতার তীব্র ঘৃণা ও স্বামীর প্রতি অনন্ত প্রেমাশ্রু ঝরে পড়েছে। গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদ-নদী পাহাড়-পর্বত সকলের উদ্দেশ্যে তাঁর কাতর আবেদনে আমার স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনাতুরা সতি-সাধ্বী-মহিয়সী নারীর রূপটিই প্রত্যক্ষ করি। পথ রেখা ধরে রামচন্দ্র যাতে অনুসন্ধানী হতে পারেন তার জন্য সীতা তাঁর গায়ের গহনাদি পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে দেন। এর মধ্য দিয়ে চরিত্রটির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের শত প্রলোভন সীতা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর কণ্ঠে এক বাণী—

"রাম ধ্যান রাম প্রাণ শ্রীরাম দেবতা।
রাম বিনা অন্য জনে নাহি জানে সীতা।"

এই অংশেই সীতার পতিব্রত্যের নৈষ্ঠিক রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। অশোককাননে বন্দিনী সীতা নীরব নিথর।

"সশোকা থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্বদা রাম মলিন নয়নে।।"

বিরহ অনলে সীতা চরিত্রটি প্রেম পবিত্ররূপ ধারণ করেছে।

লক্ষ্মণ ঃ শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছর বনবাসী জীবনে ছায়াসঙ্গী ছিল লক্ষ্মণ। কৃত্তিবাসের হাতে 'অরণ্যখণ্ডে' লক্ষ্মণ শুধু রামচন্দ্রের ছায়া নয় কায়ারূপও ধারণ করেছে। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দুর্বল অসহায় রামের মনে শক্তি ও আশা স্বপ্ন জাগাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, ভাতৃভক্তির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সীতার কটূক্তির প্রত্যুত্তর না দিয়ে নিজেকে সংযমের শাসনে বেঁধে সীতার নিরাপত্তা বিধানে কার্পণ্য করেনি। ধীর-স্থির অটল-স্বল্পভাষী লক্ষ্মণের চরিত্রটিকে কৃত্তিবাস দু-একটি তুলির টানে জীবন্ত করে এঁকেছেন।

দণ্ডকারণ্যের পথে আগে রাম মধ্যে সীতা ও পিছনে লক্ষ্মণ পথ চলছে। তিনজনে প্রকৃতির কোলে আনন্দে আত্মহারা। এমন সময় ভীষণ রাক্ষণ বিরাধের আগমন। সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে সে ভক্ষণ করতে চায়। শুধু সীতা নয় দুই ভাইকেও সে হত্যা করতে উদ্যত। এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে রাম ভীত হয়ে পড়েন। তাঁদের সামনে সীতাকে রাক্ষস গিলে খাবে অথচ নিরুপায়ভাবে তা দেখতে হবে এই ভাবনায় রাম যখন দিশেহারা, তখন লক্ষ্মণ দাদার মনোবল ফেরাতে—

"লক্ষ্মণ বলেন দাদা না ভাবিও তাপ।
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মনস্তাপ।।"

লক্ষ্মণের এই উদ্দীপন মন্ত্রেই রামের শৌর্য-বীর্যের জাগরণ ঘটে। সুতরাং চরম সঙ্কট মুহূর্তে লক্ষ্মণকে আমরা দৃঢ়চেতা যুবকরূপে দেখতে পাই। অগস্ত্য মুনির লক্ষ্মণ সম্পর্কে মন্তব্য—

"দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।"

লক্ষ্মণ চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন। রাম-সীতার সুখ-দুঃখের সমঅংশভাগী সে। আত্মসর্বস্বতার কোনো মলিনতা চরিত্রটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। লক্ষ্মণের পরামর্শেই গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বনে রামচন্দ্র কুটীর নির্মাণ করেন। দাদার স্বপ্নকে সে একদিনে সুন্দর কুটীর তৈরী করে সার্থক করে। তার ছিল গভীর সৌন্দর্যবোধ। কুটীর সম্পর্কে কবির 'মনোহর' শব্দটি এবং 'পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি'—এই বর্ণনা তার সাক্ষ্য বহন করে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

খর-দূষণের সঙ্গে যুদ্ধে রামচন্দ্রের সহযোগী যোদ্ধার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে লক্ষ্মণ। 'ভয়' শব্দটি তার চরিত্র অভিধানে লেখা নেই। পরিহাস করে রামচন্দ্র সূর্পণখাকে লক্ষ্মণের কাছে যেতে বল্লে সূর্পণখা তার দিকে ধাবিত হয়ে শৃঙ্গার রস ঢেলে দেয়।

লক্ষ্মণ নিজেকে 'শ্রীরামের দাস' বলে তাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু সূর্পনণখা বাড়াবাড়ি করে সীতাকে গিলে খেতে গেলে রামের ইঙ্গিতমাত্র বাণ দিয়ে তার নাক কান কেটে দেয়। একদিকে ভ্রাতৃভক্তি অন্যদিকে দুষ্টকে শায়েস্তা করা —দুটি কাজ লক্ষ্মণ করে তার চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছে।

মারীচের ছলনায় ভুল বুঝে সীতা লক্ষ্মণকে অশালীন ভাষায় গালাগালি ও রুচিহীন ইঙ্গিত করলেও—

"লক্ষ্মণ ধার্ম্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ।।"

কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের নিষ্পাপ চরিত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েও কর্তব্য কর্মে তার অবহেলা নাই। তাই সীতাকে সাবধান করে গণ্ডী একে দিয়ে যায়। এর মধ্যে তার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণের মানসিক অবস্থা না বুঝে পরিস্থিতি অজ্ঞাত থাকার জন্য রামচন্দ্র সীতাকে একাকিনী ফেলে আসার জন্য অপ্রত্যক্ষভাবে দোষারোপ করলেও সে নিরুত্তর থাকে। বুক ভরা জ্বালা নিয়েও তার কর্তব্য জ্ঞান ও সংযমের জন্য চরিত্রটি আদর্শস্থানীয় হয়েছে। কবন্ধের দুই-হাত ছিন্ন করার ব্যাপারে লক্ষ্মণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা আছে। তার আহ্বানেই কবন্ধ মুক্তি পাবার পর সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের কাছে তাদের যাবার নির্দেশ দেয়।

সুতরাং লক্ষ্মণ চরিত্রটিকে কৃত্তিবাস স্বল্প স্থানের মধ্যে রেখেও অসামান্য করে তুলেছেন। ভ্রাতৃভক্তি, বৌদির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, চরম বিপদে স্থির থেকে বুদ্ধি দান, সাহসীও সংযমী ভূমিকা পালন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লক্ষ্মণ নিঃসন্দেহে দৃষ্টি আকর্ষণকারী চরিত্র হয়েছে।

রাবণ ঃ কৃত্তিবাসের অরণ্যকাণ্ডের শেষের দিকে আমরা লঙ্কেশ্বর রাবণকে দেখতে পাই। সূর্পণখা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের প্রতি দৈহিক কামনা-বাসনা-সঘন প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে সীতাকে আক্রমণ করলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ তার নাক, কান কেটে দিলে খর-দূষণকে উত্তেজিত করে চোদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য নিয়ে তারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। আতঙ্কে দিশেহারা প্রতিশোধের শেষ অস্ত্র হিসাবে সূর্পণখা রাবণকে বেছে নেয়।

রাবণ-রাজ সভায় আসীন। বিভৎস মুখ নিয়ে সূর্পণখা রাবণকে প্রথমে গালাগালি দেয় তারপর রামের বন গমন ও রাক্ষসদের হত্যার বিবরণ দিয়ে সীতার রূপ বর্ণনা করে—

"রামের মহিষী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী।
ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপে পরমা কামিনী।"

এখানেই শেষ নয়। সীতার সৌন্দর্য্যের কাছে স্বর্গের অপ্সরী উর্বশী, মেনকা, রম্ভাও হার মানে। শেষে রাবণের কামনা আগুন জ্বালতে বলে—

"তার রূপ কেবল তোমাকে মাত্র সাজে।"

সূর্পণখার দুরবস্থায় রাবণ বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। সে 'সুন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে'। এই একটি চরণেই কৃত্তিবাস কামুক রাবণের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। রূপবতী সীতাকে তার চাই। মনে মনে পরিকল্পনা গ্রহণ করে মারীচের কাছে সূর্পণখার নাক কান কাটার কথা বলে সীতাহরণের জন্য মারীচকে হরিণ সেজে রামকে মায়াজালে জড়িয়ে ফেলতে

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

বলে। মারীচ তাকে অনেক সুমন্ত্রণা দেয়, এমনকি এই কু-কর্মের জন্য লঙ্কাপুরী ধ্বংস হবে এমন কথাও বলে। কিন্তু রাবণ সব মন্ত্রণা নস্যাৎ করে মারীচকে তার আজ্ঞা পালন করতে বলে নতুবা তার মৃত্যু অনিবার্য একথাও বলে।

নিরুপায় মারীচ রাবণের নির্দেশে সোনার হরিণ সাজে, সীতাকে প্রলুব্ধ করে, রামকে কুটীর থেকে অরণ্যে আনে রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে সীতাকে প্রতারিত করে লক্ষ্মণকেও কুটীর ছাড়তে বাধ্য করে। রাম-লক্ষ্মণ শূন্য কুটীরে একা সীতা। তপস্বীর বেশ ধরে রাবণ মিষ্টি মধুর কথায় সীতার মন ভেজায়। নিজের কথা বলে ভিক্ষা চায়। সীতা ইতস্ততঃ করতে থাকলে তার বজ্র নির্ঘোষ—

"................... ভিক্ষা আনহ সত্বর।
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।।"

আতিথেয়তার ধর্ম নষ্ট হবে বলে লক্ষ্মণের কথা উপেক্ষা করে গণ্ডী পেরোতেই ছদ্মবেশী রাবণের আসল চেহারাটা প্রকাশ পায়। কৃত্তিবাসের ভাষায় 'রাবণ পাতকী'। সীতার মনহরণের জন্য স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্যের জগতকে তার সামনে তুলে ধরে নির্লজ্জের মতো বলে—

"সীতে তুমি সুন্দরী লাবণ্য আর বেশে।
তোমা হেন সুন্দরী আমাকে অভিলাষে।।"

সূর্পণখা দাদার কামুক চরিত্রের যে আভাস দিয়েছিল তা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় রাবণের এই নগ্ন ইচ্ছার মধ্যে। জটায়ু পাখী সীতা হরণের জন্য রাবণের উদ্দেশে কটু বাক্য প্রয়োগ করেছিল তা সম্পূর্ণ সঠিক। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু সুচতুর রাবণ নিজের কামাগুণের কথা চেপে সূর্পণখার প্রতি রাম-লক্ষ্মণের নৃশংস ব্যবহার, খর-দূষণের নিষ্ঠুর মৃত্যু ইত্যাদির কথা অনুনয়ের সুরে বলে, পক্ষীরাজের কাছে পরাজয় মেনে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে কোনোক্রমে ভাঙ্গা রথ নিয়ে লঙ্কায় আসে। সীতার সঙ্গে, জটায়ুর সঙ্গে রাবণ যে অভিনয় করেছে তাতে তার চাণক্যীয় কূট-কৌশল লক্ষ্য করা যায়। চতুর কামুক রাবণ অশোক কাননে সীতাকে বন্দিনী রেখে তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। কৃত্তিবাসের হাতে রাবণ পাপিষ্ঠ, ছল-চাতুরী পূর্ণ কামুক রূপেই চিহ্নিত।

সূর্পণখা ঃ পঞ্চবটী বনে সূর্পণখার আবির্ভাব। 'মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী'—রামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হয়ে রূপজ মোহে তাকে জীবনসঙ্গী করে ভোগসুখে মগ্ন হতে চায়। সীতা লক্ষ্মণের পরিচয় দিয়ে এবং বনবাসী হওয়ার কারণ জানিয়ে রামচন্দ্র সূর্পণখাকে এড়াতে চায়। খর-দূষণ দুই ভাই এর কথা বলে সে নগ্নভাবে রামচন্দ্রকে প্রস্তাব দেয়—

"সুমেরু পর্ব্বত আর কৈলাস মন্দর।
তোমাসহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর।।"

শুধু তাই নয় সীতাকে ভক্ষণ করে একা রামের সঙ্গিনী হবে বলে। রামচন্দ্র কৌতুক বলে লক্ষ্মণকে দেখিয়ে দিলে সে নির্লজ্জের মতো তাকে বলে—

"তুমি যুবা হইয়া একেলা বঞ্চ রাতি।
রসক্রীড়া ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি।।"

কৃত্তিবাস দেহ সম্ভোগী সূর্পণখার চরিত্রটিকে সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। কামনা-বাসনার স্বপ্ন ব্যর্থ হলে—নাক,

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

কান কাটা গেলে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে সে খর-দূষণকে যুদ্ধে পাঠায়। তাদের মৃত্যুর পর রাবণকে নরমে-গরমে, চোখের জলে নানা অভিনয় করে সীতা হরণের পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয় নিজের কামাগ্নিকেই সে ছড়িয়ে দেয় রাবণের চিন্তায় ভাবনায়।

সুতরাং দেখা যায় সূর্পণখা চরিত্রটি অরণ্যকাণ্ডে সম্পূর্ণ মসীলিপ্ত। স্বাধীন প্রেম শ্রদ্ধার অর্ঘস্বরূপ। কিন্তু সূর্পণখার নগ্ন প্রেম নিবেদন ঘৃণার্হ। লক্ষ্মণ তার নাক-কান কেটে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে। লঙ্কাপুরী যে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে তার মর্ম মূলে সূর্পণখার কামনার অনল অন্যতম। সে এই অনলই প্রজ্জ্বলিত করেছে রাবণের হৃদয়ে।

মারীচ ঃ 'অরণ্যখণ্ডে' মারীচের জন্য আমাদের সহানুভূতি ও দুঃখ দুই-ই জাগে। সুবিবেচক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নিরুপায় মারীচ করুণার পাত্র। সীতাহরণের কামনা পূর্ণ করতে রাবণ মারীচের গুণগানে মুখর হলেও সে তার প্রস্তাবকে মনে প্রাণে সমর্থন করেনি। ন্যায়-অন্যায় বোধে চরিত্রটি উদ্দীপিত। সে স্পষ্ট ভাষায় রাবণকে সুমন্ত্রণা দিয়ে বলে—

"যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।।"

কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী'—রাবণ নাছোড়বান্দা। সে মারীচকে কু-কর্মে সহযোগী হতে বলে, না হলে তার মৃত্যু অনিবার্য বলে ভয় দেখায়। কিন্তু মারীচ মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। তবে এই মৃত্যু রাবণের হাতে নয় রামচন্দ্রের হাতেই তার কাম্য। তাই আমরা শুনতে পাই মারীচের মর্ম কথা।

"বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল।
রাবণের হাতে মৃত্যু নরক কেবল।

পাপ-পুণ্য বোধ চরিত্রটিকে অসামান্য মর্যাদা দান করেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বে তাকে রাবণের নির্দেশ মেনে ছলা-কলা নিতে হয়েছিল, যার পরিণামে সীতাহরণ, লঙ্কাযুদ্ধ ও লঙ্কাপুরী ধ্বংস। মারীচের আত্মত্যাগ যেন লোভ ও পাপের উচিত ফল প্রাপ্তির নির্দেশক। মারীচের শত ছলা-কলা, সীতার অপহরণ ইত্যাদির জন্য সাধারণ দৃষ্টিতে মারীচকে দায়ী বলে মনে হলেও কৃত্তিবাস মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মারীচকে উচ্চস্থানে বসিয়েছেন।

৩০.৭ অরণ্যকাণ্ডের বিশেষ-কয়েকটি ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ

(ক) অত্রিমুনি পত্নীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন, (খ) অগস্ত্য মুনির উপদেশ, (গ) রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা, (ঘ) শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।

এই অংশে কৃত্তিবাসের রামায়ণ গ্রন্থের 'অরণ্যখণ্ডে'র বিশেষ বিশেষ অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এই অংশগুলি পাঠ করলে অন্যান্য প্রধান বা অপ্রধান অংশগুলি ও মূল-পাঠ দু-তিনবার পাঠ করে আপনারা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন। নিজের ভাবনা ও প্রকাশ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্য অংশগুলি বিশ্লেষণ করা হল।

(ক) অত্রিমুনির আশ্রমে মুনিপত্নীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন ঃ

চিত্রকূট ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে রামচন্দ্র অত্রিমুনির আশ্রমে সমাদরে স্থান পাবার পর মুনি,

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

সীতাদেবীকে তাঁর পত্নী গৌতমীর হাতে সমর্পণ করেন। মুনি-পত্নীকে দেখে সীতার মনে হয় 'মূর্ত্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।'

সীতাকে প্রাণ ঢালা আশীর্বাদ করে মুনিপত্নী তাকে মুখোমুখী বসিয়ে সস্নেহে মধুর কথা বলতে শুরু করেন।

সীতাদেবীর ভাগ্যপ্রসন্ন। পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়ই রাজকুল। দুই বংশকেই সীতা উজ্জ্বল করেছেন। রামচন্দ্র বহু তপস্যা করে এমন স্ত্রী লাভ করেছেন। রাজ সম্পদের মোহত্যাগ করে সীতা স্বামী সঙ্গিনী হয়ে বনবাসিনী হয়েছেন। সীতার গুণগান মুনিপত্নী পঞ্চমুখে করলে, সীতা বিনয়ের সঙ্গে বলেন—

'ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।
আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।।"

স্বামী ভক্তির পরম নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করে মুনিপত্নী আনন্দে আত্মহারা। তিনি সযত্নে তাঁকে নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে আদরে আলিঙ্গন করে সীতাকে তাঁর পূর্ব জীবনের ঘটনা বলতে বলেন। সীতা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত তুলে ধরেন।

স্বর্গের অপ্সরা মেনকা আকাশপথে যাবার সময় তার বস্ত্র উড়ে যায়। তার দৈহিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে জনক রাজার কামনাবহ্নি জ্বলে ওঠে এবং তার বীর্যের স্খলন হয়। সেই বীর্য মাটিতে পড়ে এবং তা থেকেই সীতার জন্ম। জমি চাষের সময় লাঙ্গলের ফলায় সীতার দেহ সূর্য্যের আলোতে আসে। নিজের কন্যা অনুমান করে জনক রাজা তাকে কোলে স্থান দেন। এমন সময় আকাশে দৈববাণী হয়। এই দৈববাণীতে সীতার জন্ম কাহিনী পিতা জানতে পারেন। লাঙ্গলের মুখে জন্ম বলে নাম রাখলেন সীতা। আনন্দে আত্মহারা রাজা দীন-দুঃখীদের অকাতরে ধন দান করেন। রাজমাতার স্নেহে সীতা বড় হন। যে শিবের ধনুকে গুণ পরাতে পারবে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন বলে মনে মনে স্থির করেন। রাজার বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তেরো লক্ষ রাজকুমার এসে উপস্থিত। কিন্তু সবাই ধনুক দেখে ভয় পায় এবং মনের দুঃখে স্থান ত্যাগ করে। জনকরাজা দুঃশ্চিন্তায় পড়েন। এমন সময় রাম-লক্ষ্মণের উপস্থিতি। শ্রীরামচন্দ্র বাম হাতে ধনুক তুলে তাতে গুণ পরাতে গেলে শিবধনুক ভেঙ্গে যায়। ধনুক ভাঙ্গার শব্দে ত্রিভুবন স্তব্ধ হয়ে যায়। এর পরই মহা ধূমধামের মধ্য দিয়ে রাম-সীতা ও কুশধ্বজের দুই মেয়ের সঙ্গে লক্ষ্মণ ও ভরতের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইভাবে পূর্বকথা শেষ করে বিনয় নম্রভাবে সীতা বলেন—

"ভগবতী পূর্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম।।"

সীতার কথায় পরিতৃপ্ত হয়ে মুনিপত্নী সীতার সিঁথিতে সিঁদুর দেন আর তার সর্বাঙ্গে মূল্যবান অলঙ্কারাদি পরিয়ে নববেশে নবরূপে সাজিয়ে দেন।

সীতা ও মুনি পত্নীর কথোপকথনে আমরা অত্যন্ত আপনজনের হৃদি বিনিময় দেখি। রাজদুহিতা রাজপত্নীর বনবাসিনী মূর্তি গুরু পত্নীকে ব্যথা দেয়—এজন্যই তিনি তাকে অলঙ্কারাদি দিয়ে সাজিয়েছেন। প্রথম দর্শনেই মুনি পত্নীকে সীতার করুণারূপিনী মনে হওয়ায় প্রাণখুলে তিনি তাঁর পূর্ব জীবনের ইতিবৃত্ত বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সীতার বনবাসিনী রূপ দেখে মুনিপত্নীর কথায় বেদনা প্রকাশ পেলে সীতা তার পতিভক্তির প্লাবনধারায় সে বেদনা দূর করে দেন। উভয়ের কথোপকথন যেমন আন্তরিক তেমনি হৃদিরসে জারিত।

(খ) অগস্ত্য মুনির উপদেশ ঃ পঞ্চবটী বনে দীর্ঘদিন বাস করে সুতীক্ষ্ণ মুনির কাছে অগস্ত্যমুনির নিকট যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মুনি পিপ্পলী বনে গিয়ে অগস্ত্যের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। অগস্ত্যের তপোবনে গিয়ে বাতাপি ও

ইল্বল রাক্ষসকে অগস্ত্য মুনি কিভাবে বধ করেছিল সে কাহিনী শুনায়। তারপর মুনির দ্বারা তাঁরা তিনজন উপস্থিত হন। রামের কথা শুনে মুনি শিষ্যকে শীঘ্র তাঁদের ডেকে আনতে বলে। তিনজন অগস্ত্যের চরণ বন্দনা করে। গোলোক ছেড়ে রামচন্দ্র বনবাসী হয়েছেন। তাঁর আর কি ইচ্ছা তা মুনি জানতে চান। শ্রান্ত বনবাসীদের ভোজনে তৃপ্ত করে। তিনদিন সেখানে তাঁর থাকার পর চতুর্থদিন ভোরে রামচন্দ্র অগস্ত্যের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বললে, অগস্ত্য মুনি তাঁকে গোদাবরী তীরে থাকতে বলেন। তিনি রামচন্দ্রকে বিশ্বকর্মা নির্মিত 'দিব্য ধনুর্ব্বান' প্রদান করেন। রামচন্দ্রকে 'সোনার টোপর' ও 'বস্ত্র রত্ন' দিয়ে আদর করে কাছে টেনে নেন। অগস্ত্য মুনির আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর নির্দেশেই রাম-লক্ষ্মণ সীতা অগস্ত্যমুনির তপোবন ত্যাগ করে। দক্ষিণ দিকে গোদাবরী নদীর তীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এই অংশে রামচন্দ্রের ভগবৎরূপ অগস্ত্যমুনি জানতে পারেন। পিতৃসত্যের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি যাতে নির্ভাবনায় আনন্দে থাকতে পারেন তার জন্যই মুনির 'দিব্য-ধনুর্ব্বান' দান এবং গোদাবরী নদীর রমণীয় তীরে কুটীর নির্মাণ করে বসবাসের নির্দেশ দান।

(গ) রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রণা দান ঃ

সূর্পণখার কাছে সীতার রূপ ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে রাবণ কামনার আগুনে জ্বলে সীতাহরণের জন্য মারীচের সাহায্য চায়। কিন্তু মারীচ স্পষ্টভাবে বলে—

'সীতা লোভ ছাড়িয়া চলিয়া যাহ ঘর'

রাবণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় রাবণ ভীষণ রেগে যায় এবং তাকে বলে—

'আমি তোরে মারিব কে রাখিতে পারে।'

রাবণ নিজের প্রতাপের কথা সদম্ভে ঘোষণা করে এবং রামচন্দ্রকে হীন মনুষ্যজাতিরূপে তাচ্ছিল্য করে। মারীচের কাছে রাবণ জোরের সঙ্গে বলে—

"ভাণ্ডাইয়া রামেরে লইয়া যাহ দূর।
হরিয়া আনিব সীতা পেয়ে শূন্য পূর।"

বারণের কু-প্রস্তাব ও তাকে হত্যা করার হুমকী অগ্রাহ্য করে মারীচ বলিষ্ঠভাবে পরিণাম সম্পর্কে বলে—

'সীতারে আনিলে হবে সবংশে মরণ।' রাবণ জীবনে অনেক নারীকে হরণ করেছে, কিন্তু সীতাকে হরণ করলে তার আর নিস্তার নেই। শুধু রাবণ নয়, লঙ্কাপুরীর সকলের জীবনও হবে সংশয়। একজনের স্ত্রীকে এনে সকল নারীর মর্যাদা নষ্ট হবে। তাই মারীচ রাবণকে সীতার লোভ ত্যাগ করার কথা বলে লঙ্কাপুরীতে ফিরে যেতে বলে। রামচন্দ্রের মুখোমুখি হয়ে আগে মারীচের মৃত্যু হবে কিন্তু সীতা হরণের পর রাবণ ও লঙ্কাপুরীর সকলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। মারীচ মায়ামৃগরূপ ধারণ করে রামচন্দ্রকে ভুলিয়ে বনে আনতে পারবে, কিন্তু সীতাকে রক্ষার জন্য দেবর লক্ষ্মণ কুটীরে থাকবে। লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে কারো সাধ্য নেই সীতাকে হরণ করে। সুতরাং মারীচের সুমন্ত্রণা দান—

"যথা তথা যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর।
না কর সীতার চেষ্টা চলি যাহ ঘর।"

শুধু তাই নয় মারীচ শেষবারের জন্য বলে যে তার মন্ত্রণা উপেক্ষা করে রাবণ যদি সীতাকে হরণ করে তবে মারীচের ভবিষ্যৎবাণী তাকে স্মরণ করতেই হবে। অর্থাৎ তার ও দেশবাসীর মহা সর্বনাশ ঘটবে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

মারীচ যুক্তিসহ মানবিক সুমন্ত্রণাই দিয়েছে রাবণকে। মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে রাবণের কু-পরামর্শে ভীরু কাপুরুষের মতো তৎক্ষণাৎ রাজি হয়নি। বরং সীতার লোভ ত্যাগ করে, ভবিষ্যৎ এর সর্বনাশের কথা ভেবে যাচ্ছে রাবণ কু-ইচ্ছা দমন করে তার জন্যই তাকে এই সৎ পরামর্শ দান। এর মধ্য দিয়ে মারীচের নির্ভীক আদর্শবাদী চারিত্রিক মাধুর্যই প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ঃ কৃত্তিবাসের 'অরণ্যখণ্ডে'র শেষ অংশটি 'শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ' রূপে চিহ্নিত।

ধনুর্বাণ হাতে রামচন্দ্র কুটীরে যাত্রা করেন। পথে অমঙ্গলের বহু চিহ্ন তাঁর চোখে পড়ে। মারীচের রামকণ্ঠের আহ্বানে লক্ষ্মণ কি সীতাকে একাকিনী রেখে বনে আসবে? যদি আসে তবে সীতার কি হবে?—এইসব চিন্তায় মগ্ন অবস্থাতেই পথে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখেই রামচন্দ্রের প্রাণ কেঁপে ওঠে। তাঁর কণ্ঠে মহা বিপদের সংকেত—

"মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ পাব নাই।।"

ভাই লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের বক্ষভেদী বিলাপ—

"শুনরে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতুলি।
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।"

দুরন্ত রাক্ষস পরিবৃত্ত এই গভীর বনে মুনি ঋষিগণ সর্বদা শঙ্কাতুর। লক্ষ্মণ সব জেনে শুনেও যে কাজ করেছে তার ভবিতব্য ভেবে রামচন্দ্র নিজের অদৃষ্টকেই বার বার দোষারোপ করতে থাকেন। মারীচ বধের দৃশ্য দেখিয়ে ভাইকে নিয়ে রামচন্দ্র দ্রুত কুটীরের দিকে গমন করেন। কুটীর দ্বারে পৌঁছে তার বুক ফাটা "সীতা-সীতা" ডাক। কোনো উত্তর নেই। কুটীর সীতা শূন্য দেখে তিনি মুর্চ্ছিতপ্রায় হন। সীতা ছাড়া রামচন্দ্র কিভাবে বাঁচবে—সীতাকে না পেলে প্রাণত্যাগ করবে ইত্যাদি বিলাপ করতে থাকেন। বন-গুহা, তরুমূল তন্ন তন্ন করে খুঁজে সীতাকে না পেয়ে রামচন্দ্র চোখের জলে বুক ভাসান। তাঁর কান্নায় বনের পশু-পাখীও কাঁদে। সীতার শোকে রাম অস্থির। তবু আশায় বুক বেঁধে লক্ষ্মণকে মুনি-পত্নীর কাছে, গোদাবরী তীরে খুঁজতে বলে।

"সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতাবিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।।"

ফণী ছাড়া সাপের জীবন যেমন ব্যর্থ, তেমনি সীতাহারা রামচন্দ্রের জীবনও অন্ধকার। লক্ষ্মণ ভাই-এর প্রতি তাঁর করুণ আবেদন—

"দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।।"

পথে সীতার অলঙ্কারাদি, রাবণের রথচূড়ার অংশাদি দেখে ঐ স্থানকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে বলেন রামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপে বন-বনানী বেদনায় দীর্ণ। হঠাৎ সামনে আহত জটায়ু পাখীর সঙ্গে দেখা, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের বৃত্তান্ত শ্রবণ এবং তার নির্দ্দেশে রাম-লক্ষ্মণের সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে যাত্রা। মূল লক্ষ্য সীতা উদ্ধার।

এই অংশে পত্নী প্রেমের অনন্তরূপ শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সীতাহারা রামচন্দ্রের বিলাপ করুণ রস ধারায় স্নাত।

৩০.৮ কৃত্তিবাসের কবি পরিচিতি ও কবিকৃতি আলোচনা

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চর্যাপদের আলোয় বাংলা সাহিত্য আলোকিত। কিন্তু তার পরেই বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জগতের ওপর নেমে আসে চরম অন্ধকার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দুশো বছরের অধিককাল সাহিত্য অঙ্গনে কোনো প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত না হবার কারণ তুর্কী আক্রমণ, মোহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ এবং তার অনুচর বক্তিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ আক্রমণ। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ না করেই পশ্চিমবঙ্গাকে তুর্কি শাসনের কবলে তুলে দেন। শুরু হয় নিষ্ঠুর অত্যাচার, বয়ে যায় রক্তের প্লাবনধারা। যার ফলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাও হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তুর্কি শাসকদের দীর্ঘদিন এই দেশ শাসনের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়। বিদেশে টিকে থাকতে হলে এদেশের মাটিকে ও মানুষকে ভালোবাসতে হবে, এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে হবে—এই বোধ ও চেতনার দূরদৃষ্টি থেকেই বিদেশি শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের মন জয় করার জন্য ও অন্তর্শায়ী বিদ্যোৎসাহিতার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের জন্য একদিকে পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে প্রেরণা দান করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৬৯ খ্রিঃ — ১৪৭৩ খ্রিঃ) হুসেন শাহ (১৪৯৩ খ্রিঃ — ১৫০০ খ্রিঃ) এবং তার পুত্র নসরৎ খাঁ (১৫১৮ খ্রিঃ — ১৫৩২ খ্রীঃ)। বাংলার এই সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আদি কবি বাল্মীকির কাহিনী অবলম্বনে যিনি সর্বপ্রথম 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সার্থক বঙ্গানুবাদ করেন তিনি হলেন "এ বঙ্গের অলঙ্কার" কৃত্তিবাস ওঝা।

কবি পরিচিতি ঃ কবি পরিচিতি প্রদানের আগে সংক্ষেপে কৃত্তিবাসের বংশলতিকার একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা হল।

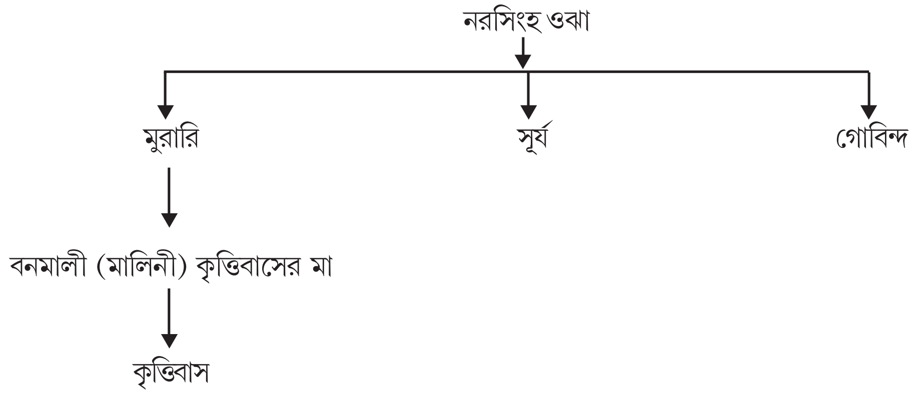

কবি প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তাঁর পিতৃপুরুষেরা পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। পরে কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার 'ফুলিয়া' (ফুলমালঞ্চ) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির ভাষায়,

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া বাখানি
দক্ষিণে পশ্চিমে বাহে গঙ্গা তরঙ্গিনী।।"

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মালিনী। কবিরা ছিলেন ছয় ভাই, এক বোন। কবি তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে লিখেছেন,

"আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।"

এই শ্লোকে সঠিক সাল তারিখের উল্লেখ নেই। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি শ্লোকটির অর্থ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করে দেখালেন তেরশ কুড়ি শকে অর্থাৎ ১৩৯৮ খ্রিঃ — ১৩৯৯ খ্রিঃ -এর ১৬ ই মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার কবি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ও সময় নির্ধারণ ইতিহাস সম্মত না হওয়ায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার 'পুণ্য' শব্দটিকে 'পূর্ণ' ধরে হিসাব করে দেখালেন ১৪৩২ - ১৪৩৩ খ্রিঃ কবির জন্ম। তবে এই তারিখও কতদূর ইতিহাস সম্মত তা বিচার্য। কৃত্তিবাসের জীবনী আলোচনা ক রলে দেখা যায় বারো বছর বয়সেই তিনি বড় গঙ্গা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে বিদ্যা অর্জনের জন্য যাত্রা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে দর্শনার্থী হিসাবে পাঁচটি শ্লোক লিখে পাঠান। রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সাতটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে তিনি রাজমহিমা ব্যাখ্যা করেন। এতে গৌড়েশ্বর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে চন্দন জলে অভিষিক্ত করেন। মাল্যভূষিত করেন, পট্টবস্ত্র দান করেন এবং রামায়ণ রচনার ভার দেন কিন্তু অবাক কাণ্ড লেখক তাঁর গ্রন্থে গৌড়েশ্বরের নামটি কোথায় উল্লেখ করেন নি। কোনো কোনো গবেষক বলেন ইনি হচ্ছেন রাজ গণেশ, কিন্তু তার শাসনকাল ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রিঃ। যদি কবির জন্ম ১৩৯৮ খ্রিঃ — ১৩৯৯ খ্রিঃ হয়, তবে রাজা গণেশের বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। এইজন্য গণেশের নামটি বাতিল হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার কৃত্তিবাসকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এনে ফেলেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের কুলপঞ্জী ও চৈতন্যমঙ্গাল বিবৃত কৃত্তিবাস সম্পর্কিত অংশ বিশেষ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রুকনুদ্দিন বারবক শাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং ইতি রামায়ণ রচনার যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং কৃত্তিবাসের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং রামায়ণ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক নির্ধারণের ক্ষেত্রে মত রয়েছে। এ ব্যাপারে ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় 'আত্মপরিচয়' শ্লোক ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, "কৃত্তিবাস, মুসলমান সুলতানের সভায় হাজির হন, সুতরাং তিনি নূতন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রাজা গণেশের সভাতে কৃত্তিবাসের উপস্থিতি যুক্তিযুক্ত মনে করেন।"

কাব্য পরিচিতি ঃ পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর কল্যাণকে সাধনার পাথেয় করে বাল্মীকি প্রসাদে কৃত্তিবাস শ্রীরাম পাঁচালী রচনা করেন।

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।"

কৃত্তিবাস সরল বাংলা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীটিকে অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর রামায়ণকে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না বলে বরং ভাবানুবাদ বলা চলে। তিনি অন্যান্য রামায়ণ ও সংস্কৃত কাব্য থেকে কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের কাঠামোটিকে বজায় রেখে কবি নিজের মতো করে রামায়ণ কথা রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের সাতটি কাণ্ড হল—'আদি', 'অযোধ্যা', 'অরণ্য', 'কিষ্কিন্ধ্যা', 'লঙ্কা' ও 'উত্তরা'। বিশ্বামিত্রের কথা, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ প্রভৃতি মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গা তিনি বাদ দিয়েছেন। গল্পরসের প্রতি প্রবণতা থাকায় এতে অনেক নূতন সরল উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি, তরণীসেন কাহিনী, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ ইত্যাদি। কৃত্তিবাস যে

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গ্রন্থখানি বাঙালি জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালীর ঢঙে রচিত। বাল্মীকি প্রদত্ত প্রথম ও ষষ্ঠ খণ্ডের নাম পরিবর্তন করে তিনি দিয়েছেন 'আদি' ও 'লঙ্কাকাণ্ড'। গল্পরসের প্রয়োজনে তিনি নানা কাহিনীতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকির হাতে যে চরিত্রগুলি মহাকাব্যিক গরিষ্ঠতা লাভ করেছিল কৃত্তিবাসের হতে সেইসব চরিত্র যেন কোমল পেলব মাখানো বাঙালি চরিত্রের মতো হয়েছে। শ্রীরামের প্রেম-করুণাঘন 'মূর্তি' কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেজস্বিনী সীতা কবির হাতে লাজনম্রা বঙ্গবধূ, আর দশরথ যেন বাঙালি ঘরের স্ত্রৈণ বৃদ্ধ স্বামী। কৈকেয়ীর মধ্যে দিয়ে অভিমানক্ষুব্ধা মাতৃহৃদয়ের অবারিত প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি রাবণ, বিভীষণ, সরমা প্রভৃতি চরিত্রও বাঙালির ভাবরসে পরিপুষ্ট। ভক্তিরসে ভরপুর তরণীসেন কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এককথায় আদি কবির 'শূরধর্মী' কাব্য হয়ে উঠেছে 'গৃহধর্মী' কৃত্তিবাসের হাতে। বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে কাব্যখানি কেমল উজ্জ্বল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য। কারণ বাঙালির সমগ্র জীবনকথা এই কাব্যে ধ্বনিত। এইজন্যই সমালোচক বলেছেন, "কৃত্তিবাস বাঙালির জাতীয় কবি এবং তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।"

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে নানা কারণ। তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—বিভিন্ন চরিত্রে বাঙালিয়ানা স্বভাব যেমন আছে তেমনি বাঙালির ভোজন রসিকতা, আলস্য পরায়ণতা, ভোগবিলাসিতা, কলহপ্রবণতা ইত্যাদিও আছে। তবে এসবের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের উদ্বেলতাও লক্ষ্যণীয়। বাঙালির আহার-বিহার, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সবকিছুই সুন্দরভাবে রূপ পেয়েছে। ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর আশ্রমে রামচন্দ্রের বানরবাহিনীকে খেতে দিয়েছিল—মতিচুর, মণ্ডা, সরুচাকলী, গুড়পিঠে, তালবড়া, ছানাবড়া, খাজা, জিলিপি, পাপড় ইত্যাদি। এইসব খাবারের সঙ্গে বাঙালির রসনা একাকার। সীতাদেবী লক্ষ্মণকে আমাদের ঘরের বধুর মতই রান্নাবান্না করে খাইয়েছেন।

উদাহরণ :

"প্রথমেতে শাক দিয়ে ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সূপআদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোলাদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ।।"

বাংলাদেশের সামাজিক আচার-বিচারের রূপরেখাও রয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মের পর পাঁচদিনে 'পাঁচুটি', ছয়দিনে 'ষষ্ঠী পূজা', তোরোদিনে 'জননী সৌচান্ত', ছয়মাসে 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

বাঙালি স্পর্শকাতর, করুণরস তাদের কাছে সমাদৃত। এই কাব্যে দশরথের অন্ধমুনির পুত্র বধ, সীতাহরণ ও রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণের 'শক্তিশেল' ইত্যাদি বাঙালিকে গভীর বেদনার রসে আপ্লুত করেছে। সীতা নির্বাসন, তাঁর পাতালপ্রবেশ, রামচন্দ্রের সরযূর জলে দেহত্যাগ ইত্যাদি বাঙালিকে কাঁদিয়েছে। ভক্তিরসের উচ্ছ্বাসে কাব্যখানি ভরা। তবে গার্হস্থ্য জীবনরসই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও জীবনরস ভরায় গ্রন্থখানি তাই যুগাতীত হয়েছে। এইজন্যই কবি মধুসূদন দত্ত এ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন যে, কৃত্তিবাসের কাব্য বাংলার জনজীবন অমৃতরসের মতো চিরকাল আস্বাদন করবেন।

কৃত্তিবাসের নামে এমন যত্রতত্র থেকে বহু রামায়ণ কাব্য প্রকাশ পাচ্ছে। কালক্রমে মূল ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণকে খুঁজে পাওয়া ভার। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগে

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

১৮০২ খ্রিঃ — ১৮০৩ খ্রিঃ -এর মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কয়েকটি খণ্ডে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। পরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যত সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে তার সবই শ্রীরামপুরী সংস্করণের উপর ভিত্তি করেই সম্পাদিত। ১৮৩০ খ্রিঃ — ১৮৩৪ খ্রিঃ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পুরাতন ভাষাকে মেজে ঘষে রামায়ণের এক নূতন সংস্করণ বের করেন। সকল দিক বিচার করে বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের সার্থক প্রতিভূ হিসাবে কৃত্তিবাসের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

৩০.৯ অনুশীলনী

১। নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (×) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) কৃত্তিবাসের রামায়ণ ৫টি খণ্ডে লিখিত।	☐	☐
(খ) রামচন্দ্র পম্পা নদীতীরে কুটীর নির্মাণ করেন।	☐	☐
(গ) রামচন্দ্রকে দিব্য ধনুর্বান প্রদান করেন অগস্ত্যমুনি।	☐	☐
(ঘ) যুদ্ধে খর-দূষণের হাতে রামচন্দ্র পরাজিত হন।	☐	☐
(ঙ) মারীচ রাবণকে সুমন্ত্রণা দেয়।	☐	☐
(চ) রামচন্দ্র সূর্পণখার নাক-কান কাটে।	☐	☐
(ছ) রামচন্দ্র আগে পঞ্চবটী বনে পরে চিত্রকূটে যান।	☐	☐
(জ) রামচন্দ্রের হাতে বিরাধ রাক্ষসের মৃত্যু ঘটে।	☐	☐

২। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

(ক) কৃত্তিবাসের কাব্য ——— গ্রন্থ।

(খ) অরণ্যকাণ্ডের প্রকৃতি চিত্র ———।

(গ) রামচন্দ্রের বিলাপ অংশে ——— রস প্রকাশ পেয়েছে।

(ঘ) রাবণ চরিত্রটি ———।

(ঙ) সীতা ——— বাঙালি বধূ হয়েছেন।

(চ) জটায়ু ——— যুদ্ধ করে।

(ছ) খর ও দূষণ রাবণের ———।

(জ) সীতা ——— রাজের কন্যা।

(ঝ) রামচন্দ্র ——— ভেঙে সীতাদেবীকে বিবাহ করেন।

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

৩। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর লিখুন।

(ক) 'শূন্য বনে কেমনে রহিব তিন জন'।
কে, কোন, বনের কথা বলেছেন? 'তিনজন' কে কে?

(খ) 'মূর্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।'
কে, কোথায়, কাকে দেখে একথা ভেবেছিলেন?

(গ) "নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।।"
এই প্রকৃতি চিত্র কোথাকার?

(ঘ) 'মেঘের গর্জন যেন ছাড়ে সিংহনাদ।'
এখানে কার গর্জনের কথা বলা হয়েছে?

(ঙ) অগস্ত্যমুনি কোন্ দুই রাক্ষসকে নিঃশেষ করে?

(চ) কোন মুনির আশ্রমে রামচন্দ্র ইন্দ্রের ধনুর্বাণ পান?

(ছ) 'সবংশে তোমারে রাম ডুবাবে সাগরে।'
কথাটি কে, কাকে, কখন বলেছে?

(জ) 'রণধ্বজ ভাঙিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।'
কেস কার রণধ্বজ ভাঙে এবং কেন?

(ঝ) 'সীতা বিনা আমি যেন মণি হারা ফণী।'
কে, কখন, কার কাছে একথা বলেছেন?

৪। নীচের কাব্যাংশগুলির ব্যাখ্যা নিজের ভাষায় লিখুন।

(ক) 'দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।"

(খ) 'দুর্জয় শরীর ধরে পর্বত সমান।
জ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান।।"

(গ) "পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটিপালটি যত গোদাবরী তীর।।"

৫। ৩.৬ একক পাঠ করে নীচের চরিত্রাদির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ১০ টি বাক্যে প্রকাশ করুন।
শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, রাবণ।

৬। অনুবাদক কৃত্তিবাসের কবি পরিচিত ও অনূদিত রামায়ণ কাব্যে কবির মৌলিক প্রতিভার দিকটি নিজের ভাষায় আলোচনা করুন ১০ টি বাক্যের মধ্যে।

৭। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের বর্ণনা সংক্ষেপে লিখুন।

৩০.১০ উত্তরমালা

১। (ক) ভুল, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক, (চ) ভুল, (ছ) ভুল, (জ) ঠিক।

২। (ক) অনুবাদ, (খ) মনোহর, (গ) করুণ, (ঘ) দেহভোগী, (ঙ) সর্বংসহা, (চ) বীরের মতো, (ছ) দুই ভাই, (জ) জনক, (ঝ) হরধনু।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর সূত্র ঃ (ক) রামচন্দ্র, চিত্রকূট পর্বত, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। (খ) সীতা দেবী, অত্রিমুনির আশ্রম, মুনিপত্নী। (গ) দণ্ডাকারণ্যের, (ঘ) বিরাধ, (ঙ) বাতাপি ও ইল্বল। (চ) শরভঙ্গমুনির আশ্রম, (ছ) মারীচ, রাবণ, সীতাহরণ ষড়যন্ত্র মুহূর্ত, (জ) জটায়ু, রাবণ, সীতাহরণের জন্য, (ঝ) রামচন্দ্র, শূন্য কুটীর, লক্ষ্মণের কাছে।

৪। ব্যাখ্যার সংকেত সূত্র ঃ

(ক) অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সীতাদেবী মুনিপত্নীকে দেখে অভিভূত হন। তাঁর সৌম্য-স্নিগ্ধ মধুর করুণা নিষিক্ত চেহারা ও মাতৃসম ব্যবহার দুর্লভ। আলোচ্য গুণাবলীর দ্বারা মুনিপত্নী যেন করুণামূর্তি লাভ করেছেন। প্রীতি প্রেম করুণা রূপিনী মুনিপত্নী সীতার কাছে সর্ব শ্রদ্ধেয় রূপে দেখা দিয়েছেন।

(খ) আলোচ্য কাব্যাংশটি কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের ‘অরণ্যকাণ্ডে’র বিরাধ বধ অংশ থেকে উদ্ধৃত। এখানে কবি বিরাধের ভয়ংকর মূর্তির চিত্র তুলে ধরেছেন। অত্রিমুনির আশ্রমে যাবার পর মুনির নির্দেশ রামচন্দ্র দণ্ডক কাননে গমন করেন। সেই বনে বিরাধ রাক্ষসের বাস। এই রাক্ষসের আকৃতি বিরাট। বিশাল শক্তিধর। কবি তার উচ্চতা ও দৈহিক শক্তিকে পর্বতের তুল্য বলে বর্ণনা করেছেন। তার রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের মতো। শক্তির মদমত্ততা ও চেহারার ভয়ংকরতা আলোচ্য অংশে সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

(গ) কুটীরে সীতা দেবীকে না দেখে রামচন্দ্র দিশেহারা হন। ভআই লক্ষ্মণকে নিয়ে রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনের প্রতিটি স্থান, প্রতিটি গাছের তলা তন্ন তন্ন করে পাগলের মতো খুঁজে বেড়ান। গোদাবরী তীরের স্মৃতিমধুর স্থানগুলি ব্যাকুল হয়ে সীতার অনুসন্ধান করেন। অজানিত আশঙ্কায় রামচন্দ্রের ব্যাকুল হৃদয়ের করুণ রূপটি আলোচ্য অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

৫। রামচন্দ্র ঃ বাল্মীকি মুনি রামচন্দ্রকে বীরচরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁকে ভক্তের ভগবানরূপে চিত্রিত করলেও অরণ্যখণ্ডে আমরা তাঁকে বীর ও প্রেমিকরূপে পাই। wাতার প্রতি অসীম স্নেহ, সীতার প্রতি অনন্ত প্রেম উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মুনিদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বিরাধ, খর-দূষণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব তুলনাহীন। সূর্পণখার সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর রস-রসিক মনের পরিচয় পাই।

রামচন্দ্রের পত্নী-প্রেম রোমান্টিক মাধুর্যে ভরা। গোদাবরী তীরের কুটীরে সীতাকে না দেখতে পেয়ে রামচন্দ্রের আকুল-ব্যাকুল আর্তি করুণ-সুন্দর। চরিত্রটি কোমলে-কঠোরে, শৌর্য ও মাধুর্যে পূর্ণ। রামচন্দ্রের চরিত্রে বাঙালি জীবনছন্দ প্রকাশ পেয়েছে। সর্বগুণে ভরা চরিত্রটি সত্যই ‘অমৃতের ভাণ্ড।’

(ঘ) **সীতা ঃ** কৃত্তিবাস সীতাদেবীকে সর্বংসহা বাঙালি গৃহবধুরূপে অঙ্কিত করেছেন। বিনয়নম্রা, ভক্তিস্নাতা সীতা অনন্যা। পতিভক্তির আদর্শ সীতাকে অনন্ত প্রেমের পূজারিণী করেছে। পতির জীবন আশঙ্কায় আকুল সীতা লক্ষ্মণকে অনেক কটুকথা বললেও পতিব্রত্যের উজ্জ্বল আলোতেই তা ভাস্বর হয়েছে। ঐতিহ্যপূর্ণ আতিথেয়তায় উদ্দীপ্ত হয়েই তাঁকে বিচ্ছেদের দহন জ্বালা সইতে হয়েছে। রাবণের দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে চরম বিপদ মূহূর্তেও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

একদিকে রাবণের প্রতি ধিক্কার অন্যদিকে পতিমিলনের জন্য উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ। পথে প্রান্তরে গায়ের অলংকারাদি ছড়িয়ে ফেলার মধ্যে তা দেখা যায়। অশোক কাননে শোকানলে দগ্ধ হয়ে সীতার প্রেম পবিত্র রূপটি আরো উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রাবণ ঃ লঙ্কেশ্বর রাবণের চরিত্রটি কৃত্তিবাস রূপমোহগ্রস্ত বিবেকশূন্য, ভোগবাদীরূপে অঙ্কন করেছেন। ভগিনীর নাক-কান কেটে ফেলার জন্য সে মোটেই দৃষ্টি দেয় নি। সীতার রূপ ঐশ্বর্য্যের কথা শুনেই তার ভোগলিপ্সা জেগে ওঠে। সীতা হরণের কথা শুনে মারীচ রাবণকে অনেক সুপরামর্শ দেয়, এমন কি এই অপকর্মের জন্য লঙ্কাপুরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু পাপী দেহলোভী রাবণ তাতে কর্ণপাত করে নি। বরং তাকে হত্যা করার ভয় দেখায়। এতেই প্রমাণিত যে চরিত্রটি অত্যন্ত নীচুস্তরের। ছল-চাতুরীতেও সে ওস্তাদ। মারীচকে সোনার হরিণের ছদ্মবেশ ধারণের পরামর্শ, তপস্বীর ছদ্মবেশ ধারণ, অতিথি সৎকারের ঐতিহ্য ইত্যাদি কূট-কৌশল অবলম্বনেও সে পারদর্শী। জটায়ু পাখীর কাছে সূর্পণখার প্রসঙ্গ এনে ক্ষমাপ্রার্থীর অভিনয় করে। চতুর, কামুক রাবণ চরিত্রটি কৃত্তিবাস সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

৬। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষগণ পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা অরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বাড়ী করেন। কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী ও মাতা মালিনী। কবির দেওয়া জন্মবৃত্তান্তের নানা ব্যাখ্যা দেখা যায়। ১৪৩২ — ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কবির জন্ম হয়েছে বলে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক সত্যতাও সর্ববাদী সম্মত নয়। নানামুনির নানামত থাকা সত্ত্বেও কবি রাজা গণেশের সভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর আদেশকে পাথেয় করে বাল্মীকির প্রসাদে তিনি 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন। যা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলে সুপ্রচারিত।

সহজ সরল ভাষায় পয়ার ত্রিপদী ছন্দে কৃত্তিবাস বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনী অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিকে আক্ষরিক অনুবাদ না বলে ভাবানুবাদ বলাই সংগত। তাঁর রচিত গ্রন্থের ৭টি কাণ্ড হলো—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরা। মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ কবি যেমন বাদ দিয়েছেন, তেমনি পুরানো উপাখ্যান থেকে অনেক সরস কাহিনী যোগ করেছেন। তাঁর কাব্যখানি গল্পরসে জম-জমাট। কৃত্তিবাসের হাতে রামায়ণের বলিষ্ঠ মহাকাব্যিক চরিত্র কোমল-মধুর-বাঙালি চরিত্র হয়েছে। অরণ্যখণ্ডের রাম-লক্ষ্মণ-সীতার চরিত্রে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর হাতে বীরধর্মী কাব্য হয়েছে 'গৃহধর্মী।' কৃত্তিবাসের রামায়ণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল বাঙালির হৃদয়ের কাব্য হয়েছে। এইজন্যই সমালোচকের ভাষায় তাঁর কাব্য হয়েছে "বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।"

৭। 'অরণ্যখণ্ডে' বিরাধ বধ, খর-দূষণের যুদ্ধ ইত্যাদি থাকলেও জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধটি প্রাণস্পর্শী হয়েছে। রাবণ সীতাকে চুরি করে আকাশ পথে যখন লঙ্কার উদ্দেশ্যে রথে চড়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় জটায়ু পাখী তার দীর্ঘ দুই পাখা দিয়ে রথের গতিতে বাধা দেয়। সীতার করুণ কান্না শুনে 'গরুড়নন্দন' আকাশে পাখা মেলে চারদিক দেখতে থাকে। রাবণকে চিনতে পেরে তার পথ আটকে দেয়। কবির ভাষায়—'দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।' সীতাকে হরণ করার জন্য জটায়ু ভীষণ ক্ষুব্ধ। বৃদ্ধ না হলে বোঁটা থেকে ফলকে যেমন ছিঁড়ে ফেলে তেমনি সে রাবণের মাথা তীক্ষ্ম ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতো। এরপর জটায়ুর সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। 'পাখসাট' মেরে 'আঁচড়ে কামড়ে' সে রাবণের রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। তারপর তীব্র বেগে ছোঁ মেরে রাবণের পীঠের মাংস খাবলে নেয়। রথের সারথীর মুণ্ড ঠোঁট দিয়ে ছিন্ন করে। রথের ধ্বজাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে জটায়ু গাছের ডালে বসে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ শুরু। রাবণ ও জটায়ুর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধের বর্ণনায় কবি লিখেছেন—

"অঙ্কুশ না মানে মত্ত মাতঙ্গ যেমন।
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ।"

মত্ত হাতী যেমন মাহুতের অঙ্কুশকে অগ্রাহ্য করে, উন্মত্ত হয়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে—ঠিক তেমনি দুই জনে ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধ করে। রাবণের সোনার মুকুটটিকে জটায়ু খান খান করে দেয়। শিবের দয়ার জন্য রাবণের দশমাথা ছিন্ন করতে না পারলেও জটায়ু তার মাথার চুল মুঠো মুঠো ছিঁড়ে ফেলে। দুই দুই বার যুদ্ধে নাস্তানাবুদ হয়ে রাবণ সীতাকে ভূমিতে রেখে ভাঙা রথ নিয়েই খুব উঁচুতে উঠে বত্রিশ হাজার বাণ জটায়ুর দিকে নিক্ষেপ করে তার দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে। তারপর 'অর্দ্ধচন্দ্রবাণ' দিয়ে জটায়ুর দুটি পাখা কেটে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে পড়ে ছট্ফট্ করতে থাকে।

বৃদ্ধ জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা কবি যেভাবে দিয়েছেন তাতে গা শিউরে উঠে। রাবণের অন্যায় কাজের প্রতিবাদে ও সীতা উদ্ধারের জন্য বিনা অস্ত্রে শুধু পাখা, নখ ও ঠোঁট দিয়ে জটায়ু যেভাবে রাবণকে পর্যুদস্তু করেছে, তার কাছে রাবণের বত্রিশ হাজার বাণ ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা প্রতি আক্রমণ ও প্রতিরোধের রূপটি অত্যন্ত ম্লান মনে হয়। কবির রাবণের প্রতি ঘৃণা ও জটায়ু পাখীর প্রতি মমত্ববোধে—এই যুদ্ধে জটায়ুর সাহসিকতা—বীরের মতে প্রাণত্যাগ বীররসে মণ্ডিত হয়েছে।

৩০.১১ গ্রন্থপঞ্জী

নির্বাচিত পুস্তক তালিকা ও লেখক—

১। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম পর্যায়) — সুকুমার সেন।

২। বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত — অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। বাঙলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ক্ষেত্র গুপ্ত।

৪। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস — ক্ষুদিরাম দাস।

M#2\D:\EBG-2\Unit-10 Pm6.5\1st proof

একক ৩১ ❐ কাব্য পাঠের ভূমিকা

গঠন

৩১.১ উদ্দেশ্য

৩১.২ প্রস্তাবনা

৩১.৩ মূলপাঠ—১ কাব্য ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

৩১.৪ মূলপাঠ—২ কাব্যের শ্রেণিবিভাগ

৩১.৫ মূলপাঠ—১ কাব্যের আঙ্গিক

৩১.৬ সারাংশ

৩১.৭ উত্তরমালা

৩১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি কাব্য বা কবিতা কী ও সেটি পাঠ করে রসোপলব্ধি করতে গেলে যে যে বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার সে সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে এবং প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে পারবেন। এই এককটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে আপনি—

- পদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নির্ধারণ,
- কাব্যের বিষয় ও গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা,
- কাব্যের আঙ্গিক নিয়ে বিচার করতে পারবেন,

৩১.২ প্রস্তাবনা

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন বর্তমান এককটিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে গদ্য পদ্যের পার্থক্য ও কাব্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভিমত সংক্ষেপে আলোচনা করে একটি সাধারণ ধারণা দিয়ে দ্বিতীয় অংশে কাব্যের বিষয় ভিত্তিক ও গঠনগত বিভাজন করে সংক্ষেপে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে গীতিকাব্য ও মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা একটু বিশেষ গুরুত্বসহ বিস্তৃত করা হয়েছে। পরবর্তী এককগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে। তৃতীয় অংশে কাব্যের আঙ্গিক বা উপস্থাপনার প্রধান তিনটি স্তম্ভ শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত এই এককটি পাঠ করে আপনি কাব্যের বিভিন্ন ধারাগুলি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাবেন। পরবর্তী এককগুলি পাঠের সময় কাব্যের গঠনগত ও আঙ্গিক বিচারে অনেকটা সহায়ক হবে।

এই এককটিতে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য যে শুধু পঠনগত নয়, ভাব প্রকাশেও সেটি আলোচনা করা হয়েছে। কালক্রমে গদ্যও যে ক্রমশ ছন্দস্পন্দের টানে কাব্যের সীমানায় বা পদ্য সমাজ বাস্তবতার প্রয়োজনে

গদ্যের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। অপরদিকে একদিকে বিষয়নির্ভর, বর্ণনামূলক, বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা, অন্যদিকে ব্যক্তিনিষ্ঠ, সময় ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ কবিতা অথবা হৃদয়াবেগনির্ভর গীতি-কবিতা, প্রচলিত বা কল্পিত কোন রোমান্টিক কাহিনী বা আখ্যান অবলম্বনে রচিত আখ্যানকাব্য এবং মহাকাব্য—সব কিছুর কথাই আমরা জানব। মহাকাব্যে সমগ্র জাতির জীবনের চিন্তাভাবনা, তার আশা আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত সংহত রূপ লাভ করে। যে কাব্যে বিষয় ও ভাবনায় বিরাটত্ব ও বিস্তৃতবোধের সঙ্গে বিস্ময়বোধের সঞ্চার করে, তাকেই সাধারণভাবে মহাকাব্য বলা হয়। এই এককের দ্বিতীয় পর্যায়ে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অংশে কাব্যের আঙ্গিকের প্রধান তিনটি স্তম্ভ শব্দ বা ভাষা, কাব্যের ভাবানুভূতির তরঙ্গ বা ছন্দ, কাব্য দেহের অলংকার বা শব্দ ব্যবহারের প্রত্যক্ষ বা ব্যঞ্জনাগত চমৎকারিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এককটি প্রথমে পূর্বাপর পাঠ করে পরে প্রতিটি পর্যায় স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করলে উপকৃত হবেন। প্রতিটি অংশ নিবিষ্ট পাঠের পর অনুশীলনীগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। পরে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন।

৩১.৩ মূলপাঠ—১ কাব্য ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনিগুচ্ছ হল ভাষা। মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি ও মনন যখন কবিতায় ছন্দ ছাড়াই কোন বক্তব্যকে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করে তখন যে অর্থবহ ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাই হল গদ্য। দৈনন্দিন মুখের কথা যেহেতু ছন্দে সাজানো নয়, তাও গদ্য। তবে সাধারণভাবে ছন্দ ও মিলহীন লিখিত ভাষাই গদ্য নামে অধিক পরিচিত।

গদ্য মানুষের মনীষার তার যুক্তি-বুদ্ধি মননের বাহন। মানুষের চিন্তা ও যুক্তির ভাষা, বিচারে ভাষা। কাব্য হল আবেগ-অনুভূতি আর কল্পনার বাহন। অনুভব আবেগের তাড়নায় ভাষায় তরঙ্গ স্পন্দন সৃষ্টি হয়। আর ভাবের তরঙ্গিত প্রকাশ সূত্রেই ছন্দের স্ফূর্তি। কাব্যমাত্রেই আবেগ ও রূপের স্বতঃপ্রকাশ। মানুষের মনে যেমন ভাবের অজস্রতা আছে কাব্যেও তেমনি আছে রূপের তথা ছন্দের বৈচিত্র্য। শুধু ছন্দ নয়, স্তবক পদ ইত্যাদির সজ্জাও কাব্যের শরীরে বৈচিত্র্য আনে।

এই কাব্যের স্বরূপ নিয়ে মত-মতান্তরের সীমা পরিসীমা নেই—এদেশে—ওদেশে। প্রাচ্যে ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্যে ইউরোপে—গ্রীসে, ইংলণ্ডে সাহিত্য তাত্ত্বিকরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তারই কিছু পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রাচ্যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা নিজনিজ দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেহেতু কাব্যের শিল্পকর্মের মাধ্যমে শব্দ-কাব্য শব্দার্থময়, তাই শব্দ ও অর্থের মিলনেই কাব্য একথা জনৈক আলঙ্কারিক বলেছেন। অপর একজন বলেছেন 'অভীষ্ট (ইচ্ছানুযায়ী) অর্থ-সংবলিত পদাবলিই কাব্য। এ মতবাদের বক্তা অর্থের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যজনের মতে মাধুর্য ইত্যাদি গুণমুক্ত পদ রচনাই কাব্য। মহাকবি কালিদাস বাক্‌ ও অর্থের সংযোগকে গুরুত্ব দিয়েছেন।[১] কিন্তু শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয়।

কাব্যশাস্ত্রকার আনন্দ বর্ধনের মতে, যদি কোন শব্দার্থময় রচনা সহৃদয়ের হৃদয়ে আনন্দময় অনুভূতম সঞ্চার করে, সেটি হল কাব্যের লক্ষণ। কাব্যের আত্মা বলতে তিনি শব্দের প্রধান অর্থ বা বাচ্যকে অতিক্রম করে বিশেষ

১. "বাগর্থৌ ইব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তরে"—রঘুবংশ।

বর্ণের যে ব্যঞ্জনা পাঠক হৃদয়ে সৃষ্টি করে তাকেই নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ-এর মতে আনন্দদায়ক বা রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। উপরিউক্ত মতবাদগুলির মধ্যে ধ্বনিবাদীদের মতবাদ বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে অনেকটা সমন্বয় আনলেও একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়।

পাশ্চাত্য কাব্যসংজ্ঞার প্রথম প্রবক্তা প্লেটোর মতে 'শিল্প সৃষ্টি হল অনুকরণ।' কবিরা অপরিবর্তনীয় ভাবসত্যকে নয়, প্রতীয়মান বস্তুকে অনুকরণ করেন। তিনি শিল্পের সঙ্গো নীতির আত্মিক সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন। অ্যারিস্টোটল-এর মতে কবি যা ঘটতে পারে তাই বলেন। তিনি বিশেষকে অবলম্বন করে নির্বিশেষের কথা বলেন। কিন্তু ইয়োরোপের রেনেসাঁসের বা নবজাগরণের কালে কাব্যকে কল্পনাবৃত্তির ক্রিয়ারূপে দেখা হল। মনস্তত্বের আলোকে সাহিত্য বিচার প্রবণতা এল। ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক যুগের প্রথম কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে কাব্য হল গভীর অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলন (Spontaneous overflow of powerful feelings) অর্থাৎ কাব্য প্রবল আবেগের উচ্ছলিত স্বাভাবিক প্রকাশ। কিন্তু আর এক রোমান্টিক কবি কোলরিজ আবেগের চেয়ে কল্পনার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় একদল সাহিত্যিক নিছক রস সৃষ্টি সাহিত্যের কাজ বলে মানলেন। আর একদল সাহিত্যে নিছক বাস্তবকে ও সত্যের অলংকারহীন মূর্তিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হলেন। দ্বিতীয় মতটি থেকে বস্তুতন্ত্রবাদের জন্ম হয়েছে। আবার ক্রোচের মতে কাব্য বা শিল্প হল বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের প্রকাশ। ম্যাথু আর্নল্ড-এর মতে কাব্য হোল জীবনের সমালোচনা (Criticism of life)।

কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের আলোচনা থেকে শব্দ, অর্থ প্রকাশ কবি প্রতিভা, কল্পনা প্রভৃতির সম্পর্ক যে গভীর ও অনেকটা ওতপ্রোত তা বোঝা যায়। উপসংহারে বলা যায়। কবিতা বা কাব্য হল প্রতিভার স্পর্শে নির্বাচিত শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে গড়ে ওঠা গভীর আবেগ বা অনুভবের ব্যঞ্জনাময় ছন্দোবন্ধ প্রকাশ। কোনো দেখা অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায়, কিংবা স্মৃতির জাগরণে, কবি যখন তাঁর কল্পনাকে অবাধে মুক্ত করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে যে অনুরণন সৃষ্টি হয়, তার প্রকাশ হয় সুরস্য শব্দরন্ধ্রে, ছন্দ মিলের গ্রন্থনায়। এভাবে কবি তাঁর অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রতিভার (যে প্রতিভা যা ছিল না তা তৈরি করে) সাহায্যে সহৃদয় পাঠকের অন্তরে কবি যে অলৌকিক আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করেন কবিতা তার অবলম্বন।

অনুশীলনী—১

আপনার পাঠের অগ্রগতি বোঝার জেন্য নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১১ পৃষ্ঠায় উত্তরমালার সঙ্গো মিলিয়ে দেখুন।

১। তিন চারিটি বাক্যে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

....

....

....

....

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) __________ সাহায্যে উচ্চারিত __________ ধ্বনিগুচ্ছ হোল __________ ।

(খ) গদ্য মানুষের মনীষার তার __________ বাহন, কাব্য হল __________ বাহন।

(গ) আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের মতে __________ বা __________ হল কাব্য।

(ঘ) অ্যারিস্টোটল-এর মতে কবি __________ বলেন। তিনি বিশেষকে __________ করে __________ কথা বলেন।

(ঙ) ওয়ার্ডসওয়ার্থে মতে কাব্য হল __________ __________ ।

(চ) ক্রোচের মতে কাব্য বা শিল্প হোল __________ __________ প্রকাশ।

৩। কাব্যের শব্দর্থবাদী মতবাদগুলি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৪। কাব্যের সংজ্ঞায় প্লেটোর মতাদর্শ ৩-৪টি বাক্যে লিখুন।

৫। পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের 'কাব্য' সম্পর্কে বক্তব্য অবলম্বনে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৬। কাব্যের সংজ্ঞা একটি বাক্যে উপস্থিত করুন।

৩১.৩ মূলপাঠ—২ কাব্যের শ্রেণিবিভাগ

বিষয়ভিত্তিক বর্ণনামূলক তন্ময় (objective) কবিতা — এই শ্রেণির কবিতায় জীবনের কোন গভীর অনুভব নয়, বস্তুবিশ্বের বর্ণনাই প্রধান প্রতিপাদ্য। বিশ্বপ্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা, বহির্জগতের কোন ঘটনা, বিষয় নিয়ে বা কোন জ্ঞানগর্ভ নীতি আদর্শ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনার্থে যে সমস্ত কবিতা লেখা হয় সেগুলি এই শ্রেণিভুক্ত।

নীতি কবিতা (Didactic poem)— যে কবিতায় সুভাষণের মাধ্যমে নীতিকথা প্রচার করে পাঠকের জ্ঞানোদয় বা চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়, তাকে নীতি কবিতা বলে। এই ধরনের কবিতায় কবি জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব ও নীতি প্রচারের প্রয়োজনে লঘু বা গুরুগম্ভীরভাবে কবিতাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত করেন। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারে 'সদ্ভাবশতক', 'নীতিসুধা' ও রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ব্যঙ্গ কবিতা, লঘু বৈঠকি কবিতা ও লালিকা (Parody-প্যারেডি) বাংলা ব্যঙ্গকাব্যের উৎপত্তি বাঙালির রঙ্গপ্রিয়তায়—নামকরণ থেকেই এটি স্পষ্ট। প্রথম দুটিতে মানুষের আচার-আচরণ চরিত্র-সমাজ রীতিনীতিকে তির্যক আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্ববিরোধ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতার প্রধান উপজীব্য। প্রসঙ্গত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজীমাৎ', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-উদ্ধার' প্রভৃতি কাব্য এবং রবীন্দ্রনাথের 'দামু ও চামু', 'হিংটিং ছট', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল', মোহিতলাল মজুমদারের সরয়মতী প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। এসব কাব্য ও কবিতার লক্ষ্য ব্যক্তিগত বা সামাজিক ত্রুটি সংশোধন। প্রথমোক্তটিতে কিছু আক্রমণাত্মক উপাদান থাকলেও, দ্বিতীয়টি লঘু বৈঠকি মেজাজে উপস্থাপিত হয়। দ্বিতীয়টির সঙ্গে Parody বা লালিকার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। 'লালিক' কোন প্রতিষ্ঠিত রচনার কায়িক অনুকরণ। এটি ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি হলেও সেখানে হাস্যরসের একটা স্বচ্ছন্দ মোড়ক থাকে ; রচনাটির মাধুর্য তার কৌতকময় উপস্থাপনায়। 'লালিকা' সকল পাঠকের কাছেই আনন্দদায়ক।

Elegy (এলিজি) বা শোককাব্য—মৃতের উদ্দেশ্যে রচিত শোকগাথায় মৃত ব্যক্তির কীর্তি ও তার সম্পর্কে কবি হৃদয়ের বেদনার আর্তি জ্ঞাপক শোকোচ্ছাসই এ কবিতার প্রধান বিষয়। স্ত্রীর মৃত্যুতে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ, সত্যেন্দ্রনাথক দত্তের মৃত্যুতে 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা "২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮" শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যেকোন উৎকৃষ্ট 'এলিজি'র সঙ্গে তুলনীয়। শোকার্ত কবির শোক জ্ঞাপক ছোট কবিতাকে ইংরাজিতে ডার্জ (Dirge) বলা হয়। এ পর্যন্ত আলোচিত সবকটি কবিকর্মই বিষয় নির্ভর ও বর্ণনামূলক হলেও কবির নিজস্ব উপলব্ধি থেকে উপজাত। কিন্তু বর্ণনামূলক অপর একটি ধারা যা কিংবদন্তি, লোক প্রচলিত বা ইতিহাস পুরাণ আশ্রয়ী কাহিনী মূলক কাব্য—যথা গাথা কাব্য (Ballad), আখ্যান কাব্য (Narrative poem), মহাকাব্য (Epic) নামে পরিচিত। এর প্রত্যেকটির আকৃতি ও প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। গাথা ও আখ্যানকাব্য উভয়ই আখ্যান কেন্দ্রিক। প্রথমটি মধ্যযুগের শেষে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত রোমান্টিক লোকগাথা হিসেবে জনজীবন থেকে উৎসারিত হয়েছিল। এতে প্রেম, বীরত্ব, দেশপ্রেম, মহত্ত্ব আত্মত্যাগ ইত্যাদির পরিচয় থাকে। গাথার রচয়িতা প্রায়ই অজ্ঞাতনামা। এতে লিরিক অনুভূতি ও সমষ্টি-চেতনার পরিচয় ফুটে ওঠে। গাথায় পরিবেশ বর্ণনার পাশাপাশি ঘটনায় নাটকীয় দ্রুততার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের এই শিল্পকলাটির অনুকরণে আধুনিক কালেও বহু গাথা জাতীয় কাব্য-কবিতা রচনা করা হয়েছে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র প্রেম ও আত্মত্যাগের পাশাপাশি, স্বদেশীযুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র অনেক রচনাই মহত্ব, বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমেরক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আখ্যানকাব্য গাথা থেকে একটু স্বতন্ত্র। এখানেও প্রচলিত কিংবদন্তী বা ইতিহাস-এর অবলম্বন। রচনারীতি বর্ণনাত্মক। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চীকাবেরী', 'রঙ্গমতী', ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' কাহিনী কাব্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস', 'পুরাতন ভৃত্য' উল্লেখযোগ্য।

মহাকাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রাচ্য কাব্যশাস্ত্র প্রণেতাদের মতে অর্থাধিক সর্গবন্ধযুক্ত পদ্যময় কাব্য বিশেষ হোল মহাকাব্য। এর নায়ক ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন বীর এবং সদ্বংশজাত। কাব্যের প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের একটি। এতে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রভাত-সন্ধ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা থাকবে। কাব্যটি পাঠ করলে পাঠকের মনে একটি বিশালতার ধারণা জন্মাবে, যার পরিক্রমা ফল বিস্ময়বোধ। মহাকাব্যের কাহিনী ইতিহাস থেকে গৃহীত হবে। উপস্থাপনায় নাটকের মত সূচনা, মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভসন্ধি ও উপসংহার থাকবে।

পাশ্চাত্য কাব্য শাস্ত্রীদের অন্যতম অ্যারিস্টোটল-এর মতে মহাকাব্যে সমগ্রত একটি মাত্র ঘটনা ও একজন নায়ক থাকবে, তার বিষয়বস্তু হবে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ, আর একাধিক উপকাহিনী মূল কাহিনীর অংশ স্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারে। মহাকাব্য বর্ণনামূলক কাব্য। এখানে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ ঘটে, ফলে এর ঘটনার পরিধিও হয় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে অনেকটা বিস্তৃত।

প্রাচ্য পাশ্চাত্য মহাকাব্যের শুধু আলংকারিক ব্যাখ্যা নয়, মহাকাব্যের রসাস্বাদ করে রবীন্দ্রনাথ এর যে পরিচয় দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে মহাকাব্য হল 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথ', এ সেই কবির রচনা যাঁর রচনার ভিতর দিয়ে একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ নিজ হৃদয়ের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে মানবজীবনের চিরন্তন সামগ্রী করে তোলে। মহাকাব্য বস্তুত সমাজ জীবনের মহনীয়তার ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। মানব সভ্যতার একটি মহতী পর্যায়ের পরিচয় এই কাব্যে তুলে ধরা হয়।

এবারে কাব্যের অপর ধারা ব্যক্তিনিষ্ঠ বা মন্ময় ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হৃদয়াবেগ নির্ভর কবিতা—গীতিকবিতা প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক। ইংরাজি Lyric শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। এক সময় lyre (লায়ার) বা বীণাযন্ত্র বাজিয়ে হৃদয়ের একান্ত আবেগের কথা পল্লী কবি সুর দিয়ে গাইতেন। সেই গানের কথা লিরিক কবিতা হিসেবে পরিচিত হয়। Lyre থেকে নীম হয় লিরিক। কবির ব্যক্তিগত চেতনাই এখানে মুখ্য। একান্ত আত্মগত আবেগানুভূতি এর উপজীব্য। নানা অভিজ্ঞতা আঘাতে উঠে আসা কবিজীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দের কথাই গীতিকবিতায় বিষয়। গীতিকবিতা তাই কবির মনের অব্যক্তভাবে অভিব্যক্তি বিশেষ। যে কবিতা কবি হৃদয়ের অনুভব পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়ে, তার হৃদয়ে দোলা দেয় আর আনন্দের হিল্লোল তোলে তাই হল গীতিকবিতা।

‘ওড’ (Ode)—লিরিক কবিতারই রকমফের। মহৎ ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশ্যে তার গুণগ্রাম ঘোষণা করতে ছন্দোরীতিতে বৈচিত্র্য এনে এর ধরনের ‘ওড’ লেখা হত। এ কবিতার প্রধান গুণভাবের স্বচ্ছতা এবং ভাষা ও ছন্দের বিশুদ্ধতা।

‘সনেট’ (Sonnet) অর্থ মৃদুধ্বনি। চৌদ্দটি পঙ্‌ক্তির সাহায্যে সুর তুলে আবেগের একটি শীর্ষকে স্পর্শ করা এ কবিতার বৈশিষ্ট্য। সনেটের আঙ্গিক ও পঙ্‌ক্তির ছন্দ বিন্যাস অনেকটা সুনির্দিষ্ট। সনেট সম্পূর্ণত গীতিকাব্যধর্মী হলেও রীতিমতো ভাবগম্ভীর। গঠনে কিছুটা ধরা বাধা ব্যাপার থাকলেও প্রেমের মতো ভাবাবেগপ্রধান বিষয়বস্তুর টানে সনেট আবেগোচ্ছল লিরিক কবিতায় পর্যবসিত হয়েছে।

অনুশীলনী—২

বর্তমান পর্যায়টি একাধিকবার পড়ে নিন। এরপর নিজের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১১ পৃষ্ঠার উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

(ক) গীতিকবিতা পাঠকের __________ বা __________ চেষ্টা করে।

(খ) ‘লালিকা’ কোন __________ রচনার __________ __________।

(গ) শোকার্ত কবির __________ ছোট কবিতাকে ইংরেজিতে __________ বলা হয়।

(ঘ) গাথা মধ্যযুগের শেষে __________ শতক পর্যন্ত __________ __________ হিসেবে __________ থেকে উৎসারিত হয়েছিল।

(ঙ) মহাকাব্যের নায়ক __________ গুণসম্পন্ন __________ এবং __________।

২। **সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

(ক) নীতি কবিতার কবি —

১। উপদেশপ্রবণ

২। আক্রমণাত্মক

৩। আনন্দদায়ক।

(খ) রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' — ১। গাথাকাব্য
২। আখ্যান কাব্য
৩। গীতি কাব্য।

(গ) মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান রস — ১। কৌতুক
২। বিস্ময়
৩। বীর।

(ঘ) সনেট — ১। গীতিকাব্য ধর্মী
২। বর্ণনামূলক কবিতা
৩। ওড জাতীয় কবিতা।

৩। ৩-৪টি বাক্যে 'লঘু বৈঠকি কবিতা' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। মহাকাব্য কাকে বলে ? মহাকাব্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের বক্তব্য একটি অনুচ্ছেদে প্রকাশ করুন।

৩১.৫ মূলপাঠ — ৩ কাব্যের আঙ্গিক

ভাষা ঃ কবি যখন কোন ঘটনা, বিষয় বা অনুভবের দ্বারা তাড়িত হন, তখন তাঁর মনে যে ভাবের বা অনুভূতির সঞ্চার করে, তাই কবিতার উৎস। কবিতা বা কাব্যের কায়া গঠনে ভাষার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আর কাব্যভাষা শব্দনির্ভর। শব্দগুচ্ছের তাৎপর্যময় বিন্যাস কাব্যের কায়া গঠন করে। শব্দ বা শব্দগুচ্ছের বিন্যাস যখন কোন অভাবিত ইঙ্গিত ও অনুষঙ্গ বিশেষ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে কবিমনের ভাবের প্রকাশ ঘটায়, তখনই তা কাব্য হয়ে ওঠে। কবির একান্ত নিজস্ব হৃদয়াবেগ যখন কবিপ্রতিভার স্পর্শে কাব্যদেহের শব্দগঠিত বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনায় নূতনতর অভিব্যক্তি পায়, তখন আমরা তাকেই কাব্য বলি। এই কাব্য দেহের শব্দ কখনও কখনও অর্থরশ্মি ভেদ করে বর্ণময় দীপ্তি পায়, নূতন নূতন বাক প্রতিমা রচনা করে নিয়ে আসে নূতনতর অনুভূতি। কবিতার ভাষা অলঙ্কৃত বা অলংকৃত যাই হোক তা নির্ভর করে প্রকাশ মুহূর্তে কবির আবেগময় অভিব্যক্তির ওপর। কোনো কোনো কাব্যশাস্ত্রী তাই কাব্যকে শব্দার্থময় বলেছেন। কাব্যের মাধ্যমে যেহেতু শব্দ তাই কাব্য শব্দকায়। তাই বিচিত্র বাণী বন্ধ কৌশলকে কেউ কেউ কাব্য বলতে চেয়েছেন। কিন্তু পরিশেষে শব্দের শঙ্গে অর্থের পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্কের উপমা দিয়ে তাঁরা বুঝিয়েছেন, ভাবের সঙ্গো শব্দময় কাব্যদেহ ওতপ্রোত সম্পর্কে জড়িত। তাই কোনো কাব্য পাঠ করে তার ভাষা শিল্পটিকেও বিচার করতে হয়। কাব্য বিচারে ভাবপ্রকাশের প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে বোঝাতে একই শব্দের পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে সমার্থক শব্দ ব্যবহার, ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দ, অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক শব্দ বিন্যাস, ছন্দ-পতন, পুনরুক্তি, অশ্লীল শব্দ ও অর্থ প্রয়োগ, দেশ-কাল, কলাশাস্ত্র, লোক ব্যবহার বিরোধী বর্ণনা ইত্যাদি পরিহার, তার পরিবর্তে কাব্যের মাধুর্য, সৌকুমার্য প্রসাদগুণ কান্তি ওজঃ প্রভৃতির অবতারণা কাব্যভাষায় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আলংকারিক আনন্দ বর্ধনের মতে যা রসসৃষ্টিতে বাধা দেয় তাই দোষ। সাহিত্য দর্পণের বিশ্বনাথের মতে কাব্যে দোষ থাকাটা আশ্চর্য নয়, দোষ প্রাধান্য কাব্যের রসবোধের অন্তরায়।

ছন্দ ঃ কবিতার বা কাব্যের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয় তার ছন্দ। ছন্দই কবিতাকে সাধারণতঃ অন্য সমস্ত রচনা থেকে আলাদা করে পরিচয় দেয়। লঘু ও গুরুদল বা সিলেব্‌লের সুনিয়মিত বিন্যাস যে ধ্বনিতরঙ্গ বা রীদ্‌ম সৃষ্টি করে তাই ছন্দ। ছন্দ, ছন্দঃস্পন্দ কবিতার প্রাণ। কবির অন্তরের ভাব শব্দধ্বনি স্পন্দনে ভর করেই কাব্য পাঠকের মনে অনুভবে প্রতিফলন তৈরি করে। তাই প্রতীকবাদীরা ছন্দস্পন্দকেই কবিতার আত্মা বলেছেন, এবং ছন্দস্পন্দের দ্বারা চালিত হয়ে শব্দ পরম্পরা কবিতার বাণীশিল্প তৈরি করে। এ বাণীশিল্প বস্তুত কবি মনে সঞ্চারিত ভাবেরই বীজ বহন করে, সেই বীজকে ছন্দস্পন্দে বিন্যস্ত করে গড়ে ওঠে কবিতা। ছন্দস্পন্দ শব্দকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। ধ্বনির উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে একটি সুরস্পন্দিত সৃষ্টি হয়। এর ফলে কবিতা পাঠকের মনে প্রত্যাশা, পরিতৃপ্তি, আনন্দ বা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে, এটিই হল ছন্দ। ছন্দের সঙ্গে সচরাচর মিল (rhythm) বা মিত্রাক্ষর যুক্ত হয়ে ছন্দের আবেদন আরও সমৃদ্ধ করে। তাই কাব্য বিচারে কবি এই ছন্দের ব্যবহার কতটা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন, ছন্দ-স্পন্দনের সাহায্যে, অভিনব কোন সূক্ষ্ম শিল্প কর্ম গড়ে উঠল কি না, বক্তব্য ও তার প্রকাশ কতটা সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে বা মাত্রা, ধ্বনি, পদ, পর্ব বিন্যাসের সৌকর্য প্রভৃতি কাব্যের ছন্দ বিচারে অপরিহার্য অঙ্গ।

কাব্য ছন্দের আলোচনায় স্বভাবতই ছন্দের প্রকৃতি পরিচয় তথা রীতি এবং আকৃতি বিন্যাস—যথা পর্ব সমাবেশ, মিলের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে হয়। প্রাচীন বাংলা ছন্দ আলোচনায় ছন্দে ব্যবহৃত শব্দের উৎসসূত্র বিচার করে তৎসম (অর্ধতৎসম), তদ্ভব ও দেশি বিভাজন করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের প্রকৃতি বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিচারের পথ প্রশস্ত করেন। তিনি ছন্দের তিনটি জাতিকে চিহ্নিত করতে পারলেও নামকরণে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

বাংলা ছন্দের ত্রিবিধ জাতি বা রীতির পরিয় নিয়ে মতদ্বৈধ না থাকলেও ছান্দসিকদের মধ্যে নামকরণের ব্যাপারে ভিন্নতা আছে। প্রবোধচন্দ্র সেন প্রথমে তিন জাতীয় ছন্দের—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত-এর কথা বললেও পরে এদেরই তিনি মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত বলেছেন। পরবর্তী ছান্দসিকরা এই তিনটি রীতিকেই যথাক্রমে তানপ্রধান অক্ষর মাত্রিক, ধ্বনি প্রধান স্বরমাত্রিক, শ্বাসাঘাত বা বল প্রধান দলমাত্রিক বলেছেন। ছন্দের প্রকৃতি বিচারে এই বিভাজন ছাড়াও গঠনগতভাবে ছন্দ, বিশেষত তার পদবন্ধের দিক থেকে পয়ার মহাপয়ার, ত্রিপদী দীর্ঘত্রিপদী, চৌদপী, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা প্রবাহমান পয়ার, প্রভৃতিতে বিন্যস্ত করা যায়। তবে এগুলি ছন্দের ‘জাতি’, নয়, ছন্দের নানা ‘রূপ’ মাত্র। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

অলংকার ঃ কাব্যের রস-লোকে পৌঁছুবার অন্যতম উপায় অলঙ্কার। অলঙ্কার কাব্যকে সুন্দর করে, অলঙ্কারের সুনিপুণ বিন্যাস কাব্যকে রমণীয় করে। একজন আলঙ্কারিকের মতে অলঙ্কারের জন্যই কাব্য গ্রাহ্য। অপরজন বললেন, দোষহীন কিন্তু গুণযুক্ত অলঙ্কৃত শব্দার্থের নাম কাব্য। অলঙ্কার অলঙ্কারে কাব্য নিয়ে দেখা যাচ্ছে মতভেদ আছে। কিন্তু যদি বলি, শব্দের সাহায্যে সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত কোনো চমৎকারিত্ব যখন সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে অলঙ্কার। অলঙ্কার বস্তুত, শব্দের অন্তরের জিনিস। কবির কাব্য আর কাব্যের অলঙ্কার, কাব্য-ভাষা ও ছন্দের মতো, একই সৃষ্টির প্রয়াসে স্বতঃউৎসারিত। সাধারণ মানুষও প্রতিনিয়ত ব্যাকরণ-শাস্ত্র বা নন্দন তত্ত্বের কোনো জ্ঞান না থাকলেও, অলঙ্কৃত বাক্য ব্যবহার করে। শব্দের উচ্চারিত ধ্বনি (শব্দ) ও শব্দগুচ্ছের অর্থের ভিত্তিতে অলঙ্কারের দুটি শ্রেণি শব্দালংকার ও অর্থালংকার। আধুনিক কবিরা গতানুগতিক একঘেয়ে অলঙ্কার ব্যবহারে অনেকটা বীতরাগ হয়ে এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ব্যাঞ্জনার তাগিদে

জগৎ থেকে আহৃত নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা সূত্রে নূতন নূতন ব্যঞ্জনাগর্ভ শব্দ, চিত্র রচনা করছেন। ফলে কাব্যেও নব নব ব্যঞ্জনার দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। কাব্যের সার্থকতা বিচারে অলংকারের প্রয়োগ কতটা সফল ও সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক—অলংকার প্রয়োগের মূল্যায়ন করে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে তার কতটা যোগ তা নিরূপণ করা হয়। প্রাচীন অলংকারের পুনরাবৃত্তি বা অনুকরণ নয়। কাব্যে ব্যবহৃত অলংকারের চমৎকারিত্বেই কবির সাফল্যের যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব। কবি কবিতা রচনা করেন প্রকাশের তাগিদে ; কবিতাও অলংকৃত হয় তাই সম্পূণ৪ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূণর্তভাবে। এই স্বতঃস্ফূর্ততা ও তার প্রয়োগের সৌন্দর্য সন্ধান কাব্যালোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়।

কাব্যে অলঙ্কার শব্দটির ব্যবহার বহু অর্থ জ্ঞানপ—রস, রীতি, ধ্বনি ছাড়াও অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি কাব্য-সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক উপাদানগুলিকেও বোঝায়। এখানে বিশিষ্ট অর্থে অলঙ্কার বলতে শব্দালঙ্কার (অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক) এবং অর্থালঙ্কার (উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক) প্রভৃতিকেই বোঝান হয়েছে। শব্দ উচ্চারণে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তার ওপর ভিত্তি করে শব্দালঙ্কার। আর শব্দার্থের ওপর ভিত্তি করে যে অলঙ্কার সৃষ্টি হয় তাকেই অর্থালঙ্কার বলা হয়। অর্থালঙ্কারে শব্দের ধ্বনি সৌকর্য প্রধান নয় আর অর্থগত তাৎপর্যই মুখ্য। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন এককে করা হয়েছে। এখানে এই আলোচনা প্রধান বিষয় নয়।

অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১২ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেত দেখুন। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর এককটির প্রাসঙ্গিক অংশ পুণরায় পাঠ করে তৈরি করুন।

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) কবির একান্ত নিজস্ব ___________ কবি প্রতিভার স্পর্শে ___________ ___________ ___________ অতিক্রম করে ___________ নূতনতর ___________ পায়।

(খ) লঘু ও গুরু দল বা সিলেব্‌লের ___________ বিন্যাস যে ধ্বনি তরঙ্গ বা ___________ সৃষ্টি করে তাই ___________।

(গ) কবির কাব্য আর কাব্যের ___________, কাব্য-ভাষাও ___________ মতো একই সৃষ্টির প্রয়াসে ___________।

(ঘ) বাংলা ছন্দের ___________ জাতি বা রীতির পরিচয় নিয়ে ___________ না থাকলেও ___________ মধ্যে ___________ ব্যাপারে ___________ আছে।

২। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) কাব্য দেহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত —
১। ছন্দ
২। শব্দ
৩। অলঙ্কার

(খ) অলঙ্কার বস্তুত শব্দের —
১। অন্তরের জিনিস
২। বাহ্য প্রসাধন
৩। অপ্রয়োজনীয় অংশ

(গ) অর্থালঙ্কার বলতে বোঝান হয়েছে — ১। শ্লেষ
২। রূপক
৩। যমক

৩। ছন্দ ও অলঙ্কারের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

৪। "কাব্যের কায়াকল্প গঠনে ভাষার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।"—উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামত পাঁচটি বাক্যে আলোচনা করুন।

৫। কাব্য বিচারে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি সহৃদয় পাঠককে বিচার করতে হয় সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৬। "কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার ছন্দ।" মন্তব্যটি কি আপনি সমর্থন করেন ? আপনার বক্তব্য তিন চারটি পংক্তিতে লিপিবদ্ধ করুন।

৭। শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যে কোনটিকে আপনি কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন এবং কেন, সে সম্পর্কে ১০০টি শব্দে অভিমত দিন।

৩১.৬ সারাংশ

গদ্য ও কাব্য প্রকাশের দিক থেকে ভিন্ন। একটি যুক্তি-বুদ্ধি মননের, অপরটি আবেগ অনুভূতির বাহন। কাব্যের সংজ্ঞা প্রকৃতি নিয়ে প্রাচ্য ভারতে ও পাশ্চাত্য ইউরোপে অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা মত প্রকাশ করা হয়েছে। তাত্ত্বিকেরা কেউ বা কাব্যে প্রকাশ বা ভাবাভিব্যক্তির উপস্থাপনা অথবা বিষয়ের ব্যঞ্জনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দুটি মতবাদ পরস্পর বিরোধী নয়, দুয়ের সমন্বয়েই কাব্যের কাব্যত্ব। তাই প্রাচ্য ধ্বনিবাদীরা প্রকাশবাদ ও ভাববাদ—এ দুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনিকে মেনে নিয়ে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেউ কেউ অনুকরণ, অনুভূতি, রসানুভূতির গুরুত্ব দিয়েছেন। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর অপর তাত্ত্বিকেরা নগ্ন বাস্তব ও সত্যের উলঙ্গামূর্তিকে তুলে ধরাকেই কাব্যের প্রধান কাজ মনে করেছেন। ক্রোচে ও আর্নল্ডের মতে কাব্য হল অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি এবং জীবনের সমালোচনা।

কাব্যের শ্রেণিবিভাগ বিষয়ভিত্তিক বা আঙ্গিকগত দিন থেকে করা যায়। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবি মনের যে দিকগুলি প্রধান হয়ে ওঠে তারই উপর ভিত্তি করে আঙ্গিক গড়ে ওঠে। নীতি কবিতা, শোককাব্য, গাথা ও আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি উপস্থাপনায় যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি এদের বিষয়বস্তু ও মননের গভীরতা ও ব্যাপ্তিরও তারতম্য আছে। গাথার প্রেম, বীরত্ব, মহত্ব, আত্মত্যাগ অজ্ঞাতনামক লোকায়ত কবিদের রচনায় ফুটে উঠেছে। রোমান্টিক আখ্যান কাব্যের অবলম্বন কিংবদন্তি বা ইতিহাস। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উপলব্ধিতে মহাকাব্যের ক্ষেত্রে অনেকটা ঐক্য আছে। বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর নায়ক বীর ও সদ্বংশজাত, একাধিক উপাখ্যান কাব্যে বিশালতার ধারণা সৃষ্টি করে। এর মধ্যে দিয়ে একটি সমগ্র দেশ, সমগ্র যুগ, মানবসভ্যতার একটি মহতী পর্যায়ের পরিচয় ফুটে ওঠে। গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিচেতনাই মুখ্য। একান্ত আত্মগত ভাবানুভূতিই এর উপজীব্য।

কাব্যভাষা শব্দনির্ভর। কবির মনের কোনো সৌন্দর্যময় আবেগ যখন শব্দ ও ছন্দের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনাময় হয়ে প্রকাশিত হয়, তখনই তা হয়ে ওঠে কাব্য। তাই কাব্য আলোচনায় ভাষা শিল্পেরও বিচার করতে হয়।

ছন্দ ঃ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধ্বনিনির্মিত লঘু ও গুরু দলের (সিলেব্‌লের) সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাস যে ধ্বনি তরঙ্গ বা রিদম (rhythm) সৃষ্টি করে তাই ছন্দ। এই ছন্দ কবিতার অন্য সমস্ত রচনা থেকে আলাদা করে। তাই কাব্যবিচারে কবি ছন্দের ব্যবহার কতটা সার্থকভাবে করেছেন সেটি বিচার্য। কাব্য ছন্দ বিচারে ছন্দোরীতি ও ছন্দবন্ধের গঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছন্দের শ্রেণি নিয়ে, গঠন নিয়ে মতভেদ না থাকলেও নামকরণে তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে প্রবোধচন্দ্র সেনের মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত নামগুলিই এখন গ্রহণ করা যেতে পারে।

অলঙ্কার ঃ অলঙ্কার কাব্যকে সুন্দর করে। অলঙ্কার শব্দধ্বনি ও শব্দ ব্যঞ্জনা ভিত্তিতে শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার দু-ভাগে বিভক্ত। শব্দালঙ্কার ধ্বনি সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যনির্ভর ; অর্থালঙ্কার অর্থনির্ভর ভাবব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ কতটা সফল ও সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক তার মূল্যায়নে কবিকৃতি বিচার করা হয়।

৩১.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ-১-এর প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়লেই উত্তরটি দিতে পারবেন।

২। (ক) বাগ্‌যন্ত্রের, অর্থবহ, ভাষা।

(খ) যুক্তি, বুদ্ধি, মননের, আবেগ, অনুভূতি, কল্পনার।

(গ) আনন্দদায়ক, রসাত্মক, বাক্যই।

(ঘ) যা ঘটতে পারে তাই, অবলম্বন, নির্বিশেষের।

(ঙ) গভীর, অনুভূতির, স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্ছলন।

(চ) বস্তুর, অন্তর্নিহিত, সৌন্দর্যের।

৩-৬ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠের প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভাগ করে আরও বার কয়েক পড়ুন। তা হলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

অনুশীলনী—২

১। (ক) জ্ঞানোদয়ের, চৈতন্য সঞ্চারের।

(খ) প্রতিষ্ঠিত, কায়িক, অনুকরণ।

(গ) শোকজ্ঞাপক, ডার্জ।

(ঘ) সপ্তদশ, রোমান্টিক, লোকগাথা, জনজীবন।

(ঙ) ধীরোদাও, বীর, সদ্বংশজাত।

২। (ক) তাত্ত্বিক, (খ) আখ্যান কাব্য, (গ) বীর, (ঘ) গীতিকাব্য ধর্মী।

৩-৪ নং প্রশ্নের জন্য মূলপাঠ—২-এর ব্যঙ্গ কবিতা বৈঠকি কবিতা এবং মহাকাব্য অনুচ্ছেদগুলি বার বার পড়ে উত্তর দিতে সচেষ্ট হন।

অনুশীলনী—৩

১। (ক) হৃদয়াবেগ, কাব্যদেহের, শব্দ, বাচ্যার্থকে, ব্যঞ্জনায়, অভিব্যক্তি।

(খ) সুনিয়মিত, ছক, রীদম্, ছন্দ।

(গ) অলঙ্কার, ছন্দের স্বতঃউৎসারিত।

(ঘ) ত্রিবিধ, মতদ্বৈধ, ছান্দসিকদের, নামকরণের, ভিন্নতা।

২। (ক) শব্দ, (খ) অন্তরের জিনিস, (গ) রূপক।

৩-৭ নং প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি একাধিকবার পাঠ করলেই আপনি লিখতে পারবেন।

৩১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

এককে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে জানতে আপনি নিম্নলিখিত বইগুলি পড়তে পারেন ঃ

(১) ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় — কাব্যতত্ত্ব বিচার (১ম খণ্ড)

(২) ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু — সাহিত্যের নানারূপ, অলঙ্কার জিজ্ঞাসা।

(৩) সাহিত্যের রূপ-রীতি — উজ্জলকুমার মজুমদার

(৪) ড. তারাপদ ভট্টাচার্য — ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দ মীমাংসা।

(৫) সাহিত্য সন্দর্শন — শ্রীশচন্দ্র দাস।

(৬) সাহিত্য প্রকরণ — হীরেন চটোপাধ্যায় ।

একক ৩২ ❒ আধুনিক বাংলা কাব্য

গঠন

৩২.১ উদ্দেশ্য
৩২.২ প্রস্তাবনা
৩২.৩ মূলপাঠ—১ আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা বিচার, লক্ষণ-নির্দেশ ও উনিশ শতক
৩২.৪ সারাংশ—১
৩২.৫ মূলপাঠ—২ ঃ আধুনিক কবিতা—বিশ শতক
৩২.৬ সারাংশ—২
৩২.৭ উত্তরমালা
৩২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩২.১ উদ্দেশ্য

পূর্বোক্ত এককটিতে আপনি কাব্য কাব্যের শ্রেণিবিভাগ ও তার আঙ্গিক বা গঠনগত বিষয়গুলি সম্পর্কে জেনেছেন। বর্তমান এককে আপনি দেশে দেশে কালের বিবর্তনে সভ্যতারও যেমন বিবর্তন হয়, মানুষের চিন্তা-চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন একটি বিশেষ কালসীমার পর বিরাট বলে মনে হয়। মনে হয় যেন জীবনবোধের একটি পর্ব থেকে আরেকটি পর্বে গিয়ে পৌঁছেছি। এই যে পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাওয়া একেই বলে যুগান্তকারী পরিবর্তন। এটিকেই ঐতিহালিকেরা যুগচিহ্নিত করেছেন।

এককটিতে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যে আলেনচা করা হয়েছে তা থেকে আপনি—

- আধুনিক কবিতার লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আধুনিক বাংলা কবিতায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝতে পারবেন।
- কবিদের ভাষা ছন্দ অলঙ্কার ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য এসেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩২.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পড়ে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যেমন জানতে পারবেন, তেমনি উনিশ-বিশ দুই শতাব্দী ব্যবধানে তার পরিবর্তনের ধারাটিও বুঝতে পারবেন। এই পরিবর্তন যেহেতু একটি দেশ কালের মধ্যে তার ইতিহাস, সমাজ পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাই, সমাজের প্রতিফলন কবিদের চিন্তা-ভাবনায় ও কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু উনিশ শতকের ভাবনা আর বিশ শতকের ভাবনা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি। এই পরিবর্তন সম্পর্কে দুটি পর্যায়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এই এককটি পর্যায় ধরে পড়ে দুটি শতকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। আমরা বলব প্রতিটি পর্যায় ভাল করে পড়ে দুটি অনুশীলনীর সমস্ত উত্তর করুন। বিষয়বস্তু সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই অসুবিধা হবে না। সবশেষে উত্তর সংকেত দেখুন।

M#2\D:\EBG-2\Unit-12 Pm6.5\1st proof

৩২.৩ মূলপাঠ—১ ঃ আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা বিচার, নির্দেশ ও উনিশ শতক

মানুষ একসময় পৃথিবীর প্রভাত-সন্ধ্যা, দিন-রাত্রি, গ্রীষ্ম-বর্ষা, শরৎ-বসন্ত, চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে অপার রহস্যের সন্ধান পেয়ে বিস্ময় বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে অলৌকিক, অতিলৌকিক ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তায়—দেবত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। পরবর্তীকালে মানুষের দৃষ্টি মর্ত্য পৃথিবীর দিকে পড়লে দেখে মানুষের বিচিত্র জীবনলীলা—সেখানে ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টির পরিচয়ই প্রধান। এই সমষ্টির মধ্যেও কালক্রমে সুন্দর পৃথিবীর প্রতি অমোঘ আকর্ষণ জনিত কারণে জাতিতে-জাতিতে, সভ্যতায়-সভ্যতায় নিরন্তর সংঘর্ষ সংগ্রামও সমন্বয় চলছে। এ যুগে মানুষ দেবাশ্রিত হলেও মানবচরিত্রের অসামান্য মহিমায়—তার বীরত্বে, মহত্ত্বে তার প্রেমে স্থান করে নেয়। সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে, অ-সাধারণ মানুষকে দেবোপম বা অতিপ্রাকৃত করে নেবার চেষ্টা ফুটে উঠেছে। এরই পাশাপাশি আবার মানুষের আদর্শে, দেবতাকে মানবিক করার আকাঙ্ক্ষায় তাকে মানুষের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসে কালক্রমে ঘরের মানুষে রূপান্তরিত করেছে। কালের সঙ্গে চিন্তা বিবর্তনে এই ধারা অনুসরণ করেই বাংলা কাব্যে ১৯শ শতকে মানবকেন্দ্রিক নতুন ভাববোধের সঞ্চার ঘটেছে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়গুলি। সেই সঙ্গে নিসর্গ চেতনার একটি স্বতন্ত্র বোধ, যথা, নিসর্গে যে একটি নিজস্ব রূপ-মাধুরী আছে এবং সে আপনাতেই স্বতন্ত্র—বর্ষায়, শরতে, শীতে, বসন্তে তার যে বিচিত্র মাধুরী ফুটে ওঠে তা অনুভূত হয়েছে। এই সময়ই মানবতার জয়ধ্বনির সঙ্গে পৃথিবীর ধুলা-মাটি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-অপ্রেম, শান্তি-সংগ্রাম ভরা জীবনের সুন্দর কুৎসিত সবকিছু গভীর ও অতলস্পর্শ মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মনে জেগেছে সমাজ ও স্বদেশের চেতনা, সমাজের মধ্যে যে আচার-অনাচার, সুব্যবস্থা-কুব্যবস্থা বিরাজমান কবির মনে তা নূতন প্রেরণা জোগাল। কাব্যে তার প্রতিফলন আমরা দেখেছি। সমাজের সঙ্গে স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক মমতা থেকে দেশের সঙ্গে নিজের মঙ্গলামঙ্গলের ধারণা ওতপ্রোত হয়েছে। আর স্বদেশপ্রীতি থেকে জাতীয়তাবোধ, পরাধীনতার গ্লানি তাকে ক্লিষ্ট করেছে। এভাবে বিশ্বপ্রকৃতি তার বুকে লালিত মানুষ এবং মানুষের সুখদুঃখ বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা যে কবিতায় প্রকাশিত হল তাই আধুনিক কবিতা। আধুনিক কবিতার মানব প্রাধান্যের কারণে মানুষের জীবন, ভাগ্য ও চরিত্র, তার সূক্ষ্ম অনুভূতি, ভাবনা কাব্যের প্রধান বিষয় হয়েছে। পুরাণ, ধর্ম প্রভৃতির প্রসঙ্গ কাব্যে যা এসেছে, তা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এ যুগের প্রকৃতি বোধেও বিশ্বপ্রকৃতির নানা রূপ-বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য নানাভাবে রূপে প্রকাশ পেয়েছে। যথার্থ অর্থে নিসর্গ চেতনার কবিতা রচনা যেমন হয়েছে, কার সঙ্গে মানুষ আর প্রকৃতির অন্তরঙ্গ যোগটিকে তুলে ধরা হয়েছে। কাব্যসাহিত্যে গতানুগতিক ধর্মাশ্রিত কাব্যের পরিবর্তে এ যুগের কাব্য নব নব রূপে বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে প্রকাশ পেয়েছে। যুরোপীয়, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের অন্তপ্রেরণায় ১৯ শতকের বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রকাশ ঘটে।

কাব্যরূপের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিতায় মধ্যযুগীয় সংস্কার অতিক্রম করে আধুনিক ধ্যানধারণার সূচনা করেছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী গীতিকবিতা, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্টিক আখ্যানকাব্য, মধুসূদন মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট রচনা করে এই পর্বেই কাব্য শিল্প কর্মের অসামান্যতা তুলে ধরেছেন। দেশকালের প্রভাবে এই আধুনিক মানসিকতাই প্রাচ্যের সংস্কৃত তামিল প্রতীচিব গ্রিক লাটিন ইংরেজি সাহিত্য থেকে নানা উপকরণ উপাদান নিয়ে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ সময় আরমা দেখেছি জীবনের খুঁটিনাটি তুচ্ছ-ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ভাষাশৈলীতে স্বভাবতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে বাংলার গ্রামগঞ্জ, মাঠ-ঘাট ও অন্তরসুরের সহজ ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি। সব মিলিয়ে এ সময়ের সাহিত্যে ব্যক্তি,

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দেশ জাতির উত্থান পতন সবকিছুর পরিচয় ভাষার স্ফুট-অস্ফুট বর্ণচ্ছটায় ফুটে উঠেছে। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা কাব্যে এরই ধারাবাহিক পরিচয় আছে। এই পরিবর্তনের কালপ্রবাহের স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে থাকবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, পশ্চিমের অভিঘাত এই বাস্তব অবস্থাটিকে সম্ভবত অনেকটা ত্বরান্বিত করেছিল। অষ্টাদশ শতকে মনীষী কোঁৎ (Comte) যে দার্শনিক বক্তব্য তুলে ধরে ছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। তিনি স্বর্গের থেকে মর্ত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার কথা বলেছেন। স্বর্গ এবং স্বর্গবাসীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যেহেতু জানিনা, তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমরা নিশ্চিত করে জানি পৃথিবীকে, সেখানকার সুখ দুঃখময় মানুষকে, তাই আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা উচিত এই মানুষের দিকে, এই প্রত্যক্ষের রাজ্যে। এই বক্তব্য অভিনব। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষিত বাঙালীর মন ও তার সৃজনশীল মনীষার চিন্তাধারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এ সময়ের কাব্যকলার তাই, বিশ্বজীবন, মানুষ ও কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

৩২.৪ সারাংশ—১

সভ্যতার আদিযুগে মানুষ বিশ্বকে দেখেছে অপার বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে, সেখানে খুঁজে পেয়েছে অনন্ত রহস্য, অলৌকিক শক্তির লীলাল। কল্পনা করে নেপথ্যচারী দেবতার। এযুগ ধর্মের যুগ। কাব্যে দেবতার প্রাধান্য। এরপর দেবতাকে ছেড়ে যখন দৃষ্টি পড়ল মানুষের প্রতি, তখন মানুষ মানে বড়ো মানুষ, রাজা-বাদশা, আমির-ওমরাহ ক্রমে জমিদার তালুকদার অভিজাতদের কথা সাধারণভাবে মানুষের কথা এসেছে। গভীরভাগে মানবজীবন ও বিশ্ববোধে চিন্তা জগৎ আক্রান্ত হয়েছে। ভাষায় প্রকাশভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে। পশ্চিমের দার্শনিক কোঁৎ একে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে।

অনুশীলনা—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১) (ক) মানুষের দেবত্বে বিশ্বাস কীভাবে জন্মাল লিখুন।

(খ) মানুষ কীভাবে দেবতার পাশে স্থান করে নিয়েছ বুঝিয়ে দিন।

২) বাংলা কাব্যে মানবকেন্দ্রিক ভাবনার সঞ্চার কীভাবে ঘটেছে আলোচনা করুন।

৩) মনীষী কোঁৎ-এর বক্তব্য সংক্ষেপে বলুন।

৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) আধুনিক কবিতার _______ _______ কারণে মানুষের জীবন _______ ও চরিত্র তার _______, ভাবনা, কাব্যের প্রধান বিষয় হয়েছে।

(খ) (১৯ শতকে) সাহিত্যের _______ _______ হয়ে উঠেছে _______ খুঁটিনাটি _______ _______ বিষয়গুলি।

(গ) স্বদেশে প্রীতি থেকেই _______ _______ গ্লানি তাকে _______ করেছে।

(ঘ) আধুনিক মানসিকতা থেকেই প্রাচ্যের _______ _______ প্রতীচীর _______ _______ ইংরেজি সাহিত্য থেকে নানা _______ _______ নিয়ে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

৫) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

ক) বিহারীলাল রচনা করেছেন—
১। আখ্যান কাব্য
২। গীতিকবিতা
৩। নীতি কবিতা

খ) যেহেতু আমরা নিশ্চিত করে জানি পৃথিবীকে, সেখানকার সুখদুঃখময় মানুষকে, তাই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত এই প্রত্যক্ষের রাজ্যে। বলেছেন—
১। ক্রোচে
২। মধুসূদন
৩। কোঁৎ

৩২.৫ মূলপাঠ—২ আধুনিক কবিতা—বিশ শতক

আধুনিক শব্দটি দেশকাল নিরপেক্ষ নয়। দেশ ও কালের ব্যবধানে আধুনিকতার সংজ্ঞা বদলায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৯ শতকে যে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল সেখানে য়ুরোপীয় বিশেষত ইংরেজি সাহিত্য থেকে অন্তপ্রেরণা নিয়ে বাংলা কাব্য নবভাবে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মধ্যযুগীয় সংস্কার বর্জন করে নবজাগৃতির ঐতিহাসিক নিয়তিকেই বরণ করে নিয়েছিল। এ যুগে মানবিমহিমা, যুক্তিবাদ, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন, স্বদেশচেতনার সঞ্চার হয়েছে। কবিমন চিন্তার সুনীল আকাশে মুক্তি পাওয়ায় কাব্য কবিতায় তার প্রতিফলন ঘটেছে রোমান্টিক ভাববিনাসে।

কিন্তু বিশ শতকে পর পর দুটি মহাযুদ্ধ—প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম এবং নানা দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল আলোড়ন তোলায় বাংলার সমাজ জীবনেও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। এরসঙ্গো অসহযোগ, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা উদ্বাস্তু নরনারীর দুঃসহ জীবন সংগ্রাম প্রভৃতির সঙ্গো উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অবদানও এসময় মানবিক চেতনায় নূতন মাত্রা যোগ করেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েড, মার্ক্স, সার্ত্র প্রমুখ মনীষীর চিন্তা মানবিক চেতনার গভীরে আলোড়ন তোলে। লেলিনের কৃতি রাশিয়ার কথা স্মরণে রেখে তরুণ কবিদের একাংশে সমাজ-পরিবর্তনের মতাদর্শ নতুন ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করে। এভাবে আধুনিক বাংলা কবিতায় এক নতুন পটভূমি তৈরি হয়েছে। কবি ও কবিতা যেহেতু সমাজের মানব-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠে তাই কবিতায় এই ইতিহাস সঞ্জাত চেতনাবোধ নতুন বাঁক নেয়। এই কালচিহ্নিত কবিতাই হল আধুনিক কবিতা।

কাব্যে বিশ শতকের এই কালপ্রভাবকে আধুনিক কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্ভবের কারণ বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ আবার রবীন্দ্রপ্রভাব উত্তরণ থেকে আধুনিকতার সূচনা মনে করেন। প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে কল্লোলের তরুণ কবিকুল মুখ্যত রবীন্দ্র ঐতিহ্যে পুষ্ট হলেও রবীন্দ্র কবি-মহিমা এরা সর্বতোভাবে অনুভব

M#2\D:\EBG-2\Unit-12 Pm6.5\1st proof

করেননি অথবা স্বীকার করতে চাননি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেই নানারূপে বিকশিত হয়েছেন। এটি তরুণতর কবিদের উপলব্ধিতে ছিল না। অপরদিকে তাঁরা তৎকালীন ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি বিদেশি কাব্যে এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে নিজেদের সম্পর্কে কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করে কাব্য রচনা ও তার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন রবীন্দ্রমুগ্ধ বাঙালি পাঠককুলই তাদের রচনার জনসমর্থনের প্রধান বাধা। সুতরাং পাঠকের রবীন্দ্র অনুরাগ-এর প্রতিকূলতা তথা রবীন্দ্র বিরোধিতাকেই তাঁদের কাব্যশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় বলে ধরে নেন। আত্মশক্তিতে আস্থাবান অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'আবিষ্কার' কবিতায় লিখলেন—

"পশ্চাতে শত্রুরা শর অগনন হানুক ধারালো
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।"

এই কবি-ভাষণ তরুণ কবিদের বিদ্রোহ প্রকাশ করলেও এঁরা প্রত্যেকেই অন্তরে ছিলেন রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত। কারণ এদের প্রত্যেকেরই মনের লালন-ভূমি রবীন্দ্র-শাসিত বাংলা কাব্য সংসার। তাই এঁদের বক্তব্যে, প্রকাশে নূতনত্বের অঙ্গীকার থাকলেও আঙ্গিকের পরিবর্তনই কবিতার আধুনিকতার একমাত্র শর্ত নয়। প্রতিভার স্পর্শে ভাব ও আঙ্গিকের যুগ্ম সম্মিলনেই কবিতায় আধুনিকতার প্রকাশ। তাই আধুনিক কবিতা বিচারে কালের পরিচয় নিয়েও কাব্য বিচারের সময় তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হবে। কালের বিচারে আধুনিক কবিতা একালের সৃষ্টি হলেও, তার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা চরিত্রধর্মেও নতুনতর। এই বিশেষ চরিত্র-ধর্মই রচনাকে অন্যান্য সমকালীন রচনা থেকে স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত করে।

কল্লোলের বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ কবি-গোষ্ঠী নতুন ও স্বতন্ত্র ধ্যানধারণায় নিবিষ্ট হতে চেয়েছিলেন। এ সময় সমাজ চিন্তাতেও একটা নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। সোভিয়েত সমাজবিপ্লবের সাফল্যের পর মানুষ ও মানবসমাজ সম্পর্কে নতুন চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল। এই পর্বেই যুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় লেখকদের রচনাবলি তরুণ লেখকদের নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে। স্মরণ করা যেতে পারে 'কল্লোল' পূর্ববর্তী সবুজপত্র ও ফরাসি ভাষা অভিজ্ঞ তার সম্পাদক সে সময়ে আধুনিক চিন্তাধারা ও মননসাধনাকে লালন করেছিলেন। ওই পত্রিকাতেই সাহিত্য-সমাজ-দর্শন-সমাজকল্যাণ-শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। 'সবুজপত্র' অবশ্যই মন ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার উপর জোর দিয়েছিল। তবু কল্লোলের কবিকুলের তার সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে তাঁদের স্বল্পস্থায়ী আন্দোলনটি সাড়া জাগাতে পেরেছিল। তাঁদের কবিতার বিষয় ও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এঁদের শব্দপ্রয়োগ, চিত্রকল্প, ছন্দ কোনোটিই ঐতিহ্যবিরোধী বা ঐতিহ্যবিচ্যুত ছিল না। 'ঝরা পালক' 'প্রথমা' ও 'বন্দীর বন্দনায়' সে পরিচয় আছে। কিন্তু বক্তব্য হয়তো ছিল কিছুটা ব্যক্তিবিদ্রোহের সূচক—যা রোমান্টিকতার অঙ্গ। বক্তব্য, উপাদান, উপস্থাপনা কাব্য নির্মিতি ও ব্যঞ্জনায় অব্যবহিত সমকালের কবি অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে মধ্যেও অনুরূপ আধুনিক চরিত্র-লক্ষণ ভিন্নতর ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। এদের সামগ্রিক কবিভাবনা ও কাব্যচর্চায় আধুনিক বাংলা কবিতা বিশ্ব কাব্য সাহিত্যের সমীপবর্তী হয়েছে।

কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার ভূমিকায় আধুনিক কবিতার মৌল লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম, আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে"—এ কবিতায়। অপর একটি আধুনিক বাংলা কবিতা সঙ্কলনের ভূমিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব আরও সংক্ষিপ্ততর এবং অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন—"কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী।"

উপসংহারে আধুনিক কবিতার ভাব ও রূপের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে বলা যায়—

১) এ কবিতা প্রধানত নগরকেন্দ্রিক, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাতজাত। পরিণামে কবিতায় জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ-এর পরিচয় ফুটেছে।

২) দেশি বিদেশি সাহিত্যের প্রভাবে বিশ্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মনস্কতা এ যুগের কবিতার অন্যতম লক্ষণ।

৩) ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান, মার্ক্সীয় দর্শন, আধুনিক কবিতায় অনেকটা স্থান করে নিয়েছে।

৪) জগৎ জীবন সম্পর্কে একটি অনিকেত ধারণা থেকে প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সংশয় ; ফলত দেহজ কামনা বাসনা এবং প্রেমের শারীরী রূপের বর্ণনায় আসক্তি।

৫) কবিতায় মননের প্রাধান্যের কারণে দেশ বিদেশের ইতিহাস, দর্শন রাষ্ট্র ও সমাজ, কাব্যভাষা ও চিত্রকল্পে বহুব্যবহারে ও কাব্যে দুরূহতা এসেছে।

৬) কাব্যদেহে বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটায় গদ্য ও কাব্যের ব্যবধান কমেছে। গদ্যছন্দের চলতি ও গ্রাম্য দেশি শব্দের সঙ্গো বিদেশি শব্দের বহুল ব্যবহার ঘটেছে।

৭) প্রচলিত কাব্যভাষা ও উপমা-চিত্রকল্পের পরিবর্তে বিদেশি এবং নতুন নতুন উপমা-চিত্রকল্প রচনা করে বিশেষ ব্যঞ্জনা ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এ পর্বের অনেকেরক কবিতায় শব্দ প্রয়োগ হল সুমিত ও অর্থঘন।

৮) বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে।

একালের কবিরা উপরিউক্ত লক্ষণগুলি পূর্ণ বা আংশিকভাবে কাব্যচর্চায় প্রয়োগ করে রাবীন্দ্রিক ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক শৈলীতে রূপায়িত করে এবং আধুনিক চিন্তা ও দর্শনকে রাবীন্দ্রিক প্রকাশভঙ্গি, শব্দ, ছন্দ ও চিত্র রচনা করে রবীন্দ্র ঋণের সদ্ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রকাব্য ধারা এ কালের কবিদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেও দ্রুত পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ২০ শ শতকের কবিদের অবস্থান হেতু তাদের রচনায় এ সময়ের বিষয়বস্তুর নবত্ব ও বক্তব্যের স্পর্ধিত ও সরল উপস্থাপনা, সংহত কাব্যকলায় প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কবিতা বলতে আমরা এ কালের এই কবিতাগুলিকে বুঝি।

বর্তমান এককে মূলপাঠ—১ ও মূলপাঠ—২ পর্যায়ে ১৯শ ও ২০শ শতকে আধুনিক কবিতার কালগত পরিবর্তনের ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী চারটি এককে যথাক্রমে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দের মধ্যে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ কী ভাবে ঘটেছে, ও তার স্বরূপ কাব্য আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩২.৬ সারাংশ—২

ইংরেজ অধিকারের পর এদেশে ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার পত্তন ঘটেছিল। সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল। ফলে দেশের নতুন অর্থব্যবস্থা হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক-সামন্তবাদী এক মিশ্র রূপ। ইংরেজ সংস্পর্শে ও রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটল, আর আধুনিক পৃথিবীর ভাবনাচিন্তা দর্শনবিজ্ঞানের সঙ্গো পরিচয়ের ফলে উদ্ভূত হল বাংলার নবজাগৃতি, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, স্বদেশচেতনা এবং শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রাণশক্তি। মধুসূদনের হাতে বাংলা কাব্য সাহিত্যের নবজন্ম ঘটল। নতুন ধারার আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য রচিত হল।

বিংশ শতকে একদিকে রবীন্দ্র ঐতিহ্য অপদিকে রাষ্ট্র-দেশ-সমাজে নানা বিপর্যয়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডের সচেতন-অবচেতন-চেতন মনের রহস্য সন্ধান, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মারীমন্বন্তর, সোভিয়েতে সামজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিস্ময়—মার্ক্সীয় সাম্যচিন্তার বিকাশ, দেশভাগ, স্বাধীনতা, দেশের অর্থনৈতিক সংকট গভীর থেকে গভীরতর হওয়ায় সমাজে জীবনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হল। কাব্য ভাবনার রূপান্তর ঘটল। রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা একদল কবির ধ্যানজ্ঞান হল। অন্য কবিরা বিশ্ব কাব্য সাহিত্যে সঙ্গো আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে ভাবনা ও বাগ্‌ভঙ্গি ও ব্যবহার করলেন। কাব্য ভাষারও পরিবর্তন এল—গদ্যকবিতার জন্ম হল, আবার গদ্য-পদ্য বাগ্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটল। ২০শ শতকের আধুনিকগতা ১৯শতক থেকে ভিন্নতর নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবজাত এবং অপেক্ষাকৃত জটিল।

অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন এবং উত্তর শেষে ———— পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেত দেখুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) পাঠকদের রবীন্দ্র অনুরাগের ________ তথা রবীন্দ্র ________ তাঁদের ________ প্রতিষ্ঠার প্রধান ________ বলে ধরে নেন।

খ) পশ্চাতে ________ ________ অগনন হানুক ধারালো
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি ________ ________
আপন চক্ষের থেকে ________ যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
________ ম্লান তার কাছে।

গ) আধুনিক কবিতার ভাব ও রূপের বৈশিষ্ট্য ঃ
জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি ________ ধারণা থেকে ________ সুন্দর ________ কল্যাণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ________ সংশয়।

২) বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবিতার রূপগত বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩) আধুনিক কবিদের কিছু রচনায় রবীন্দ্র বিরোধিতার সুর স্পষ্ট। এই বিরোধিতার কারণ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩২.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ—১-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৪। ক) মানব, প্রাধান্যের, ভাগ্য, সূক্ষ্ম অনুভূতি।

খ) বিষয়, বস্তু, জীবনের, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র।

গ) জাতীয়তাবোধ, পরাধীনতার, ক্লিষ্ট।

ঘ) সংস্কৃত, তামিল, গ্রিক, লাতিন, উপকরণ, উপাদান।

অনুশীলনী—২

১। ক) প্রতিকূলতা, বিরোধিতাকেই, কাব্য-শক্তি, উপায়।

খ) শত্রুরা, শর, রবীন্দ্র, ঠাকুর, জ্বালিব, যুগসূর্য।

গ) অনিকেত, প্রেম, কল্যাণ, মূল্যবোধে, সংশয়।

২নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য আধুনিক কবিতার সূত্রাকারে উপস্থাপিত বৈশিষ্ট্যগুলি ৬-৮ অংশটি ভালো করে পড়ুন।

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর বর্তমান পাঠ্য অংশটি পড়লেই আপনি লিখতে পারবেন।

৩২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১) আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)—আধুনিক কবিতার ইতিহাস।

২) দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়।

একক ৩৩ ❐ মধুসূদন দত্ত ঃ মেঘনাদবধ কাব্য—ষষ্ঠ সর্গ

গঠন

৩৩.১ উদ্দেশ্য

৩৩.২ প্রস্তাবনা

৩৩.৩ মধুসূদন দত্ত ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলী

৩৩.৪ মূলপাঠ

৩৩.৫ সারাংশ—১

৩৩.৬ মেঘনাদবধ কাব্য (৬ষ্ঠ সর্গ) ঃ শব্দার্থ টীকা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৩.৭ মহাকাব্য ঃ স্বরূপ, বৈচিত্র্য

৩৩.৮ মেঘনাদবধ কাব্য—কাহিনী বিন্যাস (৬ষ্ঠ সর্গ)

৩৩.৯ মেঘনাদবধ কাব্য—দেশী-বিদেশী প্রভাব, রসবিচার, ট্র্যাজেডি ও নিয়তিবাদ

৩৩.১০ মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র বিচার

৩৩.১১ মেঘনাদবধ কাব্যের (৬ষ্ঠ সর্গ) ঃ ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার

৩৩.১২ সারাংশ

৩৩.১৩ উত্তরমালা

৩৩.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

৩৩.১ উদ্দেশ্য

যদি আপনি এই এককটি সযে- পাঠ করেন এবং অনুশীলনগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারেন তাহলে আপনি—

- উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা কাব্যধারার অন্যতম মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- মহাকাব্য-শৈলীর অন্যান্য কবিকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মহাকাব্যপাঠ ও বিশ্লেষণ-এর সূত্রগুলির ধারণা করতে পারবেন।

৩৩.২ প্রস্তাবনা

আপনারা এই এককটি পড়ে উনিশ শতকের নবজাগৃতির বিশিষ্ট উপাদানগুলিকে যুগন্ধর মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ মহাকাব্যে কীভাবে সমসাময়িক জাতীয় জীবনের একটি সামগ্রিক প্রচ্ছন্ন চিত্রের পটভূমিকায় তুলে ধরেছেন সেটি বুঝতে পারবেন। মেঘনাদবধের কাহিনী-উপকরণ কোনো একটি বিশেষ রামায়ণ নয়, বলা যেতে

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

পারে বাঙালির রামায়ণ-সংস্কার থেকে আহরণ করা হয়েছে। তার সঙ্গো যুক্ত হয়েছে মধুসূদনের মাদ্রাজ সূত্রে তামিল-কম্বন্ রামায়ণের প্রভাব। কম্বন্ রামায়ণে রাবণ কুৎসিত বা অত্যাচারী শাসক নয়। মধুসূদন রাবণ-চরিত্র পরিকল্পনায় বাল্মীকি কৃত্তিবাসের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণতার অবসান ঘটিয়ে আর্যজাতিসুলভ উন্নতম্মন্য মূঢ়তা ভেঙে দিয়েছেন। এভবে তিনি পুরাণকে যে নতুনতর অর্থে ব্যঞ্জিত করেছেন তার পেছনে সে সময়ের মানসপটভূমিটি কাজ করেছে।

ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, মায়াদেবী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রগুলি কাব্যের চরিত্র বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গো সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে রাম লক্ষ্মণের প্রতি কবির মমতা ও সহানুভূতি প্রকাশিত হলেও রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি তাঁর গভীরতর পক্ষপাত ফুটে উঠেছে। এটি কবির ব্যক্তিগত ; কিন্তু সমকালের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রাচীন ধারণা ও সংস্কারের পুনর্বিচার করার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। মধুসূদনের এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছত্রশেষে মিলের বিলোপ এবং যতি স্থাপনের স্বাধীনতা। তিনি বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনার প্রয়োজনে ছন্দোবন্ধনকে ভাবের সঙ্গো সঙ্গাতি রেখে ইচ্ছামত সাজিয়েছেন। ফলে দেখা দিয়েছে ছত্র-উল্লঙ্ঘনকারী প্রবহমানতা (enjambment)।

ষষ্ঠ সর্গটি ভালো করে পড়ে কাব্যগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে নানা নতুন বিষয় আপনার নজরে পড়বে যার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। মরমি রসগ্রাহী পাঠক শুধু কাব্য পাঠ করেন না, তিনি কীভাবে এবং কোন্ বিশেষ রীতির মাধ্যম ব্যবহার করে কবি তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, তার কারণ সন্ধান করে কবির শিল্পকৃতিরও বিচার করেন। এ সম্পর্কে কিছু ধারণা এককের ৪৮.৯, ৪৮.১১, ৪৮.১২, ৪৮.১৪ উপবিভাগে দেওয়া হয়েছে। সর্গটি বিশ্লেষণ করে পড়বার সময় কিছু আভিধানিক শব্দ ও গুরুত্বপূর্ণ কাব্য-বাক্যাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োজন হবে মনে করে ৪৮.৬ উপবিভাগটি প্রস্তুত করা হয়েছে, এতে আপনাদের সুবিধা হবে। এছাড়াও আপনারা কিছু বিশেষ পঙ্‌ক্তি নির্বাচন করে গভীর ও সযত্নে পাঠ করতে পারেন।

আপাতত ষষ্ঠ সর্গ পড়ে কাব্যটি বুঝতে চেষ্টা করা যাক। সঙ্গো কিছু অনুশীলনী দেওয়া আছে, সেগুলি এবং লেখক ও রচনা সম্পর্কে যে সাধারণ আলোচনা আছে তা পাঠবস্তু বুঝতে সাহায্য করবে বলে মনে করি।

৩৩.৩ মধুসূদন দত্ত ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলী

দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন স্বরচিত সমাধি লিপিতে আত্মপরিচয় দিয়েছেন ঃ

'যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা, দত্ত মহামতি
রাজনায়ারণ, নামে, জননী জাহ্নবী।'

কবির জন্ম ২৫শে জানুয়ারি ১৮২৪ ; মৃত্যু ২৯শে জুন ১৮৭৩। জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি, আম-জাম-কাঠাল গাছের শ্যামলতাস্নিগ্ধ একটি সাধারণ গ্রাম। এই গ্রামে জন্মের পর আরও সাত বছর কাটিয়েছেন। এর স্মৃতি তাঁর মানসলোকে স্থায়ী হয়ে ছিল। পিতৃসূত্রে তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, মাতৃসূত্রে তাঁর জমিদারি রক্তের সঙ্গো যোগ ছিল। মা ছিলেন জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। মধুসূদন চার-পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। সে সময় আইন-আদালত ফারসির চলন ছিল। তাই সেই ছয়-সাত বছর বয়সেই মধুসূদন ভিন্ন গ্রামের এক মৌলবির কাছে ফারসি পড়তেন। বাড়িতে মায়ের কাছে সাগ্রহে রামায়ণ, মহাভারত মঙ্গালকাব্যের পাঠ নিয়েছেন। বারো বছর বয়সে কলকাতায় আসেন। রাজনারায়ণ তখন কলকাতার সদর

দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করতেন। পরে খিদিরপুরে একটি বাড়ি কিনে (১৮৩২) স্থায়ী হন। মধুসূদনের পিতা তাঁকে কলকাতায় এনে হিন্দু কলেজে ভর্তি করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কিছু কবিতা খ্যাতনামা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিলাত যাওয়ার আগ্রহ ও বাবা-মার ঠিক করা বিবাহ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী খ্রিস্টাধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত মধুসূদনের হিন্দু কলেজে পড়া হল না, তাই তিনি বিশপস্ কলেজে (শিবপুর) ভর্তি হলেন। পিতাই তাঁর শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করতেন। এখানেই তিনি গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। পরে অসন্তুষ্ট রাজনারায়ণ আর্থিক সাহায্য বন্ধ করায় তিনি ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজ চলে যান (১৯৪৮)। শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। এখানেই রেবেকা ম্যাক্টাভিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও খ্রিস্টীয় মতে বিবাহ। মাদ্রাজ প্রবাসে তিনি তামিল, তেলুগু, গ্রিক ও হিব্রু ভাষা নিয়মিত চর্চা করতেন।

মধুসূদনের প্রথম বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া নামক আর এক ইংরেজ মহিলাকে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রেবেকা পরাজিত হলেন। আত্মনিবেদন পরায়ণা হেনরিয়েটা শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন।১৮৫৬ তে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে এসে কলকাতার পুলিশ কোর্টে চাকরি নেন। সে সময়ই তাঁর বাংলা লেখনী চর্চা শুরু। শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক, ১৮৫৯ সালে দুটি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং ১৮৬০-এ পূর্ণাঙ্গ নাটক 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। এখানেই প্রথম অমিত্রাক্ষর নিয়ে পরীক্ষা করেন।১৮৬০ অমিত্রাক্ষরে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' আর ১৮৬১ 'মেঘনাদবধ কাব্য'* ও 'ব্রজাঙ্গনা' এবং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রকাশিত হয়। তারপর 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২)। এ সময় পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের পর বিলি ব্যবস্থা করে, ১৮৬২-র ৯ জুন বিলাত যাত্রা করেন। ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্য 'গ্রেজ ইনে' ভর্তি হন। ওই বৎসরই ১৯শে আগস্ট পাশ করে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসেন। মধুসূদন বিদেশে বাসকালেই রচনা করেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। জীবন সায়াহ্নে 'হেক্টর বধ' (১৮৭১) গদ্যকাব্য ও 'মায়াকানন' নাটক (১৮৭৪) রচনা করেছিলেন।

মহাকবির শেষজীবন দুঃখ ও দারিদ্র্যে জর্জরিত। অসুস্থ কবি আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ২৯শে জুন ১৮৭৩-এ। তাঁর তিনদিন পূর্বে ২৬শে জুন হেনরিয়েটার মৃত্যু হয়।

বর্তমান এককের পাঠ্যবস্তু মেঘনাদবধ কাব্য-এর ৬ষ্ঠ সর্গ। মহাকাব্যের রীতি অনুযায়ী এ সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে-'বধ'—"ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে বধো নাম ষষ্ঠ ঃ সর্গ।"

ষষ্ঠ সর্গের ঘটনাকালের সূচনা রামরাবণের যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন সকালে। স্থান—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার, বিষয়বস্তু লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ। 'বধে'—এর মূল ঘটনাটি রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু চরিত্রে, ঘটনা উপস্থাপনা ও পরিণতিতে রামায়ণ অনুসরণ করা হয়নি। রামচন্দ্রের আশঙ্কা, বিভীষণের স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা, রামের দৈববাণী শোনা ও আকাশে সাপ-ময়ূরের যুদ্ধ দেখা, মায়া-লক্ষী সংলাম, বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণের মায়াবলে লঙ্কা প্রবেশ, নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণ, মেঘনাদকর্তৃক কোষা দিয়ে লক্ষ্মকে আক্রমণ ও ফলে তাঁর মূর্চ্ছা, মেঘনাদ-বিভীষণ সংবাদ, মায়ার যে- লক্ষ্মণের চেতনা লাভ ও দৈবাস্ত্রের সাহায্যে মেঘনাদকে তীক্ষ্মশরে বিদ্ধ করা, রক্তাক্ত মেঘনাদের উক্তি—'দুঃখ যে, একটি কাপুরুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে।'

---

* ১ম খণ্ড - ১ম সর্গ - ৫ম সর্গ, ১২৬৭ সন,
২য় খণ্ড - ৬ষ্ঠ সর্গ - ৯ম সর্গ ১২৬৮ সন
একে খণ্ডে ১৮৬১ খৃঃ

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

৩৩.৪ মূলপাঠ ঃ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা ; শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর[1] সংগ্রাম।
কতক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি,—
"কৃতকার্য আজি, দেব, তব আশীর্বাদে
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি, কাননে,
পুজিনু চামুণ্ডে[2], প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক ; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব ; মহোরগ[3] যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে!
পশিল কাননে দাস ; আইল গর্জিয়া
সিংহ ; বিমুখিনু তাহে ; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড় ; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এরে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী ; কৃতাঞ্জলি-পুটে
পুজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—'সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতীসুমিত্রাসূত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা[4] যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে[5] যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!'—কি ইচ্ছা তব, কহ,
নৃমণি? পোহায় রাতি ; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!"
উত্তরিলা রঘুনাথ, "হায় রে, কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, উর্দ্ধশ্বাসে

---

১. নশ্বর — নাশশীল, এখানে 'বিনাশক' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
২. চামুণ্ডে — কালীর নাম। ইনি ভয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেছিলেন বলে চামুণ্ডা নামকরণ হয়েছে।
৩. মহোরগ — মহাসর্প।
৪. নিকুম্ভিলা—লঙ্কার পশ্চিমদিকের গুহা বিশেষ, সেখানে অবস্থিতা দেবী।
৫. পিধানে—কোষে, খাপে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে,
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্যে ; শোনিতস্রোতঃ হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল[৬] মহীরে !
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে-
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
(হে বিধি ; কি দোষে দাস দোষী তব পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট ! কে আর আছে রে ?
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এ পরাণ আমি ? থাকি এ সংসারে ?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ ! কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা !”
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;
“কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরায় সে ত্রিভুবনে ! দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষী[৭] পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ[৮] ; শৈলবালা ধর্ম-সহায়িনী !
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে ! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু ! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা ? ধর্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম কার্য, আর্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে ?”
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র, —“যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস,[৯] অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী ;—‘হায় ! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ ! এ পাপ-সংসারে
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্বেষিণী
আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত[১০] গগনে কে কবে
হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব কর্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর ; পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই ! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার ! দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্বুররাজ[১১] ! উঠিনু জাগিয়া ;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্র[১২], দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু ! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে

---

৬. আর্দ্রিল—আর্দ্র, সিক্ত করল বা ভেজাল। ৭. সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র। ৮. বিরূপাক্ষ—শিব। ৯. বাসবত্রাস—বাসব বা ইন্দ্রের ভয়ের কারণ। ১০. জীমূতাবৃত—মেঘাচ্ছন্ন। ১১. কর্বুররাজ—(কর্বুর—রাক্ষস), রাক্ষসরাজ। ১২. বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র।

মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী !
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী ; ভাতিছে কেশে র-রাশি ;—মরি !
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ-নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পুজে দেব বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে !”
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে ;—
“স্মরিলে পূর্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে ! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?
হায়, সখে, মন্থরায় কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে
নির্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে !
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা ! উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা উর্মিলা বধু ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা ; — ‘নয়নের মণি
আমার, হরিলি, তুই রাঘব ! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে !
সঁপিনু এ ধন তোরে ! রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি !’
“নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে ! দুর্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গাদ, সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি ; নল, নীল ; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য ; তুমি মহারথী ;—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা !”
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;
“উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্য পানে !” দেখিলা বিস্ময়ে
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে[১৩]
ভৈরব আরবে[১৪] দেশ পুরিছে চৌদিকে !
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে,

---

১৩. ফণীর স্বননে—সর্প গর্জন শব্দে।
১৪. আরবে—শব্দে। রব > আরব, আরাব।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

হলাহল ! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজাগর[১৫]—বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলা রাবণানুজ ; —"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে !
নহে ছায়াবাজি[১৬] ইহা ; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;—
নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী !"
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইলা প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি—
সদৃশ ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময় ; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দ্বীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ[১৭] দুলিল
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্ধর ; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক ; মুকুটোপরি লড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরিপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি
কেশর ! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী-মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশমালী !
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে,
সমরতরঙ্গ যাবে উথলে নির্ঘোষে !
বাহিরিলা বীরবর, বাহিরিলা সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে !
বরিষলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা,
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে !
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিলা রঘুবর ; "তব পদ্মম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে ! ভুল না, দেরি, এ তব কিঙ্করে !
ধর্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙ্গা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,[১৮]
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে !
দুর্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেববলে, নিস্তারিণি ! নিস্তার অধীনে,
মহিষমর্দিনি, মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে !"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দাবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে[১৯] ; পবন অমনি।
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, তথাস্তু, বলি আশীষিলা মাতা।
হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী ! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিলা শর্বরী,

---

১৫. অজাগর - অজগর - বড়ো সাপ বিশেষ। ১৬. ছায়াবাজি—অলী মায়াজাল। ১৭. নিষঙ্গ—শরাধার, তূণীর।
১৮. মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে—শিবাপ্রিয়ে। ১৯. দিবিন্দ্র দিবে—দেবরাজ ইন্দ্র-স্বর্গে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

তারাদলে লয়ে সঙ্গে ; ঊষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে !
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী !
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা ;
"সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে
রামেব, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে
রথিবর ! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে-
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে !"
আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে[২০] বিভীষণ বলী।
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি ;
কাহারে ডরাও, প্রভু ? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে !"
বন্দি রাঘবেন্দ্র পদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে !
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা-
রক্ষঃকুলে-রাজলক্ষ্মী-রক্ষোবধূ-বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ দেউলে।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—
"কি কারণে, মহাদেবী, গতি এবে তব
এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি ?"
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে,[২১] তেজঃ তব আজি ;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে।—
কালানলসম তেজঃ তব, তেজস্বিনি ;
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি ! তার, বরদানে
ধর্মপথ-গামী রামে, মাধবরমণি !"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা ইন্দিরা ;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া,[২২] অবহেলে তব
আজ্ঞা ? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো স্মরিলে
এ সকল কথা ! হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার ? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ?
কহ সৌমিত্রের তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী — অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !"
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত ! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রম্ভাতরুরাজি ;
ভাঙিল মঙ্গলঘট ; শুষিলা মেদিনী
বারি রাঙা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, মিশা-অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কব-জালে !
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা ; হারাইলে, মরি !
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি !
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা,
আক্ষেপে, রে রক্ষপুরি, তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !
প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত

২০. মহেষ্বাসে—মহাধনুর্ধর (রামচন্দ্র)। ২১. নীলাম্বুসুতে—সমুদ্রে কন্যা—লক্ষ্মী। ২২. বিশ্বধ্যেয়া—বিশ্ববাসীর আরাধ্যা (মায়াদেবী !)।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

যেন দেব ত্বিষাম্পতি,[২৩] কিম্বা বিভাবসু
ধুমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী-
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্বার সমরে।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে ! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,
সুযোগপ্রয়াসী, কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র[২৪] ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে।
    বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া ! উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমূল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে।
    প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে ; কিন্তু কার কানে
পশিল আরাব ? হায় ! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে,
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে !
    সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত-
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য ; অজেয় সংগ্রামে।

কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে !
    হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভূকরূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেবড়নধারী,[২৫]
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ;[২৬] তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর-অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী ; বিশারদ রণে,
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস ! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল[২৭], বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে !—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে-
দেবলোভে, দৈত্যকুলে-মাৎসর্য ? কে পারে
গণিতে সাগরে র-, নক্ষত্র আকাশে ?
    নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজরাজগৃহ। ভাতে সারি সারি
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড় ; হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী। হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর ! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা,—“অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,

---

২৩. ত্বিষাম্পতি—সূর্য। ২৪. নক্র—কুমীর। ২৫. প্রক্ষেড়ন—লৌহময় বাণ, নারাচ। ২৬. স্যন্দন—রথ। ২৭. দেউল—< দেবকুল —দেবালয়, মন্দির।।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে।
ও হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?”
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ,—“যা কহিলে সত্য, শূরমণি !
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,
সাগরতরঙ্গ যথা ! চল ত্বরা করি,
রথিবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে !”
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য ! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষীগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি ! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে ! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে
ভীমকায় ; পদাতিক, আয়সী-আবৃত,
ত্যাজি ফুলশয্যা ; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা ; সাজাইছে বাজী
বাজিপাল ; গর্জি গজ সাপটে প্রমদে[২৮]
মুদগর ; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাতি ; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদোলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে !
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে,
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
ঊষা যথা ! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে
লইয়া ধাইছে ভারী ; — ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে, — “চল, ওহে উঠিগে প্রাচীরে।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে।” কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে,—“কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে
মুহূর্তে নাশিবে রামে অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী সভাতলে, চল সভাতলে।”
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে,
দেবাকৃতি, দেববীর্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ; —
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধূপদান ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরশে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি ! পাশে হেম-ঘন্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ; বসেছে, একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র, —কৈলাস গিরি। তব উচ্চ চূড়ে।

২৮. প্রমদে—প্রমত্ত হয়ে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘর বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশমালী!
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে!
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব,
প্রভাময়?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে!
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে!" যথা পথে সহসা হেরিলে
উর্দ্ধ ফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!
বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার ; শৃঙ্গাধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে[২৯] তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক? কি কৌতুক এ তব কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে!
নিঃশঙ্ক করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আইন রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমু, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই ; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি ;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালনল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শত্রুকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,-

২৯. প্রপঞ্চে—মায়ায়, ছলনায়।

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ;— কি আর কহিব ?"
জলদ-প্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায় মাঝারে[৩০] বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে ! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে ? মারি অরি যে কৌশলে !"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে !) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ ! নির্লজ্জ তুই ! ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ ! তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই ; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি !
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর ! কে তোরে হেথা আনিল দুর্মতি ?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে ! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে।
বহিল রুধির-ধারা ! ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ;—নারিলা তুলিতে
তাহায় ! কার্মুক[৩১] ধরি কর্ষিলা ; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ ! সাপটিলা কোপে
ফলক ; বিফল বল সে কাজ সাধনে !
যথা শুণ্ডধর[৩২] টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গাধর-শৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র ! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে !
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতল শূল হস্তে, ধূমকেতুসম[৩৩]
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণে রণে !
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে,
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে ! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ ? নিকষা, সতী তোমার জননী !
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ! শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী !
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে[৩৪] !"
উত্তরিলা বিভীষণ, "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্। রাঘবদাস আমি ; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে

---

৩০. আনায় মাঝারে—ফাঁদে বা জালের মধ্যে। ৩১. কার্মুক—ধনুক। ৩২. শুণ্ডধর—হাতি। ৩৩. ধূমকেতুসম—ধূমকেতুর মতো অমঙ্গল সূচক। ৩৪. আহবে—যুদ্ধে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

অনুরোধ ?” উত্তরিলা কাতরে, রাবণি ;—
“হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে !
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন মহাকুলে ?
কে বা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে, শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথিপ্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ? ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?”
মহামন্ত্র বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;
“নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি ! নিজ কর্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে !
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে ?”
রুষিলা বাসবত্রাস ! গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—“ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ; কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।”
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিল শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস-শরজালে বিঁধেন তারকে।
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী !
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ ঘন্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে,
সপ্তরথি-অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে !
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে ! সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী !
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথিবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে !
    ত্যাজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পুরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে !
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল !
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে !
    অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই ! শত ধিক্ তোরে !
রাবণনন্দন, আমি, না ডরি শমনে !
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে !
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে !
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি !
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি তোরে, রাবণ রুষিলে ?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,

কলঙ্কি ?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ ? লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে,—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে ?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায় ? মন্দোদরী, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী ?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী ?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী ? নিকষা সতী—বৃদ্ধা পিতামহী ?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলে ? উঠ, বৎস ! খুল্লতাত আমি
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক ? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার ! যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে !
হে কর্বুরকুলগর্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগৎনয়নানন্দ ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে ?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;
গর্জে গজরাজ, অশ্ব হেষিছে ভৈরবে ;
সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী[৩৫], উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম !
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে !"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা,—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি !
কি ফল এ বৃথা খেদে ? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি অপরাধ নহে
তোমার ! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া
ত্রিদশ-আলয়ে, শূর !" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র ধ্বনি—স্বপনে যেমনি
মনোহর ! বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দূলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় উর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে !
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরসে তরাসে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা
ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে !
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে,—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস,[৩৬] জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর ! গতজীব মেঘনাদ বলী
শত্রুজিৎ !" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে,—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,

৩৫. রক্ষঃঅনীকিনী—রাক্ষস সেনাদল। 'অনীকিনী' অক্ষৌহিনীর পূর্ববর্তী সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাপক। বাংলায় শব্দটি সৈন্যদল অর্থেই ব্যবহার হয়। ৩৬ রঘুবংশ—অবতংস-রঘুকুলের শিরোভূষণ (রাম)।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্য ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল ! পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম ! নিজবলে দুর্বল সতত
মানব ; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে !”
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ,—“শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গাল তুমি রক্ষোবেশে।
কিনিলে রাঘবকুলে আমি নিজগুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে !
চল সবে, পুজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী !” কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল,
“জয় সীতাপতি জয় !” কটক চৌদিকে,-
আতঙ্গে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে !

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

৩৩.৫ সারাংশ—১

ষষ্ঠ সর্গের মূল ঘটনা লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধ। দৈবাস্ত্র লাভ করবার পর লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কাছে সেটি কীভাবে পেলেন তা বর্ণনা করে। তিনি জানান লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডী বলেছেন দেবতারা সকলে তাঁর প্রতি প্রসন্ন। ইন্দ্র দৈবাস্ত্র পাঠিয়েছেন, সেগুলি তিনি লক্ষ্মণকে দিয়ে বলেন সে যেন বিভীষণের সঙ্গে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে মেঘনাদকে বধ করে। দেবী আরও বলেছেন, তাঁর কৃপায় তাঁরা অদৃশ্যভাবে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করতে পারবেন।

রামচন্দ্র বলেন, যে ভীষণ শত্রুর ভয়ে দেব-নর সকলেই ভীত, সেখানে লক্ষ্মণকে তিনি কেমন করে পাঠাবেন ? সীতা উদ্ধারের জন্য বৃথা চেষ্টা করে আর লাভ নেই। তিনি রাজ্য সম্পদ, বাবা-মা, বন্ধুবান্ধব সব হারিয়েছেন—বাকি ছিলেন সীতা, সেও রাবণ কর্তৃক অপহৃত, এখন একমাত্র লক্ষ্মণ আছেন, তাকেও যদি যুদ্ধে হারাতে হয়, এই আশঙ্কায় বলেন আর যুদ্ধে কাজ নেই।

রামের এই খেদোক্তিতে লক্ষ্মণ বলেন, দেবতা যেখানে সহায় যেখানে এই খেদ অনুচিত। তিনি যদি রামচন্দ্রের আদেশ পান তাহলে লঙ্কায় প্রবেশ করে মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবেন। সুতরাং দেবতাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করা ঠিক হবে না। বিভীষণও অনুরূপে বোঝালেন এবং বললেন স্বপ্নে দেবী তাঁকে আদেশ দিয়েছেন মেঘনাদবধ-এ লক্ষ্মণকে সাহায্য করতে। তবুও রামচন্দ্র আশ্বস্তবোধ করেননি। রামচন্দ্রের জন্য যে লক্ষ্মণ রাজ্যে, মা ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসেছেন সেই লক্ষ্মণের জীবন বিপন্ন করে তিনি কেমন করে সীতা উদ্ধারে পাঠাবেন ? তাই এ চেষ্টায় প্রয়োজন নেই। এমন সময় তিনি দৈববাণী শুনলেন, দেবাদেশ অবহেলা করা অনুচিত। আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দেখেন সাপ আর ময়ূরের এক যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধে ময়ূরের মৃত্যু হলে সাপ গর্জন করতে লাগল। বিভীষণ ব্যাখ্যা করে বললেন সাপের কাছে সর্পভক্ষক ময়ূরের পরাজয় ঘটেছে, তার অর্থই হল লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু হবে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

রামচন্দ্র আশ্বস্ত হয়ে লক্ষ্মণকে দৈবাস্ত্রে সাজিয়ে দিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণের সঙ্গে দ্রুত অদৃশ্যভাবে যাত্রা করলেন। মায়াদেবী রাক্ষসকুল-রাজলক্ষীর মন্দিরে প্রবেশ করে তাঁর তেজ সম্বরণ করতে অনুরোধ করলেন। রাজপুরলক্ষ্মী মায়াদেবীর সঙ্গে মন্দির ত্যাগ করে লঙ্কার পশ্চিমদ্বারের দিকে গেলেন। লঙ্কায় একের পর এক অঘটন ঘটতে লাগল।

মায়াবলে লক্ষ্মণের স্পর্শমাত্রে লঙ্কার সিংহদ্বার খুলে গেল, কেউ শব্দ শুনতে পেল না, এবং তাঁদের কেউ দেখতে পেল না। লঙ্কার অপরূপ ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে তাঁরা নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পৌঁছুলেন—সেখানে নির্জনে বিবিধ উপাচার বেষ্টিত হয়ে মেঘনাদকে ধ্যানে রত দেখতে পেলেন। লক্ষ্মণের অস্ত্রের শব্দে মেঘনাদের ধ্যান ভঙ্গ হল। লক্ষ্মণের রূপ ধরে অগ্নিদেবতার আবির্ভাব ঘটেছে মনে করে। এভাবে তাঁর আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে লক্ষ্মণ আত্মপরিচয় দিলেন এবং দেব অসি কোষমুক্ত করে মেঘনাদকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, মেঘনাদ বললেন, যদি সত্যই তাঁর যুদ্ধে সাধ জাগে তা পূর্ণ করবেন। কিন্তু নিরস্ত্রকে আক্রমণ করা বীরধর্ম নয়, তাই তাকে অস্ত্র-সজ্জিত হবার সুযোগ দেওয়া বিধেয়। লক্ষ্মণ বললেন রাক্ষসের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম পালন অর্থহীন—শত্রুকে যে কোনো উপায়ে বধ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। লক্ষ্মণের এ কথায় মেঘনাদ তার তীব্র নিন্দা করেন। এবং অবশেষে পূজার কোষা তুলে তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করেন। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে পড়লে তাঁর দৈবাস্ত্র কেড়ে নিতে গিয়ে পারলেন না, বুঝলেন এ হোল দেবতাদের ষড়যন্ত্র। দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন শূলধারী বিভীষণকে। বিষণ্ণভাবে মেঘনাদ বললেন, এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে লক্ষ্মণ এখানে প্রবেশ করেছেন। বিভীষণের এ হেন কাজের জন্য মেঘনাদ তাঁর নিন্দা করলেন। পিতৃব্যকে অনুরোধ করলেন পথ ছেড়ে দিতে, তাহলে তিনি অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র নিতে পারেন। বিভীষণ নিজেকে রামচন্দ্রের দাস বলায় মেঘনাদ তাঁকে ধিক্কার দিলেন। বিভীষণ লজ্জাবনত মুখে বললেন, তাকে ভর্ৎসনা বৃথা, রাবণের পাপের জন্যই সবংশে ধ্বংস হতে চলেছেন। মেঘনাদ তখন বললেন হীন সংসর্গে থাকার জন্যই আজ বিভীষণ এতই অধঃপতিত হয়েছেন যে, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন।

এদিকে মায়ার যে- লক্ষ্মণ চেতনা পেয়ে মেঘনাদকে তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করতে লাগলেন। মেঘনাদের দেহ থেকে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে মাটি লাল হয়ে গেল। বেদনায় অস্থির মেঘনাদ একের পর এক পূজাপাত্র লক্ষ্মণের দিকে নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু মায়ার প্রভাবে তা তাঁর গায়ে লাগল না। গর্জন করে লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হলে মায়ার বলে দেখলেন দেবতারা লক্ষ্মণকে আঁড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখে হতাশ হলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ দৈব-অসি দিয়ে মেঘনাদকে আঘাত করলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। পৃথিবী কেঁপে উঠল, সমুদ্র উদবেল হল, ভৈরব রবে বিশ্ব পূর্ণ হল। রাজসভায় রাবণের মাথার সোনার মুকুট খসে পড়ল। প্রমীলা ভুলে অকস্মাৎ কপালের সিঁদুর মুছে ফেললেন, মন্দোদরী বিনা কারণে মূর্ছিত হলেন, রাক্ষস শিশুরা কেঁদে উঠল।

মৃত্যুপথযাত্রী মেঘনাদ বললেন তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না, কিন্ত একটি কাপুরুষের হাতে তাঁর মৃত্যু হচ্ছে, এটিই তাঁর দুঃখ। লক্ষ্মণকে দেবদৈত্য মানব কেউই শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারবেন না, তাঁর অপযশ কোনো কালে ঘুচবে না।

মেঘনাদের মৃত্যুতে বিভীষণও শোকার্ত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মেঘনাদের মৃত্যুতে বিভীষণের কোনো হাত নেই, বিধির বিধানেই সব ঘটেছে। এখন অনতিবিলম্বে ফিরে গিয়ে রামচন্দ্রের উৎকণ্ঠা দূর করা কর্তব্য। অবশেষে তাঁরা রামচন্দ্রের কাছে ফিরে গিয়ে মেঘনাদ নিধনের সংবাদ দিলে, রামচন্দ্র তাঁদের সাধুবাদ ও বিভীষণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শঙ্করীর পূজা করতে

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

বললেন। আকাশে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন, 'জয় সীতাপতির জয়' ধ্বনিতে লঙ্কার অধিবাসীরা সচকিত হল।

৩৩.৬ মেঘনাদবধ কাব্য (ষষ্ঠ সর্গ) ঃ শব্দার্থ, টীকা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তজি সে উদ্যান — লঙ্কার যে উদ্যানে 'চণ্ডীর দেউল' আছে, সেখানে দেবীর কাছ থেকে বর লাভ করে সুমিত্রা পুত্র লক্ষ্মণ সেই উদ্যান ত্যাগ করে রঘু-রাজ রামচন্দ্রের শিবিরের দিকে গেলেন।

নীলোৎপলাঞ্জলি — নীলপদ্ম দিয়ে লক্ষ্মণের দেবীর অর্চনার বিষয়টি কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের অকাল বোধনের ঘটনা থেকে পরিকল্পিত।

নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি — সীতা উদ্ধারের জন্য মেঘনাদ ও রাবণ বধ প্রয়োজন। কিন্তু মেঘনাদ যে রকম পরাক্রমশালী, ভাই লক্ষ্মণকে পাঠালেন, তাঁর জীবনশঙ্কা আছে। তাই লক্ষ্মণের প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁকে বিনাশের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেয়ে সীতা উদ্ধারের চেষ্টা না করার কথা বলেছেন। দেবানুগ্রহ ও দৈবাস্ত্র পাওয়া সত্ত্বেও, ভাইয়ের প্রতি মমত্ব ও মেঘনাদের দুর্বার শক্তির পরিচয় তুলে ধরবার জন্য এ অংশ পরিকল্পিত হয়েছে মনে করা যায়। কিন্তু এর ফলে মেঘনাদের বীর্যবত্তার পরিচয় পেলেও রামচন্দ্রের চরিত্রমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কুক্ষণে ভুলি আশার ছলনে — রামের এই হতাশা ও বিলাপের সাহায্যে পরোক্ষে মেঘনাদ-এর গৌরব বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আছিল, ডরায় পালিস প্রভৃতি লোকায়ত শব্দ মধূসূদন অনায়াসে মহাকাব্যেও প্রয়োগ করেছেন।

উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী — লক্ষ্মণকে এখানে রামচন্দ্রের চেয়ে পৌরুষ-সম্পন্ন করে আঁকা হয়েছে।

কালমেঘসম দেবক্রোধ — দেবতাদের বিরূপতার কারণে স্বর্ণলঙ্কার দীপ্তি মেঘছায়াবৃত হয়েছে—অর্থাৎ লঙ্কার স্বাভাবিক শোভা অন্তর্হিত হয়েছে।

দেবহাস্য উজলিছে — দেবতারা যে রামচন্দ্রের প্রতি সুপ্রসন্ন, তা বোঝা যায় রামচন্দ্রের শিবিরের উজ্জ্বলতায়।

কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাত — পবিত্র ও শুভকর্মের প্রতীক মঙ্গল ঘট। তাকে কেউ পদাঘাতে ভাঙে না। দেবানুগ্রহ পেয়েও মূঢ়ের মতো কেউ তাকে ভীতিবশে প্রত্যাখ্যান করে না।

স্মারিলে পূর্বের কথা — ইতোপূর্বে দুবার মেঘনাদের যে বীরত্বের পরিচয় পেয়েছেন, তা মনে হলে।

নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি — বিভীষণকে সম্বোধন করে রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের আর প্রয়োজন নেই বলেছেন, প্রধানতঃ মহাবিক্রমশালী ইন্দ্রজিতের কাছে লক্ষ্মণের পরাভাবের সম্ভাবনার কাথ ভেবে। এই সর্গের প্রথমদিকেও এ ধরনের উক্তি আছে।

দেবাকৃতি, দেববীর্য — রামচন্দ্রের বানর সৈন্যরাই এ সংকটে একমাত্র সহায়। তাই বানরদের 'rabble' বললেও এখানে তিনি তাদের অসামান্য মহিমাকে স্মরণ করেছেন—বলেছেন, তারা দেবতাদেরই মতো শক্তিধর।

আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী — আকাশ থেকে সৃষ্ট বাণী ; দৈববাণী।

অহিসহ যুঝিছে অম্বরে শিখী — আকাশে সাপের সঙ্গো ময়ূরের যুদ্ধ হচ্ছে। এই চিত্রকল্পটি ইলিয়াড কাব্যের অনুসরণে সৃষ্টি করা হয়েছে।

জ্বলিছে মাঝে কালানলতেজে হলাহল — যুদ্ধে রত সাপের মুখ থেকে তীব্র বিষ প্রলয়ংকর আগুনের মতো আকাশে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিরদ-রদ-নির্মিত — হাতির দাঁতে তৈরি।

কালানল সম তেজঃ তব...... এ নগরে ? — শক্তিময়ী তোমার উজ্জ্বল দীপ্তি যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ শত্রু মনোভাব নিয়ে কে লঙ্কায় প্রবেশ করতে পারবে। অর্থাৎ লঙ্কার রাজলক্ষ্মী যতক্ষণ প্রসন্ন তখন কারও পক্ষে রাবণ তথা লঙ্কার ক্ষতি করতে পারবে না।

প্রাক্তনের গতি — পূর্বকৃত কর্মফল — অদৃষ্ট।

বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা — লক্ষ্মীদেবীর তেজ সংবরণের ফলে যে বৃষ্টিপাত হয়েছিল, তা আসলে বৃষ্টি নয়— লঙ্কার আসন্ন বিপদে আকাশের অশ্রু বর্ষণ।

বিরূপাক্ষ ; তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিক্ষুর — এরা সকলেই রাক্ষস সেনাপতি।

দৈত্যকুল-মাৎসর্য — দৈত্যদের ঈর্ষার বস্তু।

মগাশীসঞ্জিনী — মৃগনয়না সুন্দরীদের গর্বহারিণী।

আয়সা-আবৃত — লৌহনির্মিত বর্ম দিয়ে আচ্ছাদিত।

সাষ্টাঙ্গে প্রণমিশূর—ইত্যাদি — সুরক্ষিত লঙ্কার সুরক্ষিততর যজ্ঞগৃহে প্রতিপক্ষ লক্ষ্মণের প্রবেশ কল্পনাতীত। দেহকান্তি-শোভিত লক্ষ্মণকে দেখে দেবতা লক্ষ্মণের রূপধারণ করে তাকে বর দিতে এসেছেন মনে করে ইন্দ্রজিৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সাষ্টাঙ্গ (স-অষ্ট + অঙ্গ)—জানুদ্বয়, পদদ্বয়, করদ্বয়, বক্ষ, শির, বুদ্ধি, বাক্য ও দৃষ্টি অথবা দুই জানু, দুই পা, দুই হাত, হৃদয় ও ললাট — এই আটটি অঙ্গ।

রৌদ্র দাশরথি — রুদ্রের মত ভয়ঙ্কর লক্ষ্মণ।

পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে — ধার্মিক নলরাজার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কলি তার শরীরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে চেষ্টা করেও অনেকদিন কোনো সুযোগ পায়নি। নল একদিন ভুলে অশুচি অবস্থায় সন্ধ্যা করায় কলি তাঁকে আশ্রয় করে তাঁকে রাজচ্যুত এবং স্ত্রী দময়ন্তী থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অনুরূপে মেঘনাদের হলেও প্রতিদিন কোনো ভয় স্থান পায়নি। আজ যজ্ঞশালায় লক্ষ্মণকে দেখে তাঁর মনে ভয় হল। এ থেকেই মেঘনাদের বিনাশ সম্ভাবনা হল।

শত্রু করে যথা ইরম্মদনয় বজ্র — ইন্দ্রের হাতে বজ্রের শক্তিতে পূর্ণ যে বজ্র হাতে তারই মতো চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ দীপ্তিময় ভয়ঙ্কর তরোয়াল তুলে ধরল।

ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালি ইত্যাদি — লক্ষ্মণের এ হেন উক্তি তাঁর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করেছে। পক্ষান্তরে মেঘনাদের বীরত্বপূর্ণ শান্ত সংযত ও শিষ্ট আচরণ তাঁর চরিত্রমহিমাকে বাড়িয়েছে। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'—বীরের কথা নয়। এই উক্তি লক্ষ্মণ চরিত্রকে করেছে, সেই সঙ্গো মেঘনাদকে উজ্জ্বল করেছে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি — রাত্রির নিস্তব্ধতায় আকাশের মেঘের ক্রুব্ধ গর্জন যেমন গম্ভীর শোনায়। সেই রকম গম্ভীর কণ্ঠে।

স্থাপিলা বিধুরে বিধি ..... ধূলায় ? — মহাদেবের ললাটের চাঁদের সঙ্গো তুলনার বিষয় রাক্ষসবংশের মর্যাদা। বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের দাসত্ব স্বীকার করায় রাক্ষসবংশের মর্যাদা। বিভীষণ কর্তৃক রামচন্দ্রের দাসত্ব স্বীকার করায় রাক্ষসবংশের মর্যাদা ধুলায় লুটিয়ে দেওয়া হয়েছে — মেঘনাদের এটি বক্তব্য। 'যান গড়াগড়ি' শব্দযুগল বক্তব্যটিকে পাঠকের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গো মিলিয়ে দিয়েছেন। মধুসূদন লোকায়ত শব্দকে এভাবে অনায়াসে প্রয়োগ করে, প্রথাসিদ্ধ শব্দ বিন্যাসে স্বাভাবিকতা এনেছেন।

কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! — বিভীষণের রাক্ষসরাজ-পক্ষ পরিত্যাগের মতো নিন্দনীয় কাজের জন্য গঞ্জনা করতে গিয়ে মেঘনাদের মনে পড়ে, হীনমতি রামের সংসর্গেই এরকমটি ঘটেছে। সংসর্গজনিত হীনতা ভর্ৎসনায় দূর হবে না। তাই বিভীষণকে ধিক্কার দেওয়া বৃথা। নীচ ব্যক্তির সংস্পর্শে চরিত্রের অবনতি ঘটে। এই সাধারণ সত্যটির উল্লেখ করে, রামের সংসর্গেই বিভীষণের এমনটি ঘটেছে। মেঘনাদ বোঝাতে চেয়েছেন।

বামেতর নয়ন — বামভিন্ন অন্যতর নয়ন অর্থাৎ দক্ষিণ নেত্র। লোকপ্রচলিত বিশ্বাস স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ও পুরুষের বা চোখ কাঁপা অমঙ্গালের সূচক।

মূর্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী আচম্বিতে — সন্তান যে যত দূরেই বা যেখানেই থাকুক তার কোনো বিপদ ঘটলে, মা অন্তরে তার আভাস পান। যজ্ঞশালায় মেঘনাদের পতনে জননী মন্দোদরী অন্তঃপুরে নিজের ঘরে অকস্মাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

বাজিছে মঙ্গালবাদ্য ইত্যাদি — মেঘনাদবধ যে দেবতার ইচ্ছায় ঘটেছে এবং সেই কারণেই দিব্য বাদ্যধ্বনি দেবতাদের আনন্দ জ্ঞাপন করছে। একথা বলে, তিনি ধর্মপরায়ণ বিভীষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন।

কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র ইত্যাদি — পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রোণবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য, পুত্র অশ্বত্থামা রাত্রে গোপনে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর ঘুমন্ত পাঁচটি ছেলেকে বধ করে যে আনন্দ ও ভয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিলে, সেইভাবে।

আতঙ্গো কনকলঙ্কা জাগিল যে রবে — মেঘনাদকে বধ করে লক্ষ্মণ শিবিরে ফিরলে রামচন্দ্রের সৈন্যরা 'জয় সীতাপতি জয়' ঘোষণা করলে লঙ্কার অধিবাসীদের সেই ধ্বনি সন্ত্রস্ত করে তোলে।

এই সর্গটিতে কবি তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্যে মেঘনাদ চরিত্রটিকে সবিশেষ মহিমান্বিত করেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায় কবি এখানে ততোধিক অনুদার—তাঁর মহিমা নানাভাবে খর্ব করেছেন। মেঘনাদ এখানে শৌর্যে-বীর্যে ও পৌরুষে যেমন উজ্জ্বল, লক্ষ্মণ তেমনি হীন, অমানুষ। দৈববলে বলীয়ান লক্ষ্মণের মেঘনাদ বধ এক অগৌরবের কাজ। সর্গের মূল ঘটনা রামায়ণ বহির্ভূত না হলেও কাহিনী গ্রন্থনা পূর্বাপর রামায়ণ অনুসারী নয়। লক্ষ্মণ চরিত্রের কাপুরুষতা দুর্বলতা রামায়ণ বিরোধী। সর্গ-বর্ণিত রামচন্দ্রের সাপ-ময়ূরের যুদ্ধ দর্শন ইলিয়াড কাব্যে হেক্টরের আকাশে ঈগল পাখির সঙ্গো সাপের যুদ্ধ দর্শনের প্রভাবে রচিত।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

অনুশীলনী — ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬০ পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেত দেখুন। যেগুলি ভুল হবে, এককের উপরের অংশগুলি আরও ভালো করে পড়লেই সংশোধন করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) __________ সদৃশ

__________ বেড়িল দেশ, পুড়িল চৌদিকে

__________ ; কতক্ষণে নিবিলা আপনি

__________ ; বায়ুদেব গেল চলি দূরে।

খ) বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিলা সাথে

বীরবেশে __________, __________ রণে।

বরষিলা __________ দেব ; বাজিল আকাশে

__________ ; শূণ্যে নাচিলা __________,

স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল পুরিল __________ ।

গ) মধুসূদনের জন্ম __________ শে __________ ১৮২৪ ; মৃত্যু ২৯শে __________ __________ ।

ঘ) __________ পরাজিত হলেন। __________ পরায়ণা __________ শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন।

ঙ) মধুসূদন __________ সালে দুটি প্রহসন __________ ও __________ এবং পূর্ণাঙ্গা নাটক __________ রচনা করেন।

২) সঠিক উত্তরে টিক (✔) চিহ্ন দিন।

ক) মধুসূদন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন —

১। ১৮৪৮

২। ১৮৪৩

৩। ১৮৫৬

খ) মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা কাল —

১। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ

২। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ

৩। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

গ) মধুসূদন লাতিন শেখেন — ১। মাদ্রাজে
২। হিন্দু কলেজে
৩। বিশপস কলেজে

ঘ) মধুসূদনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ — ১। হেক্টর বধ
২। মায়াকানন
৩। বিষ না ধনুর্গুণ

৩) নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন।

মহোরগ, পিধানে, আর্দ্রিল, জীমূতাবৃত, বিভাবসু, বায়ুসখা, অবিচয়ি, কাকোদর, পরুষ, অনীকিনী, অবতংস, কার্মুক।

৪) নীচে কয়েকটি শব্দ ও অর্থ দুটি সারিতে বিন্যস্ত আছে। শব্দের সঠিক অর্থটি চিহ্নিত করুন।

বাদিএ	—	কার্ত্তিকেয়
কাদম্বিনী	—	বৃষ্টি
স্কন্দ	—	কুমীর
দিবিন্দ্র	—	মেঘরাজ
নক্রু	—	আকাশ
আনায়	—	মেঘমালা
আহবে	—	সংগ্রামে, যুদ্ধে
জীমূতেন্দ্র	—	জাল
আসার	—	ইন্দ্র
শব্দবাহক	—	বাজনা

৫) নীচের প্রশ্নগুলির প্রাসঙ্গিক উত্তর দিন।

ক) 'নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি'—কথাটি কে বলেছেন ? কেন বলেছেন ? বক্তা সম্পর্কে আপনার ধারণা সংক্ষেপে লিখুন।

খ) মূলপাঠ অবলম্বনে রাবণের পাঁচজন সেনাপতির নাম উল্লেখ করুন।

গ) 'সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর'—কে, কাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণা করেছেন এবং কেন করেছেন ? বুঝিয়ে লিখুন।

ঘ) 'ক্ষাত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব'—বক্তা কে ? বক্তা একথা কেন বলেছেন ? বক্তা সম্পর্কে আপনার অভিমত লিপিবদ্ধ করুন।

ঙ) 'আতঙ্কে কনক লঙ্কা জাগিল সে রবে'—কনকলঙ্কা আতঙ্কে জেগে উঠল কেন ? বুঝিয়ে দিন।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13 Pm6.5\1st proof

৩৩.৭ মহাকাব্য ঃ স্বরূপ ও বৈচিত্র্য

মধুসূদন দত্তের অন্যতম অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। ‘মেঘনাদবধ’ বাংলা সাহিত্যে প্রথম ও এ পর্যন্ত রচিত সফলতম কাব্যকৃতি। এই কাব্যের অনুসরণে পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি মহাকাব্য লেখা হলেও মধুসূদনের মহাকাব্য অর্জনকারী কবিপ্রতিভাকে আর কেউ অতিক্রম করতে পারেননি।

মধ্যযুগে রাজা বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষণায় সংস্কৃতি রচিত রামায়ণ মহাভারত কাব্যের অংশত বা সমগ্রত অনুবাদ হয়েছে। সেগুলি ছিল ভক্তিমূলক বা বীরত্বজ্ঞাপক কাহিনীর বঙ্গীয় সংস্করণ। বস্তুতঃ এগুলি সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শিল্প রূপ বা মৌলিক সৃষ্টি নয়। মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ সাহিত্যিক মহাকাব্যের (Literary epic) আদর্শে সৃষ্ট। এটি থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার প্রবর্তনা ঘটেছে।

মহাকাব্যই বোধ হয় সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা। ইলিয়াড-ওডিসি, রামায়ণ-মহাভারত, বিউলক প্রভৃতি মহাকাব্যগুলি জাতীয় জীবনের সহস্ররূপকে তুলে ধরেছে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘এপিক (Epic) গ্রিক ‘এপস’ (Epos) শব্দ থেকে এসেছে। এখানে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী থাকে, যে ভাষাতেই লেখা হোক, তা বিষয় ও ভাষায় মহত্বের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। এ শ্রেণির রচনায় একটা বিশালতা, বিস্তৃতি, ঔদার্য ও সর্বজনীনতা থাকে। এই বিরাটত্ব ও বিস্তৃতি পাঠক হৃদয়ে এক মহিমান্বিত ভাবের সঞ্চার করে। মহাকাব্যে কবির ব্যক্তিগত প্রকাশের পরিবর্তে ব্যাপকতর সমাজ, গোষ্ঠী, জাতির ঐতিহ্য ও চিন্তাভাবনা পরিচয় পাওয়া যায়।

‘পোয়েটিকস্’ রচয়িতা অ্যারিস্টোটল ট্র্যাজেডির পাশাপাশি মহাকাব্যেরও লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। এখানেও কাহিনীর আদি-মধ্য-অন্ত থাকে এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে নানা উপাখ্যান যুক্ত হতে পারে। এ শ্রেণির কাব্যের ছন্দ ও ভাষারীতি ওজোগুণ সম্পন্ন। এখানে উপমার ঐশ্বর্য কখনও কাহিনীর গতি অবরুদ্ধ করলেও আবেগের গভীরতা ও বিস্তৃতি ঘটায় কাব্যের উপস্থাপনায় বস্তু নিষ্ঠা যেমন তেমনি চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য কিছু অলৌকিকত্ব ও কাব্যসম্মতভাবে থাকতে পারে। এপিক শ্রেণির রচনায় দেবতা ও মানুষ একসঙ্গে সক্রিয় থাকে, এখানে নায়ক হন জাতীয় বীর। উদাহরণ হিসেবে মেঘনাদ বধ-এর পূর্বমুহূর্তে মেঘনাদ কর্তৃক লক্ষ্মণকে আক্রমণের বর্ণনায় এই পরিচয় পাওয়া যায়—

অধীন ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘন্টা, উপহার পাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিতা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রক্ষী, নিরস্ত্র সমরে,
সপ্তরথি অস্ত্রবসে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে।
সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষণ পানে গর্জি ভীম নাদে,
প্রহারয়ে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

আলংকারিক বিশ্বনাথ 'সাহিত্যদর্পণে' মহাকাব্যের কতকগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন, যেমন এতে অষ্টাধিক সর্গ থাকবে। প্রতিটি সর্গে যে কথা প্রাধান্য পাবে সেই কথা বা তাৎপর্য অনুসারে এটির নামককরণ হবে। বিভিন্ন সর্গ একই ছন্দে লেখা হবে। এ ছাড়া মহাকাব্যের নায়ক যিনি হবেন তিনি কোনো দেবতা বা সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। রচনা অলঙ্কার এবং রসভাব-সম্বলিত হবে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের যে কোনো একটি মহাকাব্যের অঙ্গী বা প্রধান রস হবে অন্য রসগুলি মূল রসকে পুষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া আরও কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন আলংকারিকেরা। আলোচনায় সেগুলি বাহুল্য বিচারে উল্লেখ করা হল না।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দেশে যে লোকগাথা কিংবদন্তি রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী নানাভাবে ও ভাষায় লোকজীবনে বহুল প্রচলিত ছিল, সেগুলি থেকে উপাদান নিয়ে জাতীয় জীবনের একটি সংহত রূপ নিয়ে মহাকাব্য প্রকাশিত হয়েছে। ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত এভাবেই গড়ে উঠেছে। এগুলিকে তাই স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্য (Epic of growth বা authentic epic) বলে। পরবর্তী যুগের সাহিত্যক মহাকাব্য (literary epic) সঙ্গে এই শ্রেণির কাব্যের সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত পার্থক্য আছে। প্রথমোক্তটির কবিকল্পনায় আদিম মানবসভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে। এ কাব্যের কবি কল্পনায় সরলতা ও প্রত্যক্ষতার পরিচয় থাকে। বিষয়বস্তু ও চরিত্র-পরিকল্পনায় গৌরব মহিমা (sublimity) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই এর কাহিনীর কেন্দ্রে থাকে কোনো বীরত্ব উদ্দীপণাপূর্ণ যুদ্ধ এবং একজন বীরনায়ক এই কাহিনীর মেরুদণ্ডরূপে অবস্থান করেন। এর গঠনরীতি স্থাপত্যধর্মী হলেও ট্র্যাজেডির তুলনায় অসংহত, কিছুটা শিথিল। ঋজুতাহ এর কল্পনার বৈশিষ্ট্য।

সাহিত্যিক মহাকাব্য সচেতন শিল্পীর রচনা—এখানে তাঁর তীক্ষ্ণ ও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টির প্রভাব অনুভব করা যায়। এখানেও নায়ক বীর, চরিত্রমহিমায় অনন্য। সে যুগের মানব মহিমার চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল বিজয়ীর সম্মান ও জয়মাল্যে। ধর্ম, চরিত্র নীতি ও সমাজনীতির কাছে তার শৌর্যবীর্যের মান্যতা ছিল। তাই সাহিত্যিক মহাকাব্য কেবলমাত্র বীরকাব্য নয়—কিছু পরিমাণে জাতীয় কাব্য। ভার্জিল, মিল্টনের মতো মধুসূদনের কাব্যে মেঘনাদ ও রাবণের প্রতিরোধ-শক্তি এবং দেশরক্ষার ক্ষেত্রে তাদের আত্মমর্যাদা জ্ঞানের বলিষ্ঠ প্রকাশ যুগধর্মকেই প্রকাশ করেছে। মধুসূদন রামায়ণ কাহিনীর যে নির্বাচিত অংশকে কাব্যরূপ দিয়েছেন তাতে নবজাগ্রত মানবিকবোধ ও আত্মগরিমার যোগ আছে। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক সাধারণ বীর নয়, জাতীয় বীর। তাঁর বীরত্ব কেবল দেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি-সম্মান আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বৃহত্তর জাতীয় মঙ্গালাদর্শে ব্যয়িত হয়েছে। সাহিত্যিক মহাকাব্যের কবি, যেহেতু তাঁর যুগ পরিবেশের সৃষ্টি, যুগের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত, তাই তাঁর মহাকাব্যও সমসাময়িক যুগের সমাজ-মনের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রসঙ্গাত দেশি বিদেশি সাহিত্যিক মহাকাব্য কালিদাসের কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ; ভার্জিনের 'ইনিড', তাসসোর 'জেরজালেমের উদ্ধার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ব্যঙ্গা মহাকাব্য (Mock epic, mock heroic epic) শব্দটির সঙ্গো মহাকাব্য শব্দ যুক্ত থাকলেও এটি বস্তুত বীরত্বব্যঞ্জক কাব্যের বিদ্রুপাত্মক অনুকরণ। অতিশয় তুচ্ছ বিষয় বস্তু নিয়ে এ ধরনের কাব্যে ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনায় গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশ থাকে। আলেকজাণ্ডার পোপের 'দি রেপ অফ দি লক' এক সময় হোমারের নামে চালিত একটি ছদ্ম মহাকাব্যের অনুসরণে রঙ্গালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভেক-মূষিক যুদ্ধ', জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' এই পর্যায়ভুক্ত। সাহিত্য হিসেবে এগুলির কোনো স্থায়ী মূল্য না থাকলেও সমকালীন পটভূমিকায় এর কিছু জনপ্রিয়তা থাকে।

মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃত্রসংহার (১৮৭৫) মহাকাব্য প্রকাশ করেন। মধুসূদনের বীরভাবপ্রধান কাব্যের মধ্যে অন্তর্গূঢ় করুণ রসের অন্তঃসলিল প্রবাহে কাব্যের বিষয়বস্তুকে হৃদয়বেদ্য করেছেন। ঘটনার ঘনঘটার সঙ্গো বীর রসপ্রধান যুদ্ধায়োজনের প্রেক্ষাপটে এই রসসৃষ্টি কাব্যশিল্পের প্রয়োজনে এসেছে। হেমচন্দ্র কাব্যের ঘটনাসংঘট্টের নীরসতা দূর করবার জন্য আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে রোমান্টিক সুরের অবতারনা করেছেন। ফলে লৌকিক প্রেমকাব্যের মূল গতি মহাকাব্যের প্রবাহের সঙ্গো অন্বিত হয়নি।

অপরদিকে মধুসূদনের কবিচিত্তের সহানুভূতিতে রাবণ-মেঘনাদ, লঙ্কা ও রাক্ষসকুল অভাবনীয় মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে। কিন্তু 'বৃত্রসংহার' কাব্যে কবির সহানুভূতি কোন্ দিকে তা সহজে বোঝা যায় না। কাব্যে বৃত্র ও অসুরকুল, ইন্দ্র ও দেবকুল প্রায় সমান গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু বৃত্র নিধন এ কাব্যের প্রধান বিষয়, কাব্যের সমাপ্তি তার পতনে—পতন চিত্রই কবির বর্ণনীয় বিষয়। বৃত্রের পতনে কাব্যে কোন ট্রাজিক রস সৃষ্টি হয়নি ; তার পতনে পাঠকের ভাবলোকে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। 'মেঘনাদবধ কাব্য' এদিক থেকে বৃত্রসংহারের তুলনায় সার্থকতর সৃষ্টি। মেঘনাদবধে রাবণের শোকক্লিষ্ট বিদীর্ণ হৃদয়, মন্দোদরীর শোকব্যাকুল চিত্ত ও সর্বোপরি লঙ্কার হাহাকার ট্র্যাজেডিকেই প্রকাশ করেছে।

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী মহাকাব্য রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬)-এ শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রতের তিনটি পর্ব বর্ণিত হয়েছে। রৈবতকে সূত্রপাত, কুরুক্ষেত্রে জটিলতা ও বিস্তার প্রভাসে পরিণতি। কবি নীরস বর্ণনায় কাহিনী বিবৃত করেছেন। স্থানে স্থানে কাহিনী সূত্র ধরে রাখবার জন্য 'তত্ত্ব' নিয়ে এসেছেন, কখনও বা লঘু রোমান্টিক আখ্যানসূত্র। নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তু প্রায়শই প্রবন্ধের উপযোগী হয়েছে। একারণে তাঁর কৃষ্ণ চরিত্র পরিকল্পনায় কৃষ্ণের আদর্শ মতবাদকে চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, কৃষ্ণ চরিত্রকে গৌণ করে কাব্যে কৃষ্ণের আদর্শ প্রাধান্য ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। কবি তখনই সফল যখন তিনি কোন আদর্শকে চরিত্রের জীবনে ও ব্যক্তিত্বে সত্য করে ফুটিয়ে তোলেন। জীবনের সঙ্গো তত্ত্বের মিলন ঘটান। মধুসূদন পেরেছেন তাই সফল। নবীনচন্দ্র তা পারেননি।

৩৩.৮ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ কাহিনী বিন্যাস (ষষ্ঠ সর্গ)

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আখ্যানভাগ রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক রাবণপুত্র মেঘনাদ নিধন এর বর্ণনীয় বিষয়। ষষ্ঠ সর্গের বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভর্ৎসনা, রামায়ণ থেকে নেওয়া মেঘনাদের মৃত্যুর পর বিভীষণের বিলাপ বাঙালির রামায়ণী সংস্কারের প্রভাবজাত। রাম এখানে অনেকটা আবেগপ্রবণ বাঙালি। চণ্ডীর বর ও দৈবাস্ত্র লাভ করে লক্ষ্মণ মেঘনাদ বধার্থে লঙ্কায় যাওয়ার প্রস্তাব করলে লক্ষ্মণের অমঙ্গাল আশঙ্কায় রামচন্দ্র যখন বলেন "নাহি কাজ,—সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাসে' ।—তখন তাঁকে কৃত্তিবাসের প্রভাবে দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ রূপেই দেখি। সম্ভবত এ জন্যই মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবে রাবণ-ইন্দ্রজিৎকে ভিন্নতর ধাতুতে গড়েছেন। শৈশব স্মৃতির রামায়ণ-মহাভারত তাকে টানত, ইলিয়াড-ওডিসির কাহিনী তাঁর কল্পনাকে উত্তেজিত করত। তাই মেঘনাদবধে রামায়ণের মহৎ ও স্নিগ্ধতার সঙ্গো ইলিয়াডের দীপ্ত শৌর্যের সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনতর শিল্পসৃষ্টি করেছেন। মেঘনাদবধের কেন্দ্রীয় ঘটনা মেঘনাদের মৃত্যু। এটি কাব্যকাহিনীর শীর্ষ। প্রথম দুটি সর্গে কাব্যের চরিত্রগুলির বহুমুখী বিকাশ ও দেবতাদের ষড়যন্ত্র, আর এই সর্গ কাব্যের চরম মুহূর্তটিকে তুলে ধরেছে। ষষ্ঠ সর্গের কাহিনী বিশ্লেষণে তাই, প্রথম থেকে ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া দরকার। কাব্যের শেষ তিনটি সর্গ ক্রমাবণতির মধ্য দিয়ে পরিণতিতে পৌঁছেছে।

M#2\D:\EEG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

মেঘনাদবধ কাব্যের ঘটনাকালে তিনদিন দুই রাত্রিতে সীমাবন্ধ। একে কবি নয়টি সর্গে বিভক্ত করে উপস্থিত করেছেন। প্রথম সর্গের সূচনা দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণের খেদ ও যুদ্ধের উদ্যোগ ঘোষণা এবং সংবাদ পেয়ে প্রমোদকানন থেকে মেঘনাদ রাজসভায় এসে স্বয়ং যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা, অনেক আশঙ্কা এবং একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষেকে প্রথম সর্গের সমাপ্তি। দ্বিতীয় সর্গে দেব কাহিনী—মুখ্যত মেঘনাদের হত্যার ষড়যন্ত্রের পশ্চাৎপট। মূল ঘটনার সঙ্গো এর যোগ ঘনিষ্ঠ। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ। শুধু বীরের মৃত্যুতে হাহাকার তীব্রতা পায় না। পাঠকের চিত্তে সহানুভূতি জাগাতে পারে না। এখানে মেঘনাদ শুধু বীর নন, পিতামাতার স্নেহে, স্ত্রীর প্রেমে সম্পূর্ণ মানুষ। প্রমীলাল স্নিগ্ধ প্রেম ও তার বীরাঙ্গানা রূপ তাঁকে পূর্ণতা দিয়েছে। সমাগম নামে এই সর্গ এখানে তাই প্রাসঙ্গিক। চতুর্থ সর্গে সীতা-সরমা চরিত্রের উপস্থাপনা করে পরোক্ষভাবে রাবণ প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পঞ্চমসর্গ সবিশেষ ঘটনাবহুল। মেঘনাদ বধ-এর সঙ্গো এর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। চিন্তান্বিত দেবরাজ, মায়াদেবীর উপস্থিতি, রক্ষকুলচূড়ামণিকে চূ র্ণ করবার সংকল্প জ্ঞাপন, রাম লক্ষ্মণকে রক্ষার পরিকল্পনা, লক্ষ্মণের স্বপ্নদর্শন, চণ্ডীপূজার উদ্যোগ, শিবের বাধা দান, লক্ষ্মণের সাহসিকতা, মায়া সুন্দরীদের ছলনা, লক্ষ্মণের সিংহবাহিনী পূজা, রাক্ষসবধের বর প্রার্থনা, দৈবাস্ত্র লাভ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গা, জননী মন্দোদরীর আশীর্বাদ প্রার্থনা, যুদ্ধে পাঠাতে মায়ের আশঙ্কা, মেঘনাদের আশ্বাস, মেঘনাদের যজ্ঞশালা অভিমুখে যাত্রা, প্রমীলার পারর্বতীর কৃপা প্রার্থনা ও বায়ু বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইল তাহায় !

মেঘনাদবধের অন্যান্য সর্গের মতো পঞ্চম সর্গের অধিকাংশ ঘটনাই রামায়ণ-বহির্ভূত। কেবলমাত্র লক্ষ্মণ কর্তৃক চণ্ডীপূজা ও বরলাভ কৃত্তিবাস অনুসারী। বাকী অংশ পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবে কল্পিত হলেও পাঠকের কাছে দেবতাদের ষড়যন্ত্র কতটা গভীর তা বোঝা যায়। তথাপি আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি কবি অসামান্য নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন স্বীকার করতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে ষষ্ঠ সর্গের ঘটনাবর্ত ও কাব্যকাহিনী চরম মুহূর্তটিকে দেখতে হবে। প্রথম ও তৃতীয় সর্গে পিতা-প-ী স্নেহ ও প্রেমের মাধুর্যে মেঘনাদ চরিত্র যেমন সহনীয় হয়ে উঠেছে তেমনি দ্বিতীয় ও পঞ্চম সর্গ দেব-মানবের যৌথ চেষ্টা ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের মৃত্যুকে অনিবার্য করে তুলেছে। স্বর্গে-মর্ত্যে এবং (পরে) পাতালে বা নরকে কাহিনীর বিস্তার তাকে এক ধরনের মহত্ত্ব দিয়েছে। চতুর্থ সর্গের সীতাহরণ প্রসঙ্গা মেঘনাদের মৃত্যু ও লঙ্কার ধ্বংসকে বাস্তবায়িত করার যুক্তি তৈরি করেছে। ষষ্ঠ সর্গের কাহিনীবৃত্ত ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মধুসূদন সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত যা বলেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার—কেবল ঘটনা নয় রচনার দিক থেকেও এ সর্গের সৌন্দর্য অতুলনীয়। এ সর্গের বর্ণনাভঙ্গির বড়ো বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে কবির দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। রামচন্দ্রের শিবির থেকে লক্ষ্মণ বিভীষণের লঙ্কাভিমুখে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণের স্বার্থও প্রয়োজনবোধের বর্ণে চিত্রিত। তাদের ভীতি সংশয় আত্মবিশ্বাস ও দৈববিশ্বাসের সুরই মুখ্য। কিন্তু বিভীষণ-লক্ষ্মণের লঙ্কা প্রবেশের পূর্বমুহূর্ত থেকেই দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হয়। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশের সঙ্গো সঙ্গো এ কাব্য লক্ষ্মণ বিভীষণকে বর্জন করে মেঘনাদের দৃষ্টিকে আশ্রয় করেছে। লক্ষ্মণ এখানে যে রূপে চিত্রিত হয়েছে, তা কবির দৃষ্টি-নিরপেক্ষ নয়। এ পরিবেশে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মেঘনাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা, অবজ্ঞা, ক্রোধ-ধিক্কার উৎসারিত হয়েছে।

ষষ্ঠ সর্গের সূচনায় লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিৎ নিধনের যাত্রার কথায় রামচন্দ্রের ভীতি বিহ্বল রূপ ফুটে উঠেছে। রাম সভয়ে বলেছেন, "নাহি কাজ মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাসে। দুর্বার সমরে, দেব-দৈত্য-নরত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি।" ইন্দ্রজিতের সেই বীর্যবত্তা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুতে সমাহিত হবে। মেঘনাদের বীরত্বের বহু উল্লেখ কাব্যে থাকলেও তাঁর বীর্যবত্তার কোনো পরিচয় প্রত্যক্ষত কাব্যে তুলে ধরা হয়নি। সে যুদ্ধের অবকাশ পায়নি। তাই তার এই অপঘাত মৃত্যুকে নিয়তি নিয়ন্ত্রিত ট্র্যাজেডি বলা যায়। ষষ্ঠ সর্গ এভাবে একটি ট্র্যাজিক বেদনায় সমাপ্ত হয়েছে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মধ্যযুগে ____________ ____________ পৃষ্ঠপোষণায় রচিত ____________ ____________ কাব্যের অংশত বা সমগ্রত হয়েছে।

খ) মহাকাব্যের উপস্থাপনায় ____________ যেমন তেমনি ____________ ____________ জন্য কিছু ____________ ____________ ভাবে থাকতে পারে।

গ) সাহিত্যিক মহাকাব্য ____________ ____________ রচনা, এখানে তাঁর ____________ ও ____________ দৃষ্টির ____________ অনুভব করা যায়।

ঘ) শৈশব স্মৃতির ____________ ____________ তাঁকে (মধুসূদন) টানত, ____________ ____________ কাহিনী তাঁর ____________ উত্তেজিত করত। তাই মেঘনাদবধে রামায়ণের মহৎ ও ____________ সঙ্গো ____________ দীপ্ত ____________ সমন্বয় ঘটিয়ে নতুনতর শিল্পসৃষ্টি করেছেন।

২) ক) 'স্বতঃস্ফূর্ত', 'সাহিত্যিক' ও 'ব্যঙ্গ' মহাকাব্যের দুটি করে উদাহরণ দিন।

খ) 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের রচয়িতা কে ? কাব্যগুলির নাম উল্লেখ করুন।

গ) নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যের শ্রীকৃষ্ণের জীবনব্রতের তিনটি পর্ব বর্ণিত হয়েছে। পর্ব তিনটি কী ?

৩) সঠিক উত্তরের টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

ক) মেঘনাদবধ কাব্য—
১। বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ
২। কৃত্তিবাসের রামায়ণের অনুসরণে রচনা
৩। বাঙালির রামায়ণী সংস্কার অনুসরণে রচনা।

খ) বৃত্রসংহার কাব্যের রচনা কাল—
১। ১৮৬৫
২। ১৮৬১
৩। ১৮৭৫

গ) 'দি রেপ অব দি লক' রচনা করেন—
১। পোপ
২। হোমার
৩। ভার্জিল

ঘ) 'ভেক মূষিক যুদ্ধ'র রচয়িতা—
১। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

২। হোমার

৩। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪) অ্যারিস্টোটল মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেগুলি উল্লেখ করুন।

৫) আলংকারিক বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের কতগুলি লক্ষণের কথা বলেছেন। লক্ষণগুলি আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।

৬) 'স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যে'র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৭) সাহিত্যিক মহাকাব্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৩৩.৯ মেঘনাদবধ কাব্য ঃ দেশি-বিদেশি প্রভাব, রসবিচার, ট্র্যাজেডি ও নিয়তিবাদ

মধুসূদন তাঁর মহাকাব্য রচনার কাহিনী বাল্মীকী-কৃত্তিবাস থেকেই প্রধানত গ্রহণ করেছেন, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য উপাদান সমন্বয়ে নূতন যুগের নূতন সৃষ্টি রূপে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ। তাঁর রাম-লক্ষ্মণ, তাঁর মেঘনাদ-বিভীষণ, মায়া-লক্ষ্মীদেবী চরিত্র ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও যুগের অভিনব কল্পনার রঙে রঞ্জিত। ষষ্ঠ সর্হের বিষয় রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ-নিধন। এই মূল ঘটনা উপস্থাপন করতে যে মহাকাব্য রচনা করেছেন, সেখানে হোমারের ইলিয়াড, দান্তের ডিভাইন কমেডি, মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট, বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের ভাবকল্পনা ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে।

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ-নিধন তেমন তাৎপর্যমণ্ডিত না হলেও মেঘনাদ বধ কাব্যে এর গুরুত্ব সমধিক। কবি এটিকে কেন্দ্রীয় ঘটনা রূপে বিন্যস্ত করে ষষ্ঠ সর্গে ঘটনা প্রবাহের সন্ধিক্ষণ বা (climax) তৈরি করেছেন। বিভীষণ প্রদর্শিত পথে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মায়ার প্রভাবে অদৃশ্য থেকে লক্ষ্মণ প্রবেশ করে উষাকালে মেঘনাদকে নিহত করেছে। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে অন্যভাবে। সেখানে নিকুম্ভিলা কোনো যজ্ঞাগার নয়, নীল মেঘের মতো বটবৃক্ষতল, কৃত্তিবাস বলেছেন 'বটবৃক্ষতলা'—সেখানে লক্ষ্মণ নিক্ষিপ্ত ঐন্দ্রাস্ত্রে মেঘনাদের মৃত্যু এবং সময়টিও 'সূর্যাস্ত কাল'। রামায়ণে ইন্দ্রজিতের রাক্ষসীয় মায়া অবলম্বনের কথা থাকলেও, মেঘনাদবধ কাব্যে তার উল্লেখ নেই। এভাবে ষষ্ঠ সংর্গেও ভারতীয় উপাদনের কিছু পরিবর্তন ঘটালেও এখানে মেঘনাদ বিভীষণ সংলাপে বাল্মীকিকে প্রায় সম্পূর্ণ অনুসরণ করেছেন।

বাল্মীকি রামায়ণের লক্ষ্মণ মেঘনাদবধে অনেকটা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রামকে সে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। সুমিত্রার নির্দেশ মতো রামকে পিতা সীতাকে জননী জ্ঞানে সেবা করেছে। রামের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় আত্মবিলোপ ঘটিয়েছে। শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণ রামের বিলাপে তাকে ভর্ৎসনা করেছে। লক্ষ্মণ চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে মধুসূদন কাজে লাগিয়েছেন। পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ নৈতিক শক্তির বলে মায়াকাননের নানা প্রলোভন অনায়াসে অতিক্রম করেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো ছলনাময়ী বামাদলকে মাতৃ সম্বোধনে নিবৃত্ত করেছে। নুপূর অলংকৃত চরণের ঊর্ধ্বে সে কখনও তাকায়নি। কিন্তু এ হেন লক্ষ্মণ চরিত্র ষষ্ঠ সর্গে তাঁর উপরিউক্ত চরিত্রমহিমা বজায় রাখেনি। দেববলে বলীয়ান হয়ে সে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। বীরধর্ম লঙ্ঘন করে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র মতো হীন উক্তি করেছে। বীরচরিত্রের আদর্শ বিরোধী এই আচরণ বোধ করি। রাবণ-মেঘনাদের বীর্যের প্রতি আত্যন্তিক আগ্রহের কারণে মধুসূদন লক্ষ্মণকে তাঁর স্বভাব বিপরীত চরিত্ররূপে

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

অঙ্কিত করেছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের দেবতারা মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন। তাদের চরিত্রের কোনো ক্রমবিকাশ নেই, পৃথক কোনো দেবীমহিমাও নেই। মানুষের মতো তাঁদের কামনা-বাসনা-লোভ-ঈর্ষা প্রভৃতি আছে। মানুষেরই মতো তাদের গতিবিধি ইচ্ছামতো কার্যসিদ্ধি—এ সবই ভারতীয় পুরাণানুসারী। এই দেবতারা প্রবঞ্চনা ছলনা করতে পরাঙ্মুখ নয়। তাই রাবণের একান্ত ভক্তি সত্ত্বেও রক্ষকুলের রাজলক্ষী বিশ্বাসঘাতকতা করে, ইন্দ্রজিতের কাছে পরাস্ত ইন্দ্র-ইন্দ্রজিদেতর সর্বনাশের উদ্যোগ নেয়। পার্বতী মোহিনী বেশে যোগী শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে। বলা হয় যে, রাবণ পাপী তাই দেবতারা তাকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু রাবণও মানুষ—সে পিতা, স্বামী, সে বীর। তাঁর হৃদয় মমত্বময়, বীরবাহুর মৃত্যুতে বিলাপ করে, মেঘনাদের মৃত্যুতে শোকাহত হয়। রাজা তাই শোক জয় করে রাজকর্তব্য পালনে কৃতসংকল্প হয়—এ সব মিলিয়ে মানবপ্রকৃতির পূর্ণ বিগ্রহ। মেঘনাদবধের দেবতারা এর কাছে হীন, তুচ্ছ। এভাবে চরিত্র-পরিকল্পনার পেছনে বাংলা মঙ্গল দেবতার এবং পাশ্চাত্য মহাকাব্যের প্রভাব থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়।

মেঘনাদবধের দেবতাদের আচরণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রিক ও লাতিন কাব্যের আদর্শে গড়া বলে মনে হয়। ইলিয়াডে যেমন দেবদেবীরা ছদ্মবেশে গিয়ে পরামর্শ দিয়েছে, মেঘনাদেও তার অনুসরণ দেখা যায়। মেঘনাদের শিবপার্বতী যেন গ্রিক দেবাতা জিউস-হেরা। গ্রিক-সাহিত্যের নিয়তি মেঘনাদবধকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে। এতৎসত্ত্বেও বলা হায় মধুসূদনের দেবদেবী চরিত্র-চিত্রণে পাশ্চাত্য প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তথাপি তাদের অচেনা বলে মনে হয় না। দেশীয় পুরাণে ও মঙ্গলকাব্যে এই ধরনের দেবদেবীর ভূমিকা আছে।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শ অনুসারে মেঘনাদবধ কাব্যের রসবিচার করতে গেলে দেখা যাবে মধুসূদন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রসম্মত রীতিকে গ্রহণ করেও পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যের অনুকরণে কিছু নূতনত্ব এনেছেন, আর এনেছেন কিছু গতিশীলতা। ফলত দুই আদর্শের মিলনে তাঁর কাব্য বিচিত্র রূপ ও রসে সঞ্জীবিত হয়েছে। মেঘনাদবধে বীররসের সঙ্গে করুণ রসের সম্মিলন ঘটেছে। বীররস এর স্থথায়ী রস হলেও সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে করুণরসের অন্তঃসলিলা ধারা নিয়ত প্রহমান। প্রথম সর্গেই সে পরিচয় আছে। দূতমুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে পিতার রাবণ হাহাকার করেছেন, তারপরই রাজা রাবণ—'স্তব্ধ হইল মনস্তাপে।' লঙ্কাপতি হরযে বিষাদে কহিলা ; "সাবাসি দূত। তোর কথা শুনি/কোন বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে/সংগ্রামে ?" দীর্ঘ কান্নার পর আবেগকম্পিত হাহাকারই স্বাভাবিক কিন্তু সাবাসি দূত প্রভৃতি কথার কথার মধ্যে দিয়ে বীরত্বের যে উল্লাস ধ্বনিত হয়েছে, তা বিস্ময়কর। রসবিচারে একে বীররস বলতেই হয়। সুতরাং বেদনার হাহাকার আর বীরত্বে উল্লাস—করুণ আর বীরের দ্বৈতসত্তা কাব্যটির প্রথম সর্গে ধ্বনিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় বীর আর করুণের প্রতি কবির আকর্ষণ প্রবল। অন্যভাবে বলা যায়, বীরের আশ্রয়ে করুণ রস সৃষ্টি করে মধুসূদন কাব্য সৌন্দর্য বৃদ্ধির এক অভিনব ও সলার্থক পরীক্ষা করেছেন।

মেঘনাদবধ ধ্বংসোন্মুখ লঙ্কার চিত্র বিশেষ—রাবণ কেমন করে তিলে তিলে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে, কেমন করে নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে দুর্বল করছে, লঙ্কার ঐশ্বর্য গর্ব ধূলিসাৎ হচ্ছে সেটি বীরবাহুর মৃত্যুতে যার শুরু মেঘনাদের মৃত্যুতে তার শেষ। অর্থাৎ বিষাদে করুণে শুরু আর বিষাদে করুণেই শেষ। তাই বীররসের অন্তরালে নিগূঢ় করুণ রস প্রবাহিদত হওয়ায় রস দুটি পরস্পরের পরিপূরক হয়েছে। এক্ষেত্রে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির মহিমা উপলব্ধি সম্ভব নয়। বস্তুত মধুসূদন বারী-কাব্যই লিখেছেন। কিন্তু বীররসের অপর দিকেই আছে বেদনা। যুদ্ধে বীরত্ব এক পক্ষের মৃত্যুকে অবধারিত করে তোলে, মৃত্যুতে বীরত্ব আরও মহিমা পায়। সুতরাং করুণরস সম্পূর্ণ বর্জন করে যে বীররস, তার মহিমা তত উন্নত নয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের ট্র্যাজিক রস পরিণতি সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু ট্রাজিডি রসসৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুটি

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

কী বা কে এ নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং এক্ষেত্রে ষষ্ঠ সর্গের ভূমিকা আলোচিত হতে পারে। এ বিচারের সূচনায় ট্রাজেডি সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করা দরকার।

গ্রিক ও ইউরোপের অন্যান্য ট্রাজেডির উদ্ভব, বিকাশ তার স্বরূপ ও রূপান্তর নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে। আমরা শুধু সংক্ষেপে বলতে পারি করুন কোনো কাহিনী, ঘটনার বর্ণনা ও তার রস পরিণতিই হোল ট্রাজেডি। তাই ট্রাজেডি করুণরসের আশ্রয়। মহৎ ও রাজকীয় কোনো ব্যক্তির শোকাবহ জীবনবৃত্ত বর্ণনা থেকে কালক্রমে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন-বিপর্যয় ট্র্যাজেডির বিষয় হয়েছে। মৃত্যুতেই ট্র্যাজেডি এ ধারণাও অপরিহার্য নয়। গ্রিক ইউরিপিদেশের রচিত মিলনান্ত ট্র্যাজেডিও আছে। কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় যখন নায়ক বা নায়িকার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নিয়তির সঙ্গে অসম যুদ্ধে সে যখন বিধ্বস্ত, তার সেই বীরত্বপূর্ণ ও মর্মান্তিক আর্তির মধ্য দিয়ে পাঠক চিত্তে যে রসপরিণতি ঘটে তাকে ট্র্যাজেডি বলা যায়। অর্থাৎ প্রাণঘাতী পরিণতি নয়, মানবাত্মার মহিমাপূর্ণ অথচ নিরুপায় শোচনা ব্যক্তিহৃদয়ের দীর্ণ হাহাকারও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে পারে।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান বিষয় মেঘনাদের মৃত্যু—ষষ্ঠ সর্গে তাঁর নিধন। একটি বীরের মহৎপ্রাণের বিনষ্টি। কাব্যটি এখানেই শেষ হয়নি। কারণ ট্র্যাজেডি যার মৃত্যু হয় তার নয়, যে বেঁচে থাকে তার। পরবর্তী তিনটি সর্গে এই ঘটনারই পরিণতি প্রলম্বিত হয়েছে। সপ্তম সর্গে মেঘনাদবধ-এর পর রাবণ মন্দোদরীর ও সমগ্র লঙ্কার হাহাকারের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ নিধনোত্তর ভাবমণ্ডল নতুন মাত্রা পেয়েছে এই শোকের হাহাকারেই প্রমীলার চিতারোহন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রাবণের সর্বহারা চিত্তের যে সীমাহীন বেদনা, সমস্ত বিশ্বময় যে অনন্ত শূণ্যতাবোদের সঞ্চার করেছে, সেখানেই এ কাব্যের ট্র্যাজেডির রসপরিণতি ঘটেছে। তাই মেঘনাদবধ এখানে কেন্দ্রীয় ঘটনা হলেও, কেন্দ্রীয় ভাব রাবণের হৃদরে আর্তনাদ লঙ্কার আসন্ন সর্বনাশ তথা সর্বাত্মক ধ্বংসের আশঙ্কাজনিত বেদনা বোধ সঞ্চারিত হয়েছে। তাই মেঘনাদের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই রাবণের জীবনের ট্র্যাজেডির সূচনা। মেঘনাদের মৃত্যু গভীর বেদনাবোধ থেকে করুণরস বা Pathos সৃষ্টি করে। একে একে বীরবাহু, কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর রাবণের একান্ত নির্ভর বীরপুত্র মেঘনাদের মৃত্যু ট্র্যাজেডির রস পরিণতি এনে দিয়েছে।

যেকোনো ট্র্যাজেডির মতোই নিয়তিবাদ—এ কাব্যের একটি উপাদান মনে করা হয়। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের আক্ষেপ, বিধি, এ-ভব যার লীলাস্থলী তিনিই যাঁকে, 'বজ্র আঘাতে' যে কাতর তার বেদনা, অথবা চিত্রাঙ্গাদার অনুযোগের উত্তরে—'বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে', 'গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ? বিধিবশে দেবি, সহি এ যাতনা।' উত্তরে চিত্রাঙ্গাদা 'নিজ কর্মফলে মজালের লাক্ষসকুলে, মজিলা আপিন', রাজলক্ষীর উক্তি 'প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এপুরে।' ষষ্ঠ সর্গেও লক্ষীদেবী অনুরূপ উক্তি করেছেন, 'প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে ? কৃতকর্মের ব্যাখ্যায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বিভীষণের উক্তি, 'নিজ-কর্ম-দোষে, হায় মজাইলা এ কনক লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।'

গ্রীকপুরাণে নেমেসিস বা নিয়তি প্রতিহিংসার দেবী। আধুনিক সাহিত্যে দৈব, পরিবেশ, পরিস্থিতির প্রতিকূল মানবসত্তার অসহায় অবস্থাকে বোঝানো হয়। গ্রিক ধারণায় নিয়তি অপরিরোধ্য। যে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মানুষ নিয়ত সংগ্রাম করেও পরিণতিতে জয়ী হতে পারে না তাই নিয়তি। এ যেন মানুষের নিয়ন্ত্রণাতীত এক বিশ্ববিধান যেখানে মানুষ সাধারণ ক্রীড়ণকমাত্র।

মধুসূদনের রাবণের মতে তিনি নিয়তির দ্বারা আক্রান্ত। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি তাঁকে এই কঠোর দন্ড দিচ্ছে। যদিও

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

চিত্রাঙ্গাদা, রাজলক্ষী এ মত পোষণ করেন না। তাঁরা রাবণের কৃতকর্মকেও দায়ী করেন। মেঘনাদ বধ-এর ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কায় প্রবেশ করার পর বিভীষণের চিত্ত দৌর্বল্য দেখা দিলে লক্ষণ বলেছে, 'চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে। এক যায় আর আসে জগতের রীতি'—এ উক্তির মধ্য দিয়ে যা ঘটতে যাচ্ছে তা যে বিধির বিধান এটি বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। আবার তিনি মেঘনাদকে বলেছেন, দৈবাদেশে রণে আমি আহ্বানি তোরে।' লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদবধের পর বিভীষণের শোকে সান্ত্বনা দিতে 'বিধির বিধানে বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে তোমার'—প্রভৃতি সমস্ত কাজই যে বিধির বিধানে নিয়ন্ত্রিত তাই বোঝাতে চেয়েছেন। মধুসূদন মেঘনাদ চরিত্র সৃষ্টিতে কোনো ফাঁক রাখেননি। তাঁকে আদর্শ নায়ক করে গড়েছেন। সর্বোপরি মেঘনাদের মতো মহৎপ্রাণ, পিতৃভক্ত, প-ীপ্রেমী, দেশপ্রেমিক বীরের স্বীয় যজ্ঞাগারে এই নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অন্যায়ভাবে নিহত হওয়াকেও অন্ধ নিয়তির নির্মমতা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা করা যায় না। নিয়তি সৃষ্ট হয়েছে রাবণের 'পাপে' এবং তার প্রতিবিধানের জন্য রামের যুদ্ধযাত্রা ও দেবতাদের ষড়যন্ত্রে।

৩৩.১০ মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র বিচার

ষষ্ঠ সর্গে রাম-রক্ষ্মণ, মেঘনাদ-বিভীষণ, লক্ষ্মী-মায়া প্রভৃতি চরিত্র কাব্য-বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গো স্বাভাবিক কারণেই সাদৃশ্যমূলক। মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গে প্রমীলার স্বীয় বংশগৌরব বীরত্বমহিমা প্রকাশ করেছে কিন্তু প্রতিপক্ষ রামচন্দ্রের প্রতি অনুচিত অবজ্ঞা "ভিখারী রাঘব" উক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মধুসূদনও একটি চিঠিতে বলেছেন 'I hate Ram and his rabble.'। সমগ্র রামায়ণের যিনি নায়ক তাঁর চরিত্র কবি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আঁকতে পারেননি। মধুসূদনের রামচন্দ্র বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র নয়। বাল্মীকির রাম ধীর, স্থির, বীর, নির্ভীক বীর্যশালী পুরুষ। কৃত্তিবাসেও সে বীর, কিন্তু বাঙালির চরিত্র মহিমায় কিছুটা কোমল। এদিক থেকে মধুসূদনের সৃষ্টি দ্বন্দ্বসঙ্কুল এবং অনেকরটা বিপীতধর্মী। নবম সর্গে 'পুত্রের সৎক্রিয়া' সমাধার জন্য রাবণ মন্ত্রী সারণকে রামচন্দ্র সকাশে পাঠিয়েছেন সাতদিন সময় চেয়ে। রাবণ সে সময় প্রসঙ্গাত 'নরকুলোত্তম' রঘুকুলমণি যে বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবলে অতুল জগতে প্রভৃতি সম্ভ্রমাত্মক বিশেষণ প্রয়োগ করে সাতদিন সময় চেয়ে নেয়। রাবণ আরও বলে, কী কুক্ষণে রক্ষদলপতির সঙ্গো নরদলপতির রিপুভাবে দেখা হয়েছিল। এর উত্তরে রামচন্দ্রও ক্ষমাশীল বীরের ঔদার্য নিয়ে বলেছেন, তাঁর দুঃখে পরম দুঃখিত আমি রাহুগ্রাসে হেরি সূর্যে কার না বিদরে হৃদয়, বিপদে অপর পর সম মম কাছে' এ রামচন্দ্র মহৎ, ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, যথার্থ বীর। কিন্তু তৃতীয় ও ষষ্ঠ সর্গে এই চরিত্রই সীমাহীন দুর্বলতার আকড়। তৃতীয় সর্গেও প্রমীলার দূতী রামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে লঙ্কায় যাওয়ার প্রসঙ্গা উল্লেখ করলে রামচন্দ্র বলেছেন, 'আর মম রক্ষঃপতি ; তোমারা সকলে কুলবালা, কুলবধূ, কোন্ অপরাধে বৈরি-ভাব আচরি তোমাদের সাথে ?' শেষে বলেছেন 'কি প্রসাদ, সুবদনে, দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্বাদ করি।' এক্ষেত্রে রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, তার মহত্ব, সস্নেহ আশীর্বাদ করার মধ্যে যে ঔদার্য তা বীর্যশালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। মধুসূদনের সচেতন কল্পনা রামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের এই মহৎ দিকটি দেখলেও, কবির নিজস্ব ভাব-দৃষ্টি তাঁকে অন্যপথে চালিত করেছে। তাই তৃতীয় সর্গেই বিভীষণকে বলেছেন 'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিণু হৃদয়ে, রক্ষোবর যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি। মূঢ় যে ঘাঁটায়, হেন বাঘিনীরে। বা ষষ্ঠ সর্গে 'চলো ফিরি। পুনঃ মোরা যাই বনবাসে ; বা 'নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি। ফিরি যাই বনবাসে।" এই বীর্যহীন কান্নাও কবির রামচন্দ্র সম্পর্কে পূর্বকল্পিত 'ঘৃণা'র কারণেই বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে মায়াদেবীর সাহায্য নিয়ে যে নিন্দনীয় উপায়ে মেঘনাদকে বধ করা হয়েছে তা রামচন্দ্রের সপ্রশংস সমর্থন পেয়েছে। এ সমস্ত ঘটনাই রামায়ণ-বহির্ভূত। কবির কল্পনায় রামচন্দ্রের যে দুর্বলচিত্ত একটি মানুষের ভাবমূর্তি আছে, এটি তারই প্রতিফলন।

মধুসূদন মেঘনাদের প্রতি আত্যন্তিক মমত্ববশত, রামচন্দ্রকে কালিমালিপ্ত করেছেন। পরিবর্তে মেঘনাদকে বীরত্বে মহত্ত্বে মহতো মহীয়ান করে তুলেছেন।

রামায়ণের লক্ষ্মণ মূলত পুরুষকার-নির্ভর। মেঘনাদবধে দেব-দৈত্য-নরত্রাস অজেয় মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েও সে বাল্মীকি রামায়ণের ছায়া মাত্র। তবে এ কাব্যে সে রামের থেকে সক্রিয়। রামচন্দ্রের মতো ভয়-ভীতি কান্নায় সে ভেঙে পড়ে না, অসম সাহসে ভর করে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মতো বীর্যবত্তা ও শক্তি তাঁর আছে। রামচন্দ্র বিপন্ন বোধ করলে, সে তাঁকে সাহস দেয়। একা বনপথে লঙ্কায় চণ্ডীমন্দিরে যাওয়া লক্ষ্মণের পক্ষে অপরিমিত সাহস ও শৌর্য, রুদ্র ভৈরবকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে, দানবীয় শক্তিকে পরাস্ত করেছে। সর্বোপরি ভোগবিলাসে প্রলুব্ধ করতে মায়া-সুন্দরীদের চেষ্টাকে প্রতিহত করেছে। সমস্ত প্রলোভন ও কামনাজয়ী এই ব্রহ্মচারী তুলনাহীন। মধুসূদন এদিক থেকে লক্ষ্মণকে মেঘনাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও, লক্ষ্মণের বীরত্ব বৈভব ম্লান হয়েছে, দৈবাস্ত্রে শক্তিশালী হয়ে মায়াদেবীর আনুকূল্যে চোরের মতো লঙ্কায় প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করায়। মেঘনাদ বলেছেন 'নিরস্ত্র যে অরি, নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।' লক্ষ্মণ উত্তরে বলেছেন 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। নিরস্ত্র মেঘনাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে, বীরধর্ম-বিরোধী এই আচরণ লক্ষ্মণকে কলঙ্কিত করেছে। তাঁর এতদিনের সমস্ত চরিত্র গৌরব মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ হয়েছে। নিরস্ত্র প্রতিপক্ষকে অস্ত্রাঘাত করায় লক্ষ্মণ মনুষ্যধর্মের অবমাননা করেছেন। বস্তুত লক্ষ্মণের জয়ে মেঘনাদের বীর-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

মেঘনাদ রক্ষকুলগৌরব—মধুসূদন-এর—Favourite Indrajit 'বধ' নামক কাব্যের বধ্য ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ। তিনি এ কাব্যের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র। বাল্মীকি রামায়ণেও তিনি অসাধারণ বীর্যবান পুরুষ। সেখানে তাঁর দাম্পত্যজীবনের কোনো ছবি নেই। মধুসূদন তাঁর নায়কের চরিত্রে মানবিক বিস্তারের প্রয়োজনেই এদিকটির প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। মধুসূদনের মেঘনাদ প্রেমিক, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত, মাতৃপিতৃভক্ত কর্তব্যপরায়ণ বীর। তিনি 'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি', রাক্ষস কুল-ভরসা'। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে কবির প্রিয়তম নায়কের মৃত্যু ঘটেছে। ইন্দ্রজিৎ তখন, 'পুজে ইষ্টদেবে নিভৃতে', কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরীয়, চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।' এই পবিত্র ভূমিকে হীন চক্রান্তের মাধ্যমে লক্ষ্মণ বধ্যভূমিতে রূপান্তরিত করেছেন। এত দ্বারা ইন্দ্রজিতের ধর্ম পরায়ণতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি লক্ষ্মণকে আতিথেয় সেবা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বীর সাজে সেজে আসার অনুমতি চেয়েছেন। এতে তাঁর রণ নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণে উদ্যত হলে, তিনি কোষার আঘাতে তাঁকে মূর্ছিত করেন। অস্তসূর্যের শেষ দীপ্তি এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। পরিশেষে লক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাতে বীরের দেহ হয়েছে ক্ষতবিক্ষত—লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে। মেঘনাদ চরিত্র সৃষ্টিতে স্রষ্টার মধ্যে মেঘনাদের প্রতি একান্ত ভালোবাসার সঙ্গে শিল্পীর গভীর সংযমের অসামান্য মেলবন্ধন ঘটেছে।

অমিতবল মেঘনাদের মৃত্যু ও রক্ষোবংশের পরাভবের মূলে রাবণানুজ বিভীষণ। রামায়ণের বিভীষণ পুণ্যাত্মা। এখানেও সে ধর্মভীরু। পাপী ভাইয়ের পক্ষ ত্যাগ করে সে বনজীবনের দুঃসহ কষ্টকে স্বীকার করেছে। ধার্মিকতার কারণেই আত্মীয় বন্ধুদের বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেনি। উনিশ শতকীয় স্বাদেশিকতার দৃষ্টিতে আক্রান্ত দেশকে ত্যাগ করে আক্রমণকারীর সহায়তা করা বিশ্বাসঘাতকের দেশদ্রোহিতা বই কি? মেঘনাদ একারণেই বিভীষণকে নিন্দাবাদ করেছেন।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

মধুসূদনের বিভীষণ শুধু দেশদ্রোহী নয়, সে শুধু 'জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি' কে বিসর্জনই দেয়নি, রাবণের কর্মফল ইত্যাদি বলে নিজের পুণ্যাত্মারূপটি তুলে ধরে হীন উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টাও করেছে। নিদারুণ সিংহাসন লোলুপতা তাঁর অন্তরে সুপ্ত ছিল। তার অন্তরবাসনাই স্বপ্নে রূপ পেয়েছে। রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী যেন দেখা দিয়ে বলেছে—"পাইবি শূন্য রাজসিংহাসন, ছত্র দণ্ড সহ তুই"। এর থেকে বোঝা যায়, বিভীষণের যতই ধার্মিকতা থাকুক রামচন্দ্রের মিত্র বলে পরিচিত হয়েও, তার অন্তরে নিহিত ছিল রাজসিংহাসনের কামনা। সংস্কৃত রামায়ণে এর স্পষ্ট উল্লেখ না থারলেও, বালীর উক্তিতে এর আভাস আছে। মধুসূদন একেই তাঁর কাব্যে স্পষ্টতর করেছেন।

এতৎসসত্ত্বেও বিভীষণ চরিত্রের আরেকটি দিকও স্মরণ রাখতে হবে। বিভীষণেরও যে হৃদয় ছিল, মমত্ববোধ ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া যায় মেঘনাদের মৃত্যুর পর বিভীষণের বিলাপে। বিভীষণের এই বিলাপ, তার স্নেহসিক্ত হৃদয়ের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। স্বার্থক্লিষ্ট দেশদ্রোহী একটি ব্যক্তির হৃদয়েও যে অন্তঃসলিল স্নেহের প্রস্রবণ থাকে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিলাপধ্বনি তার মানবিক ভিত্তিকেই বিশ্বাসযোগ্য করেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যে দেবদেবীর ভূমিকাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যের কাহিনী নিয়ন্ত্রণে এঁদের অসামান্য অবদান আছে। রাবণ মেঘনাদের ভাগ্য এঁদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ষষ্ঠ সর্গে স্বর্গের লক্ষী ও মায়ার ভূ মিকা নিরপেক্ষ দ্রষ্টার নয়। প্রধানতঃ এরাই সক্রিয় কুশীলবের মত মেঘনাদবধ কাব্য সম্পন্ন করিয়েছে।

লক্ষ্মী একদা সমুদ্রতলে নির্বাসিতা ছিলেন। মধুসূদন কল্পিত এই দেবী সাগরমন্থনের পর স্বর্গে ফিরে যেতে পারেননি। রাবণের ভক্তিতে লঙ্কায় ঐশ্বর্যলক্ষী হয়ে বিরাজ করছেন। রাবণ বীর্যের দ্বারা ধনসম্পদ অর্জন করায় লক্ষ্মী সেখানে ধরা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বর্গে বিষ্ণুবক্ষে ত্বারায় ফিরে যেতে চান, তাই রাবণের পতন না ঘটলে যেতে পারছেন না। বীরবাহুর পতনের পর তিন 'প্রভাসা'র ছদ্মবেশে প্রমোদ উদ্যানে সংবাদ দিয়ে মেঘনাদকে লঙ্কায় নিয়ে এসে সৈনাপত্যে বরণ করান। ইনি আবার বলেন 'চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী/বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি/প্রমদা-কুল-রোদন। প্রতি গৃহে কাঁদে/পুত্রহীনা মাতা, পতিহীনা সতী।' (নবম সর্গ)। রাবণের দুষ্কৃতির জন্য তিনি তাঁর প্রতি বিরূপ, তাই রাবণ নিধনে উদ্যোগী। তিনিই দেবরাজ ইন্দ্রকে মেঘনাদের সৈনাপত্য গ্রহণের সংবাদ জানিয়ে, তার বধের উপায় জানবার জন্য ইন্দ্র দম্পতিকে পার্বতীর কাছে পাঠিয়েছেন। ইন্দ্রকে বলেছেন, না হইলে নির্মূল সমূহে/রক্ষপতি ভব রসাতলে যাবে।'—এ আগ্রহাতিশয্য শুধুই দুষ্কৃতিবিনাশ হেতু নয়, এর পেছনে বৈকুণ্ঠে ফিরে প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষায়ও। লক্ষীর এই স্ববিরোধী আচরণ তাই শুধু কৃতি-দুষ্কৃতি নয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টও বটে।

বধকাব্যের দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রভৃতি সর্গে মায়াদেবীর কথা আছে। তিনি মোহিনী বা মায়াজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষের কাছে অনেক ঘটনা আড়াল করেছেন। রামচন্দ্র ষষ্ঠ সর্গে দেবী মহামায়া অম্বিকার কাছে লক্ষ্মণকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছেন। দেবী মহামায়ার আদেশে মায়াদেবী মেঘনাদবধ-এর সহায়িকা শক্তিরূপে কাজ করেছেন। মায়ার আনুকূল্যে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ লঙ্কায় প্রবেশ করেছে। মায়ার ছলনায় ইন্দ্রজিতের সমস্ত দৈবাস্ত্র ব্যর্থ হলে কোষাঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছা গেছে। মায়াদেবীরই যে- পরে তার চেতনা সঞ্চার হয়েছে। তাই বলা যায় মেঘনাদবধে মায়াদেবী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। দেবতাগণ রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মায়ার সাহায্যে দৈবাস্ত্র দেওয়া থেকে সমস্ত সফল আয়োজন শেষে মেঘনাদকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিধন সম্পন্ন করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী থেকে বেশ বোঝা যায় মানুষ ও দেবতা এখানে একাকার হয়ে গেছে। তাঁদের মানুষের মতো কামনা-বাসনা-ঈর্ষা-ক্রোধ আছে কিন্তু মানবচরিত্রের মতো তাদের কোনো ক্রমবিকাশ নেই। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে-কোনো কাজই তাদের পক্ষে সম্ভব। তাদের কেউ মানবচরিত্রের মহত্ত্বও পায়নি।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। প্রয়োজনে মূলপাঠ ৪৮.১১ এবং ২৮.১২ আরেকবার পড়ুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মূল রামায়ণে ____________ ____________ তেমন ____________ না হলেও ____________ এর গুরুত্ব সমধিক।

খ) নিকুম্ভিলা কোনো ____________ নয়, নীল মেঘের মতো ____________, ____________ বলেছেন 'বটবৃক্ষতলা' যেখানে লক্ষ্মণ নিক্ষিপ্ত ____________ মেঘনাদের মৃত্যু।

গ) মধুসূদন ____________ অলংকারশাস্ত্র-সম্মত রীতিকে গ্রহণ করেও ____________ কাব্য সাহিত্যের ____________ কিছু নূতনত্ব এনেছেন, আর এনেছেন কিছু ____________।

ঘ) মেঘনাদবধে ____________ রসের সঙ্গে ____________ রসের ____________ ঘটেছে।

ঙ) দূতমুখে ____________ মৃত্যু সংবাদ শুনে ____________ ____________ হাহাকার করেছেন, তারপরই ____________ ____________ 'স্তব্ধ হইল ____________।'

২) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায়—
১। বাল্মীকির প্রভাব আছে
২।কৃত্তিবাসের প্রভাব আছে
৩।পাশ্চাত্য প্রভাব আছে

খ) মেঘনাদবধ কাব্য লঙ্কার—
১। ঐশ্বর্যের চিত্র বিশেষ
২।ধ্বংসোন্মুখ চিত্র বিশেষ
৩।যুদ্ধ চিত্র বিশেষ।

গ) মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কাব্য—
১। বীরাঙ্গনা
২।মেঘনাদবধ
৩।চর্তুদশপদী কবিতাবলী

ঘ) ষষ্ঠ সর্গের কেন্দ্রীয় চরিত্র—
১। রাবণ
২।মেঘনাদ
৩।লক্ষ্মণ

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

৩) মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের কাহিনীবিন্যাসে মৌলিকতা সম্পর্কে ৫০ শব্দের মধ্যে আলোচনা করুন।

৪) ষষ্ঠ সর্গের পাশ্চাত্য প্রভাবিত অংশগুলির পরিচয় দিন।

৫) ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত মেঘনাদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিন।

৬) লক্ষ্মী ও মায়াদেবী ষষ্ঠ সর্গের মূল চালিকাশক্তি।—এ সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

৭) লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায় বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণ কতটুকু, আলোচনা করুন।

৩৩.১১ মেঘনাদবধ কাব্য (ষষ্ঠ সর্গ) ঃ ভাষা, ছন্দ, অলংকার

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকরা মহাকাব্যের ভাব-রসের সঙ্গে তার ভাষা-ছন্দ-অলংকার নিয়েও ভেবেছেন। এর বিষয়বস্তু, চরিত্র কল্পনা, ভাব ও রস সমস্তই গুরুগম্ভীর। তাই মহাকাব্যের ওজস্বিতা, বিশালতা ও বিস্তৃতি। ফলে মহাকাব্যের কল্পনায় একটি অসামান্য সমুন্নতি, ভাষায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে—সেখানে প্রাধান্য পায় ওজোগুণ। অ্যারিস্টোটল মহাকাব্যের ভাব ও বাষায় ঐশ্বর্য ও রাসকিগুণ বিশিষ্ট ড্যাকটিলিক 'হেক্সামিটার' বা এ জাতীয় ছন্দ ব্যবহার সমর্থন করেছেন। বিশ্বনাথ গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণার সঙ্গে একই প্রকারের গাম্ভীর্যপূর্ণ ছন্দ ব্যবহারের কথা বলেছেন, কেবল সর্গের শেষে অন্য পদ্যছন্দ অনুমোদন করেছেন।

যেহেতু ভাষা ভাবের বাহন, কবি ভাষার আশ্রয়েই ভাবকে প্রকাশ করেন। আলংকারিকরাও বলেছেন, ভাবের সঙ্গে ভাষার পার্বতীপরমেশ্বর সম্পর্ক। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষায় ও বর্ণনায় মহাকাব্যোচিত ওজস্বিতা, গাম্ভীর্য ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এর ভাষা সম্পদ যে কোনো পাঠকের কাছে বিস্ময়ের স্থল। স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের কবির মতো মধুসূদনও তাঁর কাব্য সৃষ্ট চরিত্রের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। যেমন লক্ষ্মণ—সতীসুমিত্রাপুত্র, সৌমিত্রি কেশরী, রামানুজ, রামবানুজ, সৌমিত্রি ভীমবাহু লক্ষ্মণ। রামচন্দ্র—সীতানাথ রাঘব, রাঘবেন্দ্র, রঘুবর, রঘুকুলমণি, বৈদেহীপতি, বৈদেহীনাথ, দেবকুলপ্রিয়, দশরথাত্মজ। মেঘনাদ—রাবণি, দশাননাত্মজ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি। এভাবে বিশেষণ ঋদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে মধুসূদন বর্ণনায় সমৃদ্ধি এনেছেন। আবার শব্দ নির্বাচনেও তিনি বর্ণনায় ওজস্বিতার প্রয়োজনে গুরুগম্ভীর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত কাব্যে সন্ধিসমান বহুল ভাষা ব্যবহার করে যে ওজোগুণ নিয়ে আসা হত, একালে সেটি অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় মধুসূদন তাকে যথাসম্ভব বর্জন করেছেন, পরিবর্তে ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য যুক্তব্যঞ্জন ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে'। কিংবা 'উড়িল কলম্বকুল মলম্বা আকাশে।' এ ধরণের শ্বদ ব্যবহারে তাঁর প্রতিভার মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরও একদিক থেকে মেঘনাদবধের ভাষা উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্র যেমন একদা তৎসম শব্দের সঙ্গে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করে ভাষায় গতি সঞ্চার করেছিলেন, মধুসূদন, তৎসম শব্দের সঙ্গে 'দাপিছে, 'নিবীরিবে', 'আশ্বাসিলা' প্রভৃতি নামধাতু এবং লোকায়ত শব্দ (যথা, 'জাভাল ভাঙি) ব্যবহার করে সেই গতি এনেছেন। এদিক থেকে মেঘনাদবধের ভাষা কিছু ত্রুটি যথা গুরুচন্ডালি (ঝড়াকারে' 'ফুলদল দিয়া')। ব্যাকরণে দুষ্ট (শিরোপরি, 'প্রফুল্লিত', গায়কী) শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।

মধুসূদন বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। বীররসপ্রধান কাব্যভাষার প্রয়োজনে ইংরেজি Blank

Verse-এর ছন্দোরীতি বাংলার চতুর্দশ মাত্রার পয়ারের (মিশ্রবৃত্তের) কাঠামোয় পুরে মিলহীন প্রবাহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন। যেহেতু কবিতায় ভাবের গুরুত্ব বেশি, তাই মধুসূদন ছন্দের বন্ধনদশা ঘোচাতে পঙক্তি অন্তে যতি পাত থেকে ভাবকে মুক্তি দিলেন। বন্ধনদশা থেকে মুক্ত এই ভাবরাশি স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হবার সুযোগ পেল। অর্থাৎ পঙক্তি শেষে ছেদ আর আবশ্যিক রইল না—পঙ্‌ক্তি থেকে পঙ্‌ক্তি ক্রমে আপন বেগে চলতে সক্ষম হল, যেখানে প্রয়োজন সেখানে থামবার সুযোগ হল। এর ফলে আট ও ছয় মাত্রার পর নিয়মিত যতি পড়ায় যে একঘেয়েমি তৈরি হয়েছিল তা আর রইল না। নানা ছত্রে, নানা জায়গায় যতি পাতের ফলে কাব্যের গতিতে বৈচিত্র্য এল। বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের পক্ষে উপযোগী। ভাবের এই যে সচ্ছন্দ প্রবহমানতা এটিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—মধুসূদন প্রবর্তিত পঙ্‌ক্তির অন্তে মিল হীনতা বা অমিত্র অক্ষরত্বই অমিত্রাক্ষর ছন্দে একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রবোধচন্দ্র সেন একে অমিত্রাক্ষর ছন্দ না বলে প্রবহমান ছন্দ বলেন। পয়ারের যেমন দুটি ভেদ ৮ ও ৬ মাত্রার পয়ার এবং ১০ ও ৮ মাত্রার, মহাপয়ার প্রবহমান ছন্দের দুটি প্রধান ভাগ। প্রবহমান চতুর্দশমাত্রিক ও প্রবহমান অষ্টাদশমাত্রিক ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ এই দুই বৈশিষ্ট্যযুক্ত কবিতায় মিল যুক্ত করে সমিল প্রবহমান বা জটিল প্রবহমান পয়ার রচনা করেছেন। যেমন—মধূসূদন রচিত অমিল প্রবহমান পয়ার ঃ

প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল।
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে। (ষষ্ঠ সর্গ, মেঘনাদবধ কাব্য)

রবীন্দ্রনাথ রচিত সমিল প্রবহমান পয়ার ঃ

কবিবর কবে কোন্ বিস্তৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে। (মেঘদূত, মানসী)।

প্রাচ্য আলংকারিক আচার্য বামনের মতে কাব্যের গ্রহণ যোগ্যতা তার অলংকার প্রয়োগে। অলংকারেই কাব্যের সৌন্দর্য। আচার্য দণ্ডী ও কাব্যের শোভাকর ধর্মকেই অলংকার বলেছেন। এই অলংকার শব্দটি দুটি অর্থে ব্যঞ্জিত হয়েছে—১) অলংকার কাব্যদেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, ২) অলংকার কাব্যদহের অর্থ সামর্থ্য বাড়ায়। এ থেকে বোঝা যায় অলংকার কাব্য দেহের ও ভাবের সৌন্দর্য বিধায়ক। কাব্য দেহ ভাবনা থেকে শব্দ নির্ভর ও 'ভাব' থেকে অর্থনির্ভর অলংকার অর্থাৎ শব্দালংকার (অর্থাৎ ধ্বনির অলংকার) ও অর্থালংকারের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। উভয়েরই লক্ষ্য কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি। মেঘনাদবধে এর ব্যাপক ব্যবহার আছে। প্রসঙ্গাতঃ ষষ্ঠ সর্গে কয়েকটি শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রসঙ্গা আলোচনা করা যায়।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রাচ্য আধারে, পাশ্চাত্যে আদর্শে পরিকল্পিত সাহিত্যিক মহাকাব্য। হোমার,

ট্যাসো, দান্তে, মিল্টনের কাব্যদর্শের সঙ্গো কালিদাস, মাঘ, ভারবি তাঁর কাব্যাদর্শকে প্রভাবিত ও উদ্বেজিত করেছে। গ্রিক মহাকাব্যে অলংকার প্রয়োগ বিশেষতঃ উপমার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। হোমার অ্যাকিলিস, হেক্টর-এর সুমাহন ব্যক্তিত্ব এবং বিশালতার অনুভব ফুটিয়ে তুলতে একাধিক উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। হোমারের উপমাগৌরব সুপ্রসিদ্ধ যার পরিচয় "হোমোরিক সিমিলি"। এই উপমাগুলি দীর্ঘ যার মধ্য দিয়ে মহাকাব্যিক বিশালতা ও বিস্তৃতির ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। মেঘনাদবধে এর প্রয়োগ প্রাচুর্য আছে।

মধুসূদনের 'মহাগীত' যে 'মধুচক্র' রচনা করেছে তার মধু পান করে 'গৌড়জন' পরিতৃপ্ত ও আনন্দ অনুভব করেছেন। এ কাব্যের ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস প্রভৃতি ধ্বনি প্রধান অলঙ্কার প্রায় প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে পাওয়া যায়। 'অসির ঝনঝনি', কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা', নীরব রবার, বীণা, সুরজ, মুরলী' ও কমলালয়ে, কমল-আসনে/বসেন কমলাজয়ী (১ম সর্গ, অনুপ্রাস) সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর, স্মরিলা শঙ্করে (ষষ্ঠ সর্গ) বা লঙ্কার পঙ্কজ রবি কেলা অস্তাচলে/(ষষ্ঠ সর্গ) প্রভৃতি বৃত্তানুপ্রাস-এর ব্যবহার কাব্যে অসাধারণ ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে।

শব্দালংকারের থেকে অর্থালংকার গঠনে কবির ব্যক্তিমন অধিকতর ক্রিয়াশীল হওয়ায়, কাব্যের রূপকল্পসৃষ্টিতে কবি মানসের সুস্পষ্ট ছাড়া পড়েছে। অলংকার প্রয়োগে বিশেষত 'হোমোরিক সিমিলি' বা মহাকাব্যিক উপমা ব্যবহারে মধুসূদন বাংলা কাব্যে অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। লঙ্কার পরিচয় দিতে 'কাঞ্চন-সৌধ কিরীটিনী' বা 'হীরাচূড় শিব দেবগৃহ' প্রভৃতি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাঁর 'উপমা' অলংকারে ব্যবহারে ব্রজ, বিজয়া প্রসঙ্গা এসেছে। যেমন ঃ

> মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিলা/শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিলা যেমতি/
> ব্রজে ব্রজকুল শিশু যবে শ্যামমণি/আঁধারি যে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে।" (ষষ্ঠ সর্গ)

বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে সদাজাগ্রত চেতনা উপমা হিসেবে তাঁর কাব্য জগতেও নানা ভাবে ও রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, "তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি পাখী।" (চিত্রাঙ্গাদার উক্তি—১ম সর্গ), নিদাঘে যেমতি/ফলশূন্য বনস্থলী, জনশূন্য নদী/, বরজে সজারু পশি বারুইর যথা ছিন্ন ভিন্ন করে তারে' (১ম সর্গ)—প্রভৃতিতে উপমা ব্যবহারে কবির প্রকৃতি প্রীতি ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশ হয়েছে। প্রথম সর্গের 'শোকেরক ঝড় বহিল সভাতে।' বা ষষ্ঠ সর্গের—'কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে প্রাণাধিক—রূপক অলংকারের যেমন, তেমনি 'কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে, পঙ্কিল ?' কাকু বক্রোক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুশীলনী—৪

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৬১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গো মিলিয়ে দেখুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) মহাকাব্যে থাকে ______ বিশালতা ও ______। ফলে মহাকাব্যের ______ একটি অসামান্য ______, ______ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে।

খ) বীর রসপ্রধান ______ প্রয়োজনে ইংরেজি ______ ______ এর ছন্দোরীতি বাংলার ______ পয়ারের (মিশ্রবৃত্তের) ______ পুরে মিলহীন ______ ______ বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন।

গ) হোমার ______ ______ এর ______ ব্যক্তিত্ব এবং ______ অনুভব ফুটিয়ে তুলতে একাধিক ______ আশ্রয় নিয়েছেন। হোমারের ______ সুপ্রসিদ্ধ, যার পরিচয় ______ ______।

ঘ) মধুসূদনের ______ যে ______ রচনা করেছে, তার ______ পান করে ______ ______ ও আনন্দ অনুভব করেছেন।

২) প্রতিটি অলংকারের দুটি করে উদাহরণ দিন ঃ ধ্বন্যুক্তি, বৃত্তানুপ্রাস, রূপক।

৩) মধুসূদন উপমাঋদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে বর্ণনায় সমৃদ্ধি এনেছেন। তিনটি উদাহরণ দিন।

৪) মধুসূদন ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য যুক্তব্যঞ্জন ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৫) প্রবোধচন্দ্র সেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ না বলে বলেন প্রবহমান পয়ার ছন্দ। এ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্রের যুক্তিটি বুঝিয়ে দিন।

৬) পয়ার ও মহাপয়ারের মধ্যে পার্থক্যটি ৫টি বাক্যে আলোচনা করুন।

৭) অমিল ও সমিল প্রবহমান বলতে কী বোঝেন। এ দুটির বৈশিষ্ট্য ৫টি বাক্যে ব্যাখ্যা করুন।

৩৩.১২ সংক্ষিপ্তসার

মধুসূদন দত্ত যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রাজনারায়ণ, মা জাহ্নবী। সেখানে শৈশব অতিবাহিত করে, কৈশোরে কলকাতায় হিন্দু ও বিশপস্ কলেজে লেখাপড়া শেখেন। এ সময় থেকেই কাব্য রচনায় হাতেখড়ি। বিলাত যাওয়ার একান্ত আগ্রহ ও বাবা মার ঠিক করে দেওয়া বিয়ে এড়াতে আকস্মিকভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা ও সাংবিদিকাত সূত্রে মাদ্রাজ যান, সেখানেই ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী রেবেকা ম্যাক্টাভিসকে বিয়ে করেন। পরে হেনরিয়েটাকে বিয়ে করেন। ১৮৫৬ তে কলকাতা ফিরে কলকাতায় পুলিশ কোর্টে চাকরি নেন। ১৮৬২ তে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাত যান, পাশ করে ফেরেন ১৮৬৭-তে। সাহিত্য রচনা শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), বীরাঙ্গানা (১৮৬২)। বিলাতে থাকাকালে চতুর্দশপদী কবিতাবলী, শেষে হেক্টর বধ ও মায়াকানন ছাড়াও কিছু অসম্পূর্ণ রচনা আছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ এই এককের মূল পাঠ বিষয়। লক্ষ্মণ কর্তৃক দৈবাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে বধ এই কাব্যের যে প্রধান উপজীব্য, তা-ই এ সর্গের বিষয়বস্তু। বীরবাহুর মৃত্যু ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য গ্রহণ, স্বর্গে দেবতাদের চক্রান্ত, মহাদেবের আনুকূল্য আদায়, মায়া প্রভাবে দৈবাস্ত্র নিয়ে রামচন্দ্রের শিবিরে পৌঁছে দেওয়ার পর লক্ষ্মণ কর্তৃক কাপুরুষের মত নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ হত্যা, এ সব দেবতাদের মায়ায় সম্ভব হয়েছে। মধ্যে তৃতীয় সর্গে প্রমীলা-ইন্দ্রজিৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করে ইন্দ্রজিতের প্রতি মানবিক মহিমা আরোপ করে তাঁর মৃত্যুকে অধিকতর ট্র্যাজিক করা হয়েছে। চতুর্থ সর্গ সীতার মুখ দিয়ে পূর্ববর্তী ঘটনা-বিবৃতির মধ্য দিয়ে রাবণের তথা রাক্ষসকুলের বিপর্যয়কে প্রাক্তনের রূপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ সর্গ তাই এ কাব্যের শীর্ষ, তার পরে তিনটি সর্গের সাহায্যে কাব্যের পরিণতি টানা হয়েছে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

এই সর্গটি পাঠের জন্যই মহাকাব্যের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সর্গটির মধ্যে মহাকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের যে সাধারণ পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। মহাকাব্যের উপস্থাপনায় বস্তুনিষ্ঠা ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য কিছু অলৌকিকত্ব আনা হয়—ষষ্ঠ সর্গের পরিকল্পনায় তা আছে। বিশেষত মেঘনাদনিধনের পূর্বমুহূর্তে এমন দৃশ্যের অবতারণা অন্যতম। মেঘনাদবধ যেহেতু এ সর্গের প্রধান বিষয়, তাই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে 'বধঃ'। মহাকাব্যের বৈচিত্র্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানতঃ দুধরনের যথা যুগসঞ্চিত কাহিনীকে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের প্রেরণায় সাহিত্যিক প্রয়াসে রচিত 'সাহিত্যিক মহাকাব্য' তৎসহ লঘু বিষয় নিয়ে বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ মহাকাব্য রচনা করা হয়েছে। মধুসূদনের সাহিত্য প্রয়াস জাত মেঘনাদবধ কাব্যের আদর্শে হেমচন্দ্র বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্র রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রভাস-ত্রয়ী মহাকাব্য রচনা করেন। শেষে দুজনসহ পরবর্তী মহাকাব্য রচনাপ্রয়াস মধুসূদনের কাব্যকে অতিক্রম করতে পারেনি।

মেঘনাদবধে কবির সহানুভূতি রাম লক্ষ্মণের পরিবর্তে রাবণ-মেঘনাদের ওপরই সমধিক। হোমার-ভার্জিলের কাব্য ও তামিল কম্বন রামায়ণের এ ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব আছে। এ ছাড়াও কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র ও চিত্রকল্প ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে মিল্টন, শেলি, কালিদাস মাঘ-ভারবি ভবভূতির প্রভাব ইতস্তত আছে। এ কাব্যের অঙ্গীরস বীর হলেও অন্তঃসলিলা করুণরসের প্রস্রবন আছে। অবশ্য এ সম্পর্কে অন্যমতও আছে। ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদ বধ হলেও দেবতাদের চক্রান্ত, লক্ষ্মণের কাপুরষতাকে ছাপিয়ে উঠেছে মেঘনাদের অসম সাহসিকতা ও প্রত্যক্ষকে বীরত্বের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার পরিচয়ে।

পাশ্চাত্য মতে মেঘনাদবধের রসপরিণতি ট্র্যাজিক। মেঘনাদ-এর বধ মানবিক বেদনায় ঋদ্ধ। একটি বীরের অন্যায় মৃত্যু শোকের কারুণ্য সৃষ্টি করেছে। শোকবিদ্ধ রাবণ দেখেছেন 'একে একে নিভিছে দেউটি'। উপলব্ধি করেছেন লঙ্কার অনিবার্য ধ্বংস। রাবণের এই অসহায় বেদনা ব্যক্তি হৃদয়ের হাহাকার-ই ট্র্যাজেডির রসপরিণতি। মেঘনাদের মৃত্যু সেই পরপরিণতিকে রঞ্জিত করেছে।

নিয়তিবাদ এ কাব্যের অন্যতম উপাদান। রাবণ বলেছেন 'বিধি বাম' রাজলক্ষ্মী বলেছেন, 'প্রাক্তনের ফল'। কিন্তু মেঘনাদের অন্যায়ভাবে অপ্রত্যাশিত মৃত্যু, অন্ধ নিয়তি নির্মমতা ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন রাম-লক্ষ্মণের পরিবর্তে রাবণ-মেঘনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। শেষোক্তদেরই তিনি এ কাব্যের প্রধান আকর্ষণস্থল করেছেন। রামচন্দ্রের অনেক মহত্ব থাকা সত্ত্বেও মেঘনাদের প্রতি আত্যন্তিক মমতাবশত কালিমালিপ্ত করেছেন। অনুরূপে লক্ষ্মণের অপরিমেয় সাহস চরিত্রবল, ধৈর্য, সংযম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও দৈবাস্ত্রে শক্তিশালী হয়েও কাপুরুষের মতো মেঘনাদকে বধ করেছে। বীরধর্মের শুধু নয়, মনুষ্যধর্মের অবমাননা, মেঘনাদের বীরগৌরবকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মেঘনাদ মধুসূদনের Favourite Indrajit লক্ষ্মণের কাপুরুষোচিত আচরণের জন্যই ষষ্ঠ সর্গে লঙ্কার পঙ্কজরবি আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

বিভীষণ শুধুমাত্র দেশদ্রোহী নয়, তারও যে একটি দুর্বল হৃদয় আছে সেটি ফুটেছে মেঘনাদের মৃত্যুর পর তার বিলাপে। বিভীষণের বিলাপ একটি স্নেহরসসিক্ত হৃদয়ের বিলাপ।

এ কাব্যের দেবদেবীর ঈর্ষাদ্বেষপরায়ণ। মেঘনাদবধ ও রাবণকে তিলে তিলে ধ্বংস করার জন্য হীন কুচক্রী মানুষের মত কোনো চক্রান্তকেই বাদ দেননি। তাঁরা দৈবাস্ত্র সরবরাহ করেই ক্ষান্ত হননি। মায়ার সাহায্যে সবার চোখের আঁড়ালে, প্রতিপক্ষের শক্তিহরণ করে, অস্ত্রাঘাতে জর্জনিরত করে নিহত হয়েছে। কামনা-বাসনা-ঈর্ষা-ক্রোধ নিয়ে দেবতা ও মানুষ এখানে একাকার হয়ে গেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা মহাকাব্যের ভাবরস ফুটিয়ে তোলার জন্য গুরুগম্ভীর তৎসম, যুক্ত ব্যঞ্জন, ধ্বনি সৌসম্যের জন্য অলঙ্কৃত। ছন্দ গতিশীল, প্রবহমান পয়ার অলংকার উপমার বাহুল্য ধ্বন্যুক্তি অনুপ্রাসের সঙ্গে উপমা হোমোরীয় উপমা রূপক প্রভৃতি শব্দালংকার ও অর্থালংকারে সমৃদ্ধ।

৩৩.১৩ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। ক) কালাগ্নি, দাবাগ্নি, বনরাজি, বায়ুসখা।

খ) বিভীষণ, বিভীষণ, পুষ্প, মঙ্গালবাজনা, অপ্সরা, জয়রবে।

গ) ২৫ জানুয়ারি, জুন ১৮৭৩।

ঘ) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রেবেকা, আত্মনিবেদন, হেনরিয়েটা।

ঙ) ১৮৬০, 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী'।

২। ক) ১৮৪৩, খ) ১৮৬২, গ) বিশপস্ কলেজ, ঘ) মায়াকানন।

৩। মহাসর্প, খাপে, সিক্ত করিল, মেঘাচ্ছন্ন, অগ্নি, অগ্নি, চয়ন করিয়া (তুলিয়া), সাপ, কর্কশ, সেনা, অলংকার, ধনুক।

৪। বাদিএ ____ বাজনা, কাদম্বিনী ____ মেঘমালা, স্কন্দ ____ কার্তিকেয়, দিবিন্দ্র ____ দেবরাজ ইন্দ্র, নক্র ____ কুমীর, আনায় ____ জাল, আহবে ____ সংগ্রামে, যুদ্ধে ; জীমুতেন্দ্র ____ মেঘরাজ ; আসার ____ বৃষ্টি, শব্দবাহক ____ আকাশ।

৫। ক) ৪৮.৬ অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অংশটি দেখুন।

খ) বিরূপাক্ষ, তালজঙ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত, চিক্ষুর।

গ) ঘ), ঙ) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অংশ দেখুন।

অনুশীলনী—২

১। ক) রাজা, বাদশাহদের, সংস্কৃতে, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ।

M#2\D:\EBG-2\Unit-13a Pm6.5\1st proof

খ) বস্তুনিষ্ঠা, চমৎকারিত্ব, সৃষ্টির, অলৌকিকত্ব, কাব্যসম্মত।

গ) সচেতন, শিল্পীর তীক্ষ্ণ, সুনির্দিষ্ট প্রভাব।

ঘ) রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসির, কল্পনাকে, স্নিগ্ধতার, ইলিয়াডের, শৌর্যের।

২। ক) রামায়ণ, মহাভারত/ইলিয়াড, ওডিসি, মেঘনাদবধ কাব্য, বৃত্রসংহার/কুমারসম্ভব, রঘুবংশ/ইনিড, জেরুজালেম উদ্ধার, ছুছুন্দরীবধ কাব্য, ভেকমূষিক যুদ্ধ / রেপ অফ দি লক।

খ) নবীনচন্দ্র সেন, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস।

গ) রৈবতক-এ সূত্রপাত, কুরুক্ষেত্র-তে জটিলতা ও বিস্তার, প্রভাসে-পরিণতি।

৩। ক) বাঙালির রামায়ণী সংস্কার অনুসরণে রচনা।

খ) ১৮৭৫, গ) পোপ, ঘ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪-৭ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর করতে বর্তমান দুটি পাঠ একাধিকবার পড়ুন।

অনুশীলনী—৩

১। ক) ইন্দ্রজিৎ, নিধন, তাৎপর্যমণ্ডিত, মেঘনাদবধে।

খ) যজ্ঞাগার, বটবৃক্ষতল, কৃত্তিবাস, ঐন্দ্রাস্ত্রে।

গ) ভারতীয়, পাশ্চাত্য, অনুকরণে, গতিশীলতা।

ঘ) বীর, করুণ, সম্মিলন।

ঙ) বীরবাহুর, পিতা রাবণ, রাজা রাবণ, মনস্তাপে।

২। ক) বাল্মীকির প্রভাব আছে ; খ) ধ্বংসোন্মুখ চিত্রবিশেষ।

গ) মেঘনাদবধ কাব্য, ঘ) মেঘনাদ

৩-৭ উত্তর সংকেত অপ্রয়োজনীয়।

৪৮.১১ এবং ৪৮.১২ মূলপাঠ অংশগুলি বারবার পড়ুন।

অনুশীলনী—৪

১। ক) ওজস্বিতা, বিস্তৃতি, কল্পনায়, সমুন্নতি, ভাষায়।

খ) কাব্যভাষার, Blank verse, চতুর্দ্দশাক্ষর, কাঠামোয়, প্রবহমান পয়ার।

গ) অ্যাকিলিস, হেক্টর, সুমহান, বিশালতার, উপমার, উপমাগৌরব, হোমারিক, সিমিলি।

ঘ) মহাগীত, মধুচক্র, মধুপান, গৌড়জন, পরিতৃপ্ত।

২-৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য এককেরক বর্তমান মূলপাঠটি একাধিকবার পড়ুন—তাহলে উত্তর করা সহজ হবে।

৩৩.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ সেন (সম্পা)—মেঘনাদবধ কাব্য।

২) অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী (সম্পা)—মেঘনাদবধ কাব্য।

৩) ড. সুরেশচন্দ্র মৈত্র—মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ জীবন ও সাহিত্য।

৪) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প।

৫) ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক বাংলা কাব্য (১ম পর্ব)।

৬) ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়—কাব্যতত্ত্ব বিচার।

৭) ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু—বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ।

একক ৩৪ ❒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুটি কবিতা

গঠন

৩৪.১ উদ্দেশ্য
৩৪.২ প্রস্তাবনা
৩৪.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত
৩৪.৪ মূলপাঠ — ১ সোনার তরী
৩৪.৫ সারাংশ — ১
৩৪.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৩৪.৭ মূলপাঠ — ২ শতাব্দীর সূর্য আজি
৩৪.৮ সারাংশ — ২
৩৪.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা
৩৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৩৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় সত্তর বৎসরের কাব্য জীবন সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। কবিতাগুলিতে কবির নিজের পরিবার, দেশ, সমাজ ও সমকাল থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিপুল ভাবসম্পদ নিয়ে তিনি অসামান্য শিল্প সৃষ্টি করেছে, তার পরিচয় পাবেন। তাই কবিতাগুলি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি —

- ১৯ শতকের শেষার্ধে রচিত আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রথম পর্যায়ের রচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগ থেকে পরিণত কবিমানসের পরিচয় লাভ করবেন।
- গীতিকবিতার বিশেষত রবীন্দ্র-গীতিকবিতার বিবর্তন ধারাটির সঙ্গো সংক্ষিপ্তভাবে পরিচিত হবেন।
- রবীন্দ্র-কবিতাপাঠের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, আধুনিক বাংলা কবিতা ও কবিদের সম্পর্কে আপনার মতামত গড়ে তুলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গীতিকবিতার গঠন সম্পর্কেও কিছু ধারণা পাঠ্য কবিতাগুলি থেকে অর্জন করা সম্ভব হবে।

৩৪.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন দুটি শতাব্দীকে স্পর্শ করে আছে। ১৯ শতকের পরার্ধ আর ২০ শতকের প্রথমার্ধ এ দুটি পর্বই নতুন যুগের ভাব আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে একটিতে নব নব সৃষ্টির উল্লাসে মাতোয়ারা, অপরটিতে

পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও যুগযন্ত্রণার সংশয় ও আর্তিতে সমকালী শিল্পীমানস পুরাতনের ওপর দাঁড়িয়ে নতুনের সন্ধানে ব্যাকুল।

রবীন্দ্রনাথ আপন পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাস করে, তাঁর কবি-আত্মাকে সদা সতর্ক ও জাগ্রত রেখেছেন। মহর্ষি পিতার সান্নিধ্য—তাঁর আবেগ ও মননে ঔপনিষদিক বোধ সঞ্চারিত করেছিল। পরিণত রবীন্দ্র হয়ে উঠেছেন 'কবিমনীষী'। তিনি কবি হয়েও ছিলেন 'ঋষি' আর 'ঋষি' হয়েও জীবনশিল্পী। আচার্য সুকুমার সেনের কথায় "রবীন্দ্রনাথ সর্বভূমির, বিশ্বজীবনের কবি, "কবীনাং কবিতমঃ।" তাঁর মতো মনে-প্রাণে চিন্তায়-কর্মে, দুঃখ-সুখে, জীবনে-মরণে সমদৃষ্টিমান, জীবন-ভাবক কবি মানুষের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গেছে। তিনি জগৎ জীবনকে, তার সৌন্দর্য-মাধুর্যকে নিজের চিন্তন ও অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই মানবসম্পদকে তিনি অনবদ্য শিল্প-সাধনায় সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। মানবমনের এই ভাব-ঐশ্বর্যকে ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ ভাষায় নানা ধারায় ও রূপে রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্র কবি-জীবনের এই কল্পনাসম্ভারকে স্পর্শ করবার একান্ত বাসনায় বর্তমান এককের পাঁচটি কবিতার পরিকল্পনা। এই কবিতা পঞ্চক কবির কাব্য জীবনের বিবর্তনের দুটি পর্বের পাঁচটি পর্ব থেকে নির্বাচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কবিমানস সম্পর্কে আপনার একটি সাধারণ বোধ জন্মাবে। এই উদ্দেশ্যেই 'সোনার তরী', 'নৈবেদ্য', 'বলাকা', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' থেকে একটি করে কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এগুলি সবই গীতিকবিতা—কবির মনের একান্ত ভাবনার ফসল। গীতিকবিতা সম্পর্কে আলোচনা প্রথম এককে আছে। এখানে 'মূলপাঠে'র পর সারসংক্ষেপে কবিতার বিষয়বস্তু ও কবিতা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কিছু বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কবিতাকে সমগ্রত বোঝাবার জন্য। কবিতাগুলি পূর্বাপর পাঠে অনুশীলনীগুলি সাহায্য করবে।

৩৪.৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (ইং ৭ই মে, ১৮৬১খ্রিঃ)। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মাতা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ বাবা-মায়ের চতুর্দশ সন্তান এবং অষ্টম পুত্র। বাড়িতেই প্রথমে তাঁর পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়। কিছুদিনের জন্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়েছেন। শৈশবেই কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রকাশিত কবিতা "হিন্দু মেলার উপহার" (১৪ ফাল্গুন, ১২৮১, ইং ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)। এটি দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'ভারতী'তে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত। 'কবিকাহিনী' (১২৮৫, ইং ১৮৭৮) ও 'বনফুল' (১২৮৭, ইং ১৮৮০) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত গিয়ে, কিছুদিন ব্রাইটনের পাবলিক স্কুলে পড়ার পর, তাকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে মাস তিনেক অধ্যাপক মর্লির কাছে পাঠ নেন। ১৮৮০-র ফেব্রুয়ারিতে কোনো পাঠক্রম শেষ না করেই দেশে ফেরেন। বাড়িতে তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে জোর গানের আসর বসছে। এই পরিবেশে গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১) অভিনয়ের আয়োজন হয়। এরপর একের পর এক তাঁর কাব্য, নাটক ও উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-14 Pm6.5\1st proof

৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ কবির বিয়ে হয়। ১৯শে এপ্রিল, ১৮৮৪ কবির কৈশোরের সাহিত্যসঙ্গী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু কবিকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। দেবেন্দ্রনাথের বড়ো জামাই সারদাপ্রসাদের মৃত্যুতে জমিদারি দেখবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ওপর বর্তায়। এ সময় তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন। মাঘোৎসবের জন্য ব্রহ্মসংগীত, ব্রাহ্মমতের সমর্থনে প্রবন্ধ লেখা, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হিন্দুত্ব নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার মতো নানা ঘটনা ঘটে। আর জমিদারি দেখার ফাঁকে 'হিতবাদীর' সাহিত্য সম্পাদকের দায়ে ওই পত্রিকায় পরপর ৬টি গল্প লেখেন—সার্থক বাংলা ছোটোগল্পের সূচনাও এখানেই। ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে এ সময় গ্রামবাংলার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ চিঠিগুলি লেখেন, তারই গ্রন্থনা 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্নপত্রাবলী'। 'সোনার তরী' (১৩০০ইং ১৮৯৪) এই পর্বেই লেখা। ১৯০১-এ 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ। ওই বৎসরেই বোলপুরে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বা 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা, এটি ১৯২১-এ বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার দু'বছরের মধ্যে স্ত্রীবিয়োগ ও মধ্যমা কন্যার মৃত্যু। ১৯০৭ কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত কবি 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) রচনা করেন। স্ত্রীবিয়োগ-বেদনার স্মৃতিতে তিনি 'স্মরণ' (১৯১৪) রচনা করেন। ইতোমধ্যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-এ দেশবাসী কবিকে সম্বর্ধনা জানায় (১৯১২, ২৮শে জানুয়ারি)। অক্টোবর, ১৯১৩ ইংরেজি 'Song offerings' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তনে তাঁকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করে।

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' (১৯১৪) "সবুজের আহ্বান" কবিতা প্রকাশ। এ সময়েই রচিত কবিতার নতুন বাণী, নতুন ছন্দ 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের এই নতুন ধারা বাংলা কাব্যে নতুন শৈলী ও ভাবনা নিয়ে এসেছে। ১৯১৯-র জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করলেন। মে ১৯২০ থেকে জুলাই ১৯২১ বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে 'বিশ্বমৈত্রীর' কথা প্রচার করে বেড়ালেন। এ সময়েই 'বিশ্বভারতীর' সূচনা। দেশে তখন চলছে গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন। নানা দেশের আমন্ত্রণে কবিকে প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণে যেতে হয়। পেরুর স্বাধীনতা যুদ্ধে শতবর্ষ উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি বুয়েনোস এয়ারিসের শহরতলিতে কবিভক্ত ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্য গ্রহণ করেন (১৯২৪)। তাঁকেই কবি বিজয়া নাম দিয়ে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ (১৯২৫) উৎসর্গ করেন। দেশে ফিরে গান্ধিজির চরকা ও খদ্দর নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ১৯৩০-এ প্যারিসে কবির প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়। তিনি অক্সফোর্ডে হির্বার্ট বক্তৃতাও দেন। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ ঘুরে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। ১৯৩২ গদ্যছন্দে কাব্য রচনার সূচনা করলেন, 'পুনশ্চ' (১৯৩২) প্রকাশিত হল। ১৯৩৫ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ ওসমানিয়া, ১৯৪০-এ অক্সফোর্ড (শান্তিনিকেতনে এসে) কবিকে ডি.লিট. উপাধি দেন। এই বৎসর কবি প্রায় একমাস শয্যাগত থাকেন। এর মধ্যে লেখেন 'রোগশয্যায়' (১৯৪০) 'আরোগ্য' (১৯৪১) ও 'জন্মদিনে' (১৯৪১)। মাঝে একটু সেরে উঠলেও, আবার অসুস্থ হলে কলকাতায় এনে তাঁকে অস্ত্রোপচার করা হয় (৩০ শে জুলাই, ১৯৪১), সেদিনই করি শেষ রচনা 'তোর সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'। অবশেষে ৭ই আগস্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮) কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

একাশি বছরের জীবনে প্রায় আটষট্টি বছর সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কবিতা-কাব্য রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে তাঁর অসামান্য কল্পনা ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রকাব্য বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছে। তিনি বাংলা কাব্যকে বাংলা ভাষার অন্তরশক্তি, ভাবমহিমা কল্পনালীলা ও ছন্দোগৌরবে, দেশকালের প্রেক্ষিতে মনন-চিন্তা-অনুভূতির রঙে রঞ্জিত করে আধুনিক মনের উপযোগী করে

M#2\D:\EBG-2\Unit-14 Pm6.5\1st proof

তুলেছেন। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর একটি বিবর্তনসূত্র আছে, সেগুলিকে কয়েকটি পর্বে চিহ্নিত করা যায়। 'কবিকাহিনী', 'বনফুলে' কবির কাব্যচর্চার হাতে খড়ি। প্রথমপর্ব বা শিল্পিত কাব্যধারার সূচনা 'সন্ধ্যা-সংগীত' (১৮৮২), 'প্রভাত-সংগীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) থেকে ধরা হয়। এগুলির মধ্যে কবির কৈশোর-কল্পনা, ক্রমশ অস্পষ্ট কুহেলিকা থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথসন্ধানী বলা যায়। একটি অনির্দেশ্য প্রেমানুভূতি এসময় কবির হৃদয়-অরণ্যে পথ-খোঁজায় ব্যাকুল দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্বে যার নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় পাওয়া গেল 'মানসী' (১৮৯০) 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬) ও 'কল্পনা' (১৯০০) কাব্যে। কবি এ সময় লীলাচপল প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যমাধুরীর সঙ্গে কালিদাসের তথা সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের সৌন্দর্য লোকে বিচরণ করে, দেশকালের আবহমানতায় নির্মিত স্বকীয় কবিসত্তাকে আবিষ্কার করেছেন। বস্তুবিশ্বের সঙ্গে কল্পনার সাহায্যে চিরন্তন সৌন্দর্য জগৎকে খুঁজে পেয়ে, নবতন আত্মোপলব্ধির আনন্দ হর্ষ-বিষাদ, কল্পজগৎ আর বাস্তবজগৎ একাকার হয়ে কবিতায় নতুন ভুবন রচনা করেছেন। চিত্রকল্পে, শব্দযোজনায়, কাব্যছন্দে, সে পরিচয় আছে। এই সময়ের 'সোনার তরী' শীর্ষক কবিতা দ্বিতীয় পর্বের 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। সোনার তবী কাব্যে প্রথমে দেখি রহস্যময় সৌন্দর্য জগতের মধ্য থেকে উঠে আসা কতকগুলি প্রশ্ন কবি চিত্তকে পীড়িত করছে। বাস্তব পৃথিবীর সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, আর সৌন্দর্য জগতের ঊর্ধ্বগত আকাশে বিহারের আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সৌন্দর্যের জগতে নিরুদ্দেশ যাত্রার অমোঘ আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করেছেন। এই জিজ্ঞাসা থেকেই কবির 'জীবন-দেবতা' ধারণার সূচনা।

তৃতীয় পর্বে কবি সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মভাবে জগতে বিচরণ করেছেন। জীবন দেবতা কল্পনা ও বিশ্বানুভূতি, ভগবৎ-ভক্তি, ব্যক্তিসত্তার অতীত রহস্যময়ী নিয়ন্ত্রী শক্তির পরিচয় পেয়ে এক সময় কবি মনে যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছিল, তা-ই কবিতার প্রেরণা হয়ে দেখা দিল। প্রকাশিত হল — 'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'খেয়া' (১৯০৬), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) ও 'গীতালি' (১৯১৪) কাব্য। শেষোক্ত কাব্যত্রয়ী গীতিধর্মী। উপরের সবকটি কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতাও নির্বাচিত গানের কবির স্বয়ংকৃত ইংরেজি অনুবাদ W.B. Yeats-এর ভূমিকাসহ Gitanjali (Song Offerings) (১৯১২) প্রকাশিত হয়। এখানে কবির বিশ্বানুভূতি থেকে অসীম বা 'ভূমা'র ভাবনার সূত্রপাত। ভূমা কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণে নয়, প্রকৃতির সীমাহীন রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর লীলাচঞ্চল পরিক্রমা। এ পর্বের ভিন্নতর রসের একটি কবিতা নৈবেদ্যের 'শতাব্দীর সূর্য' মূল পাঠের বিষয়।

চতুর্থ পর্বে রবীন্দ্রকাব্যে সুস্পষ্ট দিক পরিবর্তন ঘটেছে। 'বলাকা' (১৯১৬), 'পূরবী' (১৯২৫) ও 'মহুয়া' (১৯২৯) এই তিনটি কাব্য নতুন জীবনদর্শনের পরিচয়বাহী। এতদিন ছিল বস্তু বিশ্ব থেকে বিশ্বাতীত সত্যের সন্ধান, প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় সীমা থেকে অসীমে যাত্রা এবার অসীম থেকে সীমাকে দেখা, বিশ্বজীবনের উপলব্ধি থেকে বস্তুজগৎকে দেখা—অর্থাৎ ভৌমচেতনা থেকে বিশ্বচেতনা, এবার বিশ্বচেতনা থেকে ভৌম জগৎকে দেখা। তাই কবি এ পর্বে অনেকটা প্রাজ্ঞ-দার্শনিক, মননশীল জীবনদ্রষ্টা। তিনি পুরাতনকে নতুনরূপে দেখেছেন, পুরাতন যৌবনোজ্জ্বল আবেগঋদ্ধ প্রেমানুভূতির পরিবর্তে অনেক শান্ত ও সংযত, আদর্শনিষ্ঠ। এই দার্শনিক ভাবানুভূতি তাঁর ছন্দ রীতিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বলাকার এই নতুন ভাবরাশি, নতুনতর ছন্দের অনিয়মিত, অসম ছত্রের মুক্তক ছন্দে অভিব্যক্তি পেয়েছে। 'বলাকা'র 'তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে' (শঙ্খ) কবিতা এককের মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্য মুক্তকে রচিত নয়।

পঞ্চমপর্বের কাব্যগুলি — 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) 'পত্রপুট' (১৯৩৬) ও 'শ্যামলী' (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থকে পুনশ্চবর্গের কাব্যগ্রন্থ বলা চলে। পুনশ্চতেই গদ্য কবিতার সূচনা, 'শ্যামলী' পর্যন্ত

এই গদ্য কবিতার বিস্তার এবং কবির আত্মপ্রকাশের বাহন। রবীন্দ্রকাব্যধারার যে সামান্য পরিচয় ইতোমধ্যে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে এটি লক্ষণীয় যে তিনি সর্বদাই, তাঁর অতীত ও কীর্তিকে অতিক্রম করে নিত্য নতুন পথে অজানার সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। সত্তর অতিক্রান্ত কবি বিচিত্র ভাব ও রূপচর্চার মধ্য দিয়ে কাব্যশিল্পের চরমোৎকর্ষে পৌঁছেও তৃপ্ত নন। এই অতৃপ্তির বেদনা থেকেই 'তিনি হঠাৎ ছন্দোহীন ও গদ্যছন্দে প্রসাধনবর্জিত, কল্পনার ঐশ্বর্যরিক্ত কবিতা রচনা' করলেন। এ পর্বে তিনি ছন্দোমোহ সৃষ্টির পরিবর্তে, 'অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ও ব্যাকুলতায় কাব্যের নিগূঢ় আবেদন পাঠক চিত্তে' সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ পর্বের কবিতায় কোনো বিশেষ জীবন দর্শন বা দার্শনিক তত্ত্ব প্রবণতা হলেও, কবিতা তার নিজস্ব ভাবগরিমা, বিষম-গৌরব ও কল্পনার মহনীয়তায় হৃদয়কে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ এভাবে এ পর্বের কাব্যগ্রন্থে ন্যূনতম অলঙ্কার প্রয়োগে প্রধানত ভাবসৌন্দর্যের ওপর নির্ভর করে কাব্যরচনার পরীক্ষা করে যে ধারাটির সূচনা করেছেন, তা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের দ্বারা বহুচর্চিত হয়েছে। এককের ৪র্থ ও ৫ম মূলপাঠের জন্য নির্বাচিত দুটি কবিতা যথাক্রমে পত্রপুট ও শ্যামলী থেকে গৃহীত হয়েছে।

ষষ্ঠ বা শেষপর্বের কাব্য 'প্রান্তিক' (১৯৩৮), 'আকাশ প্রদীপ' (১৯৩৯), 'নবজাতক' এবং 'সানাই' (১৯৪০), 'রোগশয্যায়' (১৯৪০), 'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শেষলেখা' (১৯৪১)। প্রথমোক্ত চারটি কাব্যগ্রন্থ কবি কল্পনার শিথিল, এলায়িত ভঙ্গি ; অসংবৃত বস্তুপুঞ্জের ভারে আপাতভাবে দুর্বল মনে হলেও পরবর্তী মুহূর্তে কাব্যের অন্তর্নিহিত রূপটিকে "গদ্যছন্দের স্মৃতিবাহী সহজ সরল ছন্দ প্রয়োগে" ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু 'রোগশয্যায়' থেকে 'জন্মদিনের' কবিতাগুলিতে রোগজীর্ণ কবি যেন আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করেছেন এবং তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রূপাতীত সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মৃত্যুকে স্বীকার করেও তিনি জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাস ব্যক্ত করেছেন। শেষপর্বে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বিশ্বাস, স্বার্থপর লোভীদের প্রতি ভর্ৎসনা তীব্র হয়ে উঠেছে। এ সময় শব্দচয়নে, চিত্ররচনায়, ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে কবি রোমান্টিক সৌন্দর্যব্যাকুলতার পরিবর্তে, নিরাসক্ত, তির্যক, ক্বচিৎ বিবর্ণ, তীব্র বাগ্‌বিন্যাসে ভিন্নতর রূপ রীতির সৃষ্টি করেছেন। 'রোগশয্যায়' কাব্যে ব্যাধিক্লিষ্ট দৃষ্টির মমতা নিয়ে দেখা জীবনের যে সূক্ষ্ম ও সত্যরূপ এবং বিভীষিকা ও অসংলগ্ন চিন্তা ভারাক্রান্ত মনের উদ্ভট দুঃস্বপ্ন-পীড়িত অনুভূতির এরকম আবেগময় শিল্পসম্মত বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। এরই সঙ্গে আছে 'আরোগ্য' রোগমুক্তির স্বস্তি, আনন্দানুভূতি। 'জন্মদিনে' পৃথিবীর প্রতি কবির প্রসন্ন বিশ্বাসের কথা রূপায়িত হয়েছে।

কাব্যকথা প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'জন্মদিনে' পর্যন্ত কাব্য ও কবিমানসের এই পরিচয় থেকে এককের পাঁচটি কবিতার সম্যক রসোপলব্ধি সম্ভব হবে আশা রেখেই এই পরিক্রমা।

৩৪.৪ মূলপাঠ — ১ ঃ সোনার তরী

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,

M#2\D:\EBG-2\Unit-14 Pm6.5\1st proof

ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা—
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে, খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়মসী-মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা-
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা॥

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে—
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে—
দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে॥
ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে—
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও—
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে॥

যত চাও তত লও তরণী' পরে।

আর আছে ?—আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এত কাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা ক'রে॥

ঠাঁই ঠাঁই, ঠাই নাই — ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছ ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥

শিলাইদহ। বোট
ফাল্গুন ১২৯৮

৩৪.৫ সারাংশ — ১

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, অবিরাম বর্ষণ থেকে ক্ষণিক ক্ষান্তির মুহূর্ত। এরই মধ্যে এক কৃষক নদীর ধারে একাকী বসে আছে, কোনো ভরসা নেই। জলভরা খরস্রোতা নদী, দুর্বার বেগে বহমান। তার চারিদিকে রাশি রাশি বোঝাই কাটা ধান।

ছোটো খেতের ধারে একলা বসে, তখন পরপারের তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামটি আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছিল। দূর থেকে গান গাইতে গাইতে কে যেন আসছে, দেখে মনে হল সে যেন চেনা। কোনো দিকে না তাকিয়ে সে পালতোলা নৌকায় ঢেউ তুলে কোথায় চলেছে। কৃষক মাঝিকে কাতর কণ্ঠে কূলে নৌকা ভেরাবার জন্য অনুরোধ করল। তার কেটে রাখা সোনার ধান তুলে নিয়ে তারপর সে যেখানে ইচ্ছা যাক—এটাই একান্ত ইচ্ছা।

অনুরোধ মত নৌকায় সমস্ত তুলে দিয়ে তাকে করুণা করে নিয়ে যাওয়ার কথা বলায় উত্তরে 'ঠাঁই নেই' বলে সোনার ফসল নিয়ে গেলেও, কৃষক প্রবহমান নদীর তীরে নিঃসঙ্গা ও অচল হয়ে বসে রইল।

৩৪.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'সোনাতর তরী' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা সোনার তরীর রচনা স্থান শিলাইদহ, কাল—ফাল্গুন ১২৯৮, ইং

ফেব্রুয়ারি ৪ মার্চ ১৮৯২। কবিতাটির নামকরণ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'সোনার তরী' সোনায় তৈরি তরী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এটি ব্যঞ্জনাগর্ভ। জীবনের সাধনায় যে স্বর্ণসম্ভার, তাই তো ফসল, সেই ফসল বহন করে যে তরী তা-ই সোনার তরী। কবিতার এই নামকরণটি আক্ষরিক-অর্থ-অতিরিক্ত অন্যতর অর্থে সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। সংসার-তরণীতে কবি তাঁর সৃষ্টির সমস্ত সম্পদ তুলে দিলেও, সংসার কবিকে গ্রহণ করল না। মহাকালরূপী নেয়ে ইতিহাসরূপ সোনারতরী নিয়ে সোনার ধান রূপ জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে তুলে নিলেও, স্রষ্টাকে গ্রহণ করে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মানুষের শিল্প, তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সঞ্চিত থাকে। জগৎ স্রষ্টাকে চায় না, তার শিল্পকে সৃষ্টিকে চায়, এটাই চিরন্তন সত্য। মানবজীবনের এই চিরন্তন সত্যটি আলোচ্য কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে বলে কবি কবিতাটির নামকরণ করেছেন 'সোনার তরী'। সোনার তরী মানব সংসারের তরী যাতে কবি বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে নিজের সৃষ্টি সম্ভারকে তুলে দিলেও "ঠাই নাই, ঠাই নাই—ছোট সে তরী"—তাই কবি স্বয়ং নির্জনতায় নির্বাসিতা। এ সব বিচারে কবিতার নামকরণ তাই সার্থক ও সুন্দর। এ পর্বে কবি আত্মস্থ, তাঁর প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ—রবি-রশ্মির মধ্যাহ্নদীপ্তি বিচ্ছুরিত। প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে কবির দৃষ্টি কল্পলোকের আলোকচ্ছটা থেকে বাস্তব জগতের উদার আকাশ-বাতাসে স্থাপিত। এ সময় কবির সৌন্দর্যানুভূতি ও বিশ্বানুভূতি প্রবলভাবে প্রকাশিত। কবি-কল্পনায় কবিত্বে প্রকাশ-ভঙ্গির চমৎকারিত্বে, ভাষার ঐশ্বর্যে ও ছন্দের বৈচিত্র্যে কবিতাগুলির দীপ্যমান। 'সোনার তরী' তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে যুক্ত হয়েছে, একটি তত্ত্ব যার ব্যাখ্যা নানা কবিতায় রূপে ভিন্ন, স্বরূপে এক।

কবিতাটি রচনার সময় কবি জমিদারি দেখাশোনার কাজে কখনো শিলাইদহ, সাজাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসরে বাস করেছেন। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর অনুভবে, রঙে, রূপে কল্পনায়, নিত্য নতুন হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। পল্লীর নরনারীর সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার সঙ্গো পরিচয় নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। এই পরিচয় সূত্রেই 'সোনার তরী' কাব্য। 'সোনার তরী' কবিতা এই অনুভবের সৃষ্টি। এখানেও প্রকৃতি ও মানুষ, কবির অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবলোকের সঙ্গো একাকার হয়ে গেছে। একে বলা যেতে পারে বিশ্বানুভূতি—এটি সম্ভব কবির সৃষ্টিপ্রেরণা বা অন্তর্দেবতার অন্তঃপ্রেরণায়, সম্ভবত কবির এই অন্তর্দেবতাই সোনারতরী কবিতার 'নেয়ে'। অন্তর্দেবতা কোনো অলৌকিক শক্তিধর নন, কবির প্রকাশপ্রেরণা, যিনি কবির মনের মধ্যে বসে সমগ্র জগৎকে সাহিত্যে রূপদান করছেন। প্রকৃতি—সোনার তরী কবিতার উৎস, চলমান নদীস্রোত, যার মধ্যে কবি জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক উপলব্ধি করেছেন, তাকে এখানে দেখেছেন সাংকেতিকতায়, রহস্যময়, রূপকের ব্যবহারে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী রূপে।

'সোনার তরী' কাব্যে কবি নদীমাতৃক বাংলাদেশের রূপ, পদ্মার প্রবহমানতা, বিচিত্র খণ্ড খণ্ড রূপকল্প ও চিত্রকল্পের ভিতর দিয়ে, কখনও সাঙ্কেতিক রহস্যময়তায়, কখনো বর্ষা প্রকৃতির বিষাদ উজ্জ্বলতায় প্রকাশিত হয়েছে। 'সোনার তরী' কবিতাটিও এরকমই এক ঘন বর্ষায় আবৃত নদীচরের নিসর্গচিত্র। কবির ভাষায় পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গো তাঁর একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, সেটি এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

'সোনার তরী' কবিতা বহু-বিতর্কিত কবিতা। এর বস্তু সত্য ও ভাবসত্য নিয়ে নানা মত আছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির পটভূমিকা বর্ণনা করেছেন— "…. ছিলাম পদ্মার বোটে। জলভারানত কালো মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরু শ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষায় পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে ধেয়ে চলেছে…..। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাটা ধানে বোঝাই চাষীদের নৌকা….. ভেসে চলেছে। এই …… ধানকে বলে জলি ধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত।" ……. ঐ বাদলদিনের ছবি সোনার তরী কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন

ও তার ছন্দে প্রকাশিত। কেউ কেউ এতে একটি রূপকের সন্ধান পেয়েছেন। রূপক ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন — "সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম। ..... মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে, জীবনের ক্ষেত্রটা দ্বীপের মত ... সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে। একটি কণাও ফেলে দেবে না, কিন্তু যখন মানুষ বলে....... আমাকেও নাও, আমাকেও রাখ, তখন সংসার বলে — তোমার জন্য জায়গা কোথায় ?" — মহাকাল মানুষের কর্মকীর্তি বহন করে রক্ষা করে, কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করে না। এ কবিতাকে কেউ কেউ বস্তুবিশ্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বের রূপক হিসেবেও দেখেছেন। কবিতার মধ্যে যে সমস্ত প্রতীক বন্ধন করেছেন, তা হল ঃ সোনার তরী — বিশ্বের চিরন্তন সৌন্দর্য, মাঝি — সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, নদী — অখণ্ড কালপ্রবাহ, খেত — জীবনের কর্মক্ষেত্র, ধান — সৌন্দর্যের সঞ্চার। ড. নীহার রঞ্জন রায় বিশুদ্ধ নিসর্গ কবিতা হিসেবেই 'সোনার তরী'কে দেখেছেন। শ্রাবণের ঘনবর্ষা, দুকূলভরা খরস্রোতা নদী প্রভৃতির অপার সৌন্দর্য স্পর্শকাতর কবিচিত্তে এক অপরূপ বেদনাপ্লুত রস ও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব রাগিণী সৃষ্টি করে। সেই রাগিণীই সোনার তরী কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। এর কাছে তত্ত্ব অবান্তর। শূন্য নদীতীরে একা থাকার বেদনা, নিজেকে একান্ত করে দান করতে না পারায়, কোনো কোনো ভাব-মুহূর্তে প্রকৃতির নিষ্ঠুর আচরণ বলে মনে হয়—এ তো কোন তত্ত্ব নয়, অনুভূত ভাব মাত্র। সুতরাং তত্ত্ব নিয়ে বিব্রত হওয়ার কারণ নেই।

কিছু কিছু সমালোচক কবিতাটির একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে 'সোনার তরী'কে শুধুমাত্র প্রকৃতির কবিতা বলা ঠিক হবে না, তাঁরা এতে একটি দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিফলিত হতে দেখেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা মানুষের জীবন এক খণ্ড চাষের জমি বিশেষ। এ জীবন মহাকাল বেষ্টিত, জীবনের ছোটো খেতটুকুও খরস্রেতা নদী ঘেরা। মানুষ তাঁর সারাজীবনের সম্পদ সংসার-তরণীতে বোঝাই করে দিলেও, সংসার তাকে গ্রহণ করলেও, স্রষ্টাকে গ্রহণ করে না — ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই — ছোট সে তরী। মহাকালের কাছে ব্যক্তি নয়, তাঁর সৃষ্টিই প্রধান। সে সৃষ্টিকে রক্ষা করে। দেশ-কাল নিরপেক্ষ এই চিরন্তন দার্শনিক সত্যটি এই কবিতার প্রধান প্রতিপাদ্য—কিছু সমালোচকের এই বিশ্বাস।

সোনার তরী-র ছন্দ লক্ষণীয়। মিশ্রবৃত্তের পক্ষে অভূতপূর্ব (৮ + ৫) ১৩ মাত্রার ছত্র বিন্যাস স্তবক গঠনে ৮ + ৫, ৮ + ৫ , ৮ +৮ + ৮ + ৫ এবং ৮ + ৫ ভাবের উপযোগী একটি সুর যোগ করেছেন। প্রথম ৮ + ৫ মাত্রার দ্বিপার্বিক দুটি ছত্রের মাত্রা সমকত্ব ও অন্তমিল যে ধ্বনিসৌকর্য সৃষ্টি করে, পরবর্তী তিনটি ৮ মাত্রার সমধ্বন্যাত্মক তিনটি পর্ব বিন্যস্ত করে একটি সুরের ঐকতান নিয়ে আসা হয়েছে। তার সঙ্গে ৮ + ৫ মাত্রার শেষ ছত্রের মিলের সঙ্গে পূর্ববর্তী ৫ মাত্রার পর্বের অন্ত্যমিল কাব্য সুষমা নিয়ে এসেছে। এভাবে দুটি স্তবক কবিতাতে অভিনব ও বিরল ছন্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। কবিতাটিতে কোনো যুক্ত বা যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির প্রয়োগ না থাকায় অসামান্য সুরতরঙ্গিত রমণীয়তা সৃষ্টি করেছে। চিত্র সন্নিবেশের কৌশলেও কবিতাটি আকর্ষক। ভরা নদী, খরজল, মেঘমেদুর পরপার, শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তরী, মাঝি এ সবের সঙ্গে কবি হৃদয়ের ব্যাকুলতা একটা করুণ রাগিণী সৃষ্টি করেছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ *ভরা নদী ক্ষুরধারা* — বর্ষায় নদীজল ক্ষুরের মতো ধারালো অর্থাৎ খরস্রোতা বোঝানো হয়েছে।

তরু ছায়া মসীমাখা (কালিমাখা) — আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় গাছের ছায়ায় ঘেরা গ্রাম অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে

M#2\D:\EBG-2\Unit-14 Pm6.5\1st proof

মনে হচ্ছে।

বাঁকা জল করিছে খেলা — বাঁকা শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করা যায়। একটি অর্থে নদী বেঁকে বেষ্টন করে আছে, অপর ব্যঞ্জনগর্ভ অর্থ 'কুটিল বা প্রতিকূল'।

কে আসে পারে — 'কে' এই শব্দটি ব্যবহার করে অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝান হয়েছে।

দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে — বর্ষা সমাগমে কাটা ফসল নিয়ে তরীর অপেক্ষায় যখন আছেন এমনি সময় দূর থেকে দেখে কোন চেনা চেনা নেয়েকে যেন দেখা যাচ্ছে — এমনি সাধারণ অর্থ হলেও উদ্ধৃতিটি ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। যাকে দেখে 'মনে হয় চিনি উহারে' সে যে কবির হৃদয়গত অন্তর্যামী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যভাবনায় ব্যক্তি আমির অতিরিক্ত পৃথক এক অন্তঃপ্রেরণা বা অন্তর্শক্তি যাকে অনেকে অন্তর্দেবতা বা জীবনদেবতা বলেন তার কল্পনা করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতায় এরা আভাস, চিত্রা'য় তার পরিণতি। ইনিই কবির প্রেরণা, তাঁর কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী। *কোন্ বিদেশে* — এখানে বলতে কোনো অজানা জগতে।

শুধু তুমি নিয়ে যাও— সৃষ্টির যে শ্রেষ্ঠ সম্ভার, মহাকালের তরণীতে তুলে দেওয়ার মধ্যেই স্রষ্টার সার্থকতা। কিন্তু কালের মাঝি কোনোদিকে দৃকপাত না করে নিতান্ত নিরাসক্ত চিত্তে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে স্রষ্টার একান্ত অনুরোধ সে জীবনের যা কিছু অর্জিত ফল তাকে যেন নিয়ে যায়।

এখন আমারে লহো করুণা করে — একলা জনবেষ্টিত ছোটো খেতে বসে আছি। করুণা করে তোমার তরীতে তুলে নাও। এর আধ্যাত্মিক অর্থ হ'তে পারে, আমাকে সকল কর্মবন্দি থেকে মুক্ত করো। অথবা আমার শিল্পের সঙ্গে আমারও অস্তিত্বকে যুক্ত করো।

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী — আজীবন সঞ্চিত সোনার ফসল, সংসার তরণীতে তুলে নিয়েছেন অর্থাৎ কবির সৃষ্টি সমাদৃত হওয়ায় তিনি আনন্দিত। কিন্তু সেখানে তাঁর স্থান না হওয়ায় — শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি — তিনি একাকিত্বের বেদনায় বিষণ্ণ।

অনুশীলনী — ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে এই এককে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। প্রয়োজনে মূলপাঠ — ১ একাধিকবার পড়ুন, তাহলেই প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) ছত্র পূরণ করুন

একখানি ছোট খেত, আমি একেলা —

....

পরপারে দেখি আঁকা

....

....

M#2\D:\EBG-2\Unit-14 Pm6.5\1st proof

প্রভাত বেলা

এ পারেতে ছোট খেত, আমি একেলা ॥

খ) যেয়ো যেথা যেতে চাও

....

....

ক্ষমিক হেসে।

গ) চতুর্থ পর্বে কবি অনেকটা প্রাজ্ঞ দার্শনিক __________ __________ যিনি পুরাতনকে __________ দেখেছেন, পুরাতন __________ আবেগঋদ্ধ __________ পরিবর্তে অনেক শান্তি ও সংযত, __________ ।

ঘ) রবীন্দ্রনাথের পঞ্চমপর্বের কাব্যগুলি হল—

পুনশ্চ __________ পত্রপুট __________

২) সঠিক উত্তরে ঠিক (✔) চিহ্ন দিন ঃ

ক) 'বলাকা' কাব্যের প্রকাশ — ১) ১৯১৪ খ্রিঃ
২) ১৯১৬ খ্রিঃ
৩) ১৯১৩ খ্রিঃ

খ) 'পত্রপুট' কাব্য প্রকাশ — ১) ১৯৩৪ খ্রিঃ
২) ১৯৩৫ খ্রিঃ
৩) ১৯৩৬ খ্রিঃ

গ) 'রোগশয্যায়' কাব্য প্রকাশ — ১) ১৯৪০ খ্রিঃ
২) ১৯৪১ খ্রিঃ
৩) ১৯৩৮ খ্রিঃ

ঘ) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্য — ১) জন্মদিন
২) শেষ লেখা
৩) শেষ সপ্তক

৩) 'সোনার তরী' কবিতা রচনা ও 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল লিখুন।

৪) কোন্ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রথম 'গদ্য কবিতা' রচনার সূচনা করেন ? কাব্যগ্রন্থটির রচনা কাল লিখুন।

৫) রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন। আলোচনা ৫০টি

M#2\D:\EBG-2\Unit-14 Pm6.5\1st proof

শব্দের মধ্যে সীমাবন্ধ রাখুন।

৬) 'সোনার তরী' কথাটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন (৩০টি শব্দ)।

৭) 'সোনার তরী' কাব্য রচনাকালের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনার যতটুকু জানা আছে তা বর্ণনা করুন। (৫০টি শব্দে)।

৮) 'সোনার তরী' কবিতা প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা বিস্তৃত করুন।

৯) 'সোনার তরী' কবিতায় কিছু সমালোচক দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৩৪.৭ মূলপাঠ — ২ ঃ শতাব্দীর সূর্য আজি

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বেজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

৩৪.৮ সারাংশ — ২

অস্ত্রে অস্ত্রে যখন রক্তাক্ত সংগ্রাম চলছে, তার মধ্য দিয়েই (ঊনবিংশ) শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্ত গেল। কুটিল ফণা তুলে নির্মম সভ্যতা নাগিনী তার বিষদাঁত নিয়ে উদ্যত। লোভী স্বার্থান্বেষীদের মুখোশ খসে গিয়ে বেধেছে সংঘাত। তারা জাতিপ্রেমের নামে, ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে বর্বরতায় মেতে উঠেছে। শ্মশান কুকুরের মতো একদল কবি এর প্ররোচনা দিয়ে জয়গান গাইছে।

৩৪.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা , কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'শতাব্দীর সূর্য আজি' রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য (প্রকাশ ১৩০৮, ইং ১৯০১) কাব্যগ্রন্থের ৬৪ সংখ্যক কবিতা। কাব্যের মতো কবিতার রচনাকাল ১৩০৭ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ইং ১৯০০-১৯০১। কবি এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির কোনো নাম দেননি। কবিতার প্রথম ছত্র বা সংকলনের সংখ্যায় এর পরিচয়। নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতাই কবির ঈশ্বর বা জীবননাথের জন্য নিবেদিত। "পারিবারিক শিক্ষা", ব্রাহ্ম-আন্দোলনের কেন্দ্রে অবস্থান, বিশেষত পিতা মহর্ষি দেবের সাহচর্যের ফলে কবির মনে কিছু ধর্মসংস্কার ও ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ভগবদ্‌ভক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এক সময় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্যের পদও গ্রহণ করেছিলেন। তবু তিনি কবি, পৃথিবী ও মানুষ তাঁর ছিল প্রথম আশ্রয় ; সংসারের অসংখ্য কাজের জন্য, দৈনন্দিন জীবনের নানা সংশয়-সংকট সামাজিক-রাজনৈতিক নানা ঘটনা ও প্রশ্ন তাঁকে ভাবিয়েছে, ব্যাকুল করেছে, তারই প্রতিক্রিয়া কখনও কবিতায় প্রবন্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান কবিতা এমনই একটি ঘটনায় আশ্রয়ী যা মনুষ্যত্বের অবমাননার দ্বারা ধিক্কৃত। কবিকে এ সময়ে আমরা বিশেষভাবে বিশ্বমনস্ক দেখতে পাই। আফ্রিকার জুলু বিদ্রোহ, বুয়র যুদ্ধ বা চীনের বক্সার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত বর্তমান কবিতা তার স্বাক্ষর। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়—১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ৯০টি নৈবেদ্য লিখে ফেলেছেন। বর্তমান ৬৪ সংখ্যক কবিতা এই সময়ের মধ্যেই লেখা। নৈবেদ্যের কবিতাগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিকে উৎসর্গ করেছেন। কাব্যের অধিকাংশ কবিতা প্রেম যৌবন সৌন্দর্য অথবা জীবন-প্রৈতি জয়গান থাকলেও এর আড়ালে একটি তত্ত্ব, চিন্তা কল্পনা কাজ করেছে। একটি বিশেষ তত্ত্বও মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেটি ব্রাহ্মমতের দ্বারা প্রভাবিত। এখানে রসের পরিবর্তে অনেক সময় ধর্ম ও নীতিবোধ প্রধানতর কাজ করেছে। উচ্চভাব ও স্পষ্ট বক্তব্য কবিতার প্রাণ। অপর কয়েকটি কবিতা সমাজ ইতিহাস, দেশপ্রেম, মনুষ্যধর্ম ও মানবিক আবেদনে তীব্র। তীক্ষ্ণ বক্তব্যে ক্ষুরধার অথচ মার্জিত, মহত্ত্বব্যঞ্জক ও ওজোগুণসম্পন্ন।

এ সময়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজরা বুয়রদের দেশ আক্রমণ (১২ অক্টোবর ১৮৯৯-৩১মে ১৯০২) করে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ও চীনে শোষণক্লিষ্ট চীনারা বিদেশী বিতাড়নের জন্য 'বক্সার বিদ্রোহে'র (১৯০০ খ্রিঃ) সূচনা করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমাজভেদ' প্রবন্ধে ('স্বদেশ') এ প্রসঙ্গে লিখেছেন — "সম্প্রতি য়ুরোপে এক অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। .... সেই জন্যই বোয়ার পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্ম প্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ৬৪ সংখ্যক কবিতা রচনা। কবি তখন শিলাইদহে। তিনি লক্ষ্য করেছেন নেশনতন্ত্রী ইউরোপ—অর্থ-বিত্ত-বৈভবের নেশায় মত্ত হয়ে হিংস্র আক্রমণে নেশন-এর ধুয়া তুলে মনুষ্যত্বের অবমাননা করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য জাতিবৈরের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বার্থপর দেশপ্রেমের মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কবি এইসব জাতিস্বার্থ প্রণোদিত যুদ্ধকে হিংসার উৎসব বলে গণ্য করেছেন, স্বার্থপরায়ণ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। নতুন শতাব্দীর উজ্জ্বল সূর্যোদয়ের দেখা নেই, শতাব্দীর শেষ সূর্য ধ্বংসের মধ্য দিয়েই এভাবে অস্তমিত হল। এই বক্তব্যই পত্রপুটের ১৬ সংখ্যক কবিতায় (আফ্রিকা) ভিন্ন ভাবে ও রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

* **পাদটীকা** — বুয়র ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু ওলন্দাজ ১৬৫২ খ্রিঃ প্রথম বসতি স্থাপন করে চাষবাস শুরু করে। এদেরই কিছু স্থানীয় অধিবাসী 'হটেনটট্' মেয়েদের বিয়ে করে স্থায়ী হয়। এই মিশ্র জাতি 'বুয়র' নামে পরিচিত। পরে ফরাসি, জার্মান, সুইডিসরা নানা ধরনের অত্যাচারে নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এখানে আসে। ইংরেজ

M#2\D:\EBG-2\Unit-14 Pm6.5\1st proof

আসে ১৯শ শতকের গোড়ায়। বুয়ররা উত্তরে সরে এসে তখনকার অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং ট্রানস্‌ভাল-এ নূতন বসতি করে। অরেঞ্জ নদীর ধারে হীরা, ট্রান্সভালে সোনা আবিষ্কার হলে, ভাগ্যান্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যাপক আগমন শুরু হয়। স্বাতন্ত্র্যবাদী বুয়রদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে, যার সূচনা ১৮৭৮-৭৯, পরিণতি ১৮৯৯-১৯০২ তে।

একই ধরনের শোষণের রাজনীতি চলেছিল চীনের ওপর। তাই বিদেশি বিতাড়নের জন্য 'বক্সার বিদ্রোহ' (১৯০০) শুরু হয়। দাঙ্গা হাঙ্গামায় বহু য়ুরোপীয় নিহত হলে, ইংরেজ-জার্মান-রুশের সম্মিলিত আক্রমণে চীনারা পর্যুদস্ত হয় (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০১)। অতঃপর ১২টি পশ্চিমী রাষ্ট্রশক্তি অসমচুক্তিতে চীনকে আবদ্ধ করে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

চতুর্দশপদী এই কবিতার উপস্থাপনা বক্তব্যের সঙ্গে খুবই সংগতিপূর্ণ। মিশ্রবৃত্তের সাধারণ পর্বের ৮ + ৬ ছত্রেতে বিন্যস্ত। প্রথম আট ছত্রে প্রস্তাবনা, শেষের ছয় ছত্রে মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা। এখানে যেহেতু বক্তব্য বিষয় বড়ো, তাই প্রস্তাবনা অংশ প্রবহমান মিশ্রবৃত্তের কক, খখ, গগ, ষষ্ঠকের পর ঘঘ, ঙঙ, চচ, ছছ ছত্রগুচ্ছে উপস্থিত করেছেন। নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতায় আত্মনিবেদনের ভাব, অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি আকুতি, গভীর ধর্মবোধ প্রভৃতি মহর্ষির জীবনবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ায় অনেকটা শান্ত, সমাহিত ভাবপ্রকাশক নিরুত্তাপ, সহজ-সরল ভাষা প্রয়োগে অভিব্যক্ত হয়েছে। আবার স্বদেশপ্রেমের কবিতায় ভাষা অপেক্ষা স্পষ্ট ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। বর্তমান কবিতায় ভাষা বক্তব্য বিষয়ের জন্য হয়ে উঠেছে তীব্র, তীক্ষ্ণ, দৃপ্ত। রক্তমেঘ, হিংসার উৎসব, গুপ্ত বিষদন্ত, প্রলয় মন্থন ক্ষোভ, শ্মশান কুক্কুর প্রভৃতি যুক্ত সংযুক্ত শব্দ যে ধ্বনি ও অর্থব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তা বক্তব্যকে তীব্রতর করেছে।

কবিতার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা —

শতাব্দীর সূর্য আজি ইত্যাদি— উনিশ শতকের শেষ সূর্য রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অস্ত গেল। একথা বলার পিছনে যে ব্যঞ্জনা আছে সেটিকে এভাবে বলা যায়—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আফ্রিকার সাধারণ বুয়র কৃষকদের আক্রমণ করছে হীন স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য। রবীন্দ্রনাথকে এ ঘটনা একান্ত বিদ্ধ করেছে বলেই নৈবেদ্যে ভগবৎভক্তিমূলক কাব্য রচনা করলেও তিনি স্থির থাকতে পারেননি, তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট, ঋজু ওজস্বী ভাষায় বর্তমান কবিতায় প্রকাশ করেছেন।

দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী— য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতাকে নির্দয় বিষধর সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কৃষ্ণ আফ্রিকার অরণ্য সমাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা, সভ্যতার হিংস্র আক্রমণে আর্তরবে চিৎকার করছে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত — সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সর্বগ্রাসী আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা আফ্রিকার জুলু ও বুয়রদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণ। বুয়ররা নিজভূমে স্বাধিকার রক্ষার সংকল্পে দৃঢ়তা দেখালে ছলে-বলে-কৌশলে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ইংরেজ শক্তিতে তাদের প্রতিহত করে। এর পিছনে যেমন ছিল জাতিগত স্বার্থ, তার পাশাপাশি ছিল তীব্র অর্থসম্পদ তৃষ্ণা। মানবতার পীড়নকারী অর্থলোভী সাম্রাজ্যবাদকে এখানে নিন্দা করা হয়েছে।

প্রলয়মন্থন-ক্ষোভ — লোভ যখন হয় সীমাহীন, তখন লোভীর কোনো দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। স্বার্থপর মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এরই ফলে অনিবার্য ধ্বংস আসে। য়ুরোপী রাষ্ট্রশক্তির অপরিমেয় লোভ সেই

বর্বতার পরিচয় দিচ্ছে।

কবিদল চীৎকারিছে—উনিশ শতকের শেষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক কবিকুল উৎকট, সংকীর্ণ, জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রকাশ করছিল, তাঁদের কাব্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, সেই সম্পর্কে এই তির্যক মন্তব্য। এসব কবিরা হলেন প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদী। যেমন — ইংরেজ কবি হার্ডি, রার্ডিয়ার্ডি কিপলিঙ, রুপার্ট ব্রুক, সিগফ্রিড স্যাসুন।

অনুশীলনী — ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্ত করুন। উত্তর শেষে এই এককে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলপাঠ — ২, প্রাসঙ্গিক আলোচনা সাহায্য নিয়ে উত্তর প্রস্তুত করুন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) দয়াহীন সভ্যতানাগিনী

তুলেছে .... নিমিষে

.... তার ভরি ....।

খ) ...., লোভে লোভে

ঘটেছে সংগ্রাম ....

.... উঠিয়াছে জাগি

................................।

গ) রবীন্দ্রনাথ এক সময় ________ সম্পাদক ও ________ পদও গ্রহণ করেছিলেন। তবু তিনি কবি, ________ ________ ও ________ তাঁর ছিল প্রথম ________।

ঘ) আফ্রিকার ________, ________ বা চীনের ________ ________ প্রেক্ষাপটে রচিত বর্তমান কবিতা।

২) সঠিক উত্তরে ঠিক (✔) চিহ্ন দিন ঃ

ক) নৈবেদ্যে —
১) কবিতার নাম
২) কাব্যের নাম
১) কবিতাগুচ্ছের নাম

খ) নৈবেদ্যের কবিতা রচনা কাল —
১) ১৩০৭ সাল
২) ১৩০৮ সাল
১) ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ

৩) ‘নৈবেদ্য’ কাব্যের কবিতাগুলিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৪) ‘বুয়র’ যুদ্ধ কী ও কেন সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (৫০টি শব্দে)।

৫) ‘শতাব্দীর সূর্য’ বলতে কী বোঝান হয়েছে লিখুন।

৬) ‘দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী’ — সভ্যতাকে ‘নাগিনী’ এবং ‘দয়াহীন’ বলবার কারণ বুঝিয়ে লিখুন।

৭) ‘স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত’ — উদ্ধৃত অংশটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৮) ‘কবিদল চীৎকারিছে’ — উদ্ধৃতিটির বক্তব্য বুঝিয়ে দিন এবং দুজন কবির নাম উল্লেখ করুন।

৩৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের — সোনার তরী, নৈবেদ্য, বলাকা, পত্রপুট ও শ্যামলী কাব্যগ্রন্থ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশক (১-৪ খণ্ড)।

ড. সুকুমার সেন — বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস ৫ম খণ্ড (রবীন্দ্রনাথ)।

ড. নীহাররঞ্জন রায় — রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা।

ড. খনা মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায়।

ড. বাসন্তী চক্রবর্তী — রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য।

ড. পম্পা মজুমদার — রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস।

ড. পবিত্র সরকার — ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ।

ড. শিশিরকুমার ঘোষ — রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য।

ড. ক্ষুদিরাম দাস — রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়।

একক ৩৫ ❒ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ দুটি কবিতা

গঠন

৩৫.১ উদ্দেশ্য

৩৫.২ প্রস্তাবনা

৩৫.৩ নজরুল ইসলাম ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

৩৫.৪ মূলপাঠ—১ নারী (সর্বহারা)

৩৫.৫ সারাংশ—১

৩৫.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৩৫.৭ মূলপাঠ—২ ঃ দারিদ্র্য (সিন্ধু হিল্লোল)

৩৫.৮ সারাংশ—২

৩৫.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

৩৫.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৩৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র অনুরক্ত অথচ স্বাতন্ত্র্য সন্ধানী কবিদের অন্যতম কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে নজরুলের সমকাল ও তাঁর কবিমানস সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। নজরুলের কাব্যজীবনের শুরু হয় ১৯১৯ সালে আর শেষ হয় ১৯৪২-এ। যদিও তার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু কাব্য বা কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সে সময় সম্ভব ছিল না। সুতরাং বলা যায় প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে তাঁর কাব্যচর্চার আরম্ভ আর তার শেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে। এই এককটি পড়ে এই দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে যে সমস্যা ও শংকা দেখা দিয়েছিল, নজরুলের কবিতা তারই পরিণত ফল—এটি বুঝতে পারবেন।

এইসব ধারণা, বোঝা ও পড়া থেকে যে জ্ঞান আহরণ করবেন, সেটি থেকে প্রয়োজনে পরে প্রাসঙ্গিক আলোচনা বা সমালোচনা করতে পারবেন।

- নজরুলের কাল ও কবিমানস সম্পর্কে ধারণা।
- নজরুলের তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচয়।
- নজরুল সম্পর্কে প্রয়োজনে আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারবেন।

৩৫.২ প্রস্তাবনা

বাংলা কাব্যে আধুনিকতা ঃ ২০ শতক পর্যায়ে এ সময়ের রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় তার যুগ লক্ষণ ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বের শেষে কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর কাব্য রচনা করলেও (তাঁর নিজস্ব কাব্য ধর্ম সূত্রে) তিনি রবীন্দ্র-উত্তর কবি হিসেবে চিহ্নিত।

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

উনিশ শতকে ঘটে গেছে বাংলার নবজাগরণ, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, স্বদেশি, অসহযোগ, সত্যাগ্রহের মতো নানা ঘটনা। দেশের জনমানসে স্বাধীনতার স্পৃহা। ইংরেজি শিক্ষার আনুষাঙ্গিক ফল একদিকে যেমন বিশ্বকে চিনতে শিখিয়েছে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে, অপরদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যাপক পণ্য-উৎপাদনের জন্য কলকারখানা স্থাপনের সঙ্গো যুক্ত সীমাহীন শোষণের ফলে প্রতিবাদী কণ্ঠ ভিন্নতর পথে সংগঠিত হয়েছে। নব্য শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজি শিক্ষার গুণে, মেকলের নির্দিষ্ট পথ অর্থাৎ চাকুরি ছাড়া আর কোনো কাজকেই কাজ মনে করছে না। ফলে বেকারি জন্ম ও বিকাশের সঙ্গো সঙ্গো বিক্ষোভ বাড়ছে। এমনই সময় এসেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৯১৮)। এর ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ভারসাম্য আরও বিপর্যস্ত হয়েছে। যুদ্ধান্তে আংশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি, মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে এক ধরনের রাজনৈতিক হতাশা জালিয়ানওয়ালাবাগের সমাবেশ ঘটেছিল, সেই নৃশংস হত্যালীলায় উদ্ধত শাসকশক্তির হটকারী আচরণে, দেশ জোড়া মানুষ বিশ্বাসঘাতকদের আচরণে হতচকিত হয়ে পড়ে। এ সময় থাকেই শিক্ষিত বাঙালির চেতনায় বিক্ষোভ উদ্দাম হয়ে ওঠে। শিক্ষিত যুবকের জীবনের সমস্যা যত বেড়েছে, ততই দৃঢ় হয়েছে শাসক ইংরেজের প্রতি অভিশ্বাস। শতগুণে বেড়েছে তার পরাধীনতার গ্লানি। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দা তার জীবন আরও জটিল ও আবর্ত সংকুল করেছে। ফলত তরুণ মনে যেমন অবিশ্বাস, হতাশা জাগে, তেমনই সমস্ত প্রচলিত ও প্রথাগত ধারণা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে। এ সবই সমকালীন কবিদের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর আধুনিক কবিতার ভূমিকায় এই যুগ লক্ষণকে ব্যাখ্যা করেছেন —"একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের।" আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানের নতুনতর আলোকদীপ্তি। ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব নতুন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। এতদিন রাজা- বাদশা, জমিদার, বিত্তবান, মধ্যবিত্ত মানুষকে নিয়ে সাহিত্য বৃত্তের চলন ছিল, তারই মধ্যে বিপ্লবের নতুন আলো নতুন জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করল। আবহমান কাল থেকে সাহিত্যে গ্রামবাংলার কৃষক-শ্রমিক কৃচিৎ স্থান পেলেও প্রাণমন জুড়ে কোনো সময়েই সে প্রাধান্য বিস্তার করেনি —তাঁরা তাঁদের বৃহৎ জীবন স্পন্দন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সুচিহ্নিত ও স্বতন্ত্র রূপে দেখা দিল। এরই ফলে ঘটল হয়তো বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন, 'বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।'

বাংলাকাব্যে নতুন মূল্যবোধ ও কাব্যচেতনার সূচনা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮০-১৯৫২)।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—বুদ্ধদেব বসুর মতে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। সত্যেন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবে বেশ শক্তিশালী, বৈচিত্র্যের সাধনায় নানা দিক থেকে অনন্য। তিনি রবীন্দ্রপ্রীতির জন্য খ্যাত হলেও, বিবিধ বিষয় ও ছন্দ নিয়ে নূতন নূতন পরীক্ষা ও তাতে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'চরকার গান', 'পালকির গান', 'ঝরনার গান' ইত্যাদি বিষয়ের দিক থেকে যেমন তেমনি ছন্দ ও রূপবন্ধেও অভিনব। ফলে তাঁর কল্পনা ও প্রকাশ—দুইই বিচিত্রসঞ্চারী। সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসে যে একটি রোমান্টিক সৌন্দর্যলিপ্সা ছিল, তা তাঁর কবিতার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ছত্রসজ্জায় ধরা পড়ে, কিন্তু সেটি অনেক সময়ই চাপা পড়েছে তার চেষ্টাকৃত তথ্য ও জ্ঞানবৈভব প্রদর্শন ও ছন্দোসৌকর্যের সচেতন চর্চায়। তিনি সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাময়িক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু কবিতা রচনা ছাড়াও বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করতে প্রচুর দেশি-বিদেশি কবিতা অনুবাদ করেছেন। এসব রচনার মধ্যে অন্যতর স্বাদ পাওয়া গেলেও, গুণগত মান সর্বত্র উল্লেখযোগ্য নয়। অনুবাদ ভাবানুবাদ অনেকক্ষেত্রেই মূলের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়নি। দেশপ্রীতিমূলক কবিতায় উচ্ছ্বাস থাকলেও, ভাব-গভীরতা ছিল না। অতীত গৌরবের প্রশস্তি থাকলেও, দেশের সমস্যার গভীরে

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

প্রবেশ করবার ক্ষমতা ছিল না। রচনাগুলি তাই ক্ষেত্রবিশেষে কবির কলমে লেখা না হয়ে অগভীর সাংবাদিক সুলভ পদ্যরচনায় পরিণতি পেয়েছে। বস্তুত "কবিতা যখন প্রকাশের বেদনায় কম্পমান, আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ, সেখানেই সত্যেন্দ্রনাথের চির নির্বাসন।" কবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ঃ 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'তীর্থসলিল' (১৯০৮—অনুবাদ), 'তীর্থরেণু' (১৯১০—অনুবাদ), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) প্রভৃতি।

যতীন্দ্রনাথ বৃত্তিতে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। জেলা বোর্ডে কর্মসূত্রে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছে। গ্রামের শস্য শ্যামলতার মধ্যেও অগণিত মানুষের নীরন্ধ্র দারিদ্র্য, হতচ্ছড়া কৃশ মূর্তি তাঁর অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করেছে। রবীন্দ্রকাব্যে অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর মধ্যে তিনি এই বাস্তবের সন্ধান পাননি। এ সময় তরুণ কবিরা যখন আত্মবদ্ধ কল্পনায় রবীন্দ্রপ্রভাব নির্গমের পথ খুঁজছিলেন তখন যতীন্দ্রনাথের দেশ ও জগৎ, তাঁর কবিতার খেদ-পরিতাপ ও নৈরাশ্য তাঁকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। বস্তুজগৎ, তাঁর রোমান্টিক অনুভূতিকে আড়াল করে বস্তুতন্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছে। তাঁর মরুকাব্যত্রয়ী—'মরীচিকা' (১৯২৩), 'মরুশিখা' (১৯২৭) এবং 'মরুমায়া' (১৯৩০) বাংলার শ্যামল আবহাওয়ার ঊষর, রুক্ষ নৈরাশ্যের ছবি নিয়ে এসেছে। তিনি ব্যঙ্গো, তীক্ষ্ণ শ্লেষে, কাব্যের প্রচলিত আদর্শবাদ ও সৌন্দর্যবোধকে তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নিপুণ যুক্তি শৃঙ্খলায় আক্রমণ করেছেন। সমস্ত মোহজাল, এমন কী মঙ্গালময় ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ প্রত্যয়কেও তিনি বর্জন করেছেন, বলেছেন ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ বা সুবিচারক নন, তিনি মঙ্গালময়ও নন ; বরং এক ছদ্মবেশী নিষ্ঠুর সত্তা যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবদের সুখদুঃখে শুধু উদাসীন থাকেন না, তাদের দুঃখের ভার বৃদ্ধিতেই যেন বেশি সচেষ্ট থাকেন।

তাঁর কবিতার কলাকর্মেও এই নেতিবাদ শব্দ, চিত্রকল্প ও ছন্দপ্রকরণে ফুটে উঠেছে। কিন্তু পরিণত প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে কবির 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা'-য় বিপরীতে সুর বেজেছে। এর আভাস অবশ্য প্রথম পর্বে তাঁর মনের গভীরে মানুষ সম্পর্কে যে প্রত্যয় ছিল তা থেকেই, অর্থাৎ মানুষের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের বেদনা থেকেই এসেছে মনে হয়। তাই শেষ পর্বের কবিতায় সন্ধ্যার রক্তিম দিগন্তে প্রতিবাদ নয়, অনুতাপম্লান বিশ্বাসে করুণার যে সুর বেজেছে তা কবির রবীন্দ্রঅনুরক্তির আভাস নির্মাণ করে। এদিক থেকে যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র অনুরাগী হয়েও স্বতন্ত্র কবিপ্রতিভায় ভাস্বর হয়ে আছেন।

প্রথম জীবনে মোহিতলালও রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন, তাঁর 'স্বপনবসারী' সে সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর কবিমানসের স্বাতন্ত্র্য ভোগকামনায়, দেহবাদে। প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষির মতোই ধ্যানী, উদাসীন। মোহিতলালের কবিতায় যেখানে উগ্র দেহাত্মবাদ, তীব্র যৌবন কামনা ও সম্ভোগ পিপাসা মুখ্য, সেখানে রবীন্দ্রনাথে দেহোত্তরণের আকাঙ্ক্ষাই প্রধান। মোহিতলালের কবিতার কাব্যনির্মিতি অনেকটা মধুসূদনের, শৈলীর স্মারক, ক্ল্যাসিক্যাল বা ঐতিহ্যপন্থী। সেখানে কোথাও শিথিলতার অবকাশ নেই। ছত্র, স্তবকবিন্যাসে একটি সদাসচেতন কবিমনের পরিচয় আছে।

মোহিতলালের মনোভঙ্গিতে লঘুতার কোনো স্থান নেই। তিনি সততই গুরুগম্ভীর মনন-কল্পনার বর্মে ক্লাসিক্যাল সংযম, বাহুল্যবর্জিত উপস্থাপনার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে 'সনেট' রচনায় মোহিতলাল বিশেষ সফল। সনেটেরে পদবিন্যাসে তিনি দক্ষ শিল্পী। কবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, 'স্বপনপসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্ত গোধূলি' (১৯৪১), 'ছন্দ চতুর্দশী (১৯৫১)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯—১৯৭৬) আবির্ভাব। কবি খ্যাতিতে এ সময়ের কবিকুলে নজরুল সর্বাতিক্রমী। তিনি অনেকটা স্বভাবকবি ছিলেন। প্রাণের একান্ত আবেগের তাড়নায়, নিজেকে প্রকাশের

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সেই স্বতঃস্ফূর্ত সূত্রেই তাঁর কবিতা ও গান রচিত হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই তা নতুন বক্তব্য, ও সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যে অনন্য। আলোচ্য কবিতা ত্রয়ীতে তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

৩৫.৩ কাজী নজরুল ইসলাম ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ ; ২৪শে মে ১৮৯৯ বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। বাবা কাজী ফকির আহমদ ও মা জাহেদা খাতুন। শৈশবেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। দশ বছর বয়সে তিনি গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক পরীক্ষা দেন। সংসারের চাপে সেখানে একবছর শিক্ষকতার সঙ্গো মোল্লাগিরিও করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথমে শিয়ারসোল হাই স্কুল ও পরে মাথরুন স্কুলে ভর্তি হন, পরের বছর পড়াশুনা ছেড়ে লেটো ও কবি দলে যোগ দেন। দারিদ্র্যের চাপে ১৯১৬তে প্রথমে বাবুর্চির ও পরে রুটির দোকানে কাজ নেন। মাঝের এক বছর ময়মনসিংহের একটি স্কুলে পড়ে, বাৎসরিক পরীক্ষার পর ১৯১৫ শিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন। এক্ষণে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক)-এর সঙ্গো বন্ধুত্ব হয় এবং বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটকের সান্নিধ্যে তাঁর প্রাণে বিপ্লবী চিন্তাধারার সঞ্চার হয়। এখান থেকেই তিনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে প্রথমে লাহোর হয়ে নৌসেরাতে প্রশিক্ষণ শেষে করাচি সেনানিবাসে যান।

কৈশোরে কিছু গান বা রচনা থাকলেও, নজরুলের যথার্থ সাহিত্য রচনার সূচনা করাচির সেনানিবাসে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সেখানে লেখা প্রথম গল্প 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' (সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫), প্রথম কবিতা 'মুক্তি' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬) এবং প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' (সওগাত, কার্তিক ১৩২৬)-এ প্রকাশিত হয়। মার্চ ১৯২০ বেঙ্গাল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়ায় কর্মহীন নজরুল কলকাতায় ফিরে শৈলজানন্দের মেসে আশ্রয় নিলে, সেখানে তাঁর ধর্মমত অন্তরায় হওয়ায় ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে মুজফর আহমেদের সঙ্গো বাস করতে শুরু করেন। এপ্রিলে একবার চুরুলিয়া যান। এ সময় কবির কিছু রচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়, কিন্তু খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছান সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে (৬ই জানুয়ারি, ১৯২২) 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সঙ্গো সঙ্গো।

ইতোমধ্যে জীবিকার তাগিদে অস্থিরচিত্ত নজরুলকে কয়েকটি কাগজে কাজ করতে দেখা যায়। ১২ জুলাই, ১৯২০ দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় ৬০ টাকা বেতনে কাজ নেন, ওই বছরই ডিসেম্বরে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সঙ্গো ১০০ টাকার বিনিময়ে লিখতে চুক্তিবন্ধ হন। ১৯২১ ফেব্রুয়ারিতে আবার 'নবযুগে' যোগ দিলেও মার্চ-এ ইস্তফা দেন। ১৯২২ জুন এ 'দৈনিক সেবক' কাগজে ১০০্ টাকা বেতনে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে রচিত সম্পাদকীয় লেখা নিয়ে মতবিরোধ হলে সে কাজ ছেড়ে দেন। ১১ই আগস্ট নিজেই সপ্তাহে দুবার প্রকাশে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ধূমকেতু' কবিতা নিয়ে 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানেই পূজা সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা ও অক্টোবরে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে 'ধূমকেতুর পথ' সম্পাদকীয় লেখেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে নভেম্বরে নজরুলের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়, আর ২৩শে নভেম্বর তিনি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন। কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্ট হয়ে ১৭ই জানুয়ারি ১৯২৩ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হন। এ সময় স্নেহভাজন নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি উৎসর্গ করেন। হুগলি জেলে, জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে ৩৯ দিন অনশন করার পরে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তাঁকে বহরমপুর জেলে বদলি করা হয়। সেখান থেকে এক বছর তিন সপ্তাহ পরে মুক্তি পান। ১৯২৪, ২৪শে এপ্রিল কলকাতায় প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গো বিবাহ। ওই বছর অক্টোবরে 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ এবং

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

নভেম্বরে 'ভাঙার গান' বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯২৫ মহাত্মা গান্ধির সঙ্গো কবির ফরিদপুর কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সাক্ষাৎ ঘটে। নভেম্বরে 'শ্রমিক কৃষক প্রজা পার্টির ইস্তাহার এবং ডিসেম্বরে তাঁর লাঙল' পত্রিকায় 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেন। ১৯২৬ এ নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মেলনে 'শ্রমিকের গান', ছাত্র-যুবা সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' রচনা করেন ও গেয়ে শোনান। ১৯২৭-এ মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম ও ১৯২৮-এ দ্বিতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় সম্লেন উপলক্ষে 'চল চল চল' গানটি রচিত হয়। ১৯২৯-এ জাতির পক্ষে কবিকে সংবর্ধিত করা হ। ১৯৩০-এ কাব্যগ্রন্থ 'প্রলয় শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু' যথাক্রমে বাজেয়াপ্ত হয়ে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। এই বছরই ২৫শে নভেম্বর কবির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে ৬ই নভেম্বর গ্রেপ্তার ও ১১ ডিসেম্বর কারাদন্ড দেওয়া হয়।

এদিকে ১৯২২, ১০ই নভেম্বর 'ধূমকেতু' ১ম বর্ষের ২১শে সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে গেলে, কবি 'নওরোজ' (১৯২৭) পত্রিকায় স্বল্পকালের জন্য যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪০-এ ফজলুল হক তাঁর দলের মুখপাত্ররূপে নবপর্যায়ের 'দৈনিক নবযুগ' প্রকাশ করলে নজরুল প্রধান সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৪১ কলকাতায় সমারোহসহকারে নজরুল জন্মোৎসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে নজরুল কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'রবিহারা' কবিতা আবৃত্তি করেন। ১৯৪২, ১০ই জুলাই নজরুল আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবিপ-ী প্রমীলা ১৯৪০ সালেই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রথমে লুম্বিনী পার্ক ও রাঁচিতে চিকিৎসার পরে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' এবং পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তান সরকারের আনুকূল্যে ছয় মাস লন্ডনে, পরে ভিয়েনায় চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু কোনো চিকিৎসাতেই তাঁর চেতনা ও সৃষ্টিশক্তি ফিরে আসেনি। ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে নজরুল ঢাকায় যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট ; বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সাহিত্য পুরস্কার '২১শে পদক' ইত্যাদিতে তিনি সম্মানিত হন। ২৭শে আগস্ট ১৯৭৬ তারিখে ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে ২৯শে কবির জীবনাবসান হয়।

কাব্যকথা ঃ নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' ১৩২৯ সালের কার্তিক (অক্টোবর, ১৯২২) প্রকাশিত হয়। বইটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করা হয়েছে। এতে বিদ্রোহী, আগমনী, ধূমকেতু প্রভৃতি কবিতা আছে। অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী বীরেশ্বর জৈন। 'দোলন চাঁপা (আশ্বিন ১৩৩০, ইং ১৯২৩) কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'ধূমকেতু' প্রকাশের দায়ে করাদণ্ডে দণ্ডিত কবি যখন জেলে, সেইসময় কবিতাগুলি লেখা। জেলের ওয়ার্ডারদের সাহায্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বাইরে এনে সেগুলি কাব্যাকারে প্রকাশ করেন। এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।' এ কাব্যের মুখ্য আবেগ প্রমীলা বা দোলন দেবীর সঙ্গো কবির সম্পর্ক। 'বিষের বাঁশী' (আগস্ট, ১৯২৪) বইটির সূচনায় জানিয়েছেন 'অগ্নিবীণা'র দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে যেটি প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল সেটি 'বিষের বাঁশী' নামে প্রকাশিত হল। এই সব স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও নজরুল 'ছায়ানট' (১৯২৫), দেশবন্ধুর মৃত্যুশোকে উদ্বেল কবির চিত্তরঞ্জনের জীবনকাহিনী বর্ণনা করে 'চিত্তনামা' (আগস্ট, ১৯২৫) রচনা ও প্রকাশের পর কবির উল্লেখযোগ্য কাব্য 'সর্বহারা' (১৯২৬), যার অন্যতম কবিতা নারী এবং 'ফণিমনসা' (১৯২৭) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। সঞ্চিতা (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথের চয়নিকার আদর্শে সে সময়ে প্রকাশিত সকল কাব্যগ্রন্থের নির্বাচিত কবিতার সংকলন—রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে। কবি নজরুলের কিছু গল্পগ্রন্থ—ব্যাথার দান (১৯২২), শিউলিমালা (১৯২৮), এবং উপন্যাস 'বাঁধনহারা' (১৯২০), কুহেলিকা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) প্রভৃতির সঙ্গো সঙ্গীত সংকলন 'চোখের চাতক' (১৯২৯) প্রতিভা সোম (বসু)-কে উৎসর্গীকৃত, চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১), গুলবাগিচা (১৯৩৩), গানের মালা (১৯৩৪), গীতিশতদল (১৯৩৪) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। কবির কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ছোটদের উপযোগী নাটক যেমন রচনা করেছেন তেমনই ওমর

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

খৈয়াম ও হাফিজের কবিতা অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এসমস্ত গ্রন্থের অনেকগুলি রচনা যেমন প্রাণের টানে লেখা, আবার সভা-সমিতিতে বক্তৃতা কর্ম বা অর্থে প্রয়োজনে কলম ধরা রচনাও আছে।

৩৫.৪ মূলপাঠ—১ ঃ নারী (সর্বহারা)

নারী

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণ-কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা, করে নারী হেয়-জ্ঞান ?
তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান।
অথবা পাপ যে—শয়তান যে—নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে!
এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্তরে তার মোম্‌তাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান!
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।
পুরুষ এনেছে দিবসের জালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষ্ণা ল'য়ে—নারী যোগায়েছে মধু।
শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল পুরুষ চালাল হল ;
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

স্বর্ণ-রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হ'য়েছে অলঙ্কার।
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।
জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্।
কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে!
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি', কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয় নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয় লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিয়াছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিল রাণী,
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।

পুরুষ হৃদয়-হীন,
মানুষ করিতে নারী দিল তারে আধেক হৃদয় ঋণ।
ধরায় যাঁদের যশ ধনে না ক' অমর মহামানব,
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা।
লব কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।
নারী সে শিক্ষা'র শিশু-পুরুষের স্নেহ প্রেম দয়া মায়া,
দীপ্ত নয়নে পরা'ল কাজল বেদনার ঘন ছায়া।
অদ্ভুতরূপে পরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে ক'রে তারে চুমিল যে, তারে কলি সে অবরোধ।
তিনি নর-অবতার—
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি' কুঠার!
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর,
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর!

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

সে যুগ হ'য়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক' নারীরা আছিল দাসী !
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি,
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে !
যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই
শোনো মর্ত্যের জীব !
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব !
স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী,
করিল তোমায় বন্দিনী, বলো কোন সে অত্যাচারী ?
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা !
চোখে চোখে আজি চাহিতে পার না ; হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোম্‌টা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল !
যে ঘোম্‌টা তোমা' করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ !
দুর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ !
ধরার দুলালী মেয়ে !
ফিরনা ত আর গিরিদরীবনে শাখী-সনে গান গেয়ে !
কখন আসিল 'প্লুটো' যমরাজা নিশীথ পাখায় উ'ড়ে,
ধরিয়া তোমায় পূরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে।
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হ'তে আছ মরি।
মরণের পুরে ; নামিল ধরায় সেইদিন বিভাবরী।
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মত আয় মা পাতাল ফুঁড়ি' !
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি !
পুরুষ যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও পদাঘাতে
লুটায়ে পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে !
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে
যে-হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে।
সে-দিন সুদূর নয়—
যে-দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয় !

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

৩৫.৫ সারাংশ—১

সাম্যের গান গাওয়া কবির কাছে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। বিশ্বের সমস্ত কল্যাণ অকল্যাণ সবেতেই নারী পুরুষের ভূমিকা আছে। খ্রিস্টিয় আদি পাপের পিছনে যে শয়তানের (Satan) কথা ভাবা হয় সেই অমঙ্গলের শক্তি নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থাকা সম্ভব। তাই নারীকে এজন্য হেয় করা ঠিক নয়। বরং পৃথিবীর যা কিছু ভালো সেই সব সৃষ্টি—যা মঙ্গলময়—সম্পদ, জ্ঞান, গুণ সৌন্দর্য সমস্তেই নারীর অবদান আছে। দিনের শেষে তপ্ত দেহ মন নিয়ে পুরুষ ঘরে ফিরে নারীর কল্যাণস্পর্শে স্বস্তি শান্তি পেয়েছে। নারী বাইরে কর্মৈষণা জোগায়, ঘরে সে-ই কল্যাণী। দুয়ের শক্তিতেই সৃষ্টি রয়েছে সচল।

অলঙ্কার সে তো নারীদেহ স্পর্শেই সুন্দর। নারীর মিলন-বিরহে কাব্যসৃষ্টি। ক্ষুধা-সুধার মধ্য দিয়ে নিত্য নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অনেক বিজয় অভিযান, মানুষের সমস্ত কীর্তির পিছনে নারীর অবদান সীমাহীন।

নারীর উৎসাহ ও প্রেরণাতেই পৃথিবীতে অমর মনীষীরা মহান সব প্রয়াস করেছেন। নারীর কোমল হৃদয়ের স্পর্শেই শিশু-পুরুষ নির্বিশেষে স্নেহ প্রেম-প্রীতি দয়ামায়ায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে।

নারীর প্রেরণায়, শক্তিতে এতদিন যাঁরা আশ্রয় পেয়েছে, তারাই আজ নারীর মর্যাদাকে স্বীকার করছে না, এ বড়ো বিস্ময়। আজ সাম্যবাদের যুগ—নারী পুরুষের সমানাধিকার। পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার বা তাকে বন্দী করতে চাইলে, তাকেই এক সময়, তারই সৃষ্ট কারাগারে বন্দী হতে হবে। কেননা এটাই যুগধর্ম—পীড়ন করলে নিজেকেই পীড়িত হতে হবে। সেই সঙ্গে নারীকেও আর স্বর্ণ-রৌপ্যের অন্ধকারে বন্দিনী থাকা চলবে না ; হাতের রুবি, পায়ের মল-শিকল, মাথার ঘোমটা ফেলে বেরিয়ে আসতে হবে। যারা একসময় পদানত করে রেখেছিল, তাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে, প্রয়োজনে পরাভূত করে, নারীকে বিশ্বজয় করতে হবে। আর তা হলেই অনাগত ভবিষ্যতে পুরুষের সঙ্গে নারীর জয় ঘোষিত হবে।

৩৫.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'নারী' কবিতাটি কবির 'সাম্যবাদী' কবিতা গুচ্ছের অন্যতম। সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয় 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫)। পরে 'সর্বহারা' (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থে 'সাম্যবাদী'র অন্যান্য কবিতার সঙ্গে 'নারী'-ও সংকলিত হয়। কবিতাটিকে প্রকাশকালের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব।

'নারী' কবিতাটি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনার শুরুতেই, ভারতীয় জনজীবনে সাধারণভাবে নারীর কি স্থান ছিল এবং শতাব্দীর সূচনাকালের পরিস্থিতিটিও জানা দরকার। তাহলেই ঐতিহাসিক পশ্চাদ্‌ভূমিতে সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের নারী কবিতার আপেক্ষিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝে নেওয়া সহজ হবে।

এমন একটি কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই নারীর স্থান উঁচুতে ছিল। মধ্যযুগে মুসলিম অধিকারের পর নারীর মর্যাদার অবনমন ঘটে। ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[১] তিনি দেখিয়েছেন বৈদিক সমাজ যখন ক্রমশ গোষ্ঠীযুদ্ধ, যূথবদ্ধ সমাজ ভেঙে পরিবার আশ্রিত বা কুলবদ্ধ সমাজে পরিণত হচ্ছে, তখন থেকেই পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রাধান্যের কারণেই

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

পুরুষের একাধিক পত্নী-উপপত্নী বা গণিকা সম্ভোগ ; পত্নীর সামান্য ত্রুটিও কুলে বা সমাজে ক্ষমা পেত না। তখন লক্ষ্য এক পুত্র সন্তান বৃদ্ধির দ্বারা সম্পত্তি বৃদ্ধি। পুরাণের কালেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।[২] ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসময় বিশেষ সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি সৃষ্টি হয়। তাদের স্বার্থ সম্পত্তির উত্তরাধিকারের জন্য পরিবারের বৈধ সন্তানের জন্য সঞ্চয় রেখে যাওয়া। এজন্য পুরুষ স্ত্রীকে অন্য সমস্ত পুরুষের সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হল। মহাভারতে এর চরম উদাহরণ দেখা যায়—যে নারী স্বামী ব্যতীত কোন পুংলিঙ্গ বিশিষ্ট (নামের বস্তু) চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ ও দর্শন করেনা সে-ই ধর্মচারিণী। (১২/১৪৬/৮৮)। এ থেকে বলা যায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকাশের অনুপাতের সঙ্গে নারী তার স্বাধীনতা হারায়। এজন্য মধ্যযুগ পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। মধ্যযুগে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্নতর ঐতিহাসিক পটভূমিতে এরই কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে মাত্র।

বর্তমান আলোচনায় এ প্রসঙ্গ দীর্ঘায়িত না করে, তাঁর উপসংহারটি উদ্ধৃত করা যাক—"বৈদিক ভারতবর্ষে নারীর মর্যাদা ছিল না, মানুষ বলে তার কোনো স্বীকৃতিই ছিল না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও ছিল না, তবে তাঁদের উত্তর পুরুষেরা এখন স্বীকার করে সে কথা ; বলে, নারী এই শতাব্দীতেই প্রথম অধিকার সচেতন হয়েছে, আগে সে অত্যাচারিতা বন্দিনীই ছিল।" শুধু আমরাই বলবার চেষ্টা করি প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।" "এতে শুধু যে সত্যের অপলাপ হয় তা নয়, অতীতকে যথার্থভাবে না দেখতে পাওয়ার জন্য অতীতের যে বিষ সমাজদেহে সঞ্চারিত, তাকে চিনতে, তার প্রতিষেধ করতে এবং সুস্থ এক ভবিষ্যতের প্রস্তুতি বিধান করতে অনাবশ্যক দেরি হয়।"

১৯২০র জানুয়ারিতে নজরুল করাচির সেনানিবাস থেকে এসে কলকাতার বন্ধু শৈলজানন্দ ও মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যান। ঐ বছরই মার্চে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে কর্মহীন কবি প্রথমে শৈলজানন্দ পরে মুজফ্ফর আহ্মেদের আশ্রয়ে বাস শুরু করেন। ইতোমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালেই সোভিয়েত বিপ্লব ঘটেছে (১৯১৭), ১৯১৯-এ প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক হয়েছে। দেশে দেশে 'সাম্যবাদে' আস্থাবান যুবসমাজ একটি সংগঠনের মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। 'নবযুগ' (জুলাই ১৯২০) পত্রিকা পর্বে নজরুলের বিদ্রোহী[৪] ভূমিকার পর, 'ধূমকেতু' (আগস্ট ১৯২২) পর্বে বিপ্লবী ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে। এরপর 'লাঙল'-এ কবিকে সাম্যবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যা নিয়ে ভাবতে দেখা যাচ্ছে।

নজরুলের কাছে সাম্যবাদ / সমাজতন্ত্রবাদ বস্তুত দেশের মুক্তি সংগ্রামের একটি পথ মাত্র। সাম্যবাদের আদর্শে তাঁর কোনো তাত্ত্বিক শিক্ষা ছিল না। মুজফ্ফরের সান্নিধ্য ও সাহচর্য তাঁর আবেগপ্রবণ মনোধর্মে মানবপ্রেমের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, নিজের জীবনের দুঃখযন্ত্রণার যে পীড়ন ছিল, তাই, তাঁকে এই মতবাদের মৌনতত্ত্ব নয়, বাহ্য উদ্দীপনা তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছে। ভারতের কমিউনিস্টদের কাছে বিশের দশক থেকে প্রাক্ স্বাধীনতাপর্ব পর্যন্ত এটি ছিল এক সংশয়াতীত সংগ্রামী চেতনা।

কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফরের সঙ্গে কিছু কাল সমবাসী হলেও উচ্ছ্বাসপ্রবণ ও রোমান্টিক কবির মনে মানব হিতৈষণা যতটা জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, সাম্যবাদী তত্ত্বের দ্বারা ততটা নয়। তাই নবযুগ বা ধূমকেতুতে জাতীয়তাবাদ 'মোসলেম ভারতে' ধর্মভাব যতটা সক্রিয় ছিল, মার্ক্সীয় ত্ত্ব ততটা প্রবল ছিল না।

---

১ ও ২ বৈদিক সমাজে নারীর স্থান। নারীর স্থান—রামায়ণে ও মহাভারতে। দ্রষ্টব্য ঃ প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য

৩ ডিসেম্বর, ১৯২১ কমরেড মুজফ্ফর আহ্মেদ-এর নেতৃত্বে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার উদ্যোগ হয়েছে।

৪ বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯২২।

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

'লাঙলে'র প্রধান পরিচালক, নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ সেটি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হল।

একসময় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮শ শতকের ইংরেজ 'বার্নস'-এর প্রভাবে 'সাম্যসাম' কবিতায় রুশ বিপ্লবের প্রসঙ্গ এনেছিলেন, আর মুজফ্‌ফরের প্রভাবে এর প্রায় দু দশক পরে নজরুল সর্বহারার মুক্তির জন্য সাম্যবাদী চেতনামূলক একগুচ্ছ কবিতা রচনা করেন। এতে রুশ বিপ্লবের প্রভাব কিছুটা থাকলেও, কমিউনিস্ট মতবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। এই গুচ্ছের 'সাম্যবাদী' কবিতা—অর্থনৈতিক বা শ্রেণিচেতনার কবিতা নয়—মরমি সাধনার কবিতা, 'মানুষ', মানুষের চেয়ে বড়ো বা মহীয়ান কিছু নেই। কিন্তু এখানে স্রষ্টাকে অস্বীকার কার হয়নি। পুরোহিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাত ঘোষণা করা হয়েছে। 'চোর-ডাকাত' কবিতায় ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শোষণের এবং মানবসব্যতার এক দেউলিয়া রূপ তুলে ধরা হয়েছে—দেখান হয়েছে ছোটোদের সব চুরি করেই বড়োরা বড়ো হয়েছে ; 'নারী' কবিতায় নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কবিতায় কবির নারী জাতিকে পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদার আসন দেবার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে—এজন্য তিনি অনেক যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে স্বমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয়েছেন। এদিক থেকে কবিতাটিকে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ-বিরোধী কবিতা বলা যায় বটে, সেই সঙ্গে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এখানে কবির দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—কারণ সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সমান। আবার নরাী পুরুষের জীবনে উভয়ের স্নেহ ও প্রেম এক পরম সম্পদ—সঞ্জীবনী সুধা। উভয়ের ত্যাগ ও সহিষ্ণুতায় গড়ে ওঠে মানব সভ্যতার ইতিহাস। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হৃদয়হীন পুরুষের কাছে নারী পায় অমর্যাদা ও আঘাত। পুরুষের এঅই অনুদার মনোভাবের কঠোর সমালোচনা আছে এ কবিতায়। নারী কবিতায় কবি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। নজরুলের নারী-সম্পর্কিত সাম্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে—

'বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি
কেহ রহিবেনা বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

'সাম্যের যুগ আজি' এই বোধ থেকে এ কবিতা রচনার প্রেরণা বলেই নারী-পুরুষে কোন ভেদ নেই। বিশ্বের রিন্তর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সমান ভূমিকা। কিন্তু নারীই প্রধানত তার ভার বহন করে। পুরুষের দ্বারা সংসার চলে না, নারীর জন্যই সংস্কার স্বর্গলোকে পরিণত হয়—

"এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে, যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ রস মধু-গন্ধ-সুনির্মল।"

পুরুষের জীবনের যত দাবদাহ নারীর সে্নেহ-প্রেমে তা স্নিগ্ধ হয়। এই নারী-ই যুগ যুগ ধরে কবির সৃষ্টিশীল রচনার প্রেরণা জুগিয়ে আসছে—

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।

নজরুল এই কবিতাটিতে বক্তব্যবিষয়কে তার কবিস্বভাবের উচ্ছ্বাসময়তার কারণে আকারে অনেকটা বড়ো করেছেন। বক্তব্যকে দীর্ঘায়ত করায় কাব্য সৌন্দর্য বিচারে কবিতাটির রসাবেদন ক্ষুণ্ণ হয়ে তা বাক্ সর্বস্ব ও বক্তৃতাধর্মী হয়েছে। তিনি এখানে নরনারীর পাপ-পুণ্যের কথা, কল্যাণ-অকল্যাণ, পুরুষ-নারীর পারস্পরিক ভূমিকার কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতার অভাব নেই যেমন কৃষি নির্ভর বাংলার গ্রাম সমাজে নরনারীর যৌথ পারিবারিক জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে একটি বাস্তবসম্মত চিত্রকল্প—

নর বাহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে।

আবার, পুরুষ শাসিত সমাজে নারী যুগ যুগ ধরে উপেক্ষিত, নারী জাতির বেদনা ও ট্র্যাজেডি এ কবিতায় অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন—

কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।

সামন্ত সমাজে নারী নানা আবরণে, আভরণে বাঁধা পড়ে থাকে, তাকেই সাম্যবাদের টানে কবি নজরুলের নারীমুক্তির কথা অত্যন্ত জোরালোভাবে আহ্বান হিসেবে ফুটে উঠেছে—

হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকল।
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ !
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন আছে যত আভরণ !

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ "সে যুগ হয়েছে বাসি, যে যুগে...নারীরার আছিল দাসী।" সেই বেদনার যুগ পার হয়ে আজ "মানুষের যুগ সাম্যের যুগ আজি", তাই "অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব।" আধুনিক সমাজব্যবস্থায় নারী সঙ্গী, সাথী বন্ধু। নজরুলের 'নারী' কবিতায় নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়।

নারী কবিতাটি ছয়মাত্রার সরল কলাবৃত্ত ছন্দে রচিত। ছত্রে তিনটি ষন্মাত্রিক পর্ব, একটি দু-মাত্রায় অপূর্ণ পর্ব।

বিশ্বে যা কিছু । মহান সৃষ্টি । চির কল্যান। কর

অর্ধেক তার । রচিয়াছে নারী । অর্ধেক তার । নর।

পূর্বাপর দ্বিপদী অন্তমিল যুক্ত পদবন্ধে রচিত। কয়েকটি ছত্রে একই যুক্তাক্ষরের পুনরাবৃত্তিতে সার্থক শব্দালঙ্কারের ও ধ্বনি ঝঙ্কারের মাধ্যমে সার্থক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে—

'জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা লক্ষ্মী, নারী-ই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।'

প্রসঙ্গ কথা ঃ

নরককুন্ড বলিয়া কে তোমা—বৈদিক ভারতে নারীকে অশুচি, স্বাভাবত পাপিষ্ঠা ও অমঙ্গালের হেতু গণ্য করা হয়েছে। মৈত্রায়নী সংহিতা বলেছে 'নারী অশুভ।' শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—যজ্ঞ কালে, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না। তাঁদের সংজ্ঞায় নারী পুত্রের জননী এবং সে ভোগ্যবস্তু। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীতেও যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে গাভী-স্বর্ণ-শস্যের সঙ্গো অগণ্য নারী দান করা হচ্ছে। খ্রিস্টীয়শাস্ত্র বাইবেলেও নারীকে 'নরকের দ্বার' বলা হয়েছে। নারীর এই অবমাননার অবসান আধুনিক কালের ঘটনা। সাম্যবাদী কবিতার 'নারী'তে নজরুলের তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ এই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য নারী যদি অশুচি-অপবিত্র সে তো পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরই দান। সুতরাং এর জন্য তো মূল অপরাধী পুরুষ। নারীকে নরককুন্ড বলে ঘৃণা করা কেন ? কামনার অগ্নিদহনের জন্য দায়ী পুরুষ তাই ঘৃন্য সে তো পুরুষ। সুতরাং নারীকে কোনক্রমেই হেয় জ্ঞান করা যায় না।

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল—নারীর স্নেহপ্রেম প্রীতি রসে আর্দ্র ও তার সয- লালনে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি আজও সচল ও সক্রিয়। বিশ্বসৃষ্টির যে নেপথ্যবিধানে প্রাণের প্রকাশ সে ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারী যেমন ধারণ ও লালন করে, তেমনি সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণাও নারী—এই সত্যটিকে নজরুল পংক্তিগুলিতে তুলে ধরেছেন।

পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই—সম্পত্তির ধারণা গড়ে ওঠার সময় থেকে পুরুষের যে শক্তি, প্রাধান্য ও অধিকারদম্ভ ক্রমশ নানারূপে ও বাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তা বৈদিক কাল থেকে পৌরাণিক যুগ বাহিত হয়ে সামন্ত শাসন পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। আধুনিক মননে ও সমাজ-রাষ্ট্র ধারণায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে নিপীড়িত মানুষের যে জাগরণ বাস্তবায়িত হল, তা নারীকেও তাঁর আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই যে কোনো ধরনের পীড়নের সঙ্গো প্রতিরোধ-শক্তিও বৈজ্ঞানিক নিয়মেই গড়ে ওঠে—এই সত্যটি কবি এখান উচ্চারণ করেছেন।

এতদিন শুধু বিলালে অমৃত—একদিন যে নারী অন্দরের অন্ধকারে কারারুদ্ধ ছিল, তাকে সেই আদিম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে আসতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হল প্রতিকূল শক্তির সঙ্গো সংগ্রাম হবে। কারণ বন্ধন থেকে মুক্তি কেউ দেয় না, নিজ অধিকারে অর্জন করতে হয়। ভারতবর্ষের মতো ইউরোপের পুরুষকেন্দ্রিক সমাজেও ব্যতিক্রম ছিল না। বিশ্বের যা কিছু মহান, 'অর্ধেক তার করিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী। নারীকে সেই সমানাধিকার থেকে সামাজিক ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে বঞ্চিত করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে নারীমুক্তি আন্দোলন তার শোধনের কাজ করেছে। সাম্যবাদী চিন্তাধারা নারী পুরুষের সমান অধিকারকে মানে। তাই প্রয়োজনে নারীকে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী প্রয়াস নিতে হবে। 'আজ প্রয়োজন যবে, যে হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে।' কবির আশা 'সে দিন সুদূর নয়।' বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 'ধরণী পুরুষের সাধে গাহিবে নারীরও জয়'।

অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। প্রাসঙ্গিক আলোচনা কয়েকবার পড়ুন। উত্তর করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) রাজা করিয়াছে ________, রাজার ________।
রাণীর দরদে ________ গিয়াছে ________ যত ________।

খ) মাথার ________, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও ________।
যে ________ তোমা করিয়াছে ________ ________ সে।
দূর করে দাও ________ চিহ্ন আছে যত ________।

২) কোন্ রচনা প্রকাশের জন্য কাজী নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়?

৩) "১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব নতুন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে।" নতুন সম্ভাবনার কথাগুলি কী, সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪) "তাঁর (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত) মরুকাব্যত্রয়ী বাংলার শ্যামল আবহাওয়ায় উষর, রুক্ষ, নৈরাশ্যের ছবি নিয়ে এসেছে।"—কাব্যত্রয়ীর নাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করুন।

৫) সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ক) কবিতায় তীব্র যৌবন-কামনা প্রকাশ পেয়েছে—
(১) রবীন্দ্রনাথ-এ।
(২) সত্যেন্দ্রনাথ-এ।
(৩) মোহিতলাল-এ।

খ) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য—
(১) হেমন্ত গোধূলি।
(২) সায়ম্।
(৩) ব্যথার দান

গ) কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেন—
(১) চরকার গান।
(২) ভাঙার গান।
(৪) পালকির গান।

ঘ) 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা—
(১) নজরুল ইসলাম।
(২) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
(৩) মোহিতলাল মজুমদার।

৬) কাজী নজরুল ইসামের বিদ্রোহী কবিতার প্রথম প্রকাশ— (১) ১৯২২-বিজলীতে

(২) ১৯২০-সওগাতে-এ

(২) ১৯২০ মোসলেম ভারত পত্রিকায়।

৬) নজরুল ইসলাম সম্পাদনার সঙ্গো যুক্ত ছিলেন এরকম যে কোনো তিনটি পত্রিকার নাম করুন।

৭) ক) 'এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল'—ইত্যাদি অংশটির অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করুন।

খ) "এতদিন শুধু বিলালে অমৃত"-এই উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে কবি কী বলতে চেয়েছেন বুঝিয়ে দিন।

৩৫.৭ মূলপাঠ—২ — দারিদ্র্য

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে ক'রেছ মহান !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কন্টক-মুকুট শোভা ! দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার !

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি কর পান ! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ !

বেদনাহলুদ-বৃন্দ কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহি, তুমি হে নির্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া-সম !
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির-সজল !

টলটল ধরণীর মত করুণায় !
তুমি রবি তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা নীহার বিন্দু ! ম্লান হ'য়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে ! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের ! তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল !

জ্বালা নাই নেশা নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্বল, অমরার অমৃত-সাধনা

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে!
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার 'টীকা'!....
গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা।....

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফের, দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন্
হে কঠোর-কণ্ঠ গিয়া ডাক, 'মূঢ়, শোন্,
ধরণী বিলাস কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর ভোগ!'—পড়ে হাহাকার
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি!

চল পথে অনশন ক্লিষ্ট ক্ষীণ তুন,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,
দু'নয়ন ভরি রুদ্র হান অগ্নি বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,
প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা।

বিনয়ের ব্যাভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ শরম বলি জান না কো কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে!
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

লক্ষ্মীর কিরীটী ধরি ফেলিতেছ টানি
ধুলিতলে ! বীণ-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী ?
যত সুর আর্তনাদ হ'য়ে ওঠে শুনি !

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে ! যেন আসে নাই
আজো কা'রা ঘরি ফিরে ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদের যেন ঘরে 'সানাইয়া' !
বধূদের প্রাণ আজ সানা'য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে ! সখী বলে, 'বল্
মুছিলি কেন লা আঁখি, মুছিলি কাজল ?'

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছি তেমনি সানাই !
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি !
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
'চুম্বনে বিবশ করি' ! ভোমোরোর পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।

উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ !
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের ! অকারণে আঁখি
পু'রে আসে অশ্রু-জলে ! মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে !
পুষ্পাঞ্জলি ভরি দুটি মাটি মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার !
সহসা চমকি উঠি ! হয়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাও নি ক' কিছু
কালি হ'তে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর !

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে !—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি ! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি ! কে বাজাবে বাঁশী ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্যাস !...

আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই।
[সিন্ধু-হিন্দোল]

২৪ আশ্বিন, ১৩৩৩।

৩৫.৮ সারাংশ—২

দারিদ্র্য মানুষকে তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে। মানুষের প্রকৃত সত্তা, তাঁর মনুষ্যত্বের প্রকৃত চেহারা এ সময়েই ফুটে ওঠে। ভারতীয় জীবনবোধের মধ্যে যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় আছে, তা কখনই ঐশ্বর্য বিকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে না। তাই দারিদ্র্যই মানুষকে মহতের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই যথার্থ শক্তির তীব্রতা প্রকাশ পায়।

দুঃখের দহন তাপে জীবনের সমস্ত রস যখন শুকিয়ে যায় তখন দু চোখে শুধু আগুন জ্বলে। ফুলের সৌরভ আর তেমন ছড়ায় না। পৃথিবীর সমস্ত করুণা ধারা যখন সূর্যের খরতাপে শুষ্ক হয় তখন আর জীবনের স্বপ্ন, তার সুন্দর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা বেদনার ভার নিয়ে যে গান রচনা হয় তা তো বেদনারই গান। তখন মনে হয় দারিদ্র্য ছাড়া জীবনের কোনো কিছুই আর সত্য নয়। মহা দারিদ্র্যের প্রলয়ঙ্কর শক্তি সর্বস্ব গ্রাস করতে উদ্যত।

এরই মধ্যে পৃথিবী যখন অপরূপ সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়, আগমনীর আনন্দের সুর ধ্বনিত হয়, তখন আশা জাগে, ম্লানমুখী শেফালিকাও ঝরে পড়বার আগে গন্ধ বিলিয়ে যায়। প্রজাপতি নেচে বেড়ায় পুষ্প থেকে পুষ্পে চঞ্চল পাখায়। এর মধ্যে কবি-প্রাণে বেদনার করুণ সুর বেজে ওঠে। আগমনী গানের মধ্যে যেন শুনতে পাওয়া যায়, নাই, কিছু নাই।

৩৫.৯ প্রাসঙ্গিক আলোচনা, কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'দারিদ্র্য' কবিতাটির রচনাকাল ২৪শে আইশ্বন ১৩৩৩ (ইং অক্টোবর ১৯২৬)। এসময় কবি বন্ধু হেমন্ত কুমার সরকারের ব্যবস্থাপনায় কৃষ্ণনগর বাস করছিলেন। সেকানে নজরুল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন ও ছাত্র-যুবা

সম্মেলনে শ্রমিকের গান ও ছাত্রদলের গান রচনা করে গেয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসে কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল-এর জন্ম। এসময় কবি সংসার পরিচালনা করতে গিয়ে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গো নিত্য লড়াই করেছেন। 'দারিদ্র্য' কবিতা প্রত্যক্ষত এই নিষ্করুণ দুর্দিনের প্রেক্ষাপটে রচিত। কবিতাটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায়, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ এ, পরে 'সত্তগাত'-এ মাঘ ১৩৩৩-এ পুনর্মুদ্রিত হয়। পরে কবির সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কবিতার সংগ্রহ গ্রন্থ 'সিন্ধু হিল্লোল' (১৩৩৪)-এ সংকলিত হয়। 'সিন্দু-হিল্লোল' প্রেমের কবিতা সংগ্রহ।

'দারিদ্র্য' কবিতা রচনার ও প্রকাশের প্রেক্ষাপট কবির অপর সহযোগী বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ-এর বর্ণনায়—"নজরুল ইসলাম তখন কৃষ্ণনগরে থাকত, আমি আরও কজনের সঙ্গো থাকতাম ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস পার্টির অফিসে...। আমাদের অফিস হতে পটুয়াটোলা লেনে 'কল্লোলে'র অফিস নিকটে ছিল। একদিন কি কারণে নজরুল কলকাতায় এসে ফিরে যাচ্ছিল। ....যাওয়ার আগে আমার হাতে সে 'দারিদ্র্যে'র পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে বলল, 'এটা ভাই তুমি কল্লোল অফিসে পৌঁছে দিও। ......দিনেশ রঞ্জন দাশ মনিঅর্ডার যোগে দশটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। একটি কবিতাও চেয়েছিলেন সেই সঙ্গো। এই কবিতাটি লিখেছি বড় দুঃখে।'"

নজরুল গবেষক ড. মিলন দত্ত এ সময়ের কিছু তথ্য প্রমাণ হাজির করেছেন। ড. দত্ত লিখেছেন—"ঘরে দারিদ্র্যে শতমুখী আক্রমণ। যে আক্রমণে প্রমীলা ও গিরিবালা জর্জরিত। .....অক্টোবর মাসে ৯ তারিখে প্রমীলা একটি পুত্র সন্তান (বুলবুল) প্রসব করলেন। ...ঘরে টাকা নেই। টাকার প্রচন্ড দরকার। চিঠি লিখলেন প্রকাশক ব্রজবিহারী বর্মনকে—'টাকার বড্ড দরকার। যেমন করে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে পাঠাও।' ব্রজবিহারী পনেরো টাকা পাঠিয়েছিলেন। টাকা পেয়ে তাকে জানালেন—'চিন্তার মধ্যে অর্থ চিন্তাটাই সবচেয়ে বড়।' অপর এক চিঠিতে বন্ধু মুরলীধর বসুকে লিখেছেন—"নিত্য অভাবের চিত্ত ক্ষোভ আমায়... দুর্বল করে তুলছে।..." মুরলীধরকে কয়েকটি কবিতা পাঠিয়ে 'বঙ্গাবানী' থেকে টাকা সংগ্রহ করে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। আক্ষেপ করেছেন, "আর মান ইজ্জত রইল না,... অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকে কেড়ে নেয় শেষে।"—এরই মধ্যে কবির দ্রারিদ্র্য কবিতা—

হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান ...।

জনৈক সমালোচক কবিতায় মর্মসত্যটি তুলে ধরেছেন—১৩৩৩ সালের শরৎকালে কৃষ্ণনগরে আগমনীর করুণ সানাইয়ে যেন কবির জীবনের ব্যথা-বেদনার কান্না ঝরে পড়ছিল, সেই মুহূর্তের অমর সৃষ্টি 'দারিদ্র্য'[১]।

এ কবিতায় কবি জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ বশত যে চিত্তক্ষোভ, বেদনাভার মনকে বিচলিত করেছে সে তো জীবনকে একান্ত করে ভালবাসার কারণেই। এদিক থেকে সিন্ধু হিল্লোলের গভীর জীবনরসরসিকতা বা প্রেমভাবনার কোনো বিরোধ নেই।

এ কবিতায় 'দারিদ্র্য' দুঃসহ দহনে প্রাণের রূপরসসৌগন্ধ্য শুষে নিয়ে জীবনকে বিবর্ণ করলেও, কবির জীবনানুরাগ বেদনায় ম্রিয়মাণ হলেও তা শেফালির শুভ্র সুরভি ছড়াতে পরাঙ্মুখ হয়নি। আশাহীন ভরসাহীন বিশুষ্ক দিনগুলিতেও কবি দেখেন, 'নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়, দুরন্ত নেশায়, পুষ্প প্রগল্‌ভায় চুম্বনে বিবশ করি।' শত হতাশার মধ্যেও এই আশার কথা, ভরসার কথা কবি নজরুলের পক্ষেই বলা সম্ভব।

---

১ রফিকুল ইসলাম—কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও কবিতা। পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৭

এ কবিতায় কবি আবেগের তীব্রতা নিয়ে বক্তব্যকে অত্যন্ত দৃঢ় সংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন। কবিতার প্রথম স্তবকটিতে যে কথা বলেছেন, তা কোন মহৎ শিল্পীর পক্ষেই বলা সম্ভব। দারিদ্র্য কবিকে মহান করেছে, খ্রিস্টের সম্মান দান করেছে—এ কথার মধ্য দিয়ে দীনহীন আস্তাবলে মাতা মেরির সন্তানের জন্মের বার্তা যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, তা স্মরণাতীত কালের জ্যোতিমণ্ডিত এক অম্লান ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবিও যেন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে এক মহত্তর জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। পার্থিব সম্পদ রিক্ততার মধ্যে জীবনের পরীক্ষা দিয়ে, মহত্তর জীবনের বাণীকে লাভ করেছেন, আর সেই প্রাণ-শক্তিতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে জীবনকে ভালোবেসে তার প্রেমসৌন্দর্যকে কাব্যে সংগীতে তুলে ধরেছেন। সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই কবি সৌন্দর্যকে যেমন দেখেছেন, তেমনই দেখেছেন রিক্ত জীবন ব্যথিতের অশ্রু। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই কবি অর্জন করেছেন সেই শক্তি যা মোহমুক্ত দৃষ্টিতে 'সত্যকে' দুরন্ত সাহস ভরে অসংকোচে, স্পষ্ট ও ক্ষুরধার ভাষায় প্রকাশ করেছে। কবির শিল্পী সত্তা, তাঁর সৌন্দর্য চেতনা, সৃষ্টিশীল আবেগ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছে দারিদ্র্যরূপী নিয়তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে। তার পরিচয় পাওয়া যায়—

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস—পংক্তিদ্বয়ে।

সুন্দরের দান গ্রহণ করবার জন্য কবির মন যখনই উন্মুখ হয়েছে, তখনই দারিদ্র্য, ভয়ংকর ক্ষুধারূপে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্যসাধনাকে ব্যর্থ করেছে। কল্পনার জগৎ হয়েছে যেন শূন্য মরুভূমি, এ যেন নিয়তির সঙ্গে কবির সৌন্দর্য কল্পনার সংঘাত।

কবিতাটির রচনাকাল আশ্বিন, শরৎকাল,—শারদীয়া উৎসবের কাল, আগমনীর সানাই, শেফালির শুভ্রতা ও তার প্রাণমাতানো সুবাস বাঙালির গৃহ জীবনকে বর্ণগন্ধময় করে তোলে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে কবির সৌন্দর্যচেতনায় করুণ পরিণতি ফুটে উঠেছে—

বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া-সম।"

এই ছত্রগুলিতে এক মর্মান্তিক বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতার চিত্ররূপ আঁকা হয়েছে। তবুও কবি হতোদ্যম হননি। তিনি কণ্ঠে জ্বালা নিয়েও গান গেয়ে মালা গেঁথে চলেছেন। 'ক্ষমাহীন দুর্বাসা'র মতো ক্ষুধার্ত সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরছে। সে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—দুর্বাসার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতেই পৃথিবীতে মহামারি দুর্ভিক্ষ, তুফান দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে—

ধরনী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো,
আছে কাঁটা শয্যাতলে, বাহুতে প্রিয়ার
তাই এবে কর্ ভোগ।

এসব সত্য বটে, কিন্তু আরও সত্য এরই মধ্যে আছে শরতের আনন্দময়ীর আগমনে সানাই-এর সুরে আগমনী গান—এ যেন প্রবাসী প্রিয়তমের প্রতীক্ষার কাল শেষের গান—

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

বধূদের প্রাণ আজ সানায়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে।

আর প্রিয় সখী বলে, ‘‘বল্ মুছিলি কেন না আঁখি, মুছিলি কাজল।’’—এখানেই ফুটে উঠেছে শত বেদনায়, শত হতাশায়—আশার প্রদীপ জ্বালবার সংবাদ।

জীবনের এই বিচিত্র রূপৈশ্বর্যে কবিপ্রাণ যখন সুরে তালে লয়ে উদ্‌বেলে হয়ে ওঠে তখনই ‘ধরিত্রী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার। ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।’ —এই অনুভব যখন জাগে, তখনই ‘সহসা চমকি’ উঠে মনে পড়ে যায় দারিদ্র্যের নির্মম যন্ত্রণার কথা। তাঁর ক্ষুধাতুর শিশু দুদিন না খেয়ে জেগে উঠে কাঁদছে। দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে না পারায় বেদনাহত কবিপ্রাণ আত্মগ্লানিতে বলেন আগমনীর আগমনে তাঁর আনন্দের নেই অধিকার।

‘দারিদ্র্য’ নজরুলের একটি অনবদ্য কবিতা। দারিদ্র্যের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মানবজীবনের রস ও সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে। তবি জীবনে দারিদ্র্যের সুতীব্র জ্বালা কবিতাটিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী কবিসত্তা অবনমিত হয় নি। পবির্তে উপহার দিয়েছে এক সংগ্রামী চেতনা।

কবিতাটি সমিল প্রবহমান মিশ্রকলা বৃত্ত ছন্দে রচিত।

শীর্ণ করপুট ভরি / সুন্দরের দান।।
যতবার নিতে যাই/—হে বুভুক্ষু তুমি।।
অগ্রে আসি কর পান।**/শূন্য মরুভূমি।।
হেরি মম কল্পলোক।**/আমার নয়ন।।
আমারি সুন্দরে করে/অগ্নি বরিষণ।** ।।

শ্বাসযতি ও অর্থযতির বিযুক্তি ও পরস্পর দুটি ছত্রে অন্ত্যমিল বা মিত্রাক্ষর। ছত্রের দ্বিপর্বিক মাত্রাবিন্যাস যথাক্রমে ৮ + ৬ মাত্রার।

শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস যথা ঃ উদ্ধত উলঙ্গা দৃষ্টি, তরল গরল, অমরার অমৃত-সাধনা। অর্থালঙ্কার—যথা উৎপেক্ষা—‘‘উছলি উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ,’’ ‘‘ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার/ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।’’

উপমা ঃ শেফালির মতো শুভ্র সুরভি বিথার,

সমসোক্তি ঃ শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
‘আয় আয়’ কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।

উদ্ধৃত অলংকারগুলি কবতির বিশেষ তাৎপর্য বাড়িয়েছে শুধু নয় কাব্যকেও ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছে।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা—

দানিয়াছে খ্রিষ্টের সম্মান—যীশু জাতিতে ছিলেন ইহুদি। তিনি পরমেশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত দূত। খ্রিস্ট একজন মুক্তিদাতারূপে গণ্য হল। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমত খ্রিস্ট ধর্ম নামে পরিচিত। যীশুর প্রথম শিষ্যরাও ইহুদি

ছিলেন। তিনি তাঁর বাণী প্রচার এবং নানা অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করলে ইহুদিরা তাঁকে খ্রিস্ট বলে মেনে নেন। যীশুর এই কার্যাবলি ইহুদি ব্যতিরিক্ত অন্যদের মধ্যে প্রচার করলে, নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যীশুর বিশ্বজনীন ও আধ্যাত্মিক বাণী অনেক ইহুদি নেতা ও যাজকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। তারা মিথ্যা রাজদ্রোহের অভিযোগে যীশুকে বিদেশি শাসনকর্তার হাতে সমর্পণ করে এবং শেষে কাঁটার মুকুট পরিয়ে বহু অপমান ও যন্ত্রণার মধ্যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। যীশু বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ করেন এবং মানুষের পাপ ও অপরাধের জন্য স্বয়ং প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন।

যীশু যেমন বিনা অপরাধে মৃত্যুবরণ ও মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন, তেমনি কবিও যেন বিনা দোষে সীমাহীন দারিদ্র্যের দ্বারা পীড়িত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে কাল যাপন করেছেন। এই জীবন-যন্ত্রণা কবির মনে যে ভাবানুভূতি সৃষ্টি করেছে, তা-ই 'দারিদ্র্য কবিতার উৎস' যীশু যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহত্তর জীবনের সত্যকে তুলে ধরেছেন, কবিও এই জীবন-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবনের মহত্তর সত্যকে আবিষ্কার করেছেন।

ঋষি ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা—কোপন স্বভাবের জন্য খ্যাত পৌরাণিক ঋষি। এ থেকে প্রচলিত কথায় ক্রোধী ব্যক্তিকে 'দুর্বাসা' বলা যায়। তাঁর উগ্র স্বভাবের পরিচয় নানা কাহিনির মধ্যে পাওয়া যায়। কালিদাস 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে পতিচিন্তায় নিমগ্না অনন্যমনা শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার কঠোর অভিশাপের বিবরণ দিয়েছেন। এই অভিশাপের ফলে পতি দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হন এবং তাঁকে দীর্ঘকাল পতিবিরহ বেদনা সহ্য করতে হয়।

(সূত্র ঃ ভারতকোষ, খণ্ড—৪)

কবি নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য' কবিতায় দারিদ্র্যের সীমাহীন নিপীড়ন কবি চিত্তকে বিহ্বল করেছে। তিনি এর কোনা কারণই খুঁজে পান নি। যখনই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর প্রেরণায় সত্য সুন্দরের সাধনায় নিরত হয়েছেন তখনই কোনো অজ্ঞাত পথে ক্ষুধা, দুঃখ দারিদ্র্যের যন্ত্রণা তাঁর স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে। আর ক্ষুধার তাড়নায় অর্থের প্রয়োজনে দ্বারে দ্বারে আবেদন জানাচ্ছেন—"টাকার বড্ড দরকার....অন্তত পঁচিশটি টাকা পাঠাও" বা দুটি গান পাঠিয়ে প্রত্যাশা করেছেন যদি ওঁরা টাকাটা দেয় তা হলে খুব উপকার হয় অথবা ভাবছেন, "অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয় শেষে।"—এই অর্থচিন্তার প্রেক্ষাপটে এই 'দারিদ্র্য' কবিতা, তাই 'দুর্বাসার' শাপের মত 'ক্ষুধা, দারিদ্র্য' কবিকে যন্ত্রণা বিদ্ধ করেছে একথা বলেছেন।

লক্ষ্মীর কিরীটী—ইত্যাদি—লক্ষ্মীর স্বর্ণমুকুট, সরস্বতীর বীণা ঐশ্বর্য ও সৃষ্টিশীল সৌন্দর্য কল্পনার প্রতিভূ—এ তো ধরণীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বসম্পদের বিচিত্র বৈভব যে গুণীজন সৃষ্টি করেন, তাঁদের উপর দারিদ্র্যের অমোঘ আক্রমণ সে সৃষ্টিকে অকালে বিনষ্ট করে, বিরূপ প্রতিকূলতায় সমস্ত 'সুর' যেন আর্তনাদ হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। প্রাসঙ্গিক আলোচনা ভালো করে পড়ুন। তাহলেই, যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হবে।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ________ দৃষ্টি, বাণী ________

বীণা মোর ________ তব হল ________।

খ) তুই নাগ, ________ তোর ________ দহে।

________ বসি তুই গাঁথিবি ________,

গ) বীণা-তারে ________ হানি

________, কী সুর বাজাতে চাহ ________ ?

যত সুর ________ হয়ে ওঠে শুনি।

২) 'দারিদ্র্য' কবিতার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন।

৩) 'দারিদ্র্য' কবিতার ছন্দ-রীতি সম্পর্কে আপনার অভিমত চারটি ছত্র উদ্ধৃত করে আলোচনা করুন।

৪) 'দারিদ্র্য' কবিতা থেকে একটি করে অনুপ্রাস, উপমা, ও উৎপ্রেক্ষা অলংকারের উদাহরণ দিন।

৫) ক) 'দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান কন্টক মুকুট শোভা'—উদ্ধৃতির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

খ) 'দুর্বাসা' কে ? তাকে ক্ষমাহীন বলবার কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩৫.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১) কাজী নজরুল ইসলাম—সঞ্চিতা/সাহারা, সিন্দুহিল্লোল, চক্রবাক।

২) ড. রফিকুল ইসলাম—কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য।

৩) ড. মিলন দত্ত—নজরুল জীবন-চরিত।

৪) অধ্যাপক আতভির রহমান—নজরুল কাব্য-সমীক্ষা।

৫) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—নজরুলের কবিতা ঃ অসংযমের শিল্প।

৬) পশ্চিমবঙ্গ ঃ কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা ১৪০৬।

৭) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ঃ নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারক-গ্রন্থ।

M#2\D:\EBG-2\Unit-15 Pm6.5\1st proof

একক ৩৬ ❒ জীবনানন্দ দাশ ঃ একটি কবিতা

গঠন

৩৬.১ উদ্দেশ্য
৩৬.২ প্রস্তাবনা
৩৬.৩ জীবনানন্দ দাশ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা
৩৬.৪ মূলপাঠ—১ ঃ বনলতা সেন
৩৬.৫ সারাংশ—১
৩৬.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।
৩৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩৬.১ উদ্দেশ্য

প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে, বিশেষত বিশ ও তিরিশের দশকে এক তরুণ কবি-গোষ্ঠী রবীন্দ্রকাব্যের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র ধরনের নতুনতর কাব্যসৃষ্টিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন রবীন্দ্র প্রতিভার সর্বব্যাপ্ত প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে, শুধু তাঁর প্রতিধ্বনি হয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি সম্ভব নয়। কল্লোল-কালিকলমের যে কবিকুল সমকালের প্রেক্ষাপটে নতুন পথের সন্ধান করছিলেন জীবনানন্দ বোধ করি তাঁদের মধ্যে ভাব স্বাতন্ত্র্য ও কাব্যভঙ্গিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। এ হেন কবির কাব্য ও কৃতি সম্পর্কে আপনার বিশেষভাবে জানবার সুযোগ ঘটবে তিনটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। আপনি কবির—

- কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও কাব্যনির্মাণে অভিনবত্ব,
- প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ-এর পরিচয়
- কাব্যের উপমা ও চিত্রকল্পের অনন্যতা
- কালচেতনা ও ইতিহাসবোধ সত্ত্বেও তাঁর কবিতা বক্তব্য প্রধান নয়
- ইতিহাস ও সমাজচেতনা এক তীক্ষ্ণ ও নতুন বেদনাবোধের সঞ্চার ঘটায়
- রচনায় বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণে শূন্যতা ও নির্জনতার একটি পরিমণ্ডল ফুটে উঠেছে
- রোমান্টিক মেজাজ ও মহৎ প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা অন্তরাশ্রয়ী হওয়ায় বিষণ্ণতা তাঁর কবিতার অন্তর্লগ্ন হয়েছে
- কাব্য প্রকরণে অচিন্তিতপূর্ব বৈচিত্র্য—প্রভৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা করতে পারবেন। আর এই ধারণা থেকে জীবনানন্দ ও তাঁর সমকালের কবিদের রচনা বিশ্লেষণ করে তাঁদের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আপনি আলোচনা করতে পারবেন।

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

৩৬.২ প্রস্তাবনা

দ্বিতীয় এককে আপনি আধুনিক বাংলাকাব্যে ১৯শ ও ২০ শতকে দেশকালগত পার্থক্য জনিত কারণে কবি ধর্ম ও কবিকৃতির বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণ ও তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনেছেন। সেই পরিচয় সূত্রে তৃতীয় এককে ১৯শ শতকের কবি মধুসূদন ও তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য ষষ্ঠ সর্গ পাঠ ও চতুর্থ এককে ১৯শ-এর উত্তরার্ধ ও ২০শ শতকের প্রথমার্ধের কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথ এবং পঞ্চম এককে একান্তভাবে প্রথম যুদ্ধোত্তরকালে কবি নজরুল ইসলামের কবিতার মধ্য দিয়ে যুগলক্ষণগুলি সম্পর্কে আপনার একটি ধারণা জন্মেছে। বর্তমান এককের কবি প্রথম যুদ্ধোত্তরকালের দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু সমসাময়িক সকল কবির চেয়ে কল্পনা ও প্রকাশে বিশেষ স্বতন্ত্র।

জীবনানন্দের প্রথম কবিতা ('বর্ষ আবাহন'—ব্রহ্মবাদী, বৈশাখ ১৩২৬) প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯১৯ সেই সময় থেকে আমৃত্যু (মৃত্যু ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪) তিনি কাব্যরচনা করে গেছেন। সুতরাং তাঁর কাব্যরচনার পরিসর প্রায় ৩৫ বছর। এ সময়টি থেকে ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্য রচনারও সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময়। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগীর সংখ্যাও অগনিত। সেই সঙ্গে অনুসারীও কম ছিল না। বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের মতো হতে গিয়ে তাঁর ভাব, ভাষা, ছন্দ অনুসরণ করেও—যেহেতু দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ হওয়া অসম্ভব,—তাই লোকদৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেছেন। প্রমথনাথ ও ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, রমনীমোহন ঘোষ ইত্যাদি তাই বিস্মৃত নাম। কিন্তু করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রভৃতির মধ্যে রবীন্দ্র ভাবানুভূতির পরিচয় সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র কবি ব্যক্তিত্ব থাকায় এঁরা রবিরশ্মিকে শুধু প্রতিফলিত করেননি। স্বকীয় ধ্যানধারণা নিয়ে স্বতন্ত্র একটি কাব্যাদর্শক তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। এটিও ছিল অনেকাংশে রবীন্দ্র ছায়াছন্ন। এঁরা লোকায়ত সংস্কার ও রোমান্টিক ভাবনার সম্মিলনের অনেকটা চেষ্টা করেছিলেন, ফলে এঁরা বাংলাকাব্যে অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। কিন্তু পরবর্তী পঁচিশ বছর কয়েকজন কবিকে আমরা পেয়েছি যাঁদের কবিতা সে সময় পাঠক সমাজকে সচকিত করে তুলেছিল। নজরুলের বিদ্রোহ, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ এবং মোহিতলালের দেহবাদী উচ্চারণ তৎকালে নতুন এক আবহ নিয়ে আসে। রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত ও রবীন্দ্র ভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কবিতায় ছন্দের দোলা, বাঙালির সমাজ ও প্রতিবেশের নানা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন—রচিত হয়েছে 'পাল্কীর গান', 'দূরের পাল্লা', ইলশে গুঁড়ি', এবং 'গান্ধিজী', 'নফর কুণ্ডু', 'জাতির পাঁতি', 'মেথরের' মতো কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথ দেশি বিদেশি কাব্যের অনুবাদ করে বাংলা কাব্যে দেশ বিদেশের মনোভূমিকে কাছে নিয়ে এসেছেন। তিনিই প্রথম গাড়োয়াল ধর্মঘট এবং ১৩১৩ সালে কিংবা তারো আগে 'সাম্যসাম' রচনা করে অসামান্য ঘটনা ঘটিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

> "মানিনা গির্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর
> দেবতা মোদের সাম্য দেবতা অন্তরে তার ঘর।"—

একথা তিনি প্রথম বলেছেন যেমন সত্য, তেমনি সত্য যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ ও শ্লেষমিশ্রিত উচ্চারণ ও নজরুলের বিদ্রোহদীপ্ত ঘোষণা। এঁদের কবিতায় শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আধিক্য অনিবার্যভাবেই বাংলা কবিতার সে

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

সময়ের পাঠককুলকে আকৃষ্ট করেছিল। এসব থেকে এই ধারণা জন্মানো সম্ভব হল যে, রবীন্দ্র কাব্যধারার সর্বত্রসঞ্চারী প্রভাবের মধ্যে থেকেও সমকালীন কাব্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা প্রকাশ সম্ভব। এঁরা বাংলা কবিতায় আমদানি করলেন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার ও জীবনাদর্শের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ জানিয়ে দিলেন 'মানুষের সঙ্গো মানুষের ভেদ নেই'। তিনি মেথরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করলেন। যতীন্দ্রনাথ চাষিকে ভাই বলে কাছে টেনে নিলেন, নজরুল আরও একধাপ এগিয়ে 'বারাঙ্গানাকে' মাতৃসম্বোধন করলেন। ওদিকে মোহিতলাল কাব্যের রীতি ও প্রকৃতির গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছেন। তাঁর কবিতার ভাবসংহতি ও অনমনীয় পৌরুষ তরুণতর কবিদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর 'যৌবনবন্দনা', তাঁর তন্ত্রধর্মী দেহবাদ—'ভুলেছি আত্মার কথা মানি শুধু দেহের সীমানা'—সে যুগের তরুণতর আধুনিক কবিদের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁক কবিতার Eternal Passion ও Eternal Pain—জীবন, মৃত্যু, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গোই তুলে ধরেছিলেন। কল্লোলের কবিরা এতে মুগ্ধ হলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, 'মোহিতলালের জীবনবোধে যে তীব্রতা "অক্ষম হাতে শুধু উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছাসে অপব্যয়িক হতে পারত", তা তাঁর হাতে "সুতীব্র অথচ শাসিত স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে।" "ইন্দ্রিয়গোচর মৃত্তিকাশ্রয়ী অনুভূতির তীব্র তপ্ত গাঢ় স্বাদ" তাঁর মতো সুনিপুণভাবে কেউ পরিবেশন করতে পারেননি।

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে সোভিয়েত সমাজ বিপ্লব। এর ফলে মানুষ ও মানব সমাজ সম্পর্কে নতুন চেতনার সঞ্চার ঘটেছে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় লেখকদের রচনাবলি তরুণ লেখকদের মনে ভাঙাচোরা পরিবার সমাজজীবনে নানা দুর্যোগ দুর্ভাবনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল। জনসমাজ জনজীবন তরুণ কবি সাহিত্যিকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করছিল। কল্লোল-কালিকলম উত্তরা-প্রগতির কবি গোষ্ঠী এই সমস্ত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলেন বলেই তাঁদের রচনা প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়েছিল। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অনেক কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' ও বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি এই সময়ের রচনা। ওদিকে 'পরিচয়' পত্রিকার আবহাওয়ার লালিত সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী এবং বিষ্ণু দে প্রভৃতি সকলেই ১৯০০—১৯১০-এর মধ্যে জন্মেছেন। প্রেমেন্দ্র, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব-এর প্রবণতাগুলিকে যদি সূত্রায়িত করা যায় তবে বলা যেতে পারে প্রথমোক্ত জন যদি হন হুইটম্যানীয় আদর্শে সমাজসচেতন, দ্বিতীয় নির্জন, নিঃসঙ্গ, প্রেম ও প্রকৃতিচেতন আর বন্দির বন্দনায় কবি দেহজ প্রেমের তীব্র আকুলতায় কাতল। 'পরিচয়ের' কবিরা এদিক থেকে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র চরিত্রলক্ষণযুক্ত এবং অনেক অংশেই মননশীল মার্জিত বৌদ্ধিক।

কল্লোলের প্রথম পর্যায়ে (১৯২৩-১৯৩০) প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪—১৯৮৮) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। 'প্রথমা'র (১৯৩২) কবিতায় তিনি কখনো বহুলোকের মিলিত অনুভবকে, কখনো বা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবকে সঞ্চারিত করেছেন। এখানে কবির স্বপ্নভাঙা প্রাণের পরম বেদনা বোধের পরিচয় আছে। তাঁর ব্যক্তিমানস যেমন দুর্গম পথ সন্ধান করেছে, তেমনি সভ্যতার বিবর্তনেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কবিকণ্ঠ ছিল অব্যর্থ।

আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম পুরোধা বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪) পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি। প্রেমের কবিতাতেই তাঁর কবিত্ব শক্তির পূর্ণ পরিচয়। তাঁর কাব্য সাধনার শুরু রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

'মর্মবাণী' (১৩৩১) কাব্যগ্রন্থে সে পরিচয় আছে। তিনি বুঝেছিলেন রবীন্দ্রানুসরণে নতুন যুগ ভাবনার প্রকাশ সম্ভব নয়, তাঁদের কবি মানসেরও মুক্তি নেই। অনুভব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের "কাব্যকলা মারাত্মক রূপে প্রতারক। সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে।" বুদ্ধদেব প্রেমের কবি। এ প্রেম মূর্ত, শরীরী 'প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী, দেহজ কামনার শাপে নিরন্তর দগ্ধ।' কিন্তু বুদ্ধদেব শুধু তাতেই নিমজ্জিত থাকেননি। ইন্দ্রিয় তাঁর কাছে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করবার উপায় মাত্র।

বুদ্ধদেবের নায়িকা রক্ত-মাংসের নারী। দেহী বলে তার নামরূপ দিয়েছেন—মৈত্রেয়ী, কঙ্কাবতী। রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া'য় বর্ণিতব্য নারী প্রকৃতিকে ধরিয়ে দিতে নাম ব্যবহার করেছেন, তার কোনো শরীরী রূপ দিতে চাননি। 'মানসী', মানসসুন্দরী তো ভাবলোকবিহারিণী। বুদ্ধদেব ও আধুনিক কবিরা রোমান্টিক অতীন্দ্রিয় অমূর্ত নায়িকাকে দেহী রূপ দিয়েছেন। জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে তাদের আরও স্পষ্ট করে তুলতে পদবী যোগ করেছেন—বনলতা সেন, শেফালিকা বোস, অরুণিমা সান্যাল।

পরে প্রৌঢ় পরিণত বুদ্ধদেবকে দেখেছি তিনি জীবনের অমোঘ সত্যটিকে উপলব্ধি করেছেন—জীবনে যেমন সত্য যৌবনের ঐশ্বর্য, তেমনি সত্য যৌবন-কামনা-মুক্ত পরিণত প্রৌঢ়ত্বের নিরাভরণ রূপ। মোহ ও মোহমুক্তি এই দুই নিয়েই মানুষের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়। তাঁর শেষ পর্যায়ী কাব্যে—'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮) ; 'শীতের প্রার্থনা', বসন্তের উত্তর', (১৯৫২) ; 'যে আধার আলোর অধিক' (১৯৫৮)-এ সে পরিচয় আছে।

(১৯০১—১৯৮৬) পরিচয় পত্রিকা প্রকাশের কাল থেকেই সুধীন্দ্রনাথ (১৯০১—১৯৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৯—১৯৮০), ও অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১—১৯৮৬) কাব্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কবিরা একই সামাজিক পটভূমিকায় বাস করেও স্বতন্ত্র ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যবাহী হলেও তাঁর কাব্যে ব্যাপক আত্মানুসন্ধানের পরিচয় আছে। একসময় নিজেকে পূর্বগামী কবিদের অনুসারী বললেও, পরে, তাঁর কবিতায় আধুনিক কালের সংহত মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রবহমান ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে কবিতার রূপান্তর ঘটান। তিনি তাঁর স্বকীয়তাকে অর্জন করেছিলেন নিখুঁত কারুকৃতির সহায়তার। সাবলীল রচনাকে তিনি স্বীকার করতে চাননি। সাধারণ পাঠকের কাছে যা স্বচ্ছন্দ, তাকে তিনি চর্বিতচর্বণের নিদর্শন মনে করতেন। একান্তভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সুধীন্দ্রনাথ মানতেন নিরাসক্তি সৎসাহিত্যের অনন্য লক্ষণ, তাকে আয়ত্ত করাই কাব্যচর্চার হেতু। মননপ্রধান কবি বহু ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন বলেই আভিধানিক ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন।

বিষ্ণুদের কবিতা এ কালের পাঠকের কাছে খুবই প্রত্যক্ষ। ইনিও একসময় রবীন্দ্রনাথের মতো সুন্দরের সাধনায় আগ্রহী ছিলেন। চেয়েছিলেন 'আনন্দ, আনন্দ, শুধু আনন্দ-নিষ্যন্দন আকাশ' কিন্তু বিরোধী পারিপার্শ্বিকতা সম্ভব ছিল না। ঊর্বশী ও আর্টেমিশ-এ 'ছেদ' কবিতায় বলেছেন,—'হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।' ফলে সাম্যবাদী চিন্তাভাবনাজনিত সমষ্টির অঙ্গীকার তাঁর কবিতায় অসামান্য মর্যাদা পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, শান্তির জন্য সংগ্রাম—এ সবের মধ্যেও তিনি কখনো বিশ্বাস হারাননি। তাঁর কাব্য স্বল্পবাক্, ভাবগম্ভীর, দেশি

প্রতীক ও চিত্রকল্পের পাশাপাশি বিদেশি প্রতীক, উপমা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে সমৃদ্ধ। তাঁর কবিতার ভাষা বিন্যাস ও প্রয়োগ কৌশল অনেক সময় একটু জটিল কদাচিৎ তাঁর কবিতার বিষয় ও ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে একটু দুরূহ বলে মনে হতে পারে।

অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিক চিন্তাভাবনা, নতুনতর আঙ্গিকে ও ভঙ্গিকে রচিত কবিতা প্রথম থেকেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। তাঁর কবিতা আপাতদৃষ্টিতে অনেকটা সহজ মনে হলেও, সেটি ঠিক নয়। বরং বলা যায় তাঁর কবিমানস অনেকটা জটিল ও দ্বিধাবিভক্ত। তাঁকে মনে হতে পারে অনেকটা আধ্যাত্মিক বা মিস্টিক বা মরমিয়া চেতনার উত্তরাধিকারী, বস্তুত এটি তাঁর এক ধরনের ছদ্মবেশ। "নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের তলায় যেমন লুকিয়ে থাকে মগ্ন শৈল ও ঘন অরণ্য, ঘূর্ণাবর্ত ও জলচর জীবের বিক্ষোভ, তেমনি ধ্যানগম্ভীর 'সঙ্গাতি'র কবির প্রশান্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক দ্বন্দ্ব জর্জর আধুনিক মানস—সমন্বয় যার কাম্য" অথচ যাকে পাওয়া যায় না। তাঁর কবিমানসের বিবর্তনের প্রথম স্তরে বস্তু ও চেতনার মধ্যে ঐক্যকে দেখেছেন, পরে উপলব্ধি করেছেন বিজ্ঞান ও বস্তু চেতনা দিয়ে বিশ্বের সকল রহস্যকে উপলব্ধি করা যায় না। "বাহিরের সকল ঘটনার তাৎপর্য, সকল বিরোধের সঙ্গাতি, সকল বৈষম্যের ঐক্য নিহিত আছে কবির ধ্যানে।" তাই যা দেখা যায়, তাই সব নয়—অর্থাৎ "দৃষ্টির দর্শন" সব কথা নয়। কাব্যেরও একটি শ্রেয়তা আছে, তা সমাজ-নিরপেক্ষ, সংসারের সুখ দুঃখ থেকে ভিন্ন—তাকে ধ্যানে উপলব্ধি করতে হয়। কাব্য এভাবে অমিয় চক্রবর্তীকে সমাজ থেকে দর্শনে পৌঁছে দিয়েছে। ফলত তাঁর কবিতায় দৃষ্টির জগৎ ধ্যানের জগতের বিরোধ বেধেছে—কবির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। এছাড়া আছে তাঁর কবিতায় বিশ্বপথিক কবির এক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার পরিচয়। উপসংহারে বলা যায় অমিয় চক্রবর্তী বস্তুবিশ্ব-সমাজদর্শন-বিশ্বদর্শন-এ নিয়ত পারাপার করে যে প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছেন, তা তাঁর কবিতাতে জটিল করেছে। কবিতার ভাষাকে আপাত বিশৃঙ্খল, ব্যাকরণকে ভেঙেচুরে তাতে প্রাণের সাড়া জাগাতে চেয়েছন। বলা যায় তাঁর রচনারীতিতে সৃষ্টিশীল বিশৃঙ্খলার—(Creative violence)-এর সুস্পষ্ট ছাপ আছে।

আধুনিক বাংলা কাব্যের নানা চেতনাসমৃদ্ধ সৃষ্টিশীল প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দের আবির্ভাব। জীবৎকালে বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে তিনি কিছুটা সমাদর পেলেও তাঁর কবিমণীষা মৃত্যুর পর যেভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, প্রথম শ্রেণির কবি প্রতিভার মর্যাদা পেয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ পাননি। জীবনানন্দের জীবনবৃত্ত ও কাব্যকথা প্রসঙ্গে সেটি আলোচ্য।

৩৬.৩ জীবনানন্দ দাশ ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও কাব্য কথা

কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫, ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯, বরিশাল শহরে। তাঁর পূর্বপুরুষরা এক সময় ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের 'গাউপাড়া' গ্রামে বাস করতেন। সেটি পরে পদ্মার ভাঙনে লুপ্ত হয়েছে। পিতামহ সর্বানন্দ প্রথমে পড়াশুনা পরে চাকরিসূত্রে বরিশালে স্থায়ী হন। সর্বানন্দ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সত্যানন্দ বাবার ইচ্ছায় কলকাতার সিটি কলেজে পড়ে প্রথমে ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতা পরে নিজের প্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সত্যানন্দের স্ত্রী কুসুমকুমারী ব্রাহ্ম চন্দনাথ দাসের মেয়ে। বেথুন স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়বার সময় তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পরেও তিনি কাজের ফাঁকে লেখাপড়া

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

করতেন, কবিতা লিখতেন। দুই ছেলে—জ্যেষ্ঠ জীবনানন্দ, কনিষ্ঠ অশোকানন্দ, বোন সুচরিতা দাশ। শৈশবে ভোরে উঠে বাবার উপনিষদ আবৃত্তি, মায়ের গান শুনতেন। পরিচারক-পরিচারিকাদের কাছে গল্প-গাথা-ছড়া শুনতেন ; গাছ, পাখি লতা পাতা এদের কাছে চেনা। ১৯১৫ তে ব্রজমোহন স্কুলে থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ব্রজমোহন কলেজে আই.এ. (১৯১৭), পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাম্মানিক ইংরেজি সহ বি. এ. (১৯১৯) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১-এ এম.এ. পাশ করে সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু (১৯২২), কলেজের অর্থ-সঙ্কটে কনিষ্ঠ অধ্যাপক জীবনানন্দের কর্মচ্যুতি (১৯২৮)। বৎসরাধিককাল টুইশন নির্ভর বেকার থাকার পর ১৯২৯-এ মাস তিনেক খুলনার বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে পড়ান। ওই বছরের ডিসেম্বরে তিনি দিল্লির রামযশ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। সেখানে বরিশালের অশ্বিনী দত্ত-র ভাইপো সুকুমার দত্ত কলেজের সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩০-এর ৯ই মে খুলনার সেনহাটি গ্রামের রোহিণী গুপ্তের কন্যা লাবণ্য দেবীকে বিয়ে করেন ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে। শোনা যায়, রামযশ কলেজ বিয়ের জন্য ছুটি দিতে চায়নি, তাই তাঁর আর ফিরে যাওয়া হয়নি। প্রায় বছর পাঁচেক বেকার ছিলেন। মাঝে কিছুদিন জীবন বিমার এজেন্ট-এর কাজ করেছেন। কিছুদিন বন্ধুর সঙ্গো ব্যবসাও করেছেন। জীবনধারণের একমাত্র উপায় গৃহ শিক্ষকতা—এই সুদীর্ঘ অন্ধকারের দিনের পরিচয় পাওয়া যায় এ সময় রচিত কবির কতকগুলি গল্প ও তিনটি উপন্যাসে। যার সন্ধান কবির জীবৎকালে মেলেনি। অবশেষে কবি ১৯৩৫-এ বরিশাল-এ ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজির স্থায়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। টানা এগারো বছর সেখানে অধ্যাপনা করেছেন। মাঝে ১৯৪৩-এ একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এসে বেড়িয়ে গেছেন। ১৯৪৬-এ দেশ বিভাগের বেশ কিছুদিন আগে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন, আর ফিরে যাননি। বছর দুয়েকের জন্য আবার বেকার। মধ্যে কয়েকমাস সঞ্জয় ভট্টাচার্যের চেষ্টায় 'দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকার রবিবারের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনা ভার পান। সে বছরের শারদ সংখ্যাও সম্পাদনা করেন। এরই মধ্যে স্পষ্ট হল সাংবাদিকতা তাঁর ধাতে নেই। ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি ছেড়ে দেন। এরপর বিজ্ঞাপন দেখে চাকুরি দরখাস্ত, বন্ধুদের কাছে আরজি জানানো। প্রায় আড়াই বছর বেকারিত্বের পর ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বরে খড়গপুর কলেজে চাকরি পান। সেখানে হোস্টেলে থাকতেন আর সুযোগ পেলেই চলে আসতেন কলকাতায়। নানা পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত জীবনানন্দ এ সময় দুশ্চিন্তাপ্রবণ হয়ে পড়েন। স্ত্রী বি. টি. তে ভর্তি হয়েছেন। বলা যায় সংসার তাঁরই ঘাড়ে- তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কবিও প্রায়ই ছুটি নিয়ে কলকাতায় থাকেন, অবশেষে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ তে চাকরি ছাড়েন। আবার বেকারি, আবার চাকরি খোঁজা। ১৯৫১ তে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রিসার্চ এসিস্টেন্টের জন্য এবং চারুচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা, অস্থায়ী ব্যবসা, আর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সুপারিশে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯৫২ তে লাবণ্য দাস বি.টি. পাশ করে স্কুলে চাকরি পেলে প্রাথমিক সমস্যা মেটে বটে কিন্তু উদ্‌বেগ কমেনি।

১৯৫২-র নভেম্বর থেকে ১৯৫৩-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার মাস বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে লিভ ভ্যাকেন্সিতে অধ্যাপনা করেন। কাগজ দেখে আবেদন পত্র পাঠিয়ে ১৯৫৩ মার্চে ফকিরচাঁদে কলেজ, ডায়মণ্ডহারবারে, গোপাল রায়ের সুপারিশে চাকরি হলেও সাংসারিক অসুবিধার কারণে যোগ দিতে পারেননি, ফলে টুইশন নির্ভরই জীবনই

চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৩-র মাঝামাঝি উক্ত শ্রীরায়ের চেষ্টাতেই অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের আনুকূল্যে জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনা পেলেন, সেখানেই আমৃত্যু চাকরি করেছেন। ইত্যবসরে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের তৎপরতায় ডি. পি. আই পরিমল রায়ের সাহায্যে এবং রাজ্য সরকারের এবং দিল্লির একটি কলেজে চাকরির সুযোগ এসেছিল, জীবনানন্দ যেতে চাননি। কলকাতায় এসময় কবি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে সহকর্মী ও ছাত্রীদের কাছ থেকে যেমন তেমনি কবি হিসেবেও ব্যাপক প্রীতি সমাদর ও মর্যাদা লাভ করছেন। কবিমহল ছাড়িয়ে তাঁর খ্যাতি বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবর্ধিত 'বনলতা সেন' ১৯৫২ তে সিগনেট প্রেস প্রকাশ করে। গ্রন্থটি নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক ১৯৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেল। ১৯৫৪ জানুয়ারিতে সিনেট হলের কবি সম্মেলনে কবি স্বরচিত পড়ে শোনালেন। এ বছরই ১৩ই অক্টোবর বেতারকেন্দ্রের কবি-সম্মিলনে কবিতা পড়লেন। ১৪ই অক্টোবর বিকেলে অন্যমনস্ক কবি রাসবিহারী ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগস্থলে ট্রামে চাপা পড়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভর্তি হলেন। সেভাবেই কয়েকদিন কাটল, শেষে সেপটিক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৪র ২২শে অক্টোবর রাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

কাব্যকথা—জীবনানন্দ শৈশবের মায়ের কাছে কাব্যচর্চার প্রেরণা পেয়েছেন। মা কুসুমকুমারী সংসারের কাজের ফাঁকে কাব্যচর্চা করতেন। স্বভাবকবির নৈপুণ্যে তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন। 'ব্রহ্মবাদী', 'মুকুল', ও 'প্রবাসী'তে তাঁর বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বাবা সত্যানন্দ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ব্রহ্মবাদী' সম্পাদনা করেন। এখানেই জীবনানন্দের 'বর্ষা আবাহন' শীর্ষক কবিতা এপ্রিল ১৯১৯ (বৈশাখ ১৩২৬) প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সদ্য বি. এ. পাশ করেছেন। কবিতাটির কোন অসামান্যতা ছিল না। পরে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে "দেশবন্ধু প্রয়াণে" বঙ্গবাণী'তে, এবং অন্যান্য কবিতা কল্লোলে, প্রবাসী, ধূপছায়া, বিজলী, কালিকলম, প্রগতি, কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা ৫৯৯টি (দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ কাব্যসংগ্রহ)।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'ঝরা পালক' (১৩৩৪), পুণর্মুদ্রণ (১৩৭৯),

২. 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৩৪৩), দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩) ;

৩. 'বনলতা সেন' (১৩৪৯), কবিতা ভবন সংস্করণ ; দ্বিতীয় সংস্করণ সিগনেট, (১৩৫৯) ;

৪. 'মহাপৃথিবী' (১৩৫১), পূর্বাশা সিগনেট সংস্করণ (১৩৭৬) ;

৫. 'সাতটি তারার তিমির' (১৩৫৫), ভারবি সংস্করণ (১৩৭৬) ;

৬. 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৩৬১), দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬৩) ; তৃতীয় সংস্করণ (১৩৬৭), চতুর্থ সংস্করণ (১৩৭০), ভারবি সংস্করণ (১৩৭৩) দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ (১৩৯০),

তারপর এ পর্যন্ত প্রকাশিত—

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

৭. 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭), দেবেশ রায় সম্পাদিত সং (১৯৮৪) ;

৮. 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৩৬৮) ;

৯. 'সুদর্শনা' (১৩৮০), ইং (১৯৭৩) ;

১০. 'মন বিহঙ্গম' (১৩৮৬), ইং (১৯৭৫) ;

১১. 'আলো পৃথিবী' (১৩৮৮), ইং ১৯৮১ প্রভৃতি।

প্রকাশক ঃ শ্রী গোপাল রায়, সাহিত্য সদন। এই গ্রন্থত্রয়ী তালিকাবদ্ধ হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা) 'জীবনানন্দ' পুস্তকে।

৩৬.৪ মূলপাঠ — ১ ঃ বনলতা সেন

বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হায়ায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেল পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী — ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

৩৬.৫ সারাংশ — ১

অনেক আবেগ আকাঙ্ক্ষা আকুলতা নিয়ে অন্বেষায় স্বপ্ন যখন ক্লান্ত, পথকে মনে হয়েছে দূরপ্রসারী, জীবনের চারিদিকে সফেন সমুদ্র উদবেল হয়ে উঠছে কিন্তু হাঁটার শেষ হয়নি — সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগর পর্যন্ত — বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ পেরিয়ে সুদূর বিদর্ভ নগরে হালভাঙা দিশেহারা নাবিকের কল্প জগতের সন্ধানে, এমনই সময় মিলেছে দুদণ্ডের শান্তি —

'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলেছে সে
এতদিন কোথায় ছিলেন ?'

আতপ্ত হৃদয় অবশেষে দিনের শেষে, সন্ধ্যা নামে জোনাকি জ্বলে, সেই অন্ধকারে সব কাজ সেরে মুখোমুখি বসবার অবকাশ পায়।

৩৬.৬ প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং কবিতা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

'বনলতা সেন' কবিতার প্রথম প্রকাশ 'কবিতা' পত্রিকায় (পৌষ ১৩৪২এ) মোট ১২টি কবিতা নিয়ে বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থে এটি সংকলিত হয়। 'কবিতা ভবন' প্রকাশিত এই গ্রন্থটির প্রকাশ পৌষ ১৩৪৯ ইং ডিসেম্বর ১৯৪২। গ্রন্থটি প্রকাশমাত্র নামকবিতা সহ কাব্যের সামগ্রিক আলোচনা করেন। 'কবিতায়' বুদ্ধদেব বসু ও 'চতুরঙ্গো' আবুল হোসেন চৈত্র, ১৩৪৯ ; 'একক'-এ শুদ্ধসত্ত্ব বসু বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'নিরুক্ত', আষাঢ় ১৩৫০ সংখ্যায় কবি জীবনানন্দ সম্পর্কে আলোচনাকালে 'বনলতা সেন' কবিতা সম্পর্কে তাঁর কথা বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, 'জীবনানন্দের কবিতার সুর একবার কানে লাগলে তাকে যে ভোলা শক্ত। দূর দেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গো আকাশ-বিহারী, কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে পদে অপ্রত্যাশিত। জীবনানন্দের জগৎ সম্পূর্ণরূপে চোখে দেখার জগৎ। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' আখ্যা দিয়েছিলেন। .... তাঁর কাব্য বর্ণনা বহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল। তাঁর কবিতা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তবে, প্রথমে দৃষ্টি, পরে স্পর্শ। তাঁর মন স্বভাবতই দৃশ্যবিলাসী ও স্পর্শ পিপাসু। ....জীবনানন্দ লিখেছিলেন, "উপমাই কবিত্ব।" তাঁর কবিতায় উপমার ছড়াছড়ি। তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দুরবগাহ। — কোন অভিনব বিশেষণ, কিংবা পুরানো বিশেষণের স্বকীয় ব্যবহার, এমনকি কোনো বিশেষ্য পদের রূপক প্রয়োগ — এ সমস্তই তো উপমা। — জীবনানন্দ যখন বলেন — বলেছে সে, "এতদিন কোথায় ছিলেন ?"

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। — তখন বোঝা যায় কবির মন কীভাবে কাজ করেছে। নাটোরের বনলতা সেনের যে চোখের সঙ্গো পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ এ সমস্তই যে কোনো সর্বদেশ কালব্যাপী ভাবের উপমা মাত্র তা উপলব্ধি করে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

আবুল হোসেনের বক্তব্য — জীবনানন্দ একান্তভাবেই বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গির প্রতীক। রবীন্দ্র ঐতিহ্যমুক্ত হয়েও, তিনি একান্তরূপেই রোমান্টিক। ভাবকে তিনি কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ছবি কি চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন।

.... কবির কাব্যের প্রাণ হল অদ্ভুত মিশ্রণে, অতীতের সঙ্গো বর্তমানের। পুরোনোর সঙ্গো নতুনের। অসম্ভবে-সম্ভবে এসে দেখেন নাটোরের বনলতা সেনকে সে পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বলে "এতদিন কোথায় ছিলেন ?" আকস্মিক বিস্ময়ের বিদ্যুৎ স্পর্শের শিহরণ সঞ্চারিত হয়। এটাই জীবনানন্দের টেকনিক। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর মতে 'বনলতা সেন' বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে অমর সৃষ্টি এবং রবীন্দ্রনাথের পর এত সুন্দর ও সার্থক রোমান্টিক কবিতা আর সৃষ্টি হয়নি বলা যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন জীবনানন্দ ইয়েটস-এর মতো অতীত জগতে আর স্বপ্নের বস্তুতে সৌন্দর্য খুঁজে পান। বনলতা সেন-এ এমন একটি জগতের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাঁর ব্যক্ত হয়েছে যেখানে হৃদয়ের ইচ্ছা আর অনুভূতির ও কল্পনার উল্লাস তৃপ্তি পেতে পারে। কবির প্রেম কাতর হৃদয় অতীতের সমস্ত মোহ যেন এখানে প্রকাশ পেয়েছে— তাঁর অন্তহীন প্রেমানুভূতি কেন্দ্রীভূত হয়েছে 'বনলতা সেন'-এ—

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য ....।" — নাটোরের একটি সাধারণ নারীকে — কবির প্রেমানুভূতি কারুকার্যখচিত করে তুলেছে। কবির আবেগের যেন কাব্যময় প্রতীক সে। বনলতা সেন' প্রেমের নিবিড়তায় মূর্ত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। যে রূপ জীবনানন্দ সৃষ্টি করেন আবেগের তাড়নায় তা শুধু দৃশ্যের বিষয়ীভূত নয়, তা উপলব্ধিরও—এখানেই জীবনানন্দের স্বচেতন স্বকীয়তা।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পর্বে কবিও কবিতা পত্রিকার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হল। তিরিশের দশকে যে কবির কাব্যযাত্রা শুরু প্রায় এক দশক পরে তার প্রাথমিক স্বীকৃতি লাভ ঘটল। এই বিলম্বিত স্বীকৃতির কারণও যে স্বয়ং জীবনানন্দের—তাঁর অন্তর্মুখী গহন মন, গভীরতর ভাবানুভূতি, তাঁর অভাবনীয় কল্পনার ঐশ্বর্য, শব্দ নির্বাচন ও চিত্র রচনার বিস্ময়কর ক্ষমতা। তাই 'বনলতা সেন' কবিতাটির বিচার বিশ্লেষণে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাটি এক সময় কাব্যালোচনার আসরে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। কবিতাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কেউ কেউ একে কবির শ্রেষ্ঠর রচনা বলেছেন।

তিন স্তবকে ১৮ ছত্রে রচিত কবিতাটি কতকগুলি অপ্রত্যাশিত শব্দযোজনায় এমন একটি অসামান্য কাব্য শিল্প সৃষ্টি করেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবিতাটির আরম্ভ 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'—যেন কোন দূরাগত কল্পনার জগতে জীবনের আভাস নিয়ে এসেছে—এই নিরন্তর চলার মধ্যে ইতিহাস-ভূগোল ছাড়িয়ে কিছু আছে। কিন্তু কবিতা কবির অনুভব থেকে সৃষ্ট—এর উৎস, আদি-অন্ত্য সন্ধান দূরবগাহ। তাই সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর বিম্বিসার অশোকের বস্তু জগৎ থেকে কল্পনা ব্যঞ্জনার্থ সন্ধানই স্বাভাবিক। এ থেকে একটি দেশে ও কালে ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ জগতের যখন আভাস আসছে, তার মধ্যে অকস্মাৎ কোনো পরিচয়হীনা নাটোরের বনলতা সেন, যার প্রসঙ্গ টেনে তারই কাছে জীবনের সফেন সমুদ্রে ভাসমান নিদারুণ অস্তিত্বের ভারে ক্লান্ত প্রাণের দুদণ্ড শান্তি পাওয়ায় সংবাদ—বস্তুত, সেই রমণীয় অসামান্যতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উপস্থাপনার অভিনবত্বে নাটোরের বনলতা সেন কাব্য রসিকের কাছে হেলেন বা বিয়াত্রিচের মতো চিরকালের একটি স্মরণীয় প্রতিমা হয়ে আছে।

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

কবিমানসী সম্পর্কে আধুনিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ থেকে একটু স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁরা মনোলোকের বাসিন্দা, অদেহী—প্রকৃতির বিচিত্র মহিমায়—সন্ধ্যার রক্তিম বর্ণে, উষার কনক স্বর্ণে, নীল আকাশের নীলিমায়-স্বপনচারিণী। বুদ্ধদেব-জীবনানন্দ-বিষ্ণুদের কাছে তারা শরীরী রক্তমাংসের নারী—তাই তাদের নাম রূপ আছে—এমনকী জীবনানন্দে গাঁই গোত্রটি পর্যন্ত—নাটোরের বনলতা সেন। রোমান্টিক প্রেমের অতীন্দ্রিয় অমূর্ত নায়িকা এখানে দেহী এবং ভৌগোলিকতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই পরবর্তী স্তবকেই তাঁর একটি বর্ণনা পাই। বনলতার উপস্থাপনা পর্বে—তাঁর দুদণ্ডের শান্তি দেওয়ার জন্য যে প্রশান্ত মাধুর্য পাঠক উপলব্ধি করেছে, তাতেই অনুভব করা গিয়েছে তার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের আকর্ষক ও পরম রমণীয়তা। কবির দেওয়া বর্ণনায় জানা যায় কবি কী করে তিলে তিলে তাকে সৃষ্টি করেছেন—শব্দকে কত সহজে ব্যবহার করে একটি অপরূপ সৌন্দর্যের জগৎ সৃষ্টি করা যায়। চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা। মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য। কালিদাসের কল্পনা সৃষ্টি সৌন্দর্য জগতের সেই অস্পষ্ট কল্প জগতের বিদিশার অন্ধকার রাত্রির থেকেও কালো যাঁর চুল, মুখ যাঁর প্রাচীন ভাস্কর্যকলার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো—এমনই একজন বনলতা সেন। এই উল্লেখেই পাঠক কবির সঙ্গে কবি অনুভূত সৌন্দর্য জগতে বিচরণ করে এমন কোনো এক রমণীয় রূপকে কল্পনা করেছেন যা ইতোপূর্বে কেউ করেনি। জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে যেন এক অপ্রত্যাশিত জগতের আরও এক অপ্রত্যাশিত নারীর সন্ধান দিলেন, যা ছিল এতদিন একেবারেই অভাবনীয়। বনলতা সেন, তাই এক সচকতি-করা কবিতা। আজও বনলতার চোখের বর্ণনা—'পাখির নীড়ের মতো চোখ'—শুধু একটি চিত্রকল্প নয়, তা যেন গভীরতর ব্যঞ্জনায় সঞ্চার করে অন্তর্লোককে আচ্ছন্ন করে। এদিক থেকে পাখির নীড় শুধু নীড় নয়, পাখিদের ক্লান্তি অপনোদন ও শান্তির নীড়। সেই বিশ্রান্তি ও শান্তির আশ্বাস আছে বনলতার চোখে—সে চোখ আশ্রয় দেয়, ক্লান্তি অপনোদন করে, শান্তি দেয়। উপমাটি এদিক থেকে সার্থক। কবিতাটি এখানেই শেষ হয়নি। এরপর জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে আপাত বিষাদময় গোধূলির এক নিঃসঙ্গ জগতে নিয়ে গেছেন—"সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী"—এই প্রত্যাবর্তনের বার্তা মাত্র দুটি শব্দে বিধৃত হলেও, এর গভীরতা সুদূর প্রসারী। কবি কবিতার প্রথমেই কাল স্রোতের প্রবহমানতার ইঙ্গিতের (হাজার বছর ধরে পথ হারায়) সঙ্গে চিরন্তন নিঃসঙ্গতার সহজ সত্যের আভাস দিয়েছেন, তা দ্বিতীয় একটি ঘটনার পটভূমি রচনা করেছে। 'সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন'—জীবনের দুকূল বেয়ে চলার নদী বা কালপ্রবাহের পরেও অবশিষ্ট থেকে যেটুকু সময়, সেটিই তো কবির কল্পজগৎবাসিনী কবি মানসীকে একান্ত আপন করে পাবার মুহূর্ত — "মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন"—বনলতা সেন তারই মূর্ত প্রতীক। বনের লতা যেমন চির শ্যামলতার প্রতীক তেমনি বনলতা সেনও মানবীয় সৌন্দর্যের দীপ্তিময় প্রকাশ—সে ক্লান্তিহারী শান্তির নিশ্চিত আশ্রয়। এদিক থেকে কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা হিসেবে ধরা যায়, কিন্তু কবিতাটির কোথাও বনলতাকে প্রিয়া সম্বোধন বা কল্পনা করা হয়নি—কবির আচরণেও তার আভাস নেই। তাই কবিতাটিকে বলা যায় নির্বিশেষে প্রেমের কবিতা—নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নয়, পারস্পরিক আকর্ষণ এই কবিতাটিকে অনেকটা রহস্যময় করেছে।

কোনো কোনো সমালোচক এজন্য বনলতা সেন কবিতায় মহাসময়ের সঙ্গে মহাজীবনের অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান জীবনকে দেখেছেন। তাঁদের মতে কবি যেমন বর্তমান সময়গ্রন্থিতে নিবিষ্ট, নাটোরের

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

বনলতা সেন তেমনি আছেন। এতে যেমন অন্ধকার অতীত ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ মাঝে দুদণ্ডের শান্তির বর্তমান—কিন্তু সেও অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাই মিলন মুহূর্তেই বলেছে—'এতদিন কোথায় ছিলেন ?' ইতিহাসের অতীতের জীবনবোধের যে কল্পছবি কবির মনে ধরা পড়েছে, তা-ই তিনি দেখতে পেয়েছেন নাটোরের বনলতা সেন ও যাঁর 'চুল .... কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশার' মতো, তাঁর মুখ যেন "শ্রাবস্তীর কারুকার্য"। কালপ্রবাহে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একাকার হওয়ার কথাই এ কবিতার কথা — মনে করেছেন কিছু সমালোচক। এভাবে কবিতাটিকে চিরন্তনের সিংহাসনে স্থাপিত হয়েছে বনলতা সেন। অপর সমালোচক ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু এই কালচেতনার মধ্যে ইতিহাসবোধ, ইতিহাস চেতনাকে অধিকার করেছেন। তাঁর ভাষায়—"কবি তাঁর মানসপরিমণ্ডলে প্রেম হোক আর প্রকৃতি হোক, কিম্বা জীবনের বিবিধ বোধের ব্যাপারই হোক, কালজ্ঞান এবং ইতিহাস চেতনার বেধ ও পরিধিতেই তিনি তার রূপদান করতেন।"

তাঁর প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও ইতিহাসচেতনার সঙ্গে ভৌগোলিক পরিসরের ব্যাপ্তিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'বনলতা সেন' কবিতায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে—"এমন কি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষ জীবন-সংগ্রামে নিরত থেকেও নারীর প্রতি ভালোবাসা থেকে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকেনি। হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথ হাঁটার প্রতীকতায় সেই চেতনাই উদ্ভাসিত হয়েছে। অতীতের শ্রাবস্তীপুরীর শিল্পী নিজ অন্তরের সংবেদনশীলতায় যে প্রতিমা নির্মাণ করেছেন—সেই মমতার প্রতিচ্ছবি বনলতা সেনের মুখে। একবার সিংহল সমুদ্র, পরমুহূর্তেই মালয়-সাগর, বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগৎ থেকে অবশেষে বর্তমানে নাটোরের বনলতা সেনকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে কালচেতনার কথা বলেছেন—"কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা এবং মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।" এই ইতিহাস চেতনাও কালজ্ঞান কবির মনোলোককে উদ্বেল করলেই, তিনি ঐতিহ্যের অধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই "অপরিহার্য সত্যটি" তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

এই কারণেই তিনি তাঁর নায়ক নায়িকার নামের সঙ্গে উপাধি বসিয়ে বাস্তববোধ সঞ্চার করে তাঁদের প্রত্যক্ষগম্য করে তুলেছেন। এজন্যই তিনি অনায়াসে অতীতের শ্রাবস্তী থেকে বর্তমানের নাটোরের মুহূর্তে পাড়ি জমাতে পেরেছেন। জীবনানন্দের কল্পনার এই অভাবনীয় ব্যাপ্তি প্রসৃত সময়সীমা ও ভূগোলচেতনার এই বিস্ময়কর ও অভিনব সমীভবনের জন্যই তাঁর পাঠকদের চমকিত করেছে।

জীবনানন্দের কবিতায় শুধু কাল-ইতিহাস-কল্পনার কথাই বা বলি কেন, তাঁর প্রকৃতিতে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখবার, উপভোগ করবার ও পাঠককে সেই অনুভূতির অংশীদার করবার জন্য অসাধারণ সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধু চোখ দিয়ে প্রকৃতির রূপ মাধুরী দেখেননি, কান দিয়ে তার ধ্বনি মাধুর্য শুনেছেন, মন দিয়ে তিনি ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুকে অনুভব করেছেন। এভাবে তাঁর রোমান্টিক অনুভূতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে তাঁকে এক ইন্দ্রিয়ের বস্তু অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। যেমন, আলোচ্য বনলতা সেন কবিতার তৃতীয় স্তবকে 'শিশিরের শব্দ' 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ'। সাধারণ অভিজ্ঞতায় ভাবা যায় না। রোদের বর্ণ নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয় হলেও, গন্ধ তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের। কিন্তু কবি তাঁর তীব্র ও গভীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়ে রৌদ্রের ঘ্রাণ উপলব্ধিগম্য

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

করে নিয়েছেন। এখানেই ফুটে উঠেছে কবির ইন্দ্রিয় সচেতনতা—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় sensuousness বা ইন্দ্রিয়ঘনত্ব। এরকম আরও অনেক উদাহরণ জীবনানন্দের কবিতায় পাওয়া যায়—'ঘুমের ঘ্রাণ', 'বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ'।

জীবনানন্দ কাব্য শরীর সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের কৌশল, পদবিন্যাস, উপমা ব্যবহার বাকপ্রতিমার রূপনির্মিতিতে তিনি একক ও অনন্য। নিজের ভাষা বলয়ে তিনি বার বার আবৃত হয়েছে। তিনি তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের পাশাপাশি অপ্রচলিত শব্দ, গ্রাম্যশব্দ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। কাব্যের কায়াগঠনে এরা দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এক আশ্চর্য মায়াময় জাদু সৃষ্টি করেছে। শেষের দিকে জীবনানন্দের সমাজ সচেতনতা এবং বাস্তববোধ সম্পর্কিত কিছু কবিতায় বিক্ষিপ্ত চিন্তার ভাবজনিত কারণে অতি দ্রুততায় চিত্র থেকে চিত্রান্তরে গিয়েছেন। ফলে কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ অসংগতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'বনলতা সেন' এদিক থেকে একটি নিটোল শিল্পরূপময় কবিতা। এ কবিতার কোন শব্দই দুরূহ বা নতুন নয়। কোথাও কোনো শব্দকে নিয়ে কষ্ট কল্পনার অবকাশ নেই। চিত্ররচনায় অনন্য ও অসামান্য এক শিল্পিত মননের পরিচয় আছে। 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ', 'সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর', 'জোনাকির রঙে ঝিলমিল' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ যে চিত্র তুলে ধরেছে। তা শব্দার্থকে অতিক্রম করে নতুনতর ব্যঞ্জনায়, অন্যতর ভিন্নতর অর্থ দ্যোতনা করে। এবং সেটি মন ও অনুভূতি নিয়ে বোঝবার বিষয়। এ না হলে নিছক অভিধানের শব্দার্থ দিয়ে এর মর্মার্থ বোঝা সম্ভব নয়। জীবনানন্দের ছত্র—'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে' বা 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'—ধ্বনি সুষমা তাঁর রোমান্টিক মনটিকে তুলে ধরবার সঙ্গো, পাঠকের চৈতন্যের গভীরে সাড়া দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

ছন্দ ব্যবহার জীবনান্দ মিশ্রকলাবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দেই অনেকটা স্বচ্ছন্দ। 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি ৮ + ৮ + ৬ মাত্রার তিনটি পর্বে ২২ মাত্রার ছত্রে বিন্যস্ত করেছেন।

> হাজার বছর ধরে / আমি পথ হাঁটিতেছি / পৃথিবীর পথে,
> সিংহল সমুদ্র থেকে / নিশীথের অন্ধকারে / মালয় সাগরে
> অনেক ঘুরেছি আমি ;/

এর মিলের ক্ষেত্রেও কিছু অভিনবত্ব আছে। মিলবিন্যাস মূলত একান্তরিক, অর্থাৎ প্রথম স্তবকে প্রথম-তৃতীয়, দ্বিতীয়-চতুর্থ, কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠে দ্বিপদী মিল। দ্বিতীয় স্তবকে অনুরূপ মিল থাকলেও ছত্রের মাত্রা বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে। তৃতীয় স্তবকেও মিল একই রকম তবে ছত্রের মাত্রাবিন্যাস ভিন্নতর।

অলঙ্কার প্রয়োগে উপমা কালিদাসস্য-র পর বোধ কবি জীবনানন্দের কথা বলতে হয়। "উপমাই কবিত্ব"—এ কথার কথক-এর কয়েকটি উদাহরণ 'বনলতা সেন' থেকেই দেওয়া হল ঃ

* "ডানায় রৌদ্রের গন্ধ"
* "চুল তার কাব্যের অন্ধকার বিদিশার নিশা"
* "বলেছে সে — এতদিন কোথায় ছিলেন ?

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।”

দুটিই লুপ্তোপমার উদাহরণ। দুটিতেই উপমান ও উপমেয় থাকলেও সামান্য ধর্ম অনুপস্থিত। দ্বিতীয়টিতে চোখ উপমেয়, পাখির নীড় উপমান, মত সাদৃশ্যবাচক শব্দ কিন্তু সামান্য বা সাধারণ ধর্মের উল্লেখ নেই। পাখির নীড় যেমন স্নিগ্ধ ও শান্ত, বনলতা সেনের চোখও তেমনি স্নিগ্ধ ও শান্ত—এটি পাঠককে ধরে নিতে হয়েছে।

যে কোনো মহৎ কবির মতো জীবনানন্দের কবিতার উৎস তাঁর মনে, তাঁর অনুভবে—অন্তর্লোকের রহস্যময় পথে তার জন্ম। এই জন্মের সঙ্গো সহজাত তার শব্দ-ছন্দ-ধ্বনি-অলংকার। এ সবই ভাব ভাবনাকে রঙ, রূপে, রসে প্রকাশের জন্য—অর্থে ও ব্যঞ্জনায়। তিনি জগৎ ও জীবনকে ভালোবেসেছিলেন—প্রকৃতি ও প্রেম হাত ধরাধরি করে তাঁর কবিতায় নানা উপমায় প্রতীকিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কালে কালোত্তরে। ‘বনলতা সেন’ এ যুগের কবিতা পাঠককে ‘প্রথম পাঠ’ হিসেবে নতুনতর পথ দেখিয়েছে।

প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা ঃ

হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি — হাজার বছর ধরে কোনো মানুষের পক্ষে পথ হাঁটা সম্ভব নয়, তথাপি এ শব্দ গুচ্ছের ব্যঞ্জনায় সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ব্যাপ্ত অন্তহীন পরিক্রমা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বাস্তবের সত্য নয়, কবির অনুভবের সত্য। জীবনের সফেন সমুদ্র মন্থন করতে করতে এই অনন্ত যাত্রার জন্যই ক্লান্ত প্রাণ দুদণ্ডের শান্তি প্রত্যাশা করে। অন্বিষ্ট সেই অধরা ভাবের যদি মূর্ত প্রত্যক্ষ রূপ হয় বনলতা সেন, তার পক্ষেই সে শান্তির আশ্রয় দেওয়া সম্ভব।

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক — ক্লান্তি ও মৃত্যুচেতনা জীবনানন্দের মতো এ যুগের অনেক আধুনিক কবির অন্যতম প্রধান সুর। এই চেতনা অবশ্য সব সময় দৈহিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জাগ্রত হয়নি। যুগের বন্ধ্যা রূপ, অচরিতার্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এর উৎসার। রবীন্দ্র-কবিভাবনায় রোমান্টিক হৃদয়াবেগ মানসী, মানসসুন্দরীর ভাব ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হত। আধুনিক কবিরা বস্তুবিশ্বে, ভাব ব্যঞ্জনার পরিবর্তে সব কিছুকেই শরীরী করতে চেয়েছেন, তাই জীবনানন্দও তাঁর কাব্যে প্রধানত বাস্তব সূত্রকে অবলম্বন করে তাকে প্রকাশ করেছেন। অন্তহীন পথ চলার শেষ নেই, তথাপি ক্লান্ত দেহমন-এর ভারাক্রান্ত রূপটি এ ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছেন নাটোরের বনলতা সেন—

অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—“বিশেষ লক্ষ্য করতে হবে ‘দু-দণ্ড’ শব্দ বন্ধ। এই শান্তি ক্ষণকালীন, কারণ মানুষের যাত্রাপথে আশ্রয়, শান্তি ও স্থিতির ধ্রুব আশ্বাস নিয়ে কোনো বনলতা সেনের আবির্ভাব ঘটেনি। ইতিহাসের কোনো কোনো সিদ্ধ লগ্নে চকিত-উদ্ভাসে হঠাৎ কখনও দেখা যায় তাকে, যেমন কবি দেখেছিলেন তাঁর বিশ্বাসী কৈশোরে, নাটোরের কোনো এক বসন্তের ভোরে।”

সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী ফুরায় — এ-জীবনের সব লেনদেন— ‘সব নদী’ শব্দ যুগ্মের সংকেত একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। দিনান্তে পাখির ঘরে ফেরা, তার শান্তি নীড়ে ফেরা। নদী ফুরায় জীবনের লেনদেন — অংশটির তাৎপর্য হল নদী ও মানুষের জীবন বস্তুত একটি প্রবহমান ধারা — জীবনের লেনদেন মিটিয়ে যেমন মানুষের জীবনাবসান, নদীও তার উৎস থেকে নিরন্তর চলার পর সে মহাসমুদ্রে তার চলার অবসান হয় অর্থাৎ সমুদ্রে লীন

হয়ে নদী তার নিজস্বতা হারায়। মানুষও তার জীবনের সমস্ত কর্ম অবসানে, জীবনের সমস্ত দেনাপাওনা সেরে, নীল মৃত্যু উজাগর অন্ধকারে বিলীন হয়।

অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। অন্যান্য প্রশ্নের জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা অংশগুলি ভালো করে পড়ুন। উত্তর করতে পারবেন।

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) অনেক ঘুরেছি আমি ; ________ ________ ধূসর জগতে

সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে ________ ________,

খ) সমস্ত দিনের শেষে ________ ________ মতন

________ আসে ; ডানার ________ ________ মুছে ফেলে চিল ;

গ) জীবনানন্দের প্রথম কবিতা ________ প্রকাশ ________ পত্রিকায়, বৈশাখে ________ ।

ঘ) জীবনানন্দের জন্ম ________ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ________ খ্রিস্টাব্দে।

ঙ) নজরুলের ________, যতীন্দ্রনাথের ________ এবং মোহিতলালের ________

উচ্চারণ তৎকালে নতুন এক ________ নিয়ে আসে।

২) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩) কবি মোহিতলাল মজুমদারের কবিকৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪) 'কল্লোল'-'কালিকলম' পত্রিকার সমসাময়িক দুটি পত্রিকার নাম করুন।

৫) 'পরিচয়' পত্রিকার আবহাওয়ায় লালিত তিনজন কবির নাম উল্লেখ করুন।

৬) বুদ্ধদেব বসুর শেষের দিকের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

৭) জীবনানন্দ স্বল্প সময়ের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকায় কাজ করেছেন। পত্রিকাটির নাম কী ?

৮) জীবনানন্দের এ পর্যন্ত সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা কত ?

৯) 'উপমাই কবিত্ব' কে বলেছেন ?

১০) 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি 'কবিতা ভবন' প্রকাশিত সংস্করণ করে প্রকাশিত হয়েছে ?

১১) জীবনানন্দ কথিত 'কালচেতনা' বিষয়টি একটু বুঝিয়ে লিখুন।

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof

৩৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ)—জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ।

২) অম্বুজ বসু—একটি নক্ষত্র আসে।

৩) ড. শুদ্ধাসত্ত্ব বসু—কবি জীবনানন্দ।

৪) সঞ্জয় ভট্টাচার্য—কবি জীবনানন্দ দাশ।

৫) অরুণ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্রনাথ ঃ আধুনিক বাংলা কবিতা ও নানা প্রসঙ্গ।

৬) ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়।

৭) প্রভাতকুমার দাস—জীবনানন্দ দাশ।

৮। পবিত্র মুখোপাধ্যায়—সূর্যকরোজ্জ্বল কবি জীবনানন্দ।

৯। অনুষ্টুপ ঃ জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা—১৪০৫।

M#2\D:\EBG-2\Unit-16 Pm6.5\1st proof